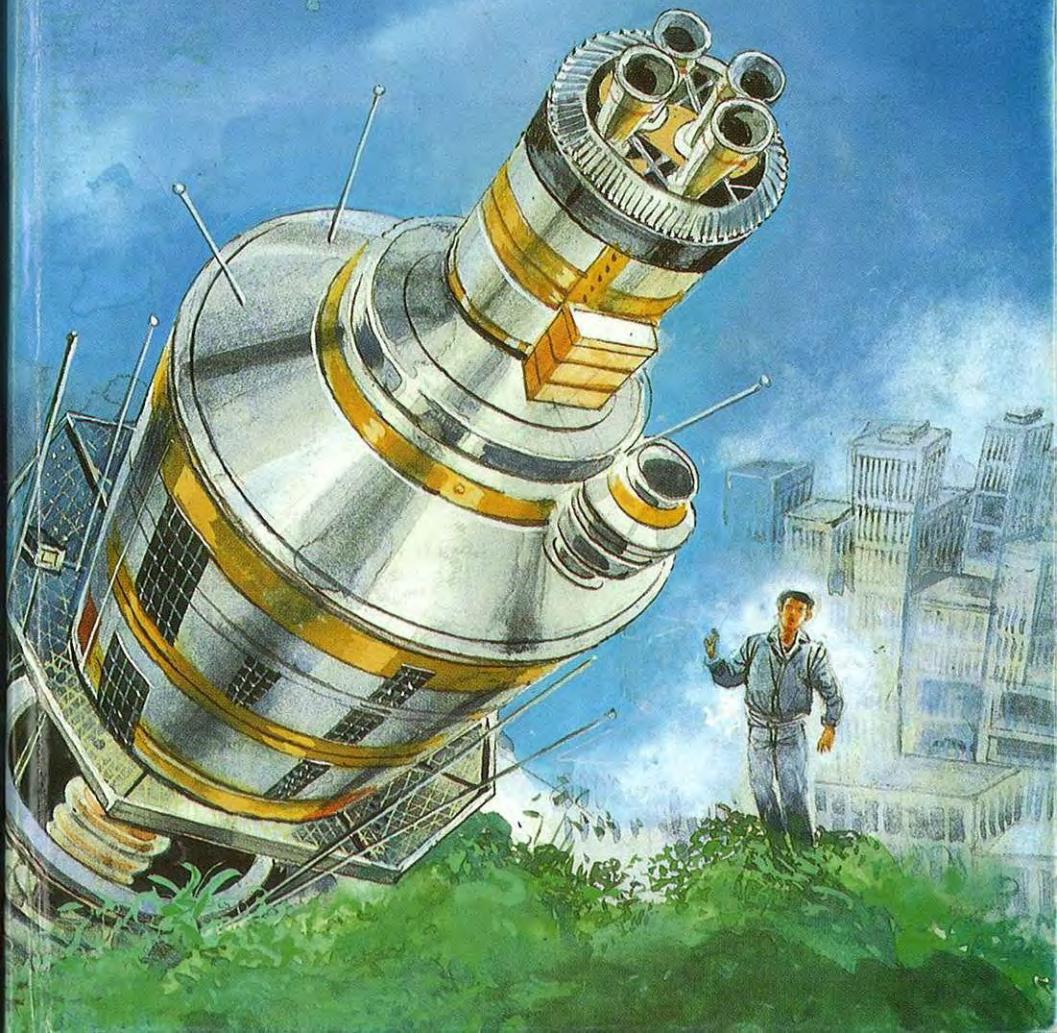


সমরেশ মজুমদার

অ র্জু ন স ম গ / ২



অর্জুন সমগ্র

সমরেশ মজুমদার

Pathagar.net

সূচিপত্র

কালাপাহাড় ৭
অর্জুন বেড়িয়ে এলো ১১১
রহ্মগর্ভ ২৪১

ফুলে বিশ্বের গন্ধ ৩৯৩

গ্রন্থপরিচয় ৫০৭

Pothagarsho.net



କାଳାପାହାଡ଼

ସମରେଶ ମଜୁମଦାର

PathagarOnline

লাল রঙের নতুন মোটরবাইকটাকে ইতিমধ্যে জলপাইগুড়ি শহরের অনেকেই চিনে গিয়েছে। শহরের সবাই জানে রোজ সকাল আটটায় বাইকটা কদমতলা থেকে রূপশ্রী সিনেমার সামনে দিয়ে থানাটাকে বাঁ দিকে রেখে একটু এগিয়েই বাঁ দিকে করলার ধার ঘেঁষে হাকিমপাড়ার দিকে চলে যাবে। কেউ-কেউ তো ওই ঘাওয়া দেখেই বুঝে নেয় এখন আটটা বাজে। মোটরবাইকটা চালাতে খুব অরূপ পায় অর্জুন।

বাইকটা উপহার দিয়েছেন নদিনীর বাবা দিল্লির মিস্টার রায়। সেই যে নদিনীরা চার বন্ধু মিলে নর্থবেঙ্গলে বেড়াতে এসে বামেলায় পড়েছিল, তা থেকে উদ্ধার করেছিল বলে তিনি ওই উপহারটি দিয়েছেন। অবশ্যই উপহারটি এসেছিল অমলদার মারফত।

প্রত্যেক সকালে লাল বাইক চালিয়ে অমল সোমের বাড়িতে যাওয়া অভ্যেস অর্জুনের। সেখানে গিয়ে বাইপত্র ঘাঁটে, হাবুর দেওয়া চা খায়। কখনও-সখনও মেজাজ ভাল থাকলে অমলদা গল্প করেন। সতোসন্ধানের ব্যাপারে তিনি এখন খুব সক্রিয় ভূমিকা নেন না বটে, তবে থানার নতুন দারোগা শ্রীকান্ত বঞ্চি সমস্যায় পড়লেই ওঁর কাছে ছোটেন।

আজ রূপশ্রী পেরিয়ে থানার সামনে আসতেই অর্জুন দেখল থানার গেটের সামনে শ্রীকান্ত বঞ্চি এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছেন। পাশেই নীল রঙের অ্যান্ডাসাডার দাঁড়িয়ে আছে। ওকে দেখতে পেয়েই দারোগাবাবু হাত তুললেন, “তোমার জন্য দাঁড়িয়ে আছি হে।” অর্জুন গতি থামাল।

শ্রীকান্ত বঞ্চি এগিয়ে এলেন, “আমাকে এখনই একটু বেলাকোবায় যেতে হবে। এঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। ইনি হরিপদ সেন। আমার কাছে এসেছিলেন অমলবাবুর ঠিকানার জন্য। থাকেন দমদম এয়ারপোর্টের কাছে। এর নাম হল অর্জুন। আমাদের শহরের গৌরব ও। অনেক রহস্য উদ্ধার করেছে। অমলবাবুর শিষ্য।”

অর্জুন নমস্কার করতেই ভদ্রলোক প্রতিনমস্কার করলেন। অর্জুন বলল, “ওই

গাড়িটা কি আপনার ?”

ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন, “না, শিলিগুড়ি থেকে ভাড়া করেছি ।”

“ও । আপনি ভ্রাইভারকে বলুন আমাকে ফলো করতে ।”

করলা নদীর ধার দিয়ে যেতে-যেতে পেছনে তাকিয়ে সে. দেখল, গাড়িটা ঠিকঠাক আসছে । একেবারে কলকাতা থেকে কোনও ক্লায়েন্ট অমলদার খোঁজে আসছে মানে কেউ ওঁকে আসতে বলেছেন । অমলদা নিজে সক্রিয় ভূমিকা নেন না যখন, তখন তাকেই কাজটা করতে হবে । কী ধরনের কাজ তা আন্দাজে না এলেও বেশ উন্নেজনা বোধ করছিল সে । কলকাতায় যেতে হবে নাকি এ-ব্যাপারে ?

অমল সোমের বাড়ির গেটে বাইক থামিয়ে সে হাত তুলল । গেট খুলে বাইকটাকে ভেতরে ঢুকিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে দেখল ভদ্রলোক গাড়ি থেকে নেমে পড়েছেন । সে বলল, “এটাই অমলদার বাড়ি । আসুন আমার সঙ্গে ।”

একটু এগোতেই হাবুকে দেখতে পাওয়া গেল বাগানে । মরা পাতা ছাঁটছে । ইশারায় অমলদাকে খবর দিতে বলতেই দাঁত বের করে দেখিয়ে হাবু ভেতরে চলে গেল । বসার ঘরের দরজা খোলা । বারান্দায় উঠে অর্জুন ভদ্রলোককে বলল, “আপনি একটু ভেতরে বসুন ।

ভদ্রলোক বললেন, “বাঃ, বেশ বড়-বড় ফুল হয়েছে তো !”

অর্জুন হাসল, “এ-সবই হাবুর কৃতিত্ব । ওর জিভ কথা বলতে পারে না কিন্তু হাত কথা বলে ।”

“হাত কথা বলে ?” হরিপদ সেন মাথা নাড়লেন, “চমৎকার বললেন ভাই ।”

হরিপদ সেনের বয়স ষাটের ধারেই । একটু অস্বস্তি হলেও আপনি বলার জন্য এখনই আপত্তি করল না অর্জুন । কাজ করতে গিয়ে নানান মানুষের সংস্পর্শে এসে এটুকু পরিবর্তন হয়েছে । সে হরিপদ সেনের চেহারাটা দেখল । হাওয়াই শার্ট-প্যান্ট-চশমায় বেশ নাদুস-নুদুস চেহারা । পায়ে বেশ দামি জুতো । শিলিগুড়ি থেকে ট্যাঙ্কি ভাড়া করে রেখেছেন, মানে পকেটে ভাল টাকা আছে । লোকটার আঙুলে কোনও আংটি নেই । চেয়ারে বসার পর বোঝা গেল ডান হাতের কড়ে আঙুল অনেকখানি বাঁকা । ইনি কী করেন তা সে আন্দাজ করতে পারল না ।

“আপনি এদিকে এর আগে এসেছেন ?” অর্জুন সময় কাটানোর জন্য প্রশ্ন করল ।

“অনেকবার ।” ভদ্রলোক আর কথা বাড়ালেন না ।

বিদ্যাসাগরী চট্টির আওয়াজ পাওয়া গেল । ইদানীং অমলদার খুব পছন্দ ওই চট্টি । ভেতরের দরজায় শব্দটা থাকতেই অমলদাকে দেখা গেল । ঝুল ফতুয়া আর পাজামা পরা । দেখা হওয়ামাত্র বললেন, “ওহে অর্জুন, তোমার-আমার

জন্য একটা ভাল খবর আছে।” তারপরেই হরিপদবাবুর ওপর নজর যাওয়া হত্তেই দুটো হাত জোড় করে বললেন, “ন্মস্কার। আমি অমল। আমার বাড়িতে আপনি এসেছেন, আগে আপনার সঙ্গেই কথা বলা উচিত ছিল। বসুন, বসুন।” বলতে-বলতে একটি চেয়ার টেনে নিলেন তিনি। হরিপদবাবু মৃদু হেসে বললেন, “আমি আপনার নাম শনেছি আমাদের প্রোফেসর বনবিহারী ভট্টাচার্যের কাছে। একটি অত্যন্ত জরুরি প্রয়োজনে সাহায্যের আশায় আপনার কাছে চুড়ে এসেছি আমি।”

অর্জুন বলল, “থানার সামনে শ্রীকান্তবাবু ওঁকে নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন।” অর্জুন আলাপ করিয়ে দিল।

“শ্রীকান্তকে আগেই চিনতেন?” অমলদা জিজ্ঞেস করলেন।

“না, না। আপনি জলপাইগুড়িতে আছেন এইটকুই জেনেছিলাম। ভাবলাম, থানায় গেলে নিশ্চয়ই আপনার ঠিকানাটা জানা যাবে।”

হরিপদবাবু দুই হাঁটুর ওপর হাত রেখে সোজা হয়ে বসলেন।

“আপনার সমস্যাটা কী?” খুবই অনাগ্রহ নিয়ে প্রশ্ন করলেন অমলদা।

“একটি মানুষের গতিবিধি বের করতে হবে আপনাকে।”

“ওঁ, সবি। এজন্য কলকাতা থেকে এতদূরে এলেন কেন? কলকাতায় অনেক এজেন্সি আছে, যাদের বললে সাগ্রহে করে দেবে।” অমল সোম উঠে দাঁড়ালেন।

“আপনি একটু শুনুন মিস্টার সোম। আমি জানি প্রস্তাবটা খুবই হাস্যকর শোনাবে, কিন্তু উপায় নেই। সাধারণ ডিটেকটিভ এজেন্সির পক্ষে কাজটা করা সম্ভব নয়। প্রফেসর বনবিহারী আমাকে বললেন আপনিই ঠিক মানুষ। আমি যাঁর গতিবিধি জানতে চাই তিনি এখনকার মানুষ নন। তিনি ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দে মারা যান।”

“অদ্ভুত। ইন্টারেন্সিং।” অমল সোম বসে পড়লেন আবার, “এতদিন জীবিত মানুষ নিয়ে কাজ করেছি! মৃত মানুষ, তাও আবার চারশো দশ বছর আগে মৃত মানুষের কেস নিয়ে কেউ আসবেন ভাবতে পারিনি। মানুষটির নাম কি আমরা জানি?”

“জানা স্বাভাবিক। অস্তত ইতিহাসের বইয়ে দু-চার লাইন প্রত্যেকেই একসময় পড়েছি। ওঁর নাম যাই হোক, ইতিহাস ওঁকে কালাপাহাড় নামে কুখ্যাত করেছে।”

“কালাপাহাড়!” অমলদাকে এমন বিশ্বিত হতে অর্জুন এর আগে কখনও দেখেনি।

হরিপদ সেন কথা বলতে যাচ্ছিলেন, এই সময় হাবু এল চায়ের ট্রে নিয়ে। দেইসঙ্গে জলপাইগুড়ির সূর্য বেকারির তৈরি সুজির বিস্কুট। দামি কম্পানির বিস্কুটে আজকাল মন ভরছে না অমলদার। অর্জুন জানে এই বিস্কুট মাসখানেক

এ-বাড়িতে চলবে । কিন্তু চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়েও সে হরিপদ সেনকে অবাক হয়ে দেখছিল । কালাপাহাড় লোকটি সম্পর্কে সে ইতিহাসে যা পড়েছে তাতে ভয়ই হয় । ওর নামকরণেই সেটা বোঝা যায় । এমন একটি মানুষের গতিবিধি জানতে চারশো বছর পর কেউ উৎসুক হবেন কেন ?

অমলদার জন্য চা আসেনি । তিনি এ-সময় চা খান না । বললেন, “মিস্টার সেন, আপনি কি কলেজে-টলেজে ইতিহাস নিয়ে পড়াচ্ছেন ?” মাথা নাড়লেন ভদ্রলোক, “না, না । আমার একটা ছেটখাটো ব্যবসা আছে ।” চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে ভদ্রলোক বললেন, “চমৎকার চা । দার্জিলিং-এর ?”

অমলদা হাসলেন, “না । এটা ডুয়ার্স অসম দার্জিলিং মিলিয়ে একটা ককটেল ।”

হরিপদবাবু নিবিষ্ট মনে কয়েক চুমুক দিয়ে বললেন, “কালাপাহাড় এ-অঞ্চলে দীর্ঘকাল ছিলেন । ইতিহাস বলছে লোকটি অত্যন্ত ভয়ানক । কিন্তু আমার কাছে প্রমাণ আছে তিনি খুবই নিঃসঙ্গ ছিলেন । এই উন্নরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়, তখন অবশ্য জেলা হিসেবে চিহ্নিত ছিল না, উনি ঘোরাফেরা করেছেন । কিন্তু কোথায়-কোথায় ছিলেন এই ডিটেলস পাওয়া যাচ্ছে না । আপনারা যদি-সেটা বের করে দেন... ।”

“কেন ?” আচমকা প্রশ্নটি বেরিয়ে এল অর্জুনের মুখ থেকে ।

অমলদা মাথা নাড়লেন, “গুড় । এই প্রশ্নটি আসা খুবই স্বাভাবিক । কেন আপনি এই ঐতিহাসিক চরিত্রটির সম্পর্কে এত আগ্রহী ? আপনি কি ইতিহাসের ছাত্র ?”

হরিপদ সেন একটু ইতস্তত করলেন, “আজ্ঞে না । আমি বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলাম । আগ্রহী হওয়ার একটা কারণ ঘটেছে । আমার ঠাকুরীর ভাই বিয়ে-থা-করেননি । তিনি থাকতেন পুরীতে । একাই । প্রায় নবুই বছর বয়স । আমার সঙ্গে চিঠিপত্রে যোগাযোগ ছিল । শেষবার পুরীতে গিয়েছিলাম বছর পনেরো আগে । হ্যাঁ মাস তিনিক আগে তিনি লেখেন আমাকে সেখানে যেতে । বিশেষ দরকার । গিয়েছিলাম । দেখলাম উনি খুবই অশক্ত হয়ে পড়েছেন । মনে-মনে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে গেছেন । উনি আমাকে কিছু কাগজপত্র দিলেন । এই কাগজগুলো প্রায় দুশো বছর আগে ওর প্রপিতামহ লিখেছিলেন । ইনি যক্ষের মতো সব আগলে রেখেছিলেন । আমায় বললেন, ইচ্ছ হলে হাদিস করতে পারিস ।”

“কিসের হাদিস ?”

“কাগজপত্র দেখলে আপনি বুঝবেন ব্যাপারটা । সংক্ষেপে যেটুকু জেনেছি, কলি । অন্তরে আদলে কর্ণাটকের মানুষ । পাল যুগে আমাদের কোনও পূর্বপুরুর আরও অনেকের সঙ্গে গৌড়ভূমিতে আসেন । তাঁরা যুদ্ধ করতে জানতেন, বলে পালরাজাদের সৈন্যবাহিনীতে কাজ করতে অস্বীকৃত হয়নি ।

আপনারা নিশ্চয়ই সামন্ত সেন, হেমন্ত সেন, বিজয় সেনের নাম শুনেছেন, যাঁরা সেনসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁদের উত্তরাধিকারী হলেন বল্লাল সেন, লক্ষ্মণ সেন। আমার পূর্বপুরুষরা এঁদের রাজত্বে ভাল মর্যাদায় ছিলেন। তারপর মহম্মদ বকতিয়ার খিলজি এলেন, মুসলমান রাজত্ব প্রতিষ্ঠা হলেও আমার পূর্বপুরুষরা রাজকর্মচারীর পদ হারালেন না। সুলেমান কিবানি এবং তার ছেলে দাউদের সেনাপতি ছিলেন কালাপাহাড়। ইনি যখন পুরী আক্রমণ করেন তখন আমার এক পূর্বপুরুষ তাঁর অনুগামী হন। কিন্তু সেখানে কালাপাহাড়ের আচরণে সন্তুষ্ট না হয়ে সেন্যাবাহিনী ত্যাগ করে পুরীতেই থেকে যান। পরে আমার ঠাকুর্দের বিনে এসেছিলেন বাংলাদেশে কিন্তু তাঁর ভাই থেকে গিয়েছিলেন। মোটামুটি এই হল বৃত্তান্ত।”

“বুবই ইন্টারেন্সিং। কিন্তু এত তথ্য কি ওই কাগজপত্রে পেয়েছেন আপনি?”

“না। কালাপাহাড়ের সঙ্গে আমার যে পূর্বপুরুষ পুরীতে অভিযান করেছিলেন তাঁর নাম নন্দলাল সেন। তাঁর সম্পর্কে আনেক কথা লেখা আছে। পরে আমি কিছুটা ছোট ঠাকুর্দের কাছে, কিছুটা ইতিহাস বই ঘেঁটে, আবার প্রোফেসর ভট্টাচার্যের কাছে শুনে এইটে খাড়া করেছি।” হরিপদ সেন কুমালে মুখ মুছলেন। এই না-গরম আবহাওয়াতে উঁর ঘাম হচ্ছিল।

অমল সোম বললেন, “আপনার বংশের ইতিহাস শুনলাম। কিন্তু আপনি কেন কালাপাহাড় সম্পর্কে এতটা আগ্রহী তা বোধগম্য হচ্ছে না।”

ভদ্রলোক জবাব না দিয়ে উস্থুস করতে লাগলেন।

অমল সোম বললেন, “দেখুন। আমি এখন সাধারণ কেস নিই না। ভাল লাগে না। যা করার অর্জুনই করে। কিন্তু এটিকে সাধারণ বলা যায় না। আপনাকে সাহায্য করতে পারি যদি আপনি কোনও কথা গোপন না করেন।”

“আমি জানি, জানি।” ভদ্রলোক কুমাল পকেটে ঢোকালেন, “আসলে বলতে সঙ্কোচ হচ্ছে। প্রথমত, তথ্যটা ভুল হতে পারে। দ্বিতীয়ত, আর কেউ জানুক সেটা আমি চাইছি না। ভুল হলেও নয়। বুঝতে পারছেন?”

অমলদা বললেন, “ডাক্তারকে কোনও রুগ্নী রোগের কথা বললে তিনি তা পাঁচজনকে বলে বেড়ান না। আপনি যদি ভাবেন অর্ধেক জেনে কাজ করব তা হলে ভুল ভেবেছেন।”

হরিপদ সেন বললেন, “ইয়ে, ছোট ঠাকুর্দের প্রপিতামহ লিখেছেন, নন্দলাল সেন কালাপাহাড়ের সঙ্গে উত্তরবঙ্গ এবং অসমে অভিযান করেছিলেন। এই সময় অজস্র সোনা কালাপাহাড় মাটির তলায় গোপনে সরিয়ে রাখেন। তাঁর নবাবও কিন্তু এই খবর জানতেন না। নন্দলাল মনে করতেন সেই সোনার একটা অংশ তাঁর পাওনা। কালাপাহাড় তাঁকে সেটা দেবেন বলে প্রতিশ্রূতি দিয়েছিলেন। বোঝাই যাচ্ছে সেই সোনা উদ্ধার করা কালাপাহাড়ের পক্ষে আর ১৩

সম্ভব হয়নি । নন্দলালের মুখ থেকে তাঁর পুত্র-পৌত্ররা যা শুনে এসেছে তা হল, কালাপাহাড় যেখানে সোনা রেখেছিলেন তার চারপাশে প্রায় দুর্ভেদ্য জঙ্গল, একটা বিশাল বিল আর শিবমন্দির ছিল । জায়গাটা উন্নরবঙ্গ অথবা অসমে । অসমে হওয়ার সম্ভাবনা খুব কম, কারণ তখন তারা পুরীর দিকে যাত্রা করেছিলেন । মিস্টার সোম, আমি নন্দলাল সেনের উন্নরাধিকারী । ওই সোনার একটা অংশের ওপর আমার অধিকার আছে । আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন ?”

“পারছি । কিন্তু আপনি আমাকে অনুরোধ করেছেন কালাপাহাড়ের এ অঞ্চলের গতিবিধির খবর জোগাড় করে দিতে । সোনা খুঁজে দিতে নয় ।”

“না, না । এটা আমি আপনাকে বল্লতাম ।” তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন হরিপদ সেন ।

অমল সোম হাসলেন, “আপনি বুনো হাঁসের খোঁজে আমাকে ছুটতে বলছেন ?”

“হ্যাঁ, ব্যাপারটা সেইরকমই । আবার তাও নয় ।”

“নয় মানে ?”

“আমার বিশ্বাস হচ্ছে এর পেছনে সত্যতা আছে ।”

“কীরকম ?”

হরিপদ সেন পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ বের করলেন । সেটা এগিয়ে দিলেন অমল সোমের দিকে । অমল সোম কাগজটি খুলে চোখ রাখলেন । তাঁর ঠোঁটের কোণে কোতুক ফুটে উঠল, “এটি কবে পেয়েছেন ?”

“গত সপ্তাহে । তারপরেই প্রোফেসর আমাকে বললেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে ।”

“আপনার এই তথ্য আর কে কে জানেন ?”

“কেউ না । আমার ছেট ঠাকুর্দা আর আমি । পূর্বপুরুষরা যাঁরা জানতেন, তাঁরা অনেককাল আগে দেহ রেখেছেন ।”

“আপনার বাবা জানতেন না ?”

“না । জানলেও আমাকে বলেননি । তা ছাড়া আমার ঠাকুর্দা অঞ্জবয়সেই চাকরি নিয়ে বাংলাদেশে চলে এসেছিলেন বলে বাবার পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না ।”

“কিন্তু কেউ একজন জানেন, এটি তার প্রমাণ ।”

“হ্যাঁ ।”

“আপনার ঠাকুর্দা, তাই মিন ছেট ঠাকুর্দা, এখন কেমন আছেন ?”

হরিপদ সেন মাথা নাড়লেন, “আমি চলে আসার দিন দশেক বাদে সমুদ্রে স্নান করতে গিয়ে উনি মারা গিয়েছেন ।”

“স্নান করতে গিয়ে মারা গেছেন ? উনি সমুদ্রস্নান করতেন ওই বয়সে ?”

“না । ভাল করে হাঁটতেও পারতেন না । আমি যখন গিয়েছিলাম তখন তুমি নিবেধ করেছিলেন সমুদ্রে স্নান করতে । বলেছিলেন জলে খুব ভয় ওঁর । তেন্যদেবের উচিত হয়নি জলের কাছে যাওয়া ।”

“তেন্যদেব ?”

“ঠাকুরী তেন্যদেবের উচ্চ ছিলেন ।”

“কুঁর মৃত্যুর খবর পেয়ে যাননি কেন ?”

“আমি পূরী থেকে ফিরেই চণ্ডীগড় গিয়েছিলাম ব্যবসার কাজে । বাড়ির কেক তিকানা জানত না । ফিরেছিলাম দিন কুড়ি বাদে । তখন গিয়ে কোনও কাস্ত হত না ।”

“আপনদের পুরীর বাড়ির কী অবস্থা ? নিজস্ব বাড়ি নিশ্চয়ই !”

“তানুক আছে । যে ঠাকুর্দাকে দেখাশোনা করত সে জানিয়েছে ।”

“এই চিঠি পোস্টে এসেছে ?”

“আজ্ঞে হ্যাঁ । মিস্টার সোম, আপনি একটু সাহায্য করুন । যদিও চারশো বছরের বেশি সময় চলে গিয়েছে, কিন্তু সোনায় তো জং পড়ে না ।”

“আপনার ব্যবসার অবস্থা কেমন মিস্টার সেন ?”

“খুব ভালুক নয় ।”

“আপনি আজকের রাতটা এখানকার হোটেলে থাকুন । থানার কাছে ‘রুবি রেস্টুরেণ্ট’ নামে একটা সাধারণ হোটেল পাবেন । কাল সকালে আসুন । আমি আজকে দেখিব ।”

হৃদয়ের সেনের মুখে হাসি ফুটল, “আমার সঙ্গে গাড়ি আছে । শিলিগুড়ির সিল্টি হোটেল আমার পরিচিত । ওখান থেকে আসতে ঘণ্টাখানেকও লাগবে না । ডিনিন্পত্র মেখানেই রেখে এসেছি । কাল তা হলে আসব ?”

“বেশ । আপনার গাড়িতে যে কাগজপত্র আছে দিয়ে যান ।”

“নিশ্চয়ই । আপনাকে দক্ষিণা বাবদ কত দিতে হবে এখন ?”

“দক্ষিণা পরে । আপাতত খরচ বাবদ হাজার তিনিক দেবেন । যদি কেস হতে না নিই তা হলে আগামীকাল টাকা ফেরত পাবেন ।”

হরিপদ সেন তৈরি হয়েই এসেছিলেন । পকেট থেকে একটা মোটা বাণিল বের করে গুনে-গুনে তিন হাজার টেবিলে রাখলেন । রেখে বললেন, “কেস্টা রিফিউজ করবেন না মিস্টার সোম । প্রিজ ।”

অমন্দা কেলও কথা না বলে অর্জুনকে ইঙ্গিত করলেন হরিপদ সেনের সঙ্গে বেতে । বাগান পেরিয়ে গাড়ির পেছনের সিটের নীচে ফেলে রাখা একটা কাপড়ের ব্যুগ থেকে মোটা চওড়া খাম বের করে ভদ্রলোক অর্জুনের হাতে দিলেন ।

অর্জুন বললেন, “এগুলো এভাবে ফেলে রেখেছেন ?”

ভুইভারের কান বাঁচিয়ে হরিপদ জবাব দিলেন, “বাজারের ব্যাগে রেখেছি

বলে কেউ সন্দেহ করবে না । আচ্ছা, আসি । ”

গাড়িটা বেরিয়ে গেলে অর্জুন ভেতরে এসে অমল সোমের হাতে প্যাকেটটা দিল । তিনি স্টো নিয়ে বললেন, “বেশির ভাগ অপরাধের পেছনে কাজ করে মানুষের লোভ । ও হ্যাঁ, বিষ্টুসাহেব এখানে আসছেন । তখন খবরটা বলা হয়নি । কাল চিঠি পেয়েছি । ”

“বিষ্টুসাহেব ?” চিৎকার করে উঠল অর্জুন । আনন্দে । কালিম্পং-এর বিষ্টুসাহেব । এখন আমেরিকায় আছেন । চিকিৎসার জন্য গিয়েছিলেন । সে কিছু বলার আগেই অমলদা ভাঁজ করা কাগজটা এগিয়ে দিলেন, “এটা পড়ো আগে । ”

কাগজটা খুলল অর্জুন । সুন্দর হাতের লেখা :

“হরিপদ সেন । যা করছ তাই করে খাও । নন্দলালের সম্পত্তির দিকে হাত বাড়ালে হাত খসে যাবে : কালাপাহাড় । ”

॥ দুই ॥

নেতাজির স্ট্যাচুটাকে বাঁ দিকে রেখে করলা সেতুর ওপর উঠে বাইকটাকে থামাল অর্জুন । একপাশে স্টোকে দাঁড় করিয়ে রেখে রেলিঙে ভর করে নদীর দিকে তাকাল । এখন নদীর জল কচুরিপানায় ছাওয়া । আর একটু দূরে যেখানে করলা গিয়ে তিস্তায় পড়েছে, সেখানে জল ষ্ঠির হয়ে গেছে ঢড়া ওঠায় । এই জায়গাটা বড় ছিমছাম, নির্জন । অর্জুন একটা সিগারেট ধরাল । গত বছর ভোট দিয়েছে সে । এখন একজন প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক । কিন্তু জলপাইগুড়ি শহরের মানুষেরা এখনও কিছু ব্যাপার মেনে চলে । অর্ধ-পরিচিত বয়স্ক মানুষ দেখে অনেকেই সিগারেট লুকোয় । পরিচিতি বেড়ে যাওয়ায় অর্জুনের পক্ষে অচেনা মানুষকে বোৰা মুশকিল হয়ে পড়েছে । বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দিতে এইরকম নির্জন জায়গা বেছে নিতে হয় সেই কারণে ।

পুরো ব্যাপারটাকেই তার অবিশ্বাস্য এবং অবাস্তব মনে হচ্ছে । অথচ অমল সোম বললেন, “ইন্টারেস্টিং । ”

কয়েকশো বছর আগে একটি অত্যাচারী সেনাপতি কোথায় কী লুকিয়ে রেখেছিল তাই খোঁজার দায়িত্ব চাপিয়ে দিতে এসেছেন হরিপদ সেন । এ যেন হিমালয়ের বরফের মধ্যে থেকে একটা সুঁচ ঝুঁজে নিয়ে আসার মতো ব্যাপার । লোকটাকে স্বচ্ছন্দে পাগল বলা যেত, যদি না ওই চিঠিটা তিনি দেখাতেন । হঠাৎ অর্জুনের মনে হল, এই চিঠি হরিপদবাবু নিজেই লিখে নিয়ে আসতে পারেন ঘটনার গুরুত্ব বাড়াতে । অমলদা এটা ভাবলেন না কেন ? এমন চিঠি অন্য কাউকে দিয়ে লেখানোর বোকায়ি কেউ করে না, নিশ্চয়ই হরিপদ সেনও নির্বোধ নন । ভদ্রলোকের হাতের লেখার নমুনা যদি পাওয়া যেত ! কিন্তু

মুশকিল হল কোনও সমস্যারই এত সহজে সমাধান হয় না ।

জীবিত মানুষকে খুঁজে পেতেই হিমশিম খেতে হয়, আর এ তো মৃত মানুষ । পনেরশো আশি খিস্টাদে যে মানুষটি মারা গিয়েছে সে কোথায় কিছু সোনাদানা লুকিয়ে রেখেছে তা খুঁজে পাওয়া । অর্জুন হেসে ফেলল । এই তো, কুড়ি বছরেই জলপাইগুড়ির চেহারা কত বদলে গেল । আটবেট্রির বন্যার আগে শহরটার চেহারা নাকি অন্যরকম ছিল । অমলদা বলেন, তিস্তায় বাঁধ হওয়ার আগে চরে অস্তুত চেহারার ট্যাঙ্কি চলত । এসব এখন কি তারা ভাবতে পারে ? অত কথা কী, জলপাইগুড়ির খেলাধুলোর জগতে যাঁর দান সবচেয়ে বেশি সেই রায়সাহেব তো মারা গিয়েছেন কয়েক বছর হল । এখন যদি তাঁকে বলা হয় রায়সাহেব, কখন কোথায় গিয়েছেন তার বিস্তারিত বর্ণনা আবিষ্কার কর, তা হলে কি সে সক্ষম হবে ? অথচ অমলদা বলে দিলেন কাল সকালের মধ্যে কালাপাহাড় লোকটা, মানে ইতিহাসের সেই সেনাপতি সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা তৈরি করে এস । কালাপাহাড় সম্পর্কে চালু ইতিহাস বইয়ে নাকি দু-চার লাইনের বেশি জানতে পারা যায় না । এখন লাইব্রেরি খেলার সময় নয় । তা হলে বাবুপাড়া পাঠাগারে গিয়ে দেখা যেত কালাপাহাড়ের ওপর কোনও বই পাওয়া যায় কি না ! সিগারেটটা শেষ হল তবু অর্জুন ভেবে পাছিল না অমল সোম এরকম কেস নিলেন কেন ! আগামীকাল সকালে যদিও দেখা করতে বলেছেন, আর সেটাই তো নেওয়ার জন্মণ ।

এই সময় ওর গৌরহরিবাবুর মনে পড়ল । স্কুলে ইতিহাস পড়াতেন । খুব পশ্চিম মানুষ । দুবছর আগে অবসর নিয়ে সেনপাড়ায় আছেন । অনেককাল ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়নি । অবসর নেওয়ার কথাটা দে শুনেছিল । খুব রাগী মানুষ, পড়া না করে এলে ক্ষেপে যেতেন । অর্জুন বাইক ঘোরাল ।

সেনপাড়ায় গৌরহরিবাবুর বাড়িতে সে ছাত্রাবস্থায় একবার এসেছিল । আজ খুঁজে বের করতে অসুবিধে হল না । টিনের ছাদ, গাছপালা আছে । রাস্তার দিকটা টিনের দেওয়াল তুলে একটু আবু রাখার চেষ্টা । গরিব মাস্টারমশাইয়ের কোনও ছেলেমেয়ে নেই । অর্জুন বাইরের দরজায় তিনবার শব্দ করার পর একটি মহিলা কষ্ট ভেসে এলো, “কে ?”

“সার আছেন ? আমি অর্জুন ।”

তিরিশ সেকেন্ড বাদে দরজাটা খুললেন এক প্রোটা, “ওঁর শরীর ভাল নেই ।”

“ও, ঠিক আছে তা হলে ।” অর্জুন ফেরার জন্য ঘুরছিল, এই সময় ভেতর থেকে গৌরহরিবাবুর গলা শোনা গেল, “হ্যাঁ গো, কে এসেছে, সার বলল দেন ?”

“তোমার নাম অর্জুন বললে ?” প্রোটা জিজেস করতেই সে মাথা নাড়ল ।

তিনি তখন গলা তুলে সেটা জানিয়ে দিতেই গৌরহরিবাবু ভেতরে নিয়ে যেতে আদেশ করলেন।

অর্জুন উঠোনে পা দিল। নানারকম ছেট গাছে উঠোন সাজান। টাঙ্গানো দড়িতে কাপড় শুকচ্ছে। গলার স্বর যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকের বারান্দায় পা দিল সে। দরজা দিয়ে ভেতরের ঘরটিতে যে আলো ঢুকছে তাতেই গৌরহরিবাবুকে দেখা গেল। একটা খাটে শুয়ে আছেন তিনি, মুখে হাত চাপা দিয়ে। অর্জুন বলল, “সার, আপনি অসুস্থ..?”

হাত সরালেন গৌরহরিবাবু, “অর্জুন মানে, আমার ছাত্র যে গোয়েন্দা হয়েছে?”

অর্জুন হাসলো, “আমি বলি সত্যসন্ধানী।”

“ভাল শব্দ। গর্ব হয়। বুবলে হে। তোমরা যারা নাম করেছ তাদের জন্য গর্ব হয়। অসুস্থ, মানে দৃষ্টিশক্তি হ্রাস। চোখে কম দেখি। এখন আলো পড়লে কষ্ট হয়। তা কী ব্যাপার বাবা? আমার কথা হঠাৎ মনে পড়ল কেন?” চোখ বন্ধ করেই প্রশ্ন করলেন গৌরহরিবাবু। অর্জুন অস্বস্তিতে পড়ল। ঠিক কীভাবে প্রশ্নটা করবে বুঝতে পারছিল না। তাহাতা শুধু স্বার্থের প্রয়োজনে সে এসেছে এটা জানাতেও খারাপ লাগছিল।

অর্জুন বলল, “আপনি অসুস্থ, আপনাকে বিরক্ত করা ঠিক হবে না।”

“কথা বলতে তো কোনও অসুবিধে নেই। চোখ বন্ধ রাখতে হবে এই যা।”

“আমি একটু সমস্যায় পড়েছি। ইতিহাসে কালাপাহাড় নামে একটি মানুষের কথা পড়েছিলাম। আপনার কাছে তাঁর সম্পর্কে কিছু জানতে চাই।”

“কালাপাহাড়? দাউদ খাঁয়ের সেনাপতি। পনেরোশো আশি খ্রিস্টান্দে মারা যান।”

“হ্যা। ওঁর সম্পর্কে বিস্তারিত খবর কোথায় পাব?”

“বিস্তারিত জানতে হলে অনেক বই পড়তে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ‘হিস্টরি অব বেঙ্গল’ নামে একটা বই বেরিয়েছিল, এখানে তো পাবে না। এই উত্তরবাংলায় কালাপাহাড়ের আনাগোনা ছিল। মনে করে তোমাকে আমি একটা বই-এর লিস্ট তৈরি করে দেব যা পড়লে অনেকটাই জেনে যাবে। এই কালাপাহাড়ের আসল নাম কী জান?”

“উনি আগে হিন্দু ছিলেন।”

“হ্যা। তখন হয় রাজকুম্ভ, রাজচন্দ্র নয় রাজনারায়ণ, এই তিনটির একটি হল ওঁর আসল নাম। লোকে জানতো রাজু বলে। মুসলমান ঐতিহাসিকরা দাবি করেছিলেন যে, উনি আফগান। এই দাবির পক্ষে কোনও প্রমাণ নেই। অসমে গেলে দেখবে লোকে ওঁকে পোড়াকুঠার, অথবা কালাকুঠার বলে চেনে। আমাদের কী অবস্থা, চারশো বছর আগের ঘটনাতে কত ধোঁয়াশা

27

অঙ্কুন আভকাল পকেটে একটা ছোট ডায়েরি রাখে । তাতেই গৌরহরিবাবুর কল্পনালো নেট করে নিছিল । গৌরহরিবাবু একটু ভেবে নিলেন, “রাজু কল্পনাট হলে । কিন্তু শান্ত হেঢ়ে অন্ত চালাতে সে পারদর্শী হয়ে উঠল । কেবল এই মতিগতি তার বাবার পছন্দ হওয়ার কথা নয় । তখন বাংলার নবাব কুসুমান কিরানি । কিন্তু ছোট-ছোট নবাবের সংখ্যাও বেশ । এরা নামেই কল্পনা করলে জায়গিরদার ধরনের । সুলেমান কিরানিকে কর দিত । এই রকম এক জয়গিরদারের মেয়ের প্রেমে পড়ল রাজু । মুসলমানের মেয়ের সঙ্গে কল্পনারের সম্পর্ক হলে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া চারশো বছর আগে হতে পারে তা অনুমান করতে পার নিশ্চয়ই ।” হঠাৎ থেমে গেলেন গৌরহরিবাবু । কিন্তু ভবনেন । তারপর জিজ্ঞেস করলেন, “বাঙালির ইতিহাসটা তুমি জান

অঙ্গুল ফঁপরে পড়ল । সে যেটুকু জানে তা গত দুশো বছরের । পলাশীর
জন্ম পর ইংরেজ এ-দেশের দখল নেওয়ার পরে যা ঘটেছিল সেই
ক্ষেত্রে পুনৰ্জন্ম । শ্বীকার করল সে । গৌরহরিবাবু হাসলেন, “না, এতে সক্ষোচ
করব কিছু নেই । তোমরা জান না সেটা আমাদের লজ্জা । আমরা ইতিহাস
ক্ষেত্রে রাজা নবাবের গল্প লিখি । তাই পাঠ্য হয় । কিন্তু নিজেদের কথা আলাদা
করে তোমাদের পড়াইনি । আমরা আবেগে চলি । ইতিহাস খুবই বাস্তব ।”

অর্জুন চুপচাপে রহিল । কালাপাহাড়ের কথা জানতে এসে কেন বাঙালির ইতিহাস শুনতে হবে এই প্রশ্ন করা যায় না । তবে বাঙালি হিসেবে নিজেদের ইতিহাসটা নিশ্চয়ই জানা দরকার ।

ଗୋରହରିବାବୁ ବଲାଲେନ, “ଆଗେ ଯାଦେର ଆଦି ଅଷ୍ଟଲୀଯ ବଲା ହତ ଏଥନ ତାଦେର ଭେଦିତ ବଲା ହୁଁ । ଏବାଇ ଭାବତବର୍ଷେର ଏହି ଅଞ୍ଚଳେର ଆଦି ବାସିନ୍ଦା । ଲୟାମ୍ବା ନାଥ, ଚତୁର୍ଦ୍ର ନାକ, କାଳୋ ରଂ ଆର ମଧ୍ୟମ ଆକାର । ଏଥନେ ବାଙ୍ଗଲିଦେର ମଧ୍ୟେ ଭେଦିତଦେର କିଛୁ ଶବ୍ଦ ଚାଲୁ ଆଛେ, ଥାମେର ହାଟେ ଗେଲେ ଶୁନବେ ଏକ କୁଡ଼ି ପାନ, ଦୁଇ କୁଡ଼ି ଲେବୁ । ହାତ-ପାଯେର ଆଙ୍ଗୁଳ ମିଲିଯେ ଏହି କୁଡ଼ି ଶବ୍ଦଟି ଭେଦିତଦେର ଦାନ । ଅଣ୍ଟିକ ଭାସା-ଭାସି ମାନୁଷେରା ଏକକାଳେ ଏ-ଦେଶର ନଦନଦୀ ପାହାଡ଼ ଆର ଜ୍ଞାଯଗାର ଯେ ନାମକରଣ ନିଜେରା କରେଛିଲ ଏଥନେ ଆମରା ତାଇ ବଲି । ଯେମନ କୋଲ ଦରଦାକ ବା ଦାମ-କାକ ଥେକେ କପୋତାକ୍ଷ ବା ଦାମୋଦର ନଦ । ଦା ବା ଦାକ ମାନେ ଭଲ ।

“বাংলা নামটা এল কোথেকে ? আবুল ফজল তাঁর আইন-ই আকর্বির বইয়ে
বলেছেন বঙ্গ শব্দের সঙ্গে আল যুক্ত হয়ে বাঙ্গাল বা বাংলা হয়েছে । আল মানে
বাঁধ ! জলের দেশে বাঁধ দরকার হয় । তাই বাংলা । বাংলাদেশে একসময়
অনেক মানুষের ভিড় । বঙ্গ, গৌড়, পুড়, রাঢ় । বঙ্গের নাম মহাভারতে আর
বহুৎসংহিতায় পাওয়া যায় । অমি এসব বেশি বললে তুমি হয়তো বিরক্ত

হবে । ওই চারটি ভাষার মানুষ চারটি জায়গা জুড়ে ছিল যা পরে সমগ্র বাঙালি জাতির মাতৃভূমি বলে চিহ্নিত হয়েছে । আগে ছিল সব টুকরো-টুকরো । এ ওর ভাষা বুঝত না । সপ্তম শতাব্দীতে শশাঙ্ক এসে মুর্শিদাবাদ থেকে ওডিশা পর্যন্ত একটা রাষ্ট্রীয় ঐক্যের চেহারা দেন । শশাঙ্কের পর তিনটে জনপদ হল । পুন্ডুবর্ধন, গৌড় এবং বঙ্গ । পাল আর সেনরাজারা সমস্ত বাংলাদেশকে গৌড় নামে চিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন । তা সম্ভব হয়নি । তিনটে কমে দুটোতে এসে ঠেকেছিল । গৌড় এবং বঙ্গ ।

“শশাঙ্কের পর এ-দেশে মাংস্যন্যায় চলেছিল । ভারতবর্ষের বিভিন্ন অংশ থেকে নানা ভাষার মানুষ এখানে এল । এমনকী কাশ্মীরের রাজা মুক্তাপীড় ললিতাদিত্য পর্যন্ত গৌড় আক্রমণ করে বিজয়ী হন । শশাঙ্ক ছিলেন শৈব । বাংলার অন্য রাজারা ব্রাহ্মণ-ধর্মাবলম্বী । শশাঙ্ক সম্ভবত হর্ষবর্ধনের জন্যই বৌদ্ধধর্মবিশ্বাসী । এর পরে গোপালদেব এসে মাংস্যন্যায় দূর করেন । শুরু হল পাল বংশ । আজকের বাঙালি জাতির গোড়াপত্ন হয়েছে এই যুগেই । অর্থাৎ অষ্টম শতক থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে । সেই অর্থে বাঙালির ইতিহাস হাজার বছরের বেশি নয় ।”

অর্জুন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, “আমাদের ইতিহাস মাত্র হাজার বছরের?”

“হ্যাঁ । তাও ধাপে-ধাপে এগিয়েছে । লক্ষ্মণসেনরা ছিলেন কর্ণটিকের মানুষ । ওঁর পূর্বপুরুষ পালরাজার সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন । কয়েকপুরুষ থাকার ফলে এখানকার মানুষ হয়ে যান শেষ পর্যন্ত । তা আজকের বাঙালির অনেকের পূর্বপুরুষ ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গা থেকে এসেছেন । তারপর মুহুম্মদ বখতিয়ার খিলজি লক্ষ্মণসেনকে ঢাকার কাছে লক্ষ্মণাবতীতে পাঠিয়ে এদেশ দখল করে নিলেন । পালদের সময় এদেশে বৌদ্ধরা এসেছিলেন । কিন্তু তাঁদের প্রভাব খুব সীমায়িত ছিল । পাঠানরা ক্ষমতা পাওয়ার পর এদেশে যারা কিছুটা নিয়ন্ত্রিত তারা পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য মুসলমান হলেন । কেউ-কেউ চাপে পড়ে বা অতিরিক্ত সুবিধে পাওয়ার জন্যও ধর্মবদল করেন । পরিষ্কার বোঝা যায় যে, এইসব ধর্মান্তরিত মানুষকে হিন্দু বাঙালি সহ্য করতে পারেনি । কিন্তু নবাবের ভয়ে সরাসরি কোনও ব্যবস্থাও নিতে পারেনি । সামাজিক জীবনে হিন্দু-মুসলমানের দুটি ধারা পৃথকভাবে বয়ে চলে । দিনে-দিনে এ-দেশীয় মুসলমানদের সংখ্যা বাড়তে লাগল । এইরকম পরিস্থিতিতে রাজু বা রাজকৃষ্ণ ধর্মান্তরিত হন ।

“সে-সময় হিন্দু থেকে মুসলমান অথবা বৌদ্ধ হওয়া খুব সহজ ছিল । কিন্তু ব্রাহ্মণদের সঙ্গীর্ণতা অন্য ধর্মাবলম্বীদের জন্য হিন্দুধর্মে প্রবেশের দরজা বন্ধ করে রেখেছিল । পাঠানদের এদেশের মানুষ সাধারণত শক্ত বলেই মনে করত । তাদের ধর্ম যেসব স্বদেশি গ্রন্থ করেছে তাদের ক্ষমা করার উদারতা এদের ছিল

“ধর্মস্তরিত রাজু তাই বিতাড়িত হল। তার পরিবার বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করতে সে বাধ্য হল। পরবর্তীকালে রাজুকে আবার ব্রাহ্মণরা হুহে করেনি। মন্দিরে প্রবেশের অধিকার নির্মমভাবে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। এই আচরণ তাকে ক্ষুঁক করে তোলে। স্বভাবতই হিনুবিদ্বেষী হতে তার বেশি দেরি হয়নি। রাজু ক্রমশ নবাবের সৈন্যদলে বিশিষ্ট হয়ে উঠল। নবাবি সৈন্য কল্পন কোনও অভিযান করত তখন তার লক্ষ ছিল সেই অঞ্চলের মন্দির ভাঙা, কিন্তু চূর্ণ করা আর হিন্দুদের ওপর অত্যাচার চালানো। আর এই কারণেই তাকে তার নামকরণ করল কালাপাহাড়।”

কালাপাহাড়ের প্রসঙ্গে চলে আসায় অর্জুন খুশি হল। এতক্ষণ সে একটু ক্ষুঁক ছিল। ইংরেজ বা ফরাসিরা নাকি হাজার-হাজার বছর ধরে নিজেদের সভ্য করেছে, রোমানদের সংস্কৃতিও সেইরকম। কিন্তু বাঙালির নিজস্ব কোনও সংস্কৃতি হাজার বছরের বেশি নয়, এটো ভাবতে তার খুব খারাপ লাগছিল।

গৌরহরিবাবু একটু দম নিয়ে বলতে শুরু করলেন, “কালাপাহাড় সুলেমান জিনিনি এবং পরে ওঁর ছেলে দাউদের সেনাপতি হয়েছিলেন। ওদিকে অসম অর এদিকে কাশী এবং ওড়িশার প্রায় কোনও মন্দির কালাপাহাড়ের হাত থেকে প্রত্যুৎসূ পায়নি। বোঝা যাচ্ছে এই অঞ্চল জুড়ে ওর গতিবিধি ছিল। গল্পে অছে, মন্দির ধ্বংস করার আগে কালাপাহাড় সৈন্যদের দূর থেকেই কাড়ানাকাড়া করতে বলত।

“কালাপাহাড় ওড়িশা-অভিযান করে পনেরোশো পঁঁয়ষট্টি খ্রিস্টাব্দে। তখন কল্জা মুকুন্দদেব পুরীতে। মুকুন্দদেবের পরাজয় হয়। ওঁর ছেলে গৌড়িয়া শ্রেবিল্পকে পদানত করে কালাপাহাড় পুরীর মন্দির ধ্বংস করতে যায়। পাণ্ডুরা এই থেবর পেয়ে জগন্নাথদেবের মূর্তি নিয়ে গড় পারিকুদে গিয়ে লুকিয়ে থাকে। কালাপাহাড়ের হাত থেকে তবু সেই মূর্তি রক্ষা পায়নি। জগন্নাথদেবের মূর্তি পুড়িয়ে সে সমুদ্রের জলে ফেলে দেয়। কালাপাহাড়ের অনেক আগে তিনশো অঞ্চলে খ্রিস্টাব্দে রাজ্যবাহু নামে একজন পুরী আক্রমণ করেছিল কিন্তু তখন পাণ্ডুরা জগন্নাথদেবকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিল।

“আকবরনামায় আছে দাউদের বিদ্রোহী স্বভাবের জন্য মুগল সশ্রাটি সেনাপতি মুনিম খাঁকে পাঠায় তাকে বন্দি করতে। কালাপাহাড় দাউদের সেনাপতি হিসেবে প্রচণ্ড যুদ্ধ করে। একসময় সে কাক্সাল নামে একটি জারগাও অধিকার করে। কিন্তু পনেরোশো আশি খ্রিস্টাব্দে কালীগঞ্জার তীরে হেগলবাহিনীর তোপে কালাপাহাড় মারা যায়।

“একজন বাঙালি হিসেবে কালাপাহাড় আমাদের ইতিহাসের প্রথম দিকে স্বরচ্ছয়ে বিতর্কিত চরিত্র। অত্যন্ত সাধারণ অবস্থা থেকে লোকটা কোথায় গিয়ে পৌঁছেছিল। ব্রাহ্মণরা ওকে হিনুবিদ্বেষী করেছিল। সেই মানুষ আজ

কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছে। কিন্তু একটি রহস্য আমাকে খুব ভাবায়। আমি অনেককে চিঠি লিখেছিলাম। কেউ আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। তুমি শুনতে চাও?”

“বলুন।” অর্জুন এখন এই কাহিনী-রসে প্রায় ডুবে গিয়েছে।

“কালাপাহাড় ওডিশা অভিযান করে পনেরোশো পঁয়র্যটি খিস্টাবে। তার ঠিক বত্রিশ বছর, মাঝ বত্রিশ বছর আগে এক বাঙালি মহাপুরুষের পুরীতে মৃত্যু হয়। তিনি শ্রীচৈতন্য। নবদ্বীপ ছেড়ে পুরীতে গিয়েছিলেন পনেরোশো দশ খিস্টাবে। তখন পুরীর রাজা প্রতাপরুদ্র তাঁর ভক্ত হন। পরে যখন চৈতন্য পুরীতে পাকাপাকি বাস করছেন তখন রাজা তাঁর সঙ্গে পরামর্শ না করে কোনও কাজ করতেন না। পনেরোশো কুড়ির পর থেকে রাজা প্রতাপরুদ্র শ্রীচৈতন্যের সঙ্গেই সময় কাটাতেন। জগন্মাথ দাস, বলরাম দাস, অচ্যুতানন্দ দাস আর তিনি মহাপুরুষের সঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম নিয়ে আলোচনা করতেন। রাজার এক ভাই গোবিন্দ বিদ্যাধর পাণ্ডবের ক্ষেপিয়ে তুললেন। তাদের বোঝানো হল রাজা জগন্মাথের চেয়ে চৈতন্যকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন। যে চৈতন্য জাত বিচার করল না, রাজা যদি তাঁর শিষ্য হন তা হলে জগন্মাথের মন্দির তো অপবিত্র হয়ে যাবে। পুরীতে তখন কিছু বৌদ্ধসংঘ ছিল। রাজার ভাই তাঁদেরও ক্ষেপিয়ে তুললেন চৈতন্যের বিরুদ্ধে। রাজা না-জগন্মাথ না-বৌদ্ধসংঘ কারও দিকে নজর দিচ্ছেন না, শুধু চৈতন্য নামে নবদ্বীপ থেকে আসা লোকটির মায়ায় ভুলে আছেন, এই তথ্য অনেককেই ক্রুদ্ধ করল। গোবিন্দ বিদ্যাধর গোপনে বড়ব্যক্তি করতে লাগল।

“চৈতন্যদেব জগন্মাথে লীন হননি, সমুদ্রে ভেসে যাননি। তা হলে তাঁর মৃতদেহ পাওয়া যেত। শুধু তিনি নন, তাঁর পার্যদের কাউকেই খুঁজে পাওয়া যায়নি। পনেরোশো তেজিশের উন্ত্রিশে জুন দুপুর থেকে রাত্রের শেষ ভাগ পর্যন্ত জগন্মাথদের মন্দিরের সমন্ত দরজা বন্ধ ছিল। চৈতন্যদেবকে সপ্তার্ষি সেখানে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তারপর তাঁরা উধাও। রাজা এই অস্তর্ধানের তদন্ত করতে চেয়েও সফল না হয়ে কটকে চলে গিয়েছিলেন। তিনি যুবরাজকে পাঠিয়েছিলেন। যুবরাজ মাস-চারেকের মধ্যেই নিহত হন। চৈতন্যদেব বৈষ্ণবধর্মের প্রচারক এবং পাণ্ডবের শক্ত হিসেবে প্রচার করে যাঁর লাভ হত সেই রাজার ভাই গোবিন্দ বিদ্যাধরের সিংহাসন দখল করার বাসনা পূর্ণ হয়নি।

“নবদ্বীপে নিশ্চয়ই এই খবর পৌঁছেছিল। মহাপ্রভু দিব্যোন্মাদ হয়ে লীন হয়ে গেছেন, এই বিশ্বাস অনেকেই করেননি। পুরী অভিযানের আগে কালাপাহাড় গিয়েছিল নবদ্বীপে। অস্তুত ব্যাপার, সে সেখানকার মন্দিরের ওপর তেমনভাবে ক্রুদ্ধ হতে পারেনি। সেই প্রথম সে জানতে পারে চৈতন্য নামের একটি মানুষ হিন্দ-মুসলমানকে সমানভাবে মর্যাদা দিয়েছেন। মুসলমানকে

অঙ্গন্দন করেছেন । কোনও ভেদাভেদ রাখেননি । এই তথ্য কি কালাপাহাড়ের হাদয়ের ক্ষতকে শাস্ত করেছিল ? তার নিজের অভিজ্ঞতার বিপরীত ছবি দেখে সে কি চৈতন্য সম্পর্কে শ্রদ্ধাহৃত হয়েছিল ? তার কানে কি চৈতন্যের অন্তর্ধানের খবর পৌঁছেছিল ? পাঞ্চাদের রাজনীতির শিকার হয়েছিলেন চৈতন্য, এইরকম ধারণা করেই কি সে প্রতিশোধ নিতে পুরী অভিযান করেছিল ? মাত্র বক্রিশ বছর পরেই আর-এক বাঙালির এই অভিযান বি শুধুই রাজ্যজয়ের আকাঙ্ক্ষা ? কালাপাহাড় অন্য জায়গার মন্দির ধ্বংস করেছে । কিন্তু জগন্মাথের মন্দির পাঞ্চাদের দখলে বলে কোন প্রতিশোধের ইচ্ছার বিগ্রহ পুড়িয়ে ফেলতে চেয়েছিল ? কেউ উত্তর দিতে পারেননি । যদি অবার সন্দেহ সত্য হয় তাহলে কালাপাহাড়ের চরিত্রের আর-একটি দিকে আলো পড়বে । আমরা নতুনভাবে বিশ্বিত হব ।”

এই সময় সেই প্রৌঢ়া দরজায় এসে দাঁড়ালেন, “তুমি অনেকক্ষণ কথা কলেছ । আর নয় ।”

গৌরহরিবাবু হাসলেন, “প্রিয় বিষয়, পুরনো ছাত্র !”

“তা হোক । দরকার থাকলে না হয় পরে আসবে ।”

অর্জুন উঠে দাঁড়াল, “সার, আমি চলি । দরকার হলে পরে আবার আসব ।”

গৌরহরিবাবু শুয়ে-শুয়েই হাত নাড়লেন । তাঁর চোখ বন্ধ । প্রায় দৃষ্টিহীন এই ইতিহাস-প্রেমিক অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে অতীত দেখে যান চুপচাপ, অর্জুনের তাই অনে হল ।

লাল মোটরবাইকে চেপে বাড়ির দিকে যাওয়ার সময় অর্জুন হেসে ফেলল । হরিপদ সেন চেয়েছিলেন কালাপাহাড় উত্তর বাংলার কোন কোন অঞ্চলে ছিলেন এবং সেখানে ওই বর্ণনার সঙ্গে মিলে যায় এমন জায়গা আছে কি না বেখনে সোনাদানা পুঁতে রাখা সম্ভব, তা খুঁজে বের করে দিতে । সারের সঙ্গে কথা বলে তার ধারে কাছে যাওয়া গেল না । শুধু কালাপাহাড় সম্পর্কে একটা ভাসা-ভাসা ছবি পাওয়া গেল, আর সেইসঙ্গে বাঙালির ইতিহাস । অবশ্য অম্বল সেম শুধু এইটকুই চেয়েছিলেন ।

কদমতলার বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছে সে অবাক । হাবু রাস্তার একপাশ দিয়ে হেঁটে আসছে । অম্বলদার এই স্বাস্থ্যবান বোৰা-কালা কাজের লোকটিকে খুব ভালবাসে অর্জুন । তাকে দেখামাত্র হাবু হাত-পা নেড়ে মুখ বেঁকিয়ে বুবিয়ে দিল অম্বলদা তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন । বোৰামাত্র হাবুকে পেছনে বসিয়ে মোটরবাইক চুরিয়ে হাকিমপাড়ার দিকে ছুটে গেল অর্জুন ।

হাবু সম্পর্কে অর্জুনের একটা কৌতুহল আছে। অনেকদিন ধরে দেখে আসছে সে এই লোকটাকে। অমলদা কোথেকে ওকে পেয়েছিলেন, কেমন করে হাবু এসব শিখে গেল, তা কখনওই গল্প করেননি। আজকাল অমলদা অনাবশ্যক কথা বলেন না। হাবুর গায়ে ভীষণ জোর, বুদ্ধি মাঝে-মাঝে খুলে যায়, কিন্তু বোৰা-কালা মানুষটি অমলদার পাহারাদার ওরফে রাঁধনি ওরফে মালি ওরফে সবকিছু হয়ে দিব্যি রয়ে গেছে। মোটরবাইকের পেছনে বসে হাবু শক্ত হতে তাকে ধরে আছে এখন। ওকে আঙুল আলগা করতে বলে কোনও লাভ নেই, হাবু শুনতেই পাবে না।

সনাতন নামের সেই লোকটা যখন অমলদার বাড়িতে এসেছিল তখন মোটেই খুশি হয়নি হাবু। তখন সনাতন যেন তার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। লোকটা সত্যি অদৃ ভবিষ্যৎ দেখতে পেত। হঠাৎ কোথায় উধাও হয়ে গেল কে জানে। অমলদা সনাতনকে কোথেকে জোগাড় করেছিলেন তাও রহস্য। হাকিমপাড়ায় চুকে মোটরবাইক যখন বাঁক নিচ্ছে তখন পিঠে মৃদু টোকা মারল হাবু। অর্জুন বাইকটাকে রাস্তার একপাশে দাঁড় করাতেই টপ করে নেমে পড়ল হাবু। ওর চোখের দিকে তাকিয়ে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “কী হল ?”

যে মানুষ ওর সঙ্গে কথা বলছে তার ঠোঁটনাড়া দেখতে পেলে হাবু যেন বুবাতে পারে। অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে হাত নেড়ে ওপাশের দোকানগুলো দেখিয়ে হাঁটা শুরু করল। অর্থাৎ কিছু কেনাকাটা করে বাড়ি ফিরবে। অনেকদিন আগে অর্জুন একবার অমলদাকে জিজ্ঞেস করেছিল, “বোৰা-কালা একজন মানুষের সঙ্গে থাকতে অসুবিধে হয় না ?” অমলদা মাথা নেড়েছিলেন, “আমার খুব সুবিধেই হয়। বাড়িটা নিশ্চক থাকে। নিজের মনে কাজ করতে পারি। অনবরত কারও বকবকানি শুনতে হয় না।”

গেটের সামনে পৌঁছে ব্রেক কষল অর্জুন। অনেকখানি ঘষটে গিয়ে দাঁড়াল বাইকটা। মাঝে-মাঝে তার ইচ্ছে হয় সার্কাসের বাইকওয়ালার মতো কোনও ছেট নালা বাইক নিয়ে টপকে যেতে। এখনও ঠিক সাহসটা আসছে না।

গেট খুলে পা বাড়াতেই অমলদার হাসির শব্দ শোনা গেল। বেশ প্রাণখোলা হাসি। অনেককাল অমলদাকে এভাবে হাসতে শোনা যায়নি। আর-একটু এগোতে একটা গলা কানে এল, “তার মানে নিরোর সময় বাঙালি বলে কোনও জাত ছিল না ? ইস, এখন নিজেকে একেবারে যাকে বলে ভুঁইফোর্ড, তাই মনে হচ্ছে।”

এই গলা ভোলার নয়। বসার ঘরের দরজা খোলা। বারান্দায় উঠে দরজায় দাঁড়াতেই বিছুসাহেবকে দেখতে পেল অর্জুন। পা ছড়িয়ে বসে আছেন। রোগা বেঁটেখাটো মানুষটাকে এখন আরও বুড়ো দেখাচ্ছে। যাড় ফিরিয়ে দরজার

দিকে তাকাতেই তিনি চিৎকার করলেন, “আরে, তৃতীয় পাণ্ডু, এ যে একেবারে নবীন যুবক, ভাবা যায় ?”

অর্জুন ঘরে চুকে ভদ্রলোককে প্রশ্ন করল, “কেমন আছেন ?”

বিষ্টুসাহেব দু’ হাতে বাতাস কাটলেন, “নতুন শক্তি পেয়েছি হে। আমেরিকানরা আমার শরীরের যেসব জায়গা রোগের কামড়ে বিকল, তা ছেঁটেকেটে বাদ দেওয়ার পর আর কোনও প্রবলেম নেই।” নিজের বুকে হাত দিলেন তিনি, “বাইপাস সাজারি।”

অর্জুনের খুব ভাল লাগছিল। সে বিষ্টুসাহেবের পাশে গিয়ে বসল। তার চোখের সামনে এখন কালিপ্পং-এর দিনগুলো, লাইটার খুঁজতে আমেরিকায় যাওয়া আর বিষ্টুসাহেবের হাসিখুশি মুখ ক্রমশ রোগে পাণ্ডুর হয়ে যাওয়া ছবিগুলো ভেসে গেল। বিষ্টুসাহেব যে আবার এমন তরতাজা কথা বলবেন তা কল্পনা করতে পারেনি সে। অমলদা বললেন, “অর্জুনকে তো দেখা হয়ে গেল, এবার খাওয়াদাওয়া করে বিশ্রাম করুন। অনেকদূর পাড়ি দিতে হয়েছে আপনাকে।”

মাথা নাড়লেন ছেট্টাট্টো মানুষটি। একমুখ হাসি নিয়ে চুপ করে রইলেন খানিক। তারপর বললেন, “নো পরিশ্রম। জে এফ কে থেকে হিথরো পর্যন্ত ঘূমিয়ে এসেছি। হিথরোতে কয়েক ঘণ্টা চমৎকার কেটেছে। হিথরো থেকে দিল্লি নাক ডাকিয়েছি। দিল্লিতে এক বাত হোটেলে। উত্তেজনায় ভাল ঘূম হয়নি অবশ্য। আর দিল্লি থেকে বাগড়োগড়া আসতে ঘুমের প্রশ্নই ওঠে না। দেশের মাটিতে ফেরার উত্তেজনার সঙ্গে কোনও কিছুর তুলনা করাই চলে না। এখন আমি একটুও ক্লাস্ট নই।”

“আপনি একাই এতটা পথ এলেন ?” অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

“ইচ্ছে ছিল তাই, কিন্তু আর-একজনকে বয়ে আনতে হল।” বিষ্টুসাহেব চোখ বন্ধ করলেন, “মেজের এসেছেন সঙ্গে। তিনি গিয়েছেন কালিপ্পঙ্গে।”

“অ্যাঁ, মেজের এসেছেন।” প্রায় চেঁচিয়ে উঠল অর্জুন।

হঠাতে অর্জুনের গায়ে হাত বোলালেন বিষ্টুসাহেব, “নাঃ, এই ছেলেটা দেখছি একদম বড় হয়নি। সেই ফ্রেশমেশ্টা এখনও ধরে রেখেছে। বড় হলৈই মানুষ কেমন গন্তব্য হয়ে যায়। এবার ক’দিন জমিয়ে আড়ডা মারা যাবে, কেমন ?”

জমিয়ে আড়ডা বলে কথা ! অর্জুন ভেবে পাছিল না সে কী করবে ! অমলদা, বিষ্টুসাহেব, মেজের ও সে ! কতদিন পরে এক জায়গায় হওয়া যাবে ! সে জানত মেজের আসছেন দিন-দুয়েকের মধ্যেই ! এখানে ওঁরা কয়েকদিন থাকবেন।

বেলা বাড়ছিল। বিষ্টুসাহেবের ইচ্ছে ছিল অর্জুন এখানেই থেয়ে নিক। কিন্তু অমলদাই আপত্তি করলেন। বাড়িতে বলা নেই, অর্জুনের মা নিশ্চয়ই খাবার নিয়ে বসে থাকবেন। তাই বাড়ি গিয়ে স্নান-খাওয়া সেরে অর্জুন বিকেলে

চলে আসুক।

বিষ্টুসাহেব ভেতরে চলে গেলে অমলদা বললেন, “যাও, আর দেরি কোরো না। ও হ্যাঁ, কিছুটা আশা করি এগিয়েছ এর মধ্যে !”

“হ্যাঁ। ইতিহাস জানলাম। তবে আলগা-আলগা।”

“পাঁচশো বছরের আগে যাওয়ার দরকার নেই। শ্রীচৈতন্যদেব থেকে শুরু করো। ওই সময় কেউ তো ইতিহাস লিখব বলে লেখেনি।”

“আপনি মোটামুটি বাঙালির ইতিহাসটা জানেন ?” অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

“যেটুকু না জানাটা অপরাধ সেটুকুই জানি।” অমলদা হাসলেন, “অর্জুন, তুমি তোমার ক'জন পূর্বপুরুষের নাম জান ?”

অর্জুন মনে করার চেষ্টা করল। বাবা-ঠাকুর্দার নাম ধর্তব্যের মধ্যে আসছে না। বাবার ঠাকুর্দার নাম সে জানে। মা বলেছিলেন বাড়িতে একটা কাগজে টোদ্পুরুষের নাম নাকি লিখে রেখেছিলেন বাবা। তিনি মারা যাওয়ার পর সে আর ওই কাগজপত্র দেখেনি। তাই পূর্বপুরুষ বলতে তার আগের তিন পুরুষেই এখন তাকে থেমে যেতে হচ্ছে। হঠাৎ এটা মনে হতে লজ্জা করল অর্জুনের। আমরা বাহাদুর শা’র পূর্বপুরুষের নাম জানি অথচ নিজের পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে উদাসীন। বাবার লেখা কাগজটা যদি না পাওয়া যায়, মায়ের যদি সেসব মনে না থাকে তাহলে তাদের বৎশের অতীত মানুষগুলো চিরকালের জন্য অঙ্ককারে হারিয়ে যাবেন।

অমলদা বললেন, “ঠিকই, জেনে রাখা ভাল, কিন্তু দরকার পড়ে না বলে তিন-চার পুরুষের বেশি খবর রাখি না। চার পুরুষ মানে একশো বছর। কালাপাহাড় ছিলেন তোমার কুড়ি পুরুষ আগে। ব্যাপারটা তাই গোলমেলে হয়ে যাচ্ছে। বিকেলে এসো, এ-ব্যাপারে কথা বলা যাবে।”

মোটরবাইকে উঠে অর্জুনের হঠাৎ একটা কথা মাথায় এল। এই যে আমরা পুরুষ-পুরুষ করি, কেন করি ? কেন বাবা-ঠাকুর্দাকে ধরে প্রজন্ম মাপা হচ্ছে এবং তাকে পুরুষ আখ্যা দেওয়া হবে ? মা-দিদিমাকে ধরে নারী শব্দটাকে পুরুষের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে না কেন ? আজ যখন ছেলেমেয়ে সমান জায়গায় এসে গিয়েছে তখন মেয়েরা এই-পুরুষ-মাপা প্রথাটার বিরুদ্ধে কথা বলতেও তো পারে !

দুপুরের খাওয়া সেরে আবার বাইক নিয়ে বের হল অর্জুন। জলপাইগুড়ির ইতিহাস জানেন এমন একজনকে খুঁজে পাওয়া দরকার। তার ছেলেবেলায় চারচল্দ্র সান্যাল নামে একজন পশ্চিত ব্যক্তি মারা গিয়েছেন, যাঁর নথদর্পণে এসব ছিল বলে সে অমলদার কাছে শুনেছে। রূপশ্রী সিনেমার সামনে এসে সে বাইক থামাল। জগ্নদা আর-এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন। ভদ্রলোকের মুখে দাঢ়ি, কাঁধে ব্যাগ, ধূতি-পঞ্জাবি পরানে। তাকে দেখে জগ্নদা হাত তুললেন। মালবাজার ঘুরে এখন জগ্নদার অফিস শিলিগুড়িতে। ডেইলি

প্যাসেঞ্জারি করেন। এই অসময়ে এখানে কোনও প্রশ্ন করা ঠিক হবে কি না বুঝতে পারছিল না সে।

জগ্নদা তাঁর সঙ্গীকে বললেন, “এই যে, এর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব অপ্নাকে বলেছিলাম। এরই নাম অর্জুন, আমাদের শহরের গর্ব। বিলেত অ্যামেরিকায় গিয়েছিল সত্যসন্ধান করতে। আর ইনি হলেন ত্রিদিব দত্ত। মন্দির নিয়ে অনেক গবেষণা করেছেন। কলকাতার কলেজে পড়ান।”

মন্দির নিয়ে গবেষণা করার কথা শোনামাত্র অর্জুনের মনে পড়ল কালাপাহাড়ের কথা। কালাপাহাড় তো একটা-পর-একটা মন্দির ভেঙেছেন। ইনি নিশ্চয়ই সেসব খবর রাখেন। সে নমস্কার করল। ত্রিদিববাবু বললেন, “আমরা এখানকার দেবী চৌধুরানির তৈরি মন্দির দেখতে গিয়েছিলাম। তখনই ভাই তোমার কথা ইনি বলছিলেন।”

“আমার কথা কেন?”

“এ-দেশে মন্দিরের সঙ্গে অপরাধের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। এই কিছুকাল আগেই ডাকাতৰা ডাকাতি করার আগে কালীর মন্দিরে পুজো দিতে থেকে। সেই প্রসঙ্গে অপরাধ নিয়ে আলোচনা করতে করতে অপরাধ-সাহিত্য থেকে গোয়েন্দাদের কথা এসে গেল। আমি ভাবতে পারছি না জলপাইগুড়ির হতো শহরে কেউ শুধু এই কাজ করে কীভাবে বেঁচে থাকতে পারে? এখানে কেস কোথায়?”

“অপরাধী তো সব জায়গায় থাকে।” অর্জুন বলতে-বলতে দেখল ভদ্রলোকের কাঁধের কাপড়ের ব্যাগের ফাঁক দিয়ে একটা ছোট লাঠির ডগা দেখা যাচ্ছে। লাঠিটা বেশ চকচকে এবং গোল।

জগ্নদা বললেন, “চললে কোথায় অর্জুন?”

“একটু ইতিহাস খুঁজতে। জগ্নদা, জলপাইগুড়ির ইতিহাস ভাল কে জানেন?”

“মনয়কে বলতে পারো। ওরা এসব নিয়ে থাকে।” এই সময় একটা জিপ এসে দাঁড়াল সামনে। জিপটাকে অর্জুন চেনে। ভাড়া থাটে। জগ্নদা বললেন, “হাতে সময় থাকলে আমাদের সঙ্গে ঘুরে আসতে পারো।”

“কোথায় যাচ্ছেন?”

“জল্লেশের মন্দির দেখতে। ত্রিদিববাবু এর আগেও ওখানে গিয়েছেন কিন্তু আর-একবার ওঁর যাওয়া দরকার।”

অর্জুন মনে করতে পারছিল না আজ সকালে মাস্টারমশাই কালাপাহাড় সম্পর্কে বলতে গিয়ে জল্লেশের মন্দিরের কথা উল্লেখ করেছিলেন কি না। কিন্তু কালাপাহাড় যদি এই অঞ্চলে থেকে থাকেন তা হলে ওই মন্দির নিশ্চয়ই তাঁর ঢাকে পড়েছিল। জল্লেশের মন্দির তো আরও প্রাচীন।

নিম্নলাই পাশে মোটরবাইক রেখে অর্জুন জিপে উঠে বসল। এখন তিনটে

বাজে । হয়তো ফিরতে সক্ষে হয়ে যাবে । কিন্তু অর্জুনের মনে হচ্ছিল একবার যাওয়া দরকার । হাসপাতালের সামনে দিয়ে রায়কতপাড়া পেরিয়ে জিপ ছুটছিল । ত্রিদিববাবু এবং জগন্নাথ ভাইভারের পাশে বসেছিলেন । পেছনে বসে পিছলে যাওয়া রাস্তার দিকে তাকিয়ে । অর্জুন চুপচাপ ভাবছিল । রাজবাড়ির গেটের সামনে দুটো ছেল হাতাহাতি করছে । তাদের ধিরে ছেট ভিড় । তারপরেই জিপ শহরের বাইরে । তিস্তা ব্রিজ সামনে । হঠাৎ অর্জুনের মনে হল সে অতীত নিয়ে বড় বেশি ভাবছে । অথচ শ্রীযুক্ত হরিপদ সেন বর্তমানের কালাপাহাড় নামক এক অঞ্জাত মানুষের কাছ থেকে যে হ্যাকি দেওয়া চিঠি পেয়েছেন তার কোনও হাদিস নেওয়া হচ্ছে না ।

হরিপদ সেন তাঁর পিতামহের-প্রপিতামহের কিছু কাগজপত্রের প্যাকেট অমলদাকে দিয়ে গিয়েছেন । সেখানে কী লেখা আছে তা অমলদা এখনও বলেননি । আজকাল সব ব্যাপারেই অমলদার উৎসাহ এমন তলানিতে এসে ঠেকেছে যে, হয়তো এখনও খুলেই দেখেননি ওগুলো । আগামীকাল হরিপদবাবু শিলগুড়ি থেকে আবার আসবেন অমলদার বাড়িতে । সেই সময় অমলদা তাঁকে টাকাটা ফেরত দিয়ে দিলে আবাক হওয়ার কিছু নেই । আর তা হলে তো সব কাজ চুকে যাবে । অর্জুনের মনে হল আগামীকাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত । এখনই হাতড়ে বেড়ানোর কোনও মানে হয় না । জিপ ততক্ষণে তিস্তা ব্রিজ পেরিয়ে দোমহানির দিকে ছুটছে । দু'পাশে মাঠের মধ্যে দিয়ে পিচের রাস্তাটা বেঁকে গেছে ঘোড়ার পায়ের নালের মতো । মানুষজনের বসতি খুব কম । বাইপাস ছেড়ে জিপ ঢুকল বাঁ দিকে । শহর থেকে মাত্র বারো মাইল দূরে জল্লেশ্বর মন্দিরে সে আগেও এসেছে । এসবই তার চেনা । মন্দিরে কোনও শিবের মৃত্তি নেই, আছে অনাদিলিঙ্গ । কেউ বলেন কোচবিহারের মহারাজ প্রাণনারায়ণ একটি স্তম্ভের মাথায় গাভীদের দুধ ছড়িয়ে দিতে দেখে এখানে এই মন্দির স্থাপন করেন ।

অর্জুন প্রসঙ্গটা তুলতেই ত্রিদিববাবু বললেন, “খুব গোলমেলে ব্যাপার । প্রাণকৃষ্ণ দণ্ড সন্দেহ করেছেন এটি এক বৌদ্ধমন্দির ছিল । মেলার সময় ভোট-তিক্রিত থেকে ঘোড়া কুকুর কহল নিয়ে বৌদ্ধরা এখানে আসতেন । জল্লেশ্বর নামে এক রাজার কথাও শোনা যায় যিনি এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন বলে কেউ দাবি রেখেছে । আসামের ঐতিহাসিকরা বলেন ভিতরগড়ের পৃথুরাজারই নাম জল্লেশ্বর, যিনি বখ্তিয়ার খিলজিকে পরাজিত করেছেন । ভদ্রলোক মারা যান ১২২৭ খ্রিস্টাব্দে । তার মানে মন্দিরের আয়ু প্রায় আটশো বছর । মাটির ভেতর থেকে শিবলিঙ্গ উঠে এসেছে ওপরে । পথগাশ বছর আগে মন্দিরে সংস্কারের সময় একটা পরীক্ষা চালানো হয় । বোঝা যায় লিঙ্গটি সাধারণ পাথর নয়, উক্ষাপিণ্ড । আকাশ থেকে খসে মাটিতে চুকে পড়ে । এই আকাশ থেকে নেমে আসতে দেখে এখানকার মানুষ এঁকে দেবতা জানে পুজো করতে

শুরু করে । ”

“এই উল্কাপিণ্ডী কবে পড়েছিল ?”

“সময়টা ঐতিহাসিকরা আবিষ্কার করতে পারেননি । ”

জিপ. থামল একটা অস্থায়ী হাটের মধ্যে । বোৰা. যায় সপ্তাহে এখানে হাট বসে, এখন চালাণ্ডলো ফাঁকা । মন্দিরের সামনে হাতির মৃত্তি । ত্রিদিববাবু বললেন, “হিন্দু মন্দিরের সঙ্গে হাতি খুব একটা মেলে না । সম্ভবত এক সময় এখানে হাতির উপদ্রব হত । পাথরের হাতি তৈরি করে পাহারায় বসিয়ে তাদের ভয় দেখানোর পরিকল্পনা হয়েছিল । ”

জর্জের মন্দিরের ভেতর অর্জুন চুকেছে । অতএব সেদিকে তার কোনও আগ্রহ ছিল না । ত্রিদিববাবু আর জগন্নাথ চলে গেছেন তাঁদের কাজে । অর্জুন দেখল মন্দিরের পাশেই লম্বা বারান্দার একতলা ব্যারাকবাড়ি । সেখানে সম্ভবত দূরের ভক্তরা এসে ওঠেন । মানুষজন খুব কম । মন্দিরের এপাশে একটি পুকুর । সে ভাল করে দেখল । মন্দিরের গায়ে কোনও আঘাতের চিহ্ন দেখা যায় কি না । কিছুই চোখে পড়ল না ।

পুকুরের ধারে এসে একটা সিগারেট ধরাতে যাচ্ছিল অর্জুন, কিন্তু সামনে মিল । একজন বৃক্ষ সন্ধ্যাসী আসছেন । তাঁর পায়ে খড়ম, শরীরে সাদাধূতি লুঙ্গির মতো পরা, গলায় রুদ্রাক্ষ এবং মুখে পাকা দাঢ়ি । তিনি হাসলেন, “আহা, মন চেয়েছিল যখন, তখন খাও । আমাকে দেখে সঙ্গে কেন ?”

অর্জুন আরও লজ্জা পেল । সে প্যাকেটটা পকেটে রেখে দিল । সন্ধ্যাসীর মুখে বেশ স্বিঞ্চ ভাব, “মন্দিরে না গিয়ে এখানে কেন ?”

“এমনিই । মন্দিরে চেহারা দেখছিলাম । আপনি এখানে অনেকদিন আছেন ?”

“দিন গুণিনি । তবে আছি !”

“এই মন্দিরে কবে শেষবার সংস্কারের কাজ হয় ?”

“হেমস্তী পুরের কুমার জগদিন্দ্রদেব রায়কৃত সংস্কার করেন, তাও অনেকদিন হয়ে গেল । সময়ের হিসেব বাবা আমার গুলিয়ে যায় । ”

“আচ্ছা, আপনি কি জানেন কালাপাহাড় এই মন্দিরের ওপর আক্রমণ করেছিলেন ?”

সন্ধ্যাসী হাসলেন, “এ-কথা কে না জানে ! মন্দিরের চুড়োটা এ-রকম ছিল না । কালাপাহাড় তখনকার চুড়ো ভেঙে ফেলেছিলেন । কিন্তু ভগবানের কোনও ক্ষতি করেননি । শোনা যায় মন্দিরের ভেতরেও তিনি ঢোকেননি । ”

“আপনি কালাপাহাড় সম্পর্কে কিছু জানেন ?”

“আরে, তুমি বাবার মন্দিরে এসে কালাপাহাড় সম্পর্কে জানতে চাইছ কেন ? মজার ছেলে তো ! কালাপাহাড়ের শক্তি ছিল, ক্ষমতাও ছিল, সেইসঙ্গে অভিমান এবং অপমানবোধ প্রবল । ব্রাহ্মণরা ওঁকে ক্ষিপ্ত করে দিয়েছিল । এসব আমার

শোনা কথা । এই জল্লেশের অনেক বৃদ্ধ মানুষ তাঁদের পিতা-পিতামহের কাছে শোনা কালাপাহাড়ের গল্প এখনও বলেন । তিনি এলেন বিশাল সন্ন্যাসীর নিয়ে । তাতে পাঠান যেমন আছে, তেমন এ-দেশের হিন্দুরাও । দেবাদিদের নাকি তাঁকে এমন আচ্ছন্ন করে ফেলেছিলেন যে, তিনি মন্দিরের ভেতরে পা বাড়াতে পারেননি । তুমি থাক কোথায় ?”

“তোমাকে আমার কিছু দিতে ইচ্ছে করছে । কী দেওয়া যায় ?”

সন্ন্যাসীর মুখ থেকে কথা বের হওয়ামাত্র পাশের নারকোল গাছ থেকে একটা নারকোল খসে পড়ল মাটিতে ধূপ করে । সন্ন্যাসী সেটা কুড়িয়ে নিলেন, “বাঃ, এইটেই নাও । নাড়ু করে খেয়ো ।”

নারকোল হাতে ধরিয়ে সন্ন্যাসী চলে গেলেন । অর্জুন হতভম্ব । এটা কী হল ? একেই কি অলৌকিক কাও বলে ? সে পুকুরের দিকে তাকাল । দুর্ভেদ্য জঙ্গল, বিশাল বিল এবং শিবমন্দির । হরিপদ সেন যে জায়গাটার কথা বলেছিলেন তা তো জল্লেশ্বর হতে পারে । যদিও এখন চারপাশে কোনও জঙ্গল নেই । কিন্তু পাঁচশো বছর আগে থাকতেও তো পারে । আর তখনই তার মনে পড়ল অমলদার সর্তর্কবাণী, প্রমাণ ছাড়া কোনও সিদ্ধান্তে শুধু নির্বোধরাই আসতে পারে ।

॥ চার ॥

কাল জলপাইগুড়িতে ফিরতে সঙ্গে পেরিয়ে গিয়েছিল । জল্লেশ্বর মন্দির দেখে ত্রিদিববাবু গিয়েছিলেন জাটিলেশ্বর মন্দির দেখতে । ফলে দেরি হয়ে গেল বেশ । জাটিলেশ্বর জল্লেশ মন্দির থেকে মাত্র চার মাইল দূরে । অথচ এর কথা শহরে এসে তেমন শোনা যায় না । শহরে ফিরে আসার সময় ত্রিদিববাবু বললেন, “জল্লেশ মন্দিরের আকৃতি নিশ্চয়ই পরবর্তীকালে কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছে । দেখেছেন, মুসলিম সংস্কৃতির ছাপ রয়েছে ওর নির্মাণে । অথচ মূল মন্দিরের কাছে বাসুদেব মূর্তি বা ক্ষয়ে যাওয়া গণেশ মূর্তি দেখলে বোৰা যায় পালবংশের সময়েই মন্দির তৈরি । তখন তো মুসলিম সংস্কৃতি এ-দেশে আসেনি ।”

অর্জুন কানখাড়া রেখেছিল । কালাপাহাড় এই মন্দিরের ক্ষতি করার পর যখন সংস্কার করা হয়েছিল তখনই কি ওই পরিবর্তন এসেছিল ? ত্রিদিববাবুকে সে-কথা বলতে তিনি বললেন, এ-ব্যাপারে তাঁর কিছু জানা নেই ।

রাত হয়ে গিয়েছিল বলেই সে অমলদার সঙ্গে যোগাযোগ করেনি । বাড়ি ফিরে দেখল বাইরের ঘরে আলো জ্বলছে । রাস্তা থেকেই দেখল কেউ একজন বসে আছেন । এখন মাঝে-মাঝেই তার কাছে মানুষজন সমস্যা নিয়ে আসেন । মা তাঁদের বসতে বলেন তার ফিরে আসার সম্ভাবনা থাকলে । দরজায়

কিছুতেই সে এক ভদ্রমহিলাকে দেখতে পেল। চলিশের কেঠায় বয়স, শরীর শুভু ভারী হলেও সুন্দরী না বলে পারা যায় না। জামাকাপড়ে এবং ভঙ্গিতে কেশ পর্যসাওয়ালা ঘরের মহিলা বলেই মনে হয়।

ভদ্রমহিলা বেশ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, “আপনি কি অর্জুনবাবু ?”

“হ্যাঁ।” কাঠের টেবিলের উল্টোদিকের চেয়ারটায় বসল সে।

“ও। আমি এক্সপেন্ট করিনি আপনি এত অল্পবয়সী।”

“বলুন, কেন এসেছেন ?”

“আমি মিস্টার অমল সোমের কাছে গিয়েছিলাম। তিনি আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। প্রায় ঘন্টাদেড়েক অপেক্ষা করছি।”

“আপনার সমস্যা কী ?”

“হেমন্তী পুর চা-বাগানটা আমাদের। আমার স্বামী অসুস্থ হয়ে পড়ার পরে বাগানে খুব গোলমাল হয়েছিল। শ্রমিক বিক্ষোভ, মারামারি। তখন বাগান বন্ধ করে দিতে হয়। এর পরে আমার স্বামী মারা যান। সমস্টো বুঝে নিতে আমার সময় লাগে। তারপর সরকার এবং ইউনিয়নের সঙ্গে অনেক কথা বলে আমি বাগান খুলেছিলাম। অনেকদিন বন্ধ থাকায় লেবাররা কাজের জন্য অন্য জায়গায় চলে গিয়েছিল। তাদের ফিরিয়ে আমার চেষ্টা হচ্ছিল। কিন্তু এই সময় বাগানে নানারকম রহস্যময় ঘটনা ঘটতে লাগল।”

“কীরকম ঘটনা ?”

“আমার বাগানের পাশে নীলগিরি ফরেস্ট। খুব গভীর জঙ্গল। কুলি লাইন ওদিকেই। কাজের জন্য যখন কুলিরা ফিরে আসছে তখন পর-পর তিন রাত্রে তিনজন খুন হয়ে গেল। কে খুন করেছে, কেন করেছে, কিছুই বোঝা যাচ্ছে না।”

“পুলিশের বক্তব্য কী ?”

“পুলিশ ! কোনও কূলই পাচ্ছে না তারা। অথচ আমার বাগানে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। যারা এসেছিল তাদের অনেকেই আমার বাগান ছেড়েছে। নতুন কাজের লোকের আসার সভাবনা নেই। এমন চললে আমাকে বাধ্য হয়ে বাগান বিক্রি করে দিতে হবে। কিন্তু আমি সেটা চাহিছি না। আমার স্বামীর পূর্বপুরুষেরা ওই বাগান তৈরি করেন। বুঝতেই পারছেন।”

“আপনার নাম ?”

“মর্মতা দন্ত।”

“অমলদাকে ঘটনাটা বলেছেন ?”

“হ্যাঁ। উনি বললেন অন্য একটি কেস নিয়ে ব্যস্ত আছেন। আপনাকে পুরো ব্যাপারটা জানাতে। পুলিশের ওপর আমি পুরো ভরসা করতে পারছি না।”

“হেমন্তী পুর চা-বাগানটা ঠিক কোথায় ?”

“হাসিমারার কাছে ।”

“দেখুন, এখনই আমি কিছু বলতে পারছি না আপনাকে । আগামিকাল সকালে একটা কেস নিয়ে আলোচনা আছে । সেটা যদি না নেওয়া হয় তা হলে অবশ্যই আপনার ব্যাপারটা দেখব । কিন্তু ওই কেস নেওয়া হলে একদম সময় পাব না ।”

মমতা দেবী খুবই বিমর্শ হলেন । তিনি জানালেন, তাঁর টেলিফোন এখনও চালু আছে এবং খবর যা হোক, তা অর্জুন কাল দুপুরের মধ্যেই জানিয়ে দিবে । অর্জুন অবাক হয়ে শুনল ভদ্রমহিলা গাড়ি নিয়ে বাগান থেকে বেরিয়ে মাঝপথে বাসে চেপে জলপাইগুড়িতে এসেছেন, যাতে কেউ যদি অনুসরণ করতে চায় তা হলে বিভ্রান্ত হবে । আজ রাত্রে এখানে এক আঙীয়ের বাড়িতে থেকে কাল সকালে ট্যাঙ্কি নিয়ে ফিরে যাবেন । তাঁর ধারণা প্রতিপক্ষ সবসময় নজর রাখছে । অর্জুন তাঁকে মোড় পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে রিকশার ব্যবস্থা করল । ভদ্রমহিলা যাওয়ার আগে বারংবার অনুরোধ করলেন তাঁকে সাহায্য করতে ।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে অর্জুনের মনে হল অতীতের পেছনে না ছুটে বর্তমানের সমস্যা সমাধান করা অনেক বেশি উত্তেজনাপূর্ণ ব্যাপার । কবে কখন কোথায় কালাপাহাড় তার লুটের সোনাদানা লুকিয়ে রেখেছে এবং সেটা উদ্ধার করে হরিপুর সেনকে তুলে দিতে হবে—এমন অসম্ভব ব্যাপার নিশ্চয়ই অমলদা করতে চাইবেন না । কিন্তু মুশকিল হচ্ছে অমলদা ভদ্রলোকের কাছে অ্যাডভান্স নিয়ে ফেলেছেন । বেশির ভাগ কেসেই এটা উনি করেন না । অ্যাডভান্স নিলে কাজটা করবেন বুঝেই নেন । কালাপাহাড়ের সোনা খোঁজা মানে অঙ্ককারে হাতড়ানো । হৈমতীপুর চা-বাগানের হত্যা রহস্যের তো একটা মোটিভ দেখা যাচ্ছে । মমতা দেবীকে বাগানছাড়া করা । ওই পথে এগোলে হত্যাকারীদের সন্ধান পেতে তেমন অসুবিধে হওয়ার কথা নয় । বাগানটা অনেকদিন বন্ধ ছিল । পাশেই নীলগিরির জঙ্গল । কুলিরা যখন আসতে শুরু করল তখন তাদের সংখ্যা নিশ্চয়ই বেশি ছিল না । তাই জঙ্গল থেকে বেরিয়ে কোনও দল যদি দু-চারজনকে হত্যা করে আবার জঙ্গলে ফিরে যায় তা হলে আতঙ্ক ছড়াতে বেশি দেরি হবে না ।

সকালে বাইক চালিয়ে বেশ উত্তেজিত হয়েই অর্জুন অমল সোমের বাড়িতে চলে এল । অমলদা এবং বিষ্টুসাহেবে বাগানেই চেয়ার পেতে বসে চা খাচ্ছিলেন । বিষ্টুসাহেবে চিকিৎসার করে বললেন, “সুপ্রভাত । কাল দুপুরের পর আর দর্শন পেলাম না কেন ?”

ইতিমধ্যে হাবু তৃতীয় চেয়ারটি নিয়ে এল । বসে পড়ল অর্জুন, “কাল বিকেলে জঙ্গলের মন্দিরে গিয়েছিলাম । আচমকাই ।”

“জঙ্গলের মন্দির ? আহা, গেলে হত সেখানে ।” বিষ্টুসাহেবে মাথা নাড়লেন ।

অমল সোম বললেন, “গেলেই হয়। আছেন তো ক'দিন।”

অর্জুন দেখল অমলদা এটিকু বলেই চুপ করে গেলেন। এটাই অস্বস্তিকর। কিন্তু বিষ্টুসাহেবই তাঁকে মনে করিয়ে দিলেন; “ওই যে, কাল এক ভদ্রমহিলা এসেছিলেন, কোনও চা-বাগানের মালিক যেন...।”

অর্জুন দেখল অমলদা তার দিকে তাকিয়ে আছেন। সে বলল, “হ্যাঁ, উনি আমার বাড়িতে এসেছিলেন। আপনি কেস্টা শুনেছেন অমলদা?”

“হ্যাঁ। ভদ্রমহিলার দুশ্চিন্তা হওয়া খুবই স্বাভাবিক।”

“আমরা কি কেস্টা নিতে পারি?”

“সময় পাওয়া যাবে না।”

“কেন?”

“তুমি তো জান, আজকাল সাধারণ ঘটনা আমাকে একদম টানে না। বরং ওই হরিপদ সেনের ব্যাপারটা ক্রমশ আমার কাছে খুব ইন্টারেস্টিং হয়ে উঠেছে। ওঁর দেওয়া কাগজপত্রগুলো পড়লাম। এই কেস নিয়ে কাজ করা যায়।”

অর্জুন বলল, “ব্যাপারটা কিন্তু খুবই গোলমেলে।”

“ঠিকই। তাই আমাকে টানছে। অর্জুন, তুমি কি মনে কর কালাপাহাড়ের মতো একজন ক্ষমতাবান লোক সবাইকে দেখিয়ে একটা জায়গায় মাটি খুঁড়ে সোনা-মুক্তি পুঁতে রাখবে? যখন তার জানাই আছে যুদ্ধের প্রয়োজনে কশী থেকে কামাখ্যা ঘুরে বেড়াতে হয়? লোকটা নিশ্চয়ই তার নবাবকে লুকিয়ে ওগুলো সরাতে চেয়েছে! কালাপাহাড়কে এতটা বোকা আমার কখনওই মনে হয়নি।”

অর্জুনের একটু অস্পষ্ট ঠেকল, “কিন্তু হরিপদবাবু বলে গেলেন যে নন্দলাল সেন জানতেন কোথায় কালাপাহাড় ওসব লুকিয়েছেন।”

“কথাটা হরিপদবাবুকে তাঁর ছোটঠাকুর্দা বলেছেন। তিনিও নিশ্চয়ই তাঁর পূর্বপুরুষদের মুখে শুনে থাকবেন। কথা হল, এতদিন এঁরা চুপ করে বসে ছিলেন কেন? পুরী থেকে অনেক আগেই তো অভিযান করতে পারতেন ওঁরা।”

অর্জুনের মনে হল অমলদা ঠিক কথাই বলছেন। বিষ্টুসাহেব জিজ্ঞেস করলেন, “ওই কাগজপত্রে কিছু পেলেন?”

“হ্যাঁ। সেইটেই ইন্টারেস্টিং। ওগুলো আসলে নন্দলাল সেনের জীবনের বৃত্তান্ত। তাঁর নিজের লেখা নয়। যিনি লিখেছেন তিনি। কণ্টটকী শব্দ জানেন। ইচ্ছে করেই হয়তো মানেটাকে গুলিয়ে ফেলা হয়েছে। কণ্টটকী আমিও জানি না। যেটিকু বোঝা গেল তাতে নন্দলাল কালাপাহাড়ের পুরী অভিযানের পর একেবারে নিঃশব্দে সরে যান দল থেকে। হয়তো কালাপাহাড়ের অত্যাচার তাঁর আর সহ্য হয়নি। এই দল-ছাড়ার আগে তিনি

অনুমতিও নেননি । কালাপাহাড় হয়তো নন্দলালের ওই ধৃষ্টতা মেনে নিত না যদি তাকে জরুরি প্রয়োজনে পুরী থেকে চলে না আসতে হত । ”

অর্জুন চুপচাপ শুনছিল । এবার জিজ্ঞেস করল, “আপনি কালাপাহাড়ের সম্পর্কে সব কিছু জেনেছেন ? মানে যেটুকু জানা সম্ভব ?” অমলদা হাসলেন, “খুব বেশি কিছু নয় । তুমি যা জেনেছ, তাই । গতকাল বিকেলে আমরা বেড়াতে-বেড়াতে তোমার মাস্টারমশাই-এর কাছে গিয়ে শুনলাম তুমি আমাদের আগেই পৌঁছে গিয়েছ । তদলোক সারাজীবন ইতিহাস নিয়ে আছেন, অনেক কিছু জানেন । কিন্তু তাঁর জানাতেও বিস্তর অনুমান আছে । ”

“আপনি কীভাবে কেসটা শুরু করবেন ?”

“এখনও ভাবিনি । কিন্তু খুব ইন্টারেস্টিং লাগছে । ”

“কালাপাহাড়ের অতীত, মানে জন্মবৃত্তান্ত... !”

“এইখানে একটা কথা ।” অমলদা হাত তুলে থামালেন, “ধরো, কোনও মানুষ খুন হলেন । অপরাধী কে সেটা আন্দাজ করতে পারছ । কিন্তু তাঁর গতিবিধি জানবার জন্য কি তুমি তাঁর বাল্যকাল হাতড়াবে ?”

“না, তা নয় । কিন্তু তাঁর অভ্যেস বা সংস্কার জানবার জন্য পেছনের দিকে হয়তো যেতে হতে পারে । আপনি বলছেন কালাপাহাড় কোনও সাক্ষী রেখে ধনসম্পদ লুকিয়ে রাখবে না । তা হলে নন্দলাল সেটা জানলেন কী করে ? জানলেও নিজের অংশ নেননি কেন ?”

“দুটো কারণ থাকতে পারে । কালাপাহাড় যে সম্পত্তি পরে ব্যবহার করবে বলে লুকিয়েছিল তা যদি নন্দলালের জানা থাকে তা হলে কালাপাহাড়ের মৃত্যুর পরেই ওঁর মনে হতে পারে এবার ওই সম্পত্তি বেওয়ারিশ, আর কেউ যখন জানে না তখন আমি ভাগ নিই । তা হলে ভাগ কেন ? পুরোটাই তো নিতে পারতেন । মুগল ফৌজের তোপে কালীগঙ্গার ধারে কালাপাহাড় মারা যায় । তবু হরিপদবাবুর দেওয়া কাগজপত্রে পাছি—নন্দলাল অংশের কথা বলছেন । কালাপাহাড় পুরী আক্রমণ করে ১৫৬৫ খ্রিস্টাব্দে । ধরা যাক, তখনই বা তাঁর কিছু পরে নন্দলাল দলত্যাগ করেন । এর প্রায় পনেরো বছর পরে কালাপাহাড় মারা যায় । ততদিন নন্দলাল পুরীতেই আঘঘোপন করে থাকতে পারেন । কিন্তু কালাপাহাড় মারা যাওয়ার পরে তো নিজেই যেতে পারতেন ধনসম্পদ উদ্ধার করতে !”

অমল সোম চোখ বন্ধ করলেন, “নন্দলাল যাননি । হয় তিনি অসুস্থ ছিলেন, নয় অন্য কারণ ছিল । নন্দলালের কথা যিনি লিপিবদ্ধ করেছেন তিনিও অংশের কথাই বলেছেন । তা হলে কি আর কেউ নন্দলালের সঙ্গী ছিল ?”

বিষ্টুসাহেব মাথা নাড়লেন, “বাঃ । চমৎকার ! দুটো কারণ বলছিলেন, আর-একটা কী ? একটা না হয় অসুস্থতা অথবা অন্য কোনও সঙ্গীর জন্যই যেতে পারেননি ভদ্রলোক ।”

অমলদা বললেন, “দ্বিতীয় কারণ খুব সোজা । কালাপাহাড়ের একার পক্ষে অন্ত ধনসম্পদ লুকোনো স্তুত ছিল না । সেইজন্য বিশ্বস্ত অনুচর নন্দলালকে লক্ষে নিয়ে সেটা করেছেন । তারপর হয়তো আশ্বাস দিয়েছিলেন কিছুটা অংশ পরে দেবেন । কিন্তু পুরী আক্রমণের পরে ভদ্রলোকের মনে অনুত্তপ্ত আসে । তিনি তাঁর প্রভুর সঙ্গ ত্যাগ করেন । ওরকম মনের অবস্থায় লুঁঠিত ধনসম্পত্তি সংপর্কে মনে ঘৃণা জন্মানো অস্বাভাবিক নয় । তাই তিনি কালাপাহাড় মারা কান্দয়ার পরেও উদ্ধারের চেষ্টা করেননি । কিন্তু ঘটনাটা ছেলে বা নাতিকে কলেছিলেন । তাঁরাই লেখার সময় ধনসম্পত্তির উল্লেখ করে নিজেদের অংশ লক্ষণ করে বসে আছে । কিন্তু ততদিনে এ-দেশের রাজনৈতিক চরিত্র ঘন-ঘন বদল ইচ্ছে । নন্দলালের বংশধরদের পক্ষে ইচ্ছে থাকলেও উদ্ধার করা স্তুত ছিল না । আর নন্দলাল তাঁদের বিস্তারিত বলেও যাননি ।”

এবার অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “এত বছর পরে আমরা জায়গাটা বের করব কী করে ?”

অমলদা হাত নেড়ে হাবুকে ডাকলেন । ইশারায় কাপ-প্লেট তুলে নিতে বললেন । তারপর চোখ বন্ধ করলেন, “কালাপাহাড় কেন ধনসম্পত্তি লুকিয়েছিল ? তার তো প্রচণ্ড প্রতাপ ছিল । নিশ্চয়ই সে চায়নি ওগুলোর কথা অন্য লোক জানুক । এই অন্য লোক সম্ভবত বাংলার নবাব দাউদ খাঁ, কালাপাহাড় যাঁর সেনাপতি । অভিযান করে সেনাপতি যা লুঠ করবে তা অবশ্যই নবাবের প্রাপ্য । যতই প্রতাপশালী সেনাপতি হোক, নবাবের কাছে কালাপাহাড়কে জবাবদিহি করতেই হত । কোনও একটা অভিযান করে রাজধানীতে ফেরার পথে কালাপাহাড় ওগুলো লুকিয়ে রাখে । নন্দলালের বর্ণনা অনুযায়ী মনে হয় জায়গাটা এই উল্লেখবঙ্গ । কারণ দাউদ খাঁর রাজধানী ছিল মালদহের তাঙ্গা নামে একটা শহরে । এবার ব্যাপারটা একটু সহজ হয়ে গেল । মালদহে ফেরার পথে উল্লেখবঙ্গ যদি পড়ে তা হলে কালাপাহাড় অসম অভিযান করেই ফিরছিল এবং সেটা পুরী অভিযান করার ঠিক আগে । তা হলে ওর ওই ফেরার পথ ধরে আমাদের এগোতে হবে ।”

ঠিক এই সময় একটা জিপ এসে গেটের সামনে থামল । অর্জুন দেখল জিপ থেকে থানার দারোগা শ্রীকান্ত বঞ্চি নামছেন । সে এগিয়ে গেল । শ্রীকান্তবাবু গেট খুলে কাছে এসে বললেন, “মিস্টার সোম, আপনাদের একটু বিরক্ত করতে এসেছি । শ্রেফ ফটিন কাজ ।”

অমলদা বললেন, “স্বচ্ছন্দে ।”

“হরিপদ সেন গতকাল আপনার কাছে এসেছিলেন । কী কথা হয়েছে ?”

“কী ব্যাপার ? আপনি আমার ক্লায়েটের ব্যক্তিগত কথা জানতে চাইছেন কেন ?”

শ্রীকান্ত বঞ্চি গভীর মুখে জবাব দিলেন, “আজ সকালে হরিপদবাবুকে তাঁর

হোটেলে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। শিলিগুড়ি পুলিশ একটু আগে জানাল। ”

অমলদা চমকে উঠলেন, “সে কী ! হরিপদবাবু মারা গিয়েছেন ?”

শ্রীকান্ত বক্সি মাথা নাড়লেন, “হ্যাঁ। ওঁকে খুন করা হয়েছে। ”

আঙ্কেপে আকাশে হাত ছুঁড়লেন অমলদা, “ইস। ভদ্রলোককে বললাম জলপাইগুড়ির কোনও হোটেলে থাকতে, কিন্তু কথাটা শুনতেই চাইলেন না !”

“আপনি কি ওঁর কথা শনে কিছু আন্দাজ করেছিলেন ?”

“না। উনি আমাকে একটা প্রস্তাব দিয়েছিলেন। সেটা নেব কি না তা ভাবতে একদিন সময় নিয়েছিলাম। ইন্ফ্যাক্ট আপনার বদলে এখন হরিপদবাবুকেই আশা করেছিলাম। আজ সকালে ওঁকে জানিয়ে দিতাম ওঁর প্রস্তাবে আমি রাজি। শিলিগুড়ি থেকে যাওয়া-আসা না করে আমি তাই ওঁকে জলপাইগুড়িতেই থাকতে বলেছিলাম। ”

“উনি রাজি হননি ?”

“না, বললেন সেখানে জিনিসপত্র রেখে এসেছেন। অথচ...।”

“উনি কী প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন ?”

হাত নাড়লেন অমলদা। খুব হতাশ দেখাচ্ছিল তাঁকে, “সেটা কি আমি বলতে বাধ্য ?”

“হয়তো ওঁর খুনের কোনও ইঙ্গিত আমরা পেতে পারি। ইন্ফ্যাক্ট, ওঁর হোটেলের ঘরে আপনার নাম-ঠিকানা লেখা একটা কাগজ পাওয়া গিয়েছে যার জন্য শিলিগুড়ি পুলিশ আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারে। ”

অমলদা একটু চিন্তা করলেন, “উনি আমাকে কিছু টাকা অ্যাডভাঞ্চ করে দিয়েছিলেন, ওঁর কাগজপত্রও আমার কাছে। কিন্তু আমার সন্দেহ ওঁর কাছে আরও কিছু ছিল যা আমাকে বিশ্বাস করে দিতে পারেননি। যা হোক, ওঁকে যখন ক্লায়েন্ট বলে ভেবেছি তখন ওঁর হত্যাকারীকে খুঁজে বের করা আমার নৈতিক কর্তব্য। মিস্টার বক্সি, উনি আমার কাছে এসেছিলেন গুপ্তধন উদ্ধার করার সাহায্য চাইতে। ”

“গুপ্তধন ?” শ্রীকান্ত বক্সি হতভম্ব।

“আজ থেকে প্রায় পাঁচশো বছর আগে মাটিতে পুঁতে রাখা ধনসম্পত্তি যা ঠিক কোথায় আছে তিনি জানেন না। ”

“তা হলে খুঁজবেন কী করে ?”

“সেই কারণেই ওঁর কাছে একদিন সময় চেয়েছিলাম। ”

“আচ্ছা ! তা হলে হত্যাকারী এই গুপ্তধনের খবর জানত !”

“মনে হচ্ছে তাই।” অমলদা উঠে দাঁড়ালেন, “আমরা একবার শিলিগুড়িতে যেতে চাই। ওঁর হোটেলে। সাহায্য করবেন ?”

“নিশ্চয়ই। আমিও যাচ্ছিলাম। আপনারা আমার সঙ্গে আসতে পারেন। ”

“আপনি কেন যাচ্ছিলেন ?”

“পুলিশের কাজ মশাই । ছুটোছুটি তো আমাদের চাকরি ।”

বিষ্ণুসাহেব বাড়িতেই থেকে গেলেন । অর্জুন আর অমল সোম দারোগাবাবুর ভিত্তে উঠে বসতেই চাকা গড়াল । অর্জুনের মনে পড়ল গতক্ষণ হরিপদবাবু এই সময় বেঁচে ছিলেন । এই বাড়ির গেট দিয়ে বেরিয়ে গাড়িতে উঠেছিলেন । আজ তিনি নেই । কে সেই লোক যে একজন অংশীদার কমিয়ে দিল ?

॥ পাঁচ ॥

প্রচণ্ড শব্দ করে জিপটা নড়ে উঠে গড়াতে-গড়াতে থেমে গেল । হরিশ ড্রাইভার আফসোসের গলায় বলল, “পাংচার হো গিয়া ।”

শ্রীকান্ত বক্সি জিজ্ঞেস করলেন, “স্টেপনি ঠিক আছে তো ?”

ড্রাইভার মাথা নাড়ল, “রিপেয়ারমে দিয়া থা, নেহি মিলা আজ ।”

শ্রীকান্ত বক্সি খিচিয়ে উঠলেন, “এত দায়িত্বজ্ঞানহীন কেন তোমরা ? স্টেপনি ছাড়া কেউ গাড়ি বের করে ?” তারপর অমলদার দিকে তাকিয়ে বললেন, “দেখুন তো কাণ্ড । এই সময় আমি যদি কোনও ক্রিমিনালকে তাড়া করতাম, তা হলে কীরকম বোকা বনতাম ?”

অমলদার দেখাদেখি অর্জুনও জিপ থেকে নেমে দাঁড়িয়েছিল । জায়গাটা শিলিঙ্গড়ি থেকে বেশি দূরে নয় এবং একেবারে ফাঁকা মাঠের গায়ে তারা দাঁড়িয়ে নেই । কিছু একতলা ঘর-বাড়ি এবং একটি বড় দোকান চোখে পড়ছে । ওই দোকানের পাস্তুয়া এ-অঞ্চলে খুব বিখ্যাত । দোকানের সামনে একটি কালো অ্যাস্তাসাড়ার দাঁড়িয়ে আছে । অমলদা সেদিকে তাকিয়ে বললেন, “এখান থেকে তো আর বাসে চড়া যাবে না, আগেরটায় যা অবস্থা দেখলাম, আপনাকে দেখে কেউ যদি লিফট দেয় তা হলে মুশকিল আসান হতে পারে ।”

শ্রীকান্ত বক্সি রাস্তার মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালেন । জলপাইগুড়ির দিক থেকে একটা মারুতি আসছে । দারোগাবাবু হাত দেখালেন । মারুতি থামল । তিনজন বসে আছেন ড্রাইভারকে বাদ দিয়ে । আরোহীরা জানতে চাইলেন গাড়ি থামাবার কারণ । দারোগাবাবু কারণটা জানালেন । স্পষ্টতই বোঝা গেল একজন মানুষের জায়গা ওই গাড়িতে হতে পারে । অমলদা দারোগাবাবুকে বললেন আগে চলে যেতে । শিলিঙ্গড়ির থানায় কথা বলে তিনি যেন সোজা হেটেলে চলে যান । শ্রীকান্ত বক্সির তেমন ইচ্ছে ছিল না কিন্তু অমলদা হিতীয়াবার বলার পরে আর আপন্তি করলেন না । মারুতি বেরিয়ে গেলে অমলদা বললেন, “এস, একটু পাস্তুয়া খাওয়া যাক ।”

রাস্তায় আর কোনও গাড়ি দেখা যাচ্ছিল না । ওরা পাস্তুয়ার দোকানে ঢুকে দেখল খদ্দের দু'জন । লোক দুটো চা খাচ্ছে আর নিজেদের মধ্যে চাপা গলায়

কথা বলছে । কাঠের টেবিল-বেঞ্চির ফাঁক গলে অর্জুন বসতেই শুনল অমলদা চারটে করে পান্তুয়া দিতে বললেন । ইদানীং অমলদা চায়ে পর্যন্ত নামমাত্র চিনি খান । চারটে পান্তুয়া অর্জুনের পক্ষেই বেশি বেশি হয়ে যাবে । কিন্তু সে কিছু বলল না ।

দুটো বড় প্লেটে পান্তুয়া এলে জিভে জল এল অর্জুনের । যেমন আকার তেমন লোভনীয় চেহারা । অমলদা প্রথমটা শেষ করে হঠাৎ দুহাত দূরে বসা লোক দুটোকে জিজ্ঞেস করলেন, “আপনারা তো শিলিগুড়িতে যাচ্ছেন, তাই না ?”

লোক দুটো কথা থামিয়ে এদিকে তাকাল । যার ফ্রেঞ্চকাট দাঢ়ি আছে সে জিজ্ঞেস করল “কী করে বুবালেন ?” লোকটার ঠোঁটে তখন সিগারেট চাপা রয়েছে ।

“গাড়িটা তো আপনাদের ?” *

ফ্রেঞ্চকাট বাইরে দাঁড় করানো গাড়ির দিকে তাকিয়ে নিয়ে মাথা নাড়ল, “হ্যাঁ ।”

“ওটা শিলিগুড়ির দিকে মুখ করে আছে, শিলিগুড়ি থেকে এলে উলটোমুখো থাকত ।”

ফ্রেঞ্চকাট হাসল, “বাঃ, আপনার নজর তো খুব । হ্যাঁ, শিলিগুড়িতেই যাচ্ছি । কিন্তু কেন ?”

অমলদা বললেন, “এখান থেকে বাসে ওঠা যায় না, একটু লিফট চাইছি ।”

এবার দ্বিতীয় লোকটি জিজ্ঞেস করল, “ওই পুলিশের জিপটাতে আপনারা ছিলেন না ?”

“হ্যাঁ । লিফ্ট নিছিলাম, খারাপ হয়ে গেল ।”

“আপনারা পুলিশ ?”

“না, না । বললাম না, লিফ্ট নিছিলাম ।”

ফ্রেঞ্চকাট কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তাকে থামিয়ে দিয়ে দ্বিতীয় লোকটি বলল, “ঠিক আছে, হিল ভিউ হোটেলের সামনে নামিয়ে দেব ।”

“বাঃ, তাতেই হবে ।”

কথ্যবার্তা শুনতে অর্জুনের পান্তুয়া খাওয়া হয়ে গিয়েছিল । অমলদা দ্বিতীয়টিতে আর চামচ বসাননি । অর্জুনের প্লেট খালি দেখে ইশারা করলেন বাকি তিনটে সে খেতে পারে । অর্জুন মাথা নাড়ল, “অসম্ভব । আমার পেট ভর্তি হয়ে গিয়েছে ।”

অমলদা উঠে দাঁড়ালেন । আটটা পান্তুয়ার দাম মিটিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালেন । অর্জুনও চলে এল তাঁর সঙ্গে । লোক দুটোর যেন চা খাওয়া শেষ হচ্ছিল না ।

হঠাৎ অমলদা জিজ্ঞেস করলেন, “অর্জুন, তোমার কী মনে হয়, হরিপদবাবু

কেন খুন হলেন ?”

“যে লোকটা শাসিয়েছিল সে-ই খুন করেছে ।”

“কিন্তু কেন ?”

“ওই সম্পত্তির লোভে ।”

“কিন্তু তুমি যাকে সম্পত্তি বলছ তা কোথায় আছে কেউ জানে না । হরিপদবাবুকে খুন করে খুনি এখনই লাভবান হচ্ছে না । তাই না ?”

“হয়তো হরিপদবাবু কিছু জানতেন, যা জানলে খুনি কালাপাহাড়ের সম্পত্তি হুঁজে পেতে পারে । কিংবা ওঁরা দুজনেই একটা সূত্র জানতেন । খুনি হরিপদবাবুকে সরিয়ে দিয়ে নিজের খোঁজার পথ নিষ্কটক করল ।”

“তা হলে আমাদের কাছে সাহায্য চাইতে এসে হরিপদবাবু সুন্দরী বললেন না কেন ? আমাদের ওপর তিনি আশ্চর্য রাখতেই চেয়েছিলেন ।”

“হয়তো প্রথম আলাপেই বলতে চাননি । এমন হতে পারে আজ এলে বলতেন ।”

“উহ । এত হয়তোর ওপর নির্ভর করা চলে না । তা হলে খোঁজার পথটা গোলকধৰ্ম্ম হয়ে যাবে । আরও স্পেসিফিক কিছু বলো ।”

অর্জুন ফাঁপরে পড়ল, “এখনই কিছু মাথায় আসছে না ।” অমলদা গাড়িটার সামনে এগিয়ে গেলেন । গাড়ির ডিকির ওপর কঁচা হাতে কেউ এস. আই. এল. লিখেছে । হয়তো কোথাও পার্ক করা ছিল, কোনও বাচ্চাছেলে আঙুলের ডগায় অক্ষর তিনটে লিখেছিল । এখন তার ওপর আরও ধূলো পড়ায় বেশ অম্পট হয়ে এসেছে । অমলদা বললেন, “গাড়িটা গতকাল শিলিঙ্গড়িতে ছিল । আজ যদি জলপাইগুড়ি থেকে আসে তা হলে বুবতে হবে ভোরেই শিলিঙ্গড়ি থেকে বেরিয়েছিল ।”

অর্জুন বুবতে পারছিল না অমলদা হঠাৎ এই গাড়ি নিয়ে এত চিন্তিত হয়ে উঠলেন কেন ! তার মনে হল আজকাল অমলদা অকারণে সব ব্যাপার মাথায় নেন ।

এই সময় লোক দুটো বেরিয়ে এল । চারপাশে তাকিয়ে দেখে দ্বিতীয়জন স্টিয়ারিং-এ বসল । পেছনের দরজা খুলে দিয়ে ফ্রেঞ্চকাট সামনের আসনে গিয়ে কাচ নামাতে লাগল । অমলদার পাশাপাশি পেছনের সিটে বসে অর্জুন দেখল দ্বিতীয় লোকটির বাঁ কান একটু ছোট । লতি প্রায় নেই বললেই চলে ।

গাড়ি চলতে শুরু করা মাত্র দ্বিতীয় লোকটি জিজ্ঞেস করল “আপনারা শিলিঙ্গড়িতে কাজে যাচ্ছেন ?”

“হ্যাঁ ।” অমলদা স্বাভাবিক গলায় বললেন, “ব্যবসার কাজে ।”

“কিসের ব্যবসা ?”

“বিনা মূলধনে যা করা যায় !”

“স্ট্রেঞ্জ ! মূলধন ছাড়া ব্যবসা করছেন ? উকিল-ডাক্তারদেরও তো এক সময়

কয়েক বছর খরচা করতে হয় ডিগ্রি পেতে। জলপাইগুড়িতেই থাকেন ?”

“আজ্জে হঁয়। কয়েক পুরুষ।”

এবার ফ্রেঞ্চকাট বলল, “কলকাতায় বাস করে জানতামই না যে, জলপাইগুড়ির ঐতিহাসিক গুরুত্ব এত বেশি। আমার তো বেশ ভাল লাগছে।” কথাগুলো বলেই সিগারেট ধরাল।

দ্বিতীয় লোকটি হাসল, “শিলিগুড়ির নেই ভাবছেন ? এই যে শিলিগুড়ি, এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব কম ? শিলিগুড়ি নামটা কী করে হল ? লেপচাদের সঙ্গে ব্রিটিশদের লড়াই। সেই ভয়ঙ্কর ব্রিটিশ সেনাবাহিনীকে হটিয়ে দিয়ে লেপচারা পাহাড় থেকে নেমে সমতলে শিবির গেড়েছিল। পরাজিত হয়েও ব্রিটিশরা আবার সৈন্য জোগাড় করে যখন ফিরে আসছে তখন একজন লেপচা সেনাপতি চিৎকার করে আদেশ দিলেন, ‘শ্যালিগ্রি’। শ্যালিগ্রি লেপচা শব্দ। মানে ধনুকে ছিলা পরাও। এই শ্যালিগ্রি থেকে শ্যালগিরি এবং শেষ পর্যন্ত শিলিগুড়ি।”

অর্জুনের মজা লাগছিল। জলপাইগুড়ি এবং শিলিগুড়ির লোকেরা পরস্পরকে সব সময় একটু নীচে রাখতে ভালবাসে। এব্যাপারে বেশ রেষারেবি আছে অনেকদিন ধরেই। জলপাইগুড়ির লোকের চেষ্টায় শিলিগুড়ির মুখে বিশাল রেল স্টেশন তৈরি হলেও তাই নাম রাখতে হলো নিউ জলপাইগুড়ি। এই দ্বিতীয় লোকটি নিশ্চয়ই শিলিগুড়ির অনেকদিনের বাসিন্দা। ফ্রেঞ্চকাট তো নিজেকে কলকাতার লোক বললাই। কয়েক মিনিটেই রাস্তাটা শেষ হয়ে গেল। হিল ভিউ হোটেলের সামনে গাড়িটা থামলে অমলদা নেমে পড়ে অনেক ধন্যবাদ দিলেন ড্রাইভার ভদ্রলোককে। তিনি মাথা নেড়ে চলে গেলেন।

একটা রিকশা নেওয়া হলো। শিলিগুড়িকে রিকশার শহর বললে ভুল বলা হবে না। প্রায় গায়ে-গায়ে অতি দ্রুত গতি নিয়ে রিকশাগুলো ফেভাবে ছুটোছুটি করে তাতে হৃৎপিণ্ড ধড়াস-ধড়াস করে। মহানন্দার ব্রিজ পেরিয়ে অমলদার পাশে বসে অর্জুন হোটেলের দিকে চলেছিল। অমলদা বসে আছেন গন্তীর মুখে। বা দিকে নতুন তৈরি বাস টার্মিনাস। এখন ফাঁকাই বলা যায়। আর-একটু গেলেই সিনক্লেয়ার হোটেল, ত্যারপরেই দার্জিলিং যাওয়ার রাস্তা, অর্জুনদের অত দূরে যেতে হলো না। ডান দিকের একটা সাধারণ হোটেলের সামনে অমলদা রিকশা থামালেন। হোটেলটির দরজায় দুটো সেপাই দাঁড়িয়ে আছে লাঠি হাতে। ভাড়া মিটিয়ে রিকশা ছেড়ে দিয়ে অমলদা এগিয়ে যেতেই অর্জুন অনুসরণ করল।

হোটেলে ঢোকার মুখে সেপাইরা বাধা দিল। একজন বলল, “হোটেল বন্ধ আছে।”

“আমরা জলপাইগুড়ি থেকে আসছি। শিলিগুড়ির ও. সি. সাহেব আমাদের সঙ্গে কথা বলবেন।”

“তা হলে থানায় যান। আমাদের ওপর অর্ডার আছে কাউকে চুক্তে না দেওয়ার।”

“ম্যানেজারবাবু আছেন?”

“না। ওঁকে থানায় ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।”

অমলদা অর্জুনের দিকে তাকালেন, “এখানেও ধৰকই সমস্যা। বিশ্লেষকরণীর জন্য গোটা গন্ধমাদন পর্বত তোলা হচ্ছে। কিন্তু আমাদের বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না। শ্রীকান্ত বঞ্চি এসে পড়েছেন।”

অর্জুন ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল শ্রীকান্ত বঞ্চি একটা পুলিশের জিপ থেকে নামছেন। তাঁর সঙ্গে আর একজন অফিসার নেমে এলেন। লোকটি রোগাটে, ঢোয়াল বসা, মাথার চুল অল্প, পঞ্চাশের ওপর বয়স। ইনিই সন্তুষ্ট শিলিগুড়ির ও. সি। এমন চেহারার মানুষ খুব সন্দেহবাতিকগ্রস্ত হন।

“আপনারা কীসে এলেন?” শ্রীকান্ত বঞ্চি জিজ্ঞেস করলেন।

“দুই ভদ্রলোক অনুগ্রহ করে পৌঁছে দিলেন।” অমলদা সহাস্যে জবাব দিলেন।

“আপনিই বোধহয় এখানকার ও. সি.? আমার নাম অমল সোম, এই ছেলেটির নাম অর্জুন।”

শ্রীকান্তবাবু বললেন, “আপনি আমাদের তলব করেছেন। নিশ্চয়ই কথা বলব, কিন্তু তার আগে আমরা কি সেই ঘরটিতে যেতে পারি যেখানে হরিপদবাবু খুন হয়েছেন?”

শিলিগুড়ি দারোগা বললেন, “কেন যেতে চাইছেন ওখানে?”

“হরিপদবাবু আমার ক্লায়েন্ট ছিলেন।”

“হ্ম। শ্রীকান্ত, তুমি কী বলো?” শিলিগুড়ির ও. সি. এবার মুখ ফেরালেন।

শ্রীকান্ত বঞ্চি ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, “মিস্টার সোম সাহায্য করলে এই কেস দুইনেই সলভড হয়ে যাবে রায়দা। তা ছাড়া উনি যা বলছেন তা করাটাই যুক্তিসঙ্গত হবে।”

“যুক্তিসঙ্গত মানে? উনি গোয়েন্দা হতে পারেন কিন্তু এই কেসে উনি একজন...মানে, ঠিক আছে, তুমি যখন বলছ! চলুন ওপরে। তবে আমিও সঙ্গে থাকব।” শিলিগুড়ির ও. সি., যাঁর পদবি রায়, হাত নেড়ে সেপাইদের সরে যেতে বললেন।

দোতলার যে ঘরটিতে হরিপদবাবু ছিলেন তার দরজায় তালা দেওয়া। হোটেলে কোনও লোকজন নেই। এমনকী কর্মচারীদেরও দেখা যাচ্ছে না। রায়বাবুর পকেটে চাবি ছিল। তিনিই দরজা খুললেন। জানলা বন্ধ। তাই আলো জ্বালা হল প্রথমে। শ্রীকান্ত বক্সি জানলা খুলে দিলেন। মাঝারি আকারের ঘর। মাঝখানে একটা ডাবলবেড, চাদর ছাড়া। টেবিলে কিছু কাগজপত্র, ব্যাগ ছাঢ়ানো আছে। অমলদা বললেন, “বড় নিয়ে যাওয়ার পর ভাল করে খুঁজে দেখা হয়েছে?”

রায়বাবু জিজ্ঞেস করলেন, “কী খুঁজব? কু? কোনও দরকার নেই। লোকটা ওই দরজা দিয়েই ঢুকেছিল। হরিপদ সেন বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে ছিলেন। চুপচাপ ভেতরে ঢুকে সোজা ওঁর পিঠে দশ ইঞ্চি শার্প সরু ছুরি বসিয়ে দিয়েছে। কাজ শেষ করে ওই দরজা দিয়েই চলে গেছে।”

অমলদা চট করে শ্রীকান্ত বক্সির দিকে তাকালেন। তিনি তখন দরজায় দাঁড়িয়ে। অমলদা বললেন, “একথা তো আপনি আমাকে জলপাইগুড়িতে বলেননি?”

“আমি তো তখন পুরো ঘটনাটা জানতাম না।”

অমলদা একটু ভাবলেন, “ভদ্রলোক, মানে খুনি ওই দরজা দিয়ে ঢুকলেন কী করে? হরিপদবাবু কি দরজা খুলে রেখে বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়েছিলেন?”

“ঠিক তাই।” রায়বাবু বললেন, “অনেক লোক হোটেলে এলেও কেয়ারলেস হয়ে থাকে।”

মাথা নড়লেন অমলদা, “হরিপদবাবুর সঙ্গে মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য আলাপ হলেও আমি জোরগলায় বলতে পারি, তিনি দরজা খুলে ওইভাবে শুয়ে থাকার মানুষ নন।”

রায়বাবু একটু বিরক্ত হয়েই জিজ্ঞেস করলেন, “তা হলে খুনি ঢুকল কী করে?”

“সেটা নিয়ে একটু ভাবনাচিন্তা করা যেতে পারে।” কথাগুলো বলতে-বলতে অমলদা পুরো ঘরটা একবার পাক মেরে এলেন। তাঁর ঘরের মেঝের ওপর ছিল। শেষ পর্যন্ত তিনি দেওয়াল আলমারিটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। কিছুক্ষণ দেখে জিজ্ঞেস করলেন, “এ ঘরের সমস্ত হাতের ছাপ নিয়ে নিয়েছেন মিস্টার রায়? নিলে আমি আলমারিটা খুলতে পারি। আমাকে যখন একজন পার্টি করেছেন তখন এটুকু সাবধানতা অবলম্বন করতেই হচ্ছে।”

রায়বাবু বললেন, “ফিঙ্গার প্রিন্টের লোককে সঙ্গের আগে পাওয়া যাচ্ছে না।”

অমলদা বললেন, “তা হলে রুমাল ব্যবহার করছি।”

পকেট থেকে সাদা রুমাল বের করে ডান হাতে নিয়ে তার আড়ালে আঙুল ঢেকে আলমারি খুললেন অমলদা। হ্যাঙরে এক-জোড়া শার্ট-প্যান্ট ঝুলছে। নীচের তাকে একটা খোলা ফাইল। ফাইলটা সন্তুষ্ট সাদা ফিতের বাঁধা ছিল। বিতেটা হেঁড়া। হাঁটু গেড়ে বসে ফাইলের কাগজপত্র দেখতে-দেখতে অমলদা বললেন, “একেবারে লভভন্ত করে দিয়ে গেছে। অর্জুন, তুমি ততক্ষণে বাথরুমটা দেখে এসো।”

রায়বাবুকে অমলদার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে দেখে অর্জুন বাঁ দিকের দরজা ঠেলে বাথরুমে ঢুকল। শুকনো বাথরুম। একটা নীল তোয়ালে ঝুলছে। আয়নার নীচে নতুন সাবানকেসে অল্প ব্যবহার করা সাবান ছাড়া আর কিছু নেই। বাথরুমে কোনও সন্দেহজনক জিনিস চোখে পড়ল না। সে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে দেখল অমলদা টেবিলের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। টেবিলের দু'ধারে দুটো চেয়ার। একটা সিনেমার ম্যাগাজিন পড়ে আছে। মাঝাখানের অ্যাসট্রেতে গোটা দুয়েক সিগারেটের টুকরো পড়ে আছে। অমলদা বললেন, “মিস্টার রায়, পোস্টমর্টেম যিনি করবেন তাঁকে বলবেন যেন পরীক্ষা করে দ্যাখেন হরিপদবাবুর সিগারেটের মেশা ছিল কি না। এটা খুব কড়া সিগারেট। শখে পড়ে যারা সিগারেট খায়, তাদের পক্ষে খাওয়া সন্তুষ্ট নয়।”

রায়বাবু অ্যাসট্রেটাকে স্বত্ত্বে সরিয়ে রাখলেন। অর্জুন দেখল ভদ্রলোকের চোখ-মুখের পরিবর্তন হয়েছে। বেশ সন্তুষ্ট ফুটে উঠেছে। টেবিলে আর কিছু পেলেন না অমল সোম। কিন্তু টেবিলের নীচে খুঁকে কিছু-একটা দেখেই সোজা হলেন। চারপাশে আর-এক-বার নজর বুলিয়ে বললেন, “আপনি বললেন এ-ঘরের কোনও জিনিসে হাত দেওয়া হ্যানি, তাই না?”

“নিশ্চয়ই।” রায়বাবু মাথা নাড়লেন।

“হরিপদবাবুর চাটি কিংবা জুতো কোথায়?”

এতক্ষণে খেয়াল হলো অর্জুনেরও। এতক্ষণ শুধু সে লক্ষ করছিল খুনি কোনও ক্লু রেখে গিয়েছে কি না। সে-কারণেই হরিপদবাবুর ব্যবহৃত জিনিসের প্রতি নজর ছিল না।

ঘরের কোথাও ভদ্রলোকের চাটি বা জুতো খুঁজে পাওয়া গেল না।

অমলদা বললেন, “ব্যাপারটা তো খুবই অস্বাভাবিক। খুনি ওঁকে খুন করে যেতে পারে কিন্তু চাটি বা জুতো নিয়ে যাবে কেন? গতকাল আমি হরিপদবাবুর পা দেখেছি। এমন কিছু মূল্যবান বস্তু ছিল না। আর ভদ্রলোক নিজে ওই প্রয়োজনীয় জিনিস দুটো বাইরে ফেলে দিয়ে বিছানায় শুয়ে থাকবেন এটা ভাবা যাচ্ছে না।”

রায়বাবু বললেন, “সত্য তো, ওগুলো গেল কোথায়?”

অমলদা বললেন, “আপনার লোকজনকে বলুন একটু খুঁজে দেখতে। এই

হোটেলের আশেপাশে পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। কিন্তু শিলিগুড়ি শহরের ডাস্টবিন বা রাস্তা থেকে যারা বাতিল জিনিসপত্র কুড়োয়, তাদের জানিয়ে রাখুন।”

অমলদা ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ামাত্র অন্যান্যরা তাঁকে অনুসরণ করল। বারাদায় দাঁড়িয়ে অমলদা জিজ্ঞেস করলেন, “হোটেলের কর্মচারীদের জেরা করে কিছু জানতে পারলেন?”

রায়বাবু মাথা নাড়লেন “ডিটেলসে জিজ্ঞেস করিনি। এমনিতে সবাই বলছে কেউ কিছু জানে না।”

“আমি একটু কথা বলার সুযোগ পাব-?”

“তা হলে তো আপনাকে থানায় যেতে হয়।”

“যেতে তো হবেই। আপনি আমাদের জেরা করবেন বলেছিলেন।”

রায়বাবু জিভ বের করলেন, “ছিন্নি। ওভাবে বলবেন না। হরিপদবাবুকে জীবিত অবস্থায় আপনি দেখেছিলেন, উনি হোটেলের ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করেছিলেন কীভাবে জলপাইগুড়িতে গিয়ে আপনাকে মিট করবেন, তাই আপনার একটা স্টেটমেন্ট নেওয়া আমার কর্তব্য।”

“সেটা অবশ্যই নেওয়া উচিত।”

হোটেলটিকে আবার তালাবন্ধ করে রায়বাবু ওঁদের নিয়ে জিপে উঠলেন। রাস্তায় কোনও কথা হল না। থানায় গিয়ে রায়বাবু ওঁদের সমাদর করে বসালেন। নিজের চেয়ারে বসেই পুলিশি গলা ফিরে পেলেন যেন, “হরিপদ সেনকে আপনি আগে চিনতেন?”

“না কম্মিনকালেও নয়।” অমলদা মাথা নাড়লেন।

“উনি সেই কলকাতা থেকে আপনার কাছে কেন এলেন?”

“গুপ্তধনের খোঁজে।”

“মানে?” রায়বাবুর মুখ হাঁ হয়ে গেল।

“ওঁর পূর্বপুরুষ কালাপাহাড়ের সহচর ছিলেন। কালাপাহাড় উত্তর বাংলার কোথাও অনেক সোনা-হিরে মাটিতে পুঁতে রেখেছিলেন। ওঁর পূর্বপুরুষ সেটা জানতেন। হরিপদবাবু চেয়েছিলেন আমরা সেটা উদ্ধার করে দিই। এই অনুরোধই তিনি করেছিলেন।”

“কোথায় ওগুলো পেঁতা হয়েছিল তিনি আপনাকে জানিয়েছিলেন?”

“না। তিনি জানতেন না।”

“স্ট্রেঞ্জ! উত্তর বাংলার কোথায় খুঁজবেন আপনি? পাগল নাকি?”

“তবু আমি কেসটা নিয়েছিলাম। এব্যাপারে ভদ্রলোক বেঁচে থাকলে সাহায্য পেতাম।”

“দেখুন মিস্টার সোম, আপনার এই গল্প কেউ বিশ্বাস করবে না।”

“প্রথমত গল্প নয়, ঘটনা। বিশ্বাস করানোর দায়িত্ব আমার নয়।”

“বেশ । তারপর কী হল ?”

“আমি ওঁকে আজ দেখা করতে বলেছিলাম ।”

“উনি শিলিগুড়িতে থাকতে গেলেন কেন ? জলপাইগুড়িই তো ভাল ছিল ।”

“সে-কথা আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম । ভদ্রলোক হেসে বলেছিলেন শিলিগুড়িতেই উনি ভাল থাকবেন । মনে হচ্ছে, মানে এখন অনুমান করছি, শিলিগুড়িতে কারও সঙ্গে দেখা করবেন ঠিক ছিল, যেটা আমাকে বলেননি ।”

“কার সঙ্গে ?”

“সম্ভবত যে লোকটি ওঁকে খুন করেছে তার সঙ্গেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল ।”

হঠাতে রায়বাবুর যেন কিছু মনে পড়ল । চট করে উঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, “হরিপদবাবুর পূর্বপুরুষ কার সহচর বললেন ?”

অমলদা বললেন, “কালাপাহাড় ।”

“আত্মুত্ত ব্যাপার ? কালাপাহাড় মানে সেই ঐতিহাসিক চরিত্র ?”

“হ্যাঁ ।”

রায়বাবু উঠে একটা আলমারির পাল্লা খুললেন । বাঁ দিকের তাক থেকে একটা খাম বের করে তা থেকে একটা কাগজ টেনে আনলেন । বেশ রহস্যময় মুখ করে এগিয়ে এসে কাগজটাকে টেবিলের ওপর মেলে ধরলেন ।

একটা প্যাডের পাতার গায়ে রক্ত শুকিয়ে রয়েছে । পাতাটা কোঁচকানো । বোঝা যাচ্ছে ওই কাগজ দিয়ে কিছু মোছা হয়েছিল । প্যাডের পাতায় কেউ অনেকবার “কালাপাহাড়” শব্দটা লিখে গেছেন নানান ঢঙে । তার ওপর শুকনো রক্ত চাপা পড়েছে ।

অমলদা জিজ্ঞেস করলেন, “এই কাগজটাকে কোথায় পাওয়া গিয়েছে ?

“হরিপদবাবুর শরীরের ওপরে ।”

“আপনি তখন যে বললেন ঘরের কোনও জিনিস সরানো হয়নি ?”

“এটাকে জিনিসের মধ্যে ধরিনি । আমি কিন্তু হরিপদবাবুর ব্যবহৃত জিনিসের কথা বলেছিলাম ।”

“ছুরিটা কোথায় ?”

“ছুরি ?”

“যেটা দিয়ে ওঁকে খুন করা হয় ?”

“সেটা তো খুনি নিয়ে গেছে । মনে হচ্ছে এই কাগজটা দিয়েই ছুরি মুছেছে ।”

“এখনও পোস্টমর্টেম হয়নি । আপনি কী করে তখন বললেন দশ ইঞ্চির ছুরি ছিল ?”

“এতদিন পুলিশের চাকরি করছি, উভ দেখে আন্দাজ করতে পারব না ?”

চুপ করে রইলেন অমলদা খানিক । তারপর বললেন, “প্যাডের কাগজটা

অবশ্যই হরিপদবাবুর । খুনি ছুরি মুছতে প্ল্যান করে পকেটে কাগজ নিয়ে আসবে না । কিন্তু ঘরের কোথাও আমি প্যাড দেখতে পাইনি । সেটা গেল কোথায় ।”

রায়বাবু মাথা নাড়লেন, “ঠিক কথা ! এটা আমার মাথায় আসেনি ।”

শ্রীকান্ত বাজি এতক্ষণ বেশ চুপচাপ শুনছিলেন । এবার বললেন, “আপনাকে আমি আগেই বলেছিলাম অমলবাবুর এ-ব্যাপারে দারুণ মাথা খোলে ।”

অমলদা হাত নাড়লেন, “আমাকে কি আর কোনও প্রশ্ন করবেন ।”

“না । তবে, হ্যাঁ । আপনি কালাপাহাড়ের নাম বললেন । ঐতিহাসিক চরিত্র । কিন্তু এই কাগজে সেই নামটা লেখা থাকবে কেন ?”

“হয়তো হরিপদবাবু লিখেছিলেন অন্যমনস্ক হয়ে ।” অমলদা হাসলেন, “মাথায় যেটা চোকে সেটা আমরা অনেকেই অন্যমনস্ক অবস্থায় কলমে ফুটিয়ে তুলি । তবে দেখতে হবে ওই কাগজের রক্ত এবং হাতের লেখা হরিপদবাবুর কি না ।”

“রক্তটা ওঁর কি না বের করতে অসুবিধে হবে না । হাতের লেখা মেলাব কী করে ?”

“হোটেলের খাতায় নিশ্চয়ই ওঁর হস্তাক্ষর পাওয়া যাবে । তাকিয়ে দেখুন বাংলার সঙ্গে ইংরেজি অক্ষরেও কালাপাহাড় লেখা হয়েছে । ক্যাপিটল লেটারে যখন নয় তখন লেখাতে কিছুটা মিল পাওয়া যাবেই । যাক, এবার আমাকে হোটেলের কর্মচারীদের সঙ্গে কথা বলার ব্যবস্থা করে দিন ।” অমলদা উঠে দাঁড়ালেন ।

॥ সাত ॥

হোটেলের যেসব কর্মচারীকে থানায় ধরে নিয়ে আসা হয়েছিল অমল সোম তাদের জেরা করলেন । গতকাল হরিপদবাবুর কাছে কারা এসেছিলেন, হরিপদবাবুর ঘর থেকে কোনও আওয়াজ শোনা গিয়েছিল কিনা, মৃতদেহ কীভাবে আবিস্কৃত হল ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর যা পাওয়া গেল তাতে কোনও কাজ হল না । লোকগুলো এত ভয় পেয়েছে যে, কোনও কথাই বলতে চাইছে না । কিংবা ওদের কিছুই বলার নেই । হত্যাকাণ্ড সকলের অগোচরে ঘটে গেছে । অর্জুনেরও মনে হল এমনটা ঘটা অসম্ভব নয় । হত্যাকারী সবাইকে জানিয়ে নিশ্চয়ই হরিপদবাবুর ঘরে ঢুকবে না ।

থানার বড়বাবুর ঘরে ফিরে এসে অমলদা ঘড়ি দেখলেন । তারপর অর্জুনের দিকে তাকিয়ে বললেন, “তুমি কি মিসেস দন্তকে কোনও কথা দিয়েছ ?”

মিসেস দন্ত ! অর্জুন ঠাওর করতে পারল না । তার অবাক-হওয়া মুখের

টিকে তাকিয়ে অমল সোম বললেন, “হৈমন্তীপুর চা-বাগানের এখন যিনি অনিক ।”

সঙ্গে-সঙ্গে মনে পড়ে গেল অর্জুনের । ভদ্রমহিলাকে আজ দুপুরের মধ্যেই জানানোর কথা হয়েছিল কেস্টা নেওয়া হবে কি না । কিন্তু সকাল থেকে এমন কৰ ঘটনা ঘটতে লাগল যে, ওঁর কথা মাথায় ছিল না । অর্জুন অমল সোমের দিকে তাকাল । হৈমন্তীপুর চা-বাগানের কেস্টা অমলদা নিতে পারবেন না বলে জানিয়েছেন তাকে । তা হলে হঠাৎ এ-প্রসঙ্গ তুললেন কেন ? সে বলল, “আমরা তো ওঁর কেস নিছি না, তাই না ?”

অমলদা কথা শেষ করার ভঙ্গিতে বললেন, “সেটাও তো ওঁকে জানিয়ে দেওয়া উচিত । তুমি একটা ফোন করে ওঁকে জানিয়ে দাও ।”

দু'জন পুলিশ অফিসার চুপচাপ শুনছিলেন কথাবার্তা । শ্রীকান্ত বঞ্চি হাত বাড়িয়ে টেবিলের কোণে রাখা টেলিফোন দেখিয়ে দিলেন । শিলিঙ্গড়ি থেকে হৈমন্তীপুর চা-বাগানে টেলিফোনে কথা বলতে হলে জলপাইগুড়ি এক্সচেঞ্জ হয়ে লাইন পেতে হবে । সেসব চেষ্টা করে যখন হৈমন্তীপুর চা-বাগানের কাছে টেলিফোন এক্সচেঞ্জকে পাওয়া গেল তখন অর্জুন জানতে পারল মিসেস দত্তের ঝংলো বা ফ্যাট্টিরির টেলিফোন কোনও সাড়া দিচ্ছে না । সেখানকার অপারেটার জানালেন হৈমন্তীপুর চা-বাগানের টেলিফোন লাইন কাজ করছে না । রিসিভার নামিয়ে রেখে অর্জুন অমল সোমকে ঘটনাটা জানাল ।

অমল সোম গভীর হয়ে গেলেন । তারপর শ্রীকান্ত বঞ্চির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, “আপনার এলাকা যদিও নয় তবু আপনি কি হৈমন্তীপুর টি এস্টেটের ব্যাপারটা জানেন ?”

শ্রীকান্ত মাথা নাড়লেন, “শ্রমিক বিক্ষেপে বক্স ছিল । শেষপর্যন্ত বাগানটা খোলা হয়েছে বলে শুনেছি । কাল জানলাম দু-একটা খুন হয়েছে সেখানে ।”

“পুলিশকে জানানো সত্ত্বেও কোনও সুরাহা হচ্ছে না ?”

শ্রীকান্ত বঞ্চি হাসলেন, “পুলিশ তো ম্যাজিসিয়ান নয় । নিশ্চয়ই খুব সাধারণ ব্যাপার নয় । কোনও কোনও সমস্যার তো চট করে সমাধান হয় না ।”

অমল সোম এবার অর্জুনকে বললেন, “ব্যাপারটা আমার খুব ভাল লাগছে না । তুমি এখনই হৈমন্তীপুরে চলে যাও । ভদ্রমহিলা যেসব আশঙ্কা করছিলেন তাই ঘটতে শুরু হয়েছে । টেলিফোন লাইন কেটে দিয়ে তাঁকে বিছিন্ন করার চেষ্টাও করা হতে পারে । তোমার কাছে টাকা-পয়সা আছে ?”

আজ অর্জুনের পকেটে টাকা ছিল না । সেরকম প্রস্তুতি নিয়ে সে বাড়ি থেকে বের হয়নি । অমল সোম তাকে পঞ্চাশটি টাকা দিলেন, “এদের কাছে তো কিছুই জানা গেল না তাই শিলিঙ্গড়ি থেকে ফিরতে আমার সঙ্গে হয়ে যাবে । ভদ্রমহিলাকে খবরটা দিয়েই তুমি জলপাইগুড়িতে ফিরে যেয়ো ।” অমল সোম পুলিশ অফিসারদের দিকে ঘুরে তাকালেন, “আমরা কি এবার একটু

চা খেতে পারি ?”

অর্জুন থানা থেকে বেরিয়ে এল। হরিপদ সেনের হত্যারহস্য খুব সহজে সমাধান হবে বলে মনে হচ্ছে না। অমলদার মুখ্য দেখে মনে হল তিনি এখন পর্যন্ত অঙ্ককারেই আছেন। আর যেহেতু হরিপদবাবু আগাম টাকা দিয়ে গিয়েছেন তাই এই রহস্য সমাধান না করা পর্যন্ত অমলদা গভীর থাকবেন। কিন্তু অর্জুন ভেবে পাঞ্চিল, না এইভাবে তাড়াহুড়ো করে অমলদা তাকে কেন হৈমন্তীপুরে পাঠাচ্ছেন ? ভদ্রমহিলাকে সে বলেছিল আজকে জানাবে। সেটা আগামিকাল হলে এমন কিছু ক্ষতি হত না। হৈমন্তীপুরে না গিয়ে অমলদার সঙ্গে শিলিগুড়িতে থেকে হরিপদবাবুর আসামিকে খুঁজে বের করার চেষ্টাতেই অনেক বেশি আনন্দ ছিল ! কালাপাহাড়ের উত্তরাধিকারী নবীন কালাপাহাড়ের মোকাবিলা তো এখানেই হবে। অর্জুন ঘড়ি দেখল। এখন সেবক-মালবাজার হয়ে হাসিমারা দিয়ে হৈমন্তীপুরে পৌঁছে আর ফেরার বাস পাওয়া যাবে না। সঙ্গের মুখেই ওদিকে বাস-চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। অর্জুন ঠিক করল মিনিবাসে জলপাইগুড়ি ফিরে গিয়ে তার নিজের মোটর বাইক নিয়ে হৈমন্তীপুরে যাবে। একটু এগিয়ে সে দেখল থানার কাছে মিনিবাস স্ট্যান্ডে কোনও বাস নেই। দেরি করা চলবে না বলে সে রিকশা নিয়ে চলে এল শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি হাইওয়েতে। এবং তখনই একটা ধাবমান ট্যাঙ্কি থেকে কেউ বিকট গলায় ‘অর্জুন’ বলে চিৎকার করে উঠল।

অবাক হয়ে অর্জুন দেখল একটা ওয়াই মার্ক অ্যাস্বাসার কোনও মতে ত্রেক ক্যাতে-ক্যাতে খানিকটা দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। নিশ্চয়ই কোনও চেনালোক, যিনি জলপাইগুড়িতে যাচ্ছেন। গাড়িটা এবার ব্যাক করছে। কাছাকাছি পৌঁছেই দরজা খুলে যিনি লাফিয়ে নেমে তাকে জড়িয়ে ধরলেন তাঁর কথা কল্পনাতেও আসেনি। দু’ হাতের চাপে ততক্ষণে হাঁসফাঁস অবস্থা অর্জুনের। মেজর কিন্তু নিশ্চেব নন। গাড়ি থেকে নামায়াত্র সমানে চিৎকার করে যাচ্ছেন, “এই যে মিস্টার থার্ড পাওব, কী সারপ্রাইজ, আঃ, কতদিন পরে দেখলাম আমাদের গ্রেট ডিটেকটিভকে, লম্বা হয়েছে, উঁচু, একটুও মোটা হওনি, দ্যাটস ফাইন, অমলবাবুর খবর কী ?”

কোনওমতে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে লম্বা-চওড়া দাঁড়িওয়ালা মানুষটির মুখে সরল হাসি দেখল অর্জুন। তারপর জিজ্ঞেস করল, “আপনি কেমন আছেন ?”

“খুব ভাল। যাকে বলে ফার্স্ট ক্লাস। একটু বুড়ো হয়েছি, এই যা।” বলে আকাশ-ফাটানো হাসলেন। অর্জুনের মনে হল এই মানুষটি একইরকম রয়েছেন। সেবার কালিম্পং থেকে শুরু করে আমেরিকা-ইউরোপে সে মেজরের সঙ্গে দিনের পর দিন থেকেছে। মেজরকে দেখলেই মনে হত হার্জের আঁকা ক্যাটেন হ্যাডক রক্তমাংসের শরীর নিয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এবার দাঁড়িতে সাদা ছোপ লেগেছে একটু বেশি পরিমাণে, এই যা।

ট্যাক্সিতে বসে অর্জুন বলল, “বিষ্ট সাহেবের কাছে খবর পেয়েছিলাম আপনি এদেশে এসেই কালিস্পাংগে চলে গিয়েছেন। কাজ হয়েছে?”

“কাজ? কাজের জন্য তো আমি যাইনি। ওখানকার একজন লামা আমাকে টিটিপত্র লিখতেন। তাঁর পেটে একটা অসুখ হয়েছে। এখানকার ওমুধে কাজ লিছে না তাই আমায় ওদেশি ওমুধ এনে দিতে লিখেছিলেন। সেটাই দিয়ে এলাম।” মাথা নাড়লেন মেজর, “এখন ক’দিন রেস্ট’ নেব, যাকে বলে অথ, অথ—।”

“অথগু বিশ্রাম।” অর্জুন সাহায্য করল।

“টিক। মাঝে-মাঝে একটা বাংলা শব্দ ভীষণ বিট্টে করে। তোমাদের হাতে কোনও কাজ নেই তো? গুড। কী? মাথা নেড়ে হাঁ বললে না কি।” চোখ ঝুঁক করলেন মেজর।

অর্জুন হাসল, “আমরা এখন তিনটে কেসে জড়িয়ে পড়েছি।”

“তিন-তিনটে? কোনও গোয়েন্দা একসঙ্গে তিনটে কেস করে না। আমি তো অস্তত পড়িনি। ইভ্ন শার্লক হোমস! তিনটে ডিফারেন্ট কেস।”

“না। দুটো গায়ে-গায়ে। একটা আলাদা।”

“ইটারেস্টিং। বলে ফ্যালো ব্যাপারটা।” কথাটা বলেই মেজর সোজা হয়ে সামনের সিটের দিকে তাকালেন। সেখানে ড্রাইভার আপনমনে গাড়ি চলাচ্ছে। লোকটি নেপালি। সম্ভবত মেজর কালিস্পাং থেকেই তাকে ভাড়া করেছেন। মেজর তাকে জিজ্ঞেস করলেন, “আপ ইংলিশ জানতা হ্যায়?”

“ইয়েস স্যার।” লোকটি মুখ না ফিরিয়ে জবাব দিল।

“হিন্দি তো জানতা হ্যায়। বেঙ্গলি? বাংলা?”

“অঞ্জ-অঞ্জ।”

“ডেঞ্জারাস। তা হলে তো থার্ড পার্সনের সামনে আলোচনা করা যাবে না অর্জুনবাবু। কী করা যায়?” মেজরকে খুব চিত্তিত দেখল।

অর্জুন এতক্ষণ ড্রাইভারের অস্তিত্ব খেয়াল করেনি। কিন্তু তার মনে হল মেজর একটু বেশি চিন্তা করছেন। কালিস্পাংগের একজন নেপালি ড্রাইভারের কোনও স্বার্থ থাকতে পারে না কালাপাহাড়ের বাসে। কিন্তু মেজর যেভাবে গভীর মুখে এখন বসে আছেন, তাতে বোধা যাচ্ছে তিনি সত্যিই তৃতীয় ব্যক্তির সামনে মুখ খুলতে চান না। কিছুক্ষণের মধ্যে ব্যাপারটা খুব মজাদার হয়ে পাঁড়াল। গাড়ি চলছে জলপাইগুড়ির দিকে কিন্তু কেউ কোনও কথা বলছে না। মেজর গভীর হয়ে রাস্তা দেখতে-দেখতে ঘুমিয়ে পড়লেন। এবার তাঁর মাকড়াকা শুর হয়ে গেল। সেইসঙ্গে ড্রাইভারও মুখ ফিরিয়ে পেছনে তাকাল। কথা বন্ধ করা মাত্র কোনও মানুষ এমন চট করে গভীর ঘুমে চুকে যেতে পারে তা মেজরকে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। অম্বল সোমের বাড়ির সামনে পৌঁছে ট্যাক্সি ছেড়ে দেওয়া হল। সুটকেস নামিয়ে মেজর হাত-পা আকাশে

ଛୋଟାର ଚେଷ୍ଟା କରଲେନ, “ଏକଟୁ ସମୟ ନିଯେ ସ୍ନାନ କରା ଯାବେ, କୀ ବଲ ?”

“ଆପନି ସ୍ନାନ କରନ । ବିଟୁସାହେବ ନିଶ୍ଚଯାଇ ଏଥନ ବିଶ୍ରାମ ନିଛେନ । ହାବୁଦା ଆଛେ । ଆମାକେ ଏଥନାଇ ବାଇକ ନିଯେ ଛୁଟିତେ ହବେ ହେମତୀପୁରେ ।”

“ସେଟା କୋଥାଯ ?”

“ଏଥାନ ଥେକେ ପ୍ରାୟ ଏକଶୋ କିଲୋମିଟାରେର ବୌଶି ଦୂରେ ଏକଟା ଚାବାଗାନ ।”

“ବାଟ ହୋଇଯାଇ ? ଯାଚ୍ଛ କେନ ?”

“ଓହି ଯେ ତଥନ ବଲଲାମ, ତିନ-ତିନଟେ କେମେର କଥା । ଏଟି ତାର ଏକଟା ।”

ମେଜର ଗେଟ ଥୁଲେ ସୁଟକେସ ନିଯେ ଭେତରେ ଚୁକତେଇ ହାବୁକେ ଦେଖା ଗେଲ । ହାବୁ ବାଗାନେ ଦାଁଡ଼ିଯେ ମେଜରକେ ଦେଖଛିଲ ସନ୍ତବତ । ତାର ମୁଖେର ଭଙ୍ଗ ସୂଖକର ନଯ । ମେଜରକେ ହାବୁ ଅପହଞ୍ଚ କରଛେ । ମେଜର ଜିଜ୍ଞେସ କରଲେନ, “ତୋମାର ନାମ ହାବୁ ? ଗୁଡ । ସୁଟକେସଟା ଭେତରେ ରାଖୋ । ବିଟୁସାହେବ କୀ କରଛେନ ? ଅମଲବାବୁ କୋଥାଯ ?”

ପାଶେ ଦାଁଡ଼ିଯେ ଅର୍ଜୁନ ବଲଲ, “ଆପନି ବୋଧହ୍ୟ ଭୁଲେ ଗିଯେଛେନ ହାବୁଦା କାନେ ଶୋନେ ନା ଏବଂ କଥାଓ ବଲତେ ପାରେ ନା । ଅମଲଦା ଏଥନ ଶିଲିଙ୍ଗଡିତେ ।”

“ଶିଲିଙ୍ଗଡିତେ କେନ ?”

“ଓହି କେମେର ବ୍ୟାପାରେଇ ଓଥାନେ ଗିଯେଛେନ ।”

“ଆଶଚର୍ଯ ! ତଥନ ଥେକେ କେମ୍-କେମ କରଛ ଅର୍ଥାଟ ଘଟନାଟା ବଲଛ ନା !”

“କୀ କରେ ବଲବ ? ଆପନି ତୋ ଘୁମୋଛିଲେନ ।”

“ଘୁମୋଛିଲାମ ? ଆମି ? ଇମ୍ପସିବଳ । ଚୋଥ ବନ୍ଦ କରେ ଭାବଛିଲାମ । ଓ ହାଁ, ମନେ ପଡ଼େଛେ, ଡ୍ରାଇଭାରଟା ଛିଲ, ତାଇ ଆମରା ଆଲୋଚନା କରିନି । କିନ୍ତୁ ଏଇ ହାବୁଚନ୍ଦ୍ରେର ସଙ୍ଗେ ତୋମାର କମ୍ବୁନିକେଟ କର କୀ କରେ ?”

“ଆପନି ସବ ଭୁଲେ ଗେଛେନ । ହାବୁଦା ଠିକ ବୁଝେ ନେଯ । ତା ହଲେ ଆପନି ବିଶ୍ରାମ କରନ । ହାବୁଦା, ଇନି ବିଟୁସାହେବର ସଙ୍ଗେ ଥାକବେନ । ସ୍ନାନ-ଖାଓ୍ୟାର ବ୍ୟବଶ୍ଵା କରୋ ।” କଥା ବଲାର ସଙ୍ଗେ ଆଙ୍ଗୁଲେର ଇଞ୍ଜିନେ ବକ୍ରବ୍ୟ ବୁଝିଯେ ଅର୍ଜୁନ ତାର ନିଜେର ବାଇକଟାର ଦିକେ ଏଗିଯେ ଗେଲ । ମେଜର କଯେକ ପା ହେଟେ ହାବୁର ହାତେ ସୁଟକେସ ଧରିଯେ ଦିଯେ ଅର୍ଜୁନେର ସଙ୍ଗେ ଗେଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଲେନ । ଅର୍ଜୁନ ଇଞ୍ଜିନେ ସଟାଟ ଦେଓୟାମାତ୍ର ବଲଲେନ, “ତୋମାର ହାତ ପାକା ତୋ ? ଆମାର ଆବାର ବାଇକେ ଉଠିତେ ଥୁବ ନାର୍ଭ୍ସ-ନାର୍ଭ୍ସ ଲାଗେ !”

“ଆପନି ଉଠିବେନ ମାନେ ?” ଅର୍ଜୁନ ଅବାକ ।

“ଆନ୍ତୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ତୋ !” ମେଜର ଖିଂଚିଯେ ଉଠିଲେନ, “ତୁନି ଯାବେନ ଏକଶୋ କିଲୋମିଟାର ଦୂରେ କେମ୍ କରତେ, ଆର ଆମି ଏଥାନେ ବସେ ସଜନେର ଡାଁଟି ଥାବ ? ତାହାଡା ତିନ-ତିନଟେ କେମେର ଗଲ୍ଲ ଏଥନ୍ତି ଶୋନା ହ୍ୟାନି ।”

ମେଜର ବାଇକ ନାଚିଯେ ପେଛନେର ସିଟେ ବସେ ବଲଲେନ, “ପେଛନେର ଚାକାର ହାଓ୍ୟା ଠିକ ଆଛେ ତୋ ?”

ଅର୍ଜୁନ କାତର ଚୋଥେ ତାର ବାଇକେର ଚାକା ଦେଖଲ । ଏଇ ଲାଲ ବାଇକେର ଓପର
୫୦

তার খুব মায়া । কাউকে হাত দিতে দেয় না । মেজরের ভারী শরীর বইলে বাইকটার ক্ষতি হবে কিনা বুঝতে পারছিল না সে । তবু শেষ চেষ্টা করল, “আপনি স্নান করে বিশ্রাম নেবেন বলেছিলেন !”

“বিশ্রাম আমার কপালে নেই ভাই । চল ।”

অগত্যা চাকা গড়াল । পেছনের ভার খানিকক্ষণ বাদেই সয়ে গেল অর্জুনের । মেজর এবার তাকে প্রায় আঁকড়ে ধরেছেন ! অর্জুন তাঁকে সহজ হয়ে বসতে বলায় তিনি রেগে গেলেন, “নিজে মাথায় হেলমেট পরেছ, আমার মাথা খালি, ছিটকে পড়লে কী হবে ভেবে দেখেছ ? হ্যাঁ, এবার বল, হৈমন্তী পুর নাকি ছাই, সেখানে কী হচ্ছ ?”

বাইকে স্পিড বাড়িয়ে তিঙ্গা বিজের দিকে যেতে যেতে অর্জুন হাওয়ার ওপর গলা তুলে বলল, “খুন হচ্ছ ।”

॥ আট ॥

লাল বাইকটা ছুটে যাচ্ছিল ডুয়ার্সের সুন্দর চওড়া পথ ধরে । গয়েরকটা বীরপাড়ার মোড় হয়ে যখন অর্জুনরা জলদাপাড়ার জঙ্গলের গায়ে পৌঁছল তখন সূর্যদেব পাতাড়ি গোটাতে ব্যক্ত । ব্যাক সিটে মেজর এখন অনেকটা স্বচ্ছন্দ হয়ে বসে আছেন । সারাটা পথ আর মুখ খোলেননি । খুন হওয়ার গঞ্জটা শোনার পর থেকেই তিনি চুপচাপ । ভুল হল, ঠিক চুপচাপ নন তিনি, ঠোঁট বন্ধ করে সমানে একটা সূর বের করে যাচ্ছেন নাকের ফুটো দিয়ে । কানের কাছে সেটা খুব শৃঙ্খিকর নয় কিন্তু অর্জুন সেটা সহ্য করেছিল । পুরনো দিনের বাংলা গান থেকে আরম্ভ করে আধুনিক ইংরেজি গান, কিছুই বাদ যাচ্ছে না ।

অর্জুনের অস্বস্তি শুরু হল মাদারিহাট টুরিস্ট বাংলো ছাড়ানোর পর থেকেই । দিনে-দিনে ফিরে না এলে অস্বস্তিটা যাবে না । অথচ সেটা যে আর সম্ভব নয় তা এখন বোঝা যাচ্ছে । এসব অঞ্চলে সঙ্গের মুখেই হাতি বেরিয়ে আসে জঙ্গল ফুঁড়ে । সেটা নিয়েও সে ভাবছে না । যাদের এড়াতে মিসেস মমতা দত্ত নিজের গাড়ি ছেড়ে অন্যভাবে জলপাইগুড়িতে তাদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন, তাদের নিয়েই এখন চিন্তা । অবশ্য এখন সে একা নেই, মেজর সঙ্গে থাকায় কিছুটা সাহস পাওয়া যাচ্ছে । অর্জুন বাইকের গতি আরও বাড়াল ।

পথে কোনও বাধা পাওয়া যায়নি । হাসিমারার মোড়ে একটা প্রাইভেট কার দাঁড়িয়েছিল । মোড় বলেই গতি কমাতে বাধ্য হয়েছিল অর্জুন । এবং তখনই সে ভানুদাকে দেখতে পেল । লম্বা পেটা শরীর । ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় সুভাষিণী চা-বাগানের ম্যানেজার । বছরখানেক আগে অমল সোমের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন ভদ্রলোক । না, কোনও প্রয়োজনে নয় । গঞ্জ শুনে আলাপ করে

গিয়েছিলেন। দারুণ মানুষ। এডমণ্ড হিলারির সঙ্গে এভারেস্টের ওপর তলায় উঠে ছবি তুলেছেন প্রচুর। সেই সময় বরফের কামড়ে পায়ের কয়েকটা আঙুল ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল। এক সময় একটি ইংরেজি দৈনিকের চাকুরে ছিলেন। এডমণ্ড সাহেবের বইয়ে ওঁর তোলা প্রচুর ছবি আছে। সত্যিকারের স্পোর্টসম্যান মানুষটি এখন চা-বাগানের ম্যানেজার। অর্জুন তাঁর গাড়ির পাশে নিজের বাইক দাঁড় করাল।

মুখ ফিরিয়ে দেখতে পেয়েই ভানুদা চিংকার করলেন, “আরে সাহেব যে! এদিকে কী ব্যাপার?” একগাল হাসলেন ভদ্রলোক।

বাইক দাঁড় করাতেই মেজরও জিজ্ঞেস করলেন, “আমরা কি পৌঁছে গিয়েছি?”

অর্জুন মাথা নাড়ল, “এখনও কিছুটা পথ বাকি। আসুন এর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। ভানুদা, ইনি মেজর, আমাদের খুব কাছের মানুষ, সারা পৃথিবী জুড়ে অনেক অ্যাডভেঞ্চার করেছেন। আর ইনি ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, টি প্ল্যান্টের, এডমণ্ড হিলারির সঙ্গে এভারেস্ট গিয়েছিলেন।”

বাইকে বসেই মেজর জিজ্ঞেস করলেন, “কতটা?”

“মানে?” ভানুদা জানতে চাইলেন।

“কতটা উঠেছেন?”

“সামান্যই। মাত্র বাইশ হাজার ফুট।”

“গুড়! এবার যখন নর্থ পোলে আমার জাহাজডুবি হল তখন ভেবেছিলাম এভারেস্টের ওপরে নিশ্চয়ই এর চেয়ে বেশি ঠাণ্ডা হবে না। কেমন ঠাণ্ডা?”

“প্রচণ্ড। কিন্তু কোথায় জাহাজডুবি হয়েছিল বললেন?”

“নর্থ পোলে। বেড়াতে গিয়েছিলাম। ওখানকার পেঙ্গুইনদের ছবি তুলব এমন ইচ্ছে ছিল। জাহাজের ক্যাপ্টেন একটা আমেরিকান গেঁয়ার। চার্লি বলে ডাকতাম। হাজারবার বলেছিলাম, কুয়াশায় যখন চারপাশ ঢাকা তখন আর এগিয়ো না। শুনল না কথা। চোরা বরফে ধাক্কা খেলাম। আইসবার্গ। ব্যস। ডুবল। লাইফ জ্যাকেট পরে ওই ঠাণ্ডায় পাক্কা আট ঘণ্টা থাবি খেয়েছি জলে। হেলিকপ্টার এসে না তুললে আপনার সঙ্গে আলাপ হত না।”

কথা শুনতে-শুনতে ভানুদা এতখানি মুক্ষ যে, তাঁর গলায় সেটা ফুটে উঠল, “আরে কী আশ্চর্য, আপনাকে তো ছাড়ছি না। চলুন আমার বাগানে।”

মেজর মাথা নাড়লেন, “না, নামতে পারব না।”

“মানে?”

“এতক্ষণ বাইকে বসে শরীর জমে গিয়েছে। এখন নেমে দাঁড়ালে আর উঠতে পারব না। এইভাবে এতক্ষণ বসা যে কী পরিশ্রমের! সেটা ভুলতে গান গাইছিলাম। শরীরের সব কজ্ঞ এখন একেবারে আটকে গিয়েছে।”

“এই বাইকে আপনাকে উঠতে হবে না। আমার গাড়িতে পা ছড়িয়ে

କଣ୍ଠମ । ”

ଏବାର ଅର୍ଜୁନ ଆପଣି କରଲ, “ଭାନୁଦା, ଆମି ଏକଟା ଜକ୍ରରି କାଜେ ହୈମଣ୍ତୀ ପୁର ଜୀବାଗାନେ ଯାଇଛି । ଏଥିନ ଆପନାର ଓଖାନେ ଯାଓଯା ଯାବେ ନା । ”

“ହୈମଣ୍ତୀ ପୁର ?” ଚମକେ ଉଠିଲେନ ଭାନୁ ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାୟ, “ମେଥାନେ କେନ ?”

“ମିସେସ ମମତା ଦନ୍ତକେ ଏକଟା ଖବର ଦିତେ । ”

“ହୈମଣ୍ତୀ ପୁରେର ଏଥନକାର ଅବଶ୍ୟା ସମ୍ପର୍କେ ଧାରଣା ଆହେ ତୋ ?”

“କିଛୁଟା ଆହେ । ”

“ଗତକାଳିମ ମିସେସ ଦନ୍ତର ବାବୁଟି ଖୁନ ହେୟେ । ”

ହଠାତ୍ ମେଜର ବଲେ ଉଠିଲେନ, “ଅୟାନାଦାର ଖୁନ ? ତା ହଲେ ତୋ ଆମାଦେର ଦେଖାନେ ଯେତେ ହଜେଇ । ନୋ ମିସ୍ଟାର ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାୟ, ଏର ପରେର ବାର ଆପନାର ସଙ୍ଗେ ଦେଖା କରବ । ”

ଭାନୁଦା ହାତ ନାଡ଼ିଲେନ, “ଜାସ୍ଟ ଏ ମିନିଟ । ସଙ୍ଗେ ହେୟେ ଏସେଛେ । ଆମାର ମନେ ହ୍ୟ ଆଜକେର ରାତଟା ଆମାର ଓଖାନେ କାଟିଯେ କାଳ ସକାଳେ ଗେଲେଇ ଭାଲ ହବେ । ”

ଅର୍ଜୁନ ମାଥା ନାଡ଼ିଲ, “ତାହଲେ କଥାର ଖେଳାପ ହେୟେ ଯାବେ । ମିସେସ ଦନ୍ତକେ ଆମି କଥା ଦିଯିଛେ ଆଜଇ ଖବର ଦେବ । ଆପନି କି କିଛୁ ଆଶଙ୍କା କରାହେ ?”

“ହୁଁ । ବାଗାନେ ଦୋକାର ଆଗେଇ ବିରାଟ ନୀଳଗିରି ଫରେସ୍ଟ । ଏକଟାର ପର ଏକଟା ଖୁନ ହଜେ ଦେଖାନେ । ତା ହଲେ ଚଲ, ଲୋକାଳ ଥାନାଯ ତୋମାଦେର ନିଯେ ଯାଇ । ଓଦେର ଏସକଟକେ ସଙ୍ଗେ ନିଯେ ଯାଓଯା ଯେତେ ପାରେ । ”

“କିନ୍ତୁ ଥାନାଯ ଯାଓଯାଟା ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଠିକ କାଜ ହବେ ନା । ଆପନି ଯାଦେର ଭୟ ପାଚେନ ତାଦେର ନଜର ନିଶ୍ଚଯାଇ ଥାନାର ଓପରେଓ ଆହେ । ”

ଭାନୁ ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାୟ ଏକଟୁ ଚିନ୍ତା କରଲେନ । ତାରପର ବଲିଲେନ, “ବାଇକଟକେ ଏଥାନେ ରେଖେ ତୋମର ଆମାର ଗାଡ଼ିତେ ଓଠୋ । ତିନଜନେଇ ଯାଇ । ”

ମେଜର ଚଟପଟ ବଲେ ଉଠିଲେନ, “ଦ୍ୟାଟିସ ନଟ ଏ ବ୍ୟାଡ ଆଇଡ଼ିଯା । ”

ଏହି ସମୟ ଏକଟା ପୁଲିଶେର ଜିଂପକେ ଦେଖା ଗେଲ । ସମ୍ଭବତ ଭାନୁ ବନ୍ଦୋପାଧ୍ୟାୟର ଗାଡ଼ି ଦେବେଇ ଦାରୋଗାବାବୁ ଦାଁଡ଼ିଯେ ଗେଲେନ, “କେମନ ଆହେନ ସାର ?”

ଭାନୁଦା ହାତ ନାଡ଼ିଲେନ, “ଭାଲ । କୀ ଖବର ?”

ଜିପେ ବସେଇ ଦାରୋଗା ଉତ୍ତର ଦିଲେନ, “ଏହି ଚଲଛେ । ଏମନ ଏକଟା ଚାକରି ମଶାଇ ଯେ, ଏକଟୁ ଶାସ୍ତିତେ ଥାକାର ଜୋ ନେଇ । ”

ଭାନୁଦା ଜିଜ୍ଞେସ କରଲେନ, “ହୈମଣ୍ତୀପୁରେ ଶୁନଲାମ ଗତ ରାତ୍ରେ ମାର୍ଡର ହେୟେଛେ ?”

“ଆର ବଲବେନ ନା । ଆଜ ଭୋରେ ନାକି ଏକଟା ଅୟାନ୍ତାଦାର ଏସେଛିଲ ଏ ତଳାଟେ, ଶିଲିଙ୍ଗିଟି ଥେକେ । ଖବରଟା ପେଯେ ଛୁଟୋଛୁଟି କରଲାମ କିନ୍ତୁ କୋନ୍ତା ଲାଭ ହଲ ନା । ହୈମଣ୍ତୀପୁରେ ଦୋକାର ମୁଖେ ଯେ ସାଁକୋଟା ଛିଲ ସେଟା କେଉ ଉଡ଼ିଯେ ଦିଯେଛେ । ଗାଡ଼ି ଯାଇଁ ନା ଆର । ମନେ ହଜେ ଭଦ୍ରମହିଳାକେ ବାଗାନ୍ଟା ବିକ୍ରି କରେ

দিয়ে যেতে হবে। ” দারোগাবাবু বললেন।

“ওঁকে আপনারা প্রোটেকশন দিচ্ছেন না ?”

“কাকে দেব ? আমদের না জানিয়ে হৃষ্টাট জলপাইগুড়ি চলে যাচ্ছেন। এঁরা কারা ?” দারোগার চোখের দৃষ্টি ঘুরল।

“আমার বক্সু। ” ভানুদা জানাতেই দারোগা হাত নেঁড়ে চলে গেলেন।

অর্জুন এবার জিজ্ঞেস করল, “কী করবেন ? আপনার গাড়ি তা হলে হৈমস্তীপুরে চুকবে না। সাঁকো থেকে বাংলো কতদূর ?”

“মাইলখানেক তো বটেই। ” মনমরা হয়ে গেলেন ভানুদা।

“তা হলে আমরা চলি। এখন সাঁকোর নীচে জল থাকার কথা নয়। বাইকটাকে পার করাতে পারব। ফেরার সময় আপনার সঙ্গে দেখা করে যাব।”

অগত্যা যেন রাজি হতে বাধ্য হলেন ভানুদা, “বেশ। রাত নটা পর্যন্ত তোমাদের জন্য আমি অপেক্ষা করব। খুব চিন্তায় ফেলে দিলে ভাই।”

অর্জুন আর অপেক্ষা করল না। মেজের বললেন, “এই নামে একজন অ্যাস্ট্রর ছিলেন না ? খুব হাসাতেন ?”

“হ্যাঁ। সেটা প্রথম দর্শনে ওঁকে বলেছিলেন অমলদা। শুনে ভানুদা জবাব দিয়েছিলেন, কার সঙ্গে কার তুলনা করছেন ? উনি জিনিয়াস, আমি ওয়ান অব দ্য ম্যান।” অর্জুনের কথা শুনে মেজের এমন হেসে উঠেছিলেন যে, বাইকটা জোর নড়ে উঠল। মেজের বললেন, “সারি।”

একটু বাদেই হেডলাইট জ্বালাতে হল। রাস্তা নির্জন। দু'পাশে বাড়িগুলো নেই। হাসিমারা ছাড়াবার পরেই কেমন জঙ্গলে আবহাওয়ায় এসে গিয়েছিল ওরা, এবার সেটা গভীর হল। হঠাৎ মেজের অর্জুনের পিঠে টোকা মারলেন। অর্জুন ঘাড় না ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করল, “কিছু বলছেন ?”

মেজের গলা নামিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কানের কাছে মুখ এনে, “তোমার সঙ্গে রিভলভার আছে তো ? গুলি ভরা আছে কিনা দেখে নাও।”

অর্জুন স্বাভাবিক গলায় জবাব দিল, “আমার কাছে কোনও অস্ত্র নেই।”

“যাচ্ছলে। ” মেজের ককিয়ে উঠলেন।

“আপনি কি ভয় পাচ্ছেন ?”

“নো, নেভার। সেবার হার্লেমে মারপিট করেছিলাম খালি হাতে। ভয় আমি পাই না হে। তবে সাবধানের তো মার নেই। আর কত দূর ? আমার দুটো পা এমন অবশ হয়ে গিয়েছে যে, ও দুটো আছে কিনা তাই বুঝতে পারছি না।”

মেজেরের গলার স্বর শুনে অর্জুনের মায়া হল। ভারী শরীর নিয়ে একভাবে বসে থাকা সহজ কথা নয়। কিন্তু এই মানুষটাই কী করে তা হলে আক্রিকা, নর্থ পোলে অথবা তিব্বতে অভিযান করে বেড়ান ? মাঝে-মাঝে মনে হয় মেজের

নমনে গুল মেরে যাচ্ছেন, কিন্তু বিষ্টুসাহেব বলেছেন ওঁর সবচেয়ে বড় গুণ কখনওই মিথ্যে কথা বলেন না ।

অর্জুন নজর রাখছিল । প্রত্যেক চা-বাগানের সামনে নাম লেখা বোর্ড রাকে । সেটা থেকেই হৈমন্তীপুরের হাদিস পেতে হবে । হঠাৎ দারোগার কথাটা মনে এল । সকালে তিনি একটা অ্যাস্বাসাড়ারের খেঁজ করেছিলেন ? কোন অ্যাস্বাসাড়ার ? ভদ্রলোক বিশদে বলেননি । আজ সকালে শিলিঙ্গড়ি যাওয়ার পথে মিষ্টির দোকানে যেটা দাঁড়িয়ে ছিল, অমলদার অনুরোধে যে-গাড়িটা তাদের লিফ্ট দিয়েছিল সেইটে কি ? শিলিঙ্গড়িতে পৌঁছবার পর এ নিয়ে অমলদার সঙ্গে কথা বলার আর সুযোগ হয়নি । তবু ব্যাপারটা মনে বিধিতে লাগল । পরক্ষণেই সে চিন্তাটাকে ঝেড়ে ফেলতে চাইল । হৈমন্তীপুরের কেস্টা যখন সে নিচ্ছে না তখন এ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কী লাভ ?

বাইকের হেডলাইটের আলো সাইনবোর্ডের ওপর পড়তেই অর্জুন গতি কমিয়ে বলল, “আমরা এসে গিয়েছি ।” মেজর পেছন থেকে বললেন, “কোথায় এলাম ? চারপাশে তো অঙ্ককার !”

ততক্ষণে রাস্তাটা দেখতে পাওয়া গিয়েছে । পিচের রাজপথ থেকে একটু নুড়িতে ভরা পথ নেমে গিয়েছে বাঁ দিকে । চা-বাগানের রাস্তা যেমন হয় । অর্জুন বাঁ দিকে বাইক ঘোরাল । মেজর বলে উঠলেন, “ভাঙা বিজ্ঞাপকে খেয়াল কর । উঃ কী অঙ্ককার রে বাবা । সেবার নিউ ইয়াকে এক ঘণ্টার জন্য পাওয়ার চলে গিয়েছিল । ঠিক এমন অঙ্ককার হয়েছিল সেখানে । অমন ঘটে না বলে কেউ তো বাড়িতে মোমবাতি পর্যন্ত রাখে না ।”

গতি কম ছিল । মিনিট দেড়েক যাওয়ার পর সাঁকেটাকে দেখা গেল । কাঠের সাঁকো । বড়জোর হাত পনেরো হবে । ঠিক মাঝখানের কাঠগুলো উধাও । গাড়ি যাওয়া-আসা অসম্ভব, কিন্তু অর্জুনের মনে হল সার্কাসের বাইক ড্রাইভাররা ওই ফাঁকটুকু বাইক নিয়ে লাফিয়ে যেতে পারে । হেডলাইটের আলোয় সাঁকোর নীচেটা দেখল অর্জুন, তারপর বলল, “এবার আপনাকে নামতে হবে । বাইকটাকে নীচে নামাতে হবে ।”

একদম ইচ্ছে ছিল না মেজরের । গাঁইগুঁই করে তিনি কোনও রকমে নীচে নেমে চিৎকার করে বসে পড়লেন । বোৰা যাচ্ছিল পায়ে বিন্দুমাত্র জোর নেই । একনাগাড়ে বসে-বসে ও দুটোতে ঝিঁঝি ধরে গেছে । অর্জুন হেসে বলল, “মোটর বাইকের পেছনে বসে আপনার এই অবস্থা ! আর ভাবুন তো, কালাপাহাড়ের কথা ? ভদ্রলোক দিনের পর দিন রাতের পর রাত ঘোড়ার পিঠে বসে থাকতেন ।”

খিঁচিয়ে উঠলেন, “ইঃ, আমাকে কালাপাহাড় দেখিও না । আমি কি ওরকম লোক ? অস্তুত তুলনা ।”

মেজরের পা ঠিক হতে যে সময় লাগল তার মধ্যে অর্জুন দেখে নিল সাঁকোর

নীচে দিয়ে কোনওমতে বাইকটাকে পার করা সম্ভব হবে। বা ভেবেছিল ঠিক তাই, জল নেই। কয়েকটা বড় বোল্ডার পড়ে আছে শুকনো হয়ে। যায়ে মাঝে বাইকটাকে দুঃহাতে তুলতে হবে এই যা। পায়ে-পায়ে শুকনো ঝোরাটা পার হয়ে আবার রাস্তায় উঠতেই ওরা পায়ের শব্দ শুনতে পেল। আওয়াজ লক্ষ করে তাকাতেই অঙ্ককারের মধ্যেই একটা ছায়ামৃত্তিকে ছুটে যেতে দেখা গেল। মেজর চিৎকার করলেন, “অ্যাই কে ? হ্র আর ইউ ?”

অর্জুন মোটর বাইকের হেডলাইট ঘুরিয়ে লোকটির পেছনটা দেখতে পেল এক ঝলক। চট করে পাশের চা-বাগানের মধ্যে মিলিয়ে গেল সে।

মেজর বললেন, “লোকটা কে হে ? পালাল কেন ওভাবে ?”

“হয়তো গার্ড দিচ্ছিল। আমরা এসেছি এই খবর দিতে গেল।”

“কাকে ?”

“সেটাই তো জানি না।”

অর্জুন আবার বাইক চালু করল। মেজর জিজ্ঞেস করলেন, “উঠতে হবে ?”

“না হলে যাবেন কী করে ? হাঁটবেন ?”

“হাঁটা আমাকে দেখিও না তৃতীয় পাওব ? এক রাত্রে সাহারায় আমি কুড়ি মাইল হেঁটেছিলাম। ঠিক আছে, উঠছি।” বাইকে উঠে তিনি বললেন, “ভানুবাবুর প্রস্তাবটা খারাপ ছিল না। আজ রাত্রে ওঁর বাড়িতে রেস্ট নিয়ে কাল সকালে এলে হত।”

“পরিশ্রমই হয়নি যখন, তখন রেস্ট নেওয়ার কী দরকার ?”

মেজর নাক দিয়ে যে শব্দটা করলেন তাতে কথাটা যে খুব অপছন্দের, তা বোঝা গেল।

অঙ্ককার চিরে হেডলাইটের আলো এগিয়ে যাচ্ছিল। রাত্রে বাগানের চেহারা ভাল বোঝা যাচ্ছে না বটে কিন্তু রাস্তার ওপর যেভাবে শুকনো ভালপালা ছড়ানো আছে, তাতেই স্পষ্ট, ইদানীং যত্ন নেওয়া হচ্ছে না। একটু বাদে বাগানের ফ্যান্টিরি এবং অফিসগুলো নজরে এল। কোথাও আলো নেই। একটি মানুষকেও কাছেপিটে দেখা যাচ্ছে না।

অর্জুন দু'বার হ্রন্স দিল। তারপর এগিয়ে গেল সামনে। ডান দিকে বাঁক নিতেই আচমকা একটি আলোকিত বাংলা চোখে পড়ল। অনুমান করা গেল এটিতেই মমতা দন্ত থাকেন। বাংলোয় বিদ্যুৎ আছে। টেলিফোন মৃত কিন্তু বিদ্যুতের লাইন যদি ঠিক থাকে তা হলে আর সব জায়গা অঙ্ককার কেন ?

গেট বন্ধ। ভেতর থেকে তালা দেওয়া। অর্জুন হ্রন্স দিল। মমতা দন্তের নিজস্ব কর্মচারীরা নিশ্চয়ই পাহারায় থাকবেন কিন্তু তাদের দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। অর্জুন আরও কয়েকবার হ্রন্স দিল। মেজর নেমে দাঁড়ালেন। গেটের সামনে গিয়ে চিৎকার করলেন, “বাড়িতে কেউ আছেন ? আমরা জলপাইগুড়ি থেকে এসেছি !”

বাড়িটা ছবির মতো নিশ্চল রইল ।

অর্জুন বলল, “আপনি বাইকটার কাছে থাকুন, আমি ভেতরে চুকছি ।”

“ভেতরে চুকবে কী করে ? গেট তো বন্ধ ।”

“গেটটা টপকাতে হবে । আলো জ্বলছে যখন, তখন মানুষ নিশ্চয়ই ভেতরে আছে ।”

বাইকটাকে দাঁড় করিয়ে অর্জুন এগিয়ে গেল । গেটের উচ্চতা ফুট হয়েকের। খাঁজে পা দিয়ে সে শরীরটাকে ওপরে তুলে লাফিয়ে নামল নীচে । দুপাশে বাগান, মাঝখানে গাড়ি চলার পথ । সেই পথ ধরে বাংলোর দিকে এগোতেই সে দাঁড়িয়ে পড়ল । বাংলোর গাড়িবারান্দার নীচে সিঁড়ির ওপর উপুড় হয়ে আছে একটা শরীর । রক্তের ধারা বেরিয়ে এসে জমাট বেঁধে গেছে পাশে ।

॥ নয় ॥

এই ভর সন্কেতেই বাগানে ঝিঁঝি ডাকছিল । এ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই । এক বুক নিজনতা নিয়ে বাংলোটা হির হয়েছে গায়ে আলো মেখে, যার সিঁড়িতে পড়ে আছে একটি মানুষ । মৃত । অর্জুন হির হয়ে দাঁড়িয়েছিল ।

গেটের ওপাশে দাঁড়িয়ে মেজর গুলা তুলে জিজেস করলেন, “কী হল ? তুম দাঁড়িয়ে কেন ? বেল-টেল বাজিয়ে কাউকে ডাকো !”

গেট পর্যন্ত দূরত্ব অনেকখানি । মৃতদেহ পড়ে থাকার খবরটা দিতে হলে সেখানে ফিরে যেতে হয় । অবশ্যই এতে নার্ভাস হবে । অর্জুন হাত তুলে ইশারায় তাঁকে থামতে বলে এগিয়ে গেল । মৃতদেহের বেশ খানিকটা দূর দিয়ে সিঁড়ির ওপর উঠে আবার ফিরে তাকাল । অন্তত ঘণ্টা চারেক আগে খুন হয়েছে লোকটা । শরীর থেকে বেরনো রক্তের ধারায় ইতিমধ্যে মাছি জাতীয় পোকামাকড় এসে বসেছে । লোকটার পরনের পোশাক বলে দিচ্ছে মিসেস মমতা দত্তের এই বাড়ির পাহারাদার ছিল সে । এখন মৃতদেহ পরীক্ষা করার সময় নয় । যদিও রক্ত এখন চাপ বেঁধে গেছে তবুও খুনি যে এ-বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে না-ও হতে পারে । সেক্ষেত্রে এখানে দাঁড়িয়ে থাকা মানে তার নিজেরও বিপদ । ভেতরে ঢোকার দরজাটা খোলা । সেখানেও আলো জ্বলছে ।

এই ব্যাপারটা একটু আশ্চর্যজনক । এখন যে সময়, তাতে ঘণ্টা-চারেক আগে তো রীতিমত দিনের আলো থাকার কথা । সেইসময় যদি খুন হয়ে থাকে তা হলে সঙ্গের পর এ-বাড়ির আলো জ্বলল কে ? মিসেস দত্ত বাড়িতে থাকলে তিনি নিশ্চয়ই এই খুনের কথা পুলিশকে জানাবার চেষ্টা করতেন । তা হলে কি মিসেস দত্তকেও খুন করে গিয়েছে আততামী ? অর্জুনের কেমন শীত শীত

করছিল আচমকাই। কিন্তু মিসেস দত্ত সত্য খুন হয়েছেন কি না তা না জেনে ফিরে যাওয়ার কোনও মানে হয় না। সে দরজা পেরিয়ে ভেতরে ঢুকল। ঘরটি ড্রাইং রুম নয়, বোধহয় মালিকের সঙ্গে যেসব মানুষ আচমকা দেখা করতে আসতেন, তাঁদের এখানেই অপেক্ষা করতে হত। এ-ঘরেও আলো জ্বলছে। অর্জুন গলা তুলল “বাংলায় কেউ আছেন ?”

আওয়াজটা এত জোরে ছিল যে, বাংলায় কোনও লোক থাকলে সাড়া না দিয়ে পারবে না। অর্জুনের অস্থির হচ্ছিল। তার মনে হচ্ছিল কেউ কিংবা কারা তাকে আড়াল থেকে লক্ষ করে যাচ্ছে। হঠাৎ পেছন থেকে ঝাঁপিয়ে পড়লে কিছু করার থাকবে না। এমন নিরন্তর অবস্থায় আর এগোনো ঠিক হবে কিনা বুঝতে পারছিল না সে।

কিন্তু কোথাও কোনও শব্দ হল না। এবার অর্জুনের মনে হল আততায়ী মৃতদেহ সাজিয়ে রেখে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে পারে না। খুনি যত শক্তিশালী হোক না কেন, খুন করার পর নিজের নিরাপত্তার কথা সে নিশ্চয়ই চিন্তা করবে। ব্যাপারটা এইভাবে ভাবতে পেরে অর্জুনের বেশ ভাল লাগল। সে দ্বিতীয় ঘরটিতে প্রবেশ করল। এটিকে সুন্দর ছিমছাম ড্রাইংকম বলা যায়। সোফা থেকে শুরু করে অন্যান্য আসবাবে ঝুঁটির ছাপ আছে। যদিও দেওয়ালে ঝোলানো হরিণের জোড়া শিং এবং বাঘের মুণ্ডুসমেত ছাল চোখে বজ্জড় লাগছিল। এই ঘরটি দেখলে মনেই হবে না বাড়িতে কোনও মারাত্মক ঘটনা ঘটতে পারে।

পাশের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠল অর্জুন। চা-বাগানের মালিক এবং ম্যানেজাররা যে যথেষ্ট আরামে বাস করেন তা এইসব বাংলোয় এলে বেঁৰা যায়। পায়ের তলার কাপেটি পুরনো হলেও যথেষ্ট নরম। সিঁড়ির ওপরও আলো জ্বলছিল। প্রথম শোওয়ার ঘরে কেউ নেই। দ্বিতীয়টি লঙ্ঘনশু। বিছানার চাদর থেকে টেবিল-চেয়ার কিছুই স্পষ্ট নেই। অর্থাৎ এখানে ঝামেলাটা হয়েছিল। সেটা কার সঙ্গে ? লাগোয়া বাথরুমের দরজাটাও খোলা। উকি মেরে দেখে গেল ঘরটা ফাঁকা।

তিন-তিনটে ঘর এই বাংলার ওপরতলায়। দেখা হলে অর্জুনের স্পষ্ট ধারণা হল মিসেস দত্ত এ-বাংলো থেকে আগেই বেরিয়ে গিয়েছিলেন, নয়তো আততায়ীরা তাঁকে জোর করে ধরে নিয়ে গেছে। সম্ভবত সেই সময় দরোয়ানটা বাথ দেওয়ার চেষ্টা করছিল এবং তাকে প্রাণ হারাতে হয়েছে। আশ্চর্য ব্যাপার, আততায়ীদের পরিচয় পাওয়ার মতো কোনও চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না।

অর্জুন নীচে নেমে এল এবং তখনই টেলিফোনের কথা মাথায় এল। ওপরেও দুটো রিসিভার দেখেছে সে। নীচে সিঁড়ির গায়ে আর একটি। রিসিভার তুলেই বুঝতে পারল লাইন কেটে রাখা হয়েছে। এ-বাড়ির সঙ্গে বাইরের সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন।

ঠিক তখনই বাইরে মোটর বাইকের হর্ন বেজে উঠল। একটানা কল্পকবার। নিশ্চয়ই তার দেরি দেখে অধৈর্য হয়ে মেজর বাইকের হর্ন ঝাজাচ্ছেন। অর্জুন ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল। দরোয়ানের মৃতদেহের পাশ কাটিয়ে বাগানের মাঝখানের রাস্তা ধরে এগোতেই দেখতে পেল গেটের ওপরে মেজরের পাশে আরও দুটো মানুষ এসে দাঁড়িয়েছে। দু'জনের একজন হাইলা।

তাকে দেখতে পেয়েই মেজর চিৎকার করলেন, “কী করছিলে ভেতরে? এবাংলোয় ডাকাত পড়েছিল।” এরা এখানে কাজ করে, তামে পালিয়েছিল।”

গেটের কাছে পৌঁছে অর্জুন দুটি মদেশিয়া নারী পুরুষকে দেখতে পেল। পুরুষটির বয়স হয়েছে, নারী মাঝবয়সী। দু'জনের চেহারায় ভয় স্পষ্ট। অর্জুন তাদের জিজ্ঞেস করল, “এই গেটের চাবি কোথায় তোমরা জান?”

মাঝবয়সী নারী বলল, “দরোয়ানকে পাশ হ্যায়।”

“তোমরা কোন দিক দিয়ে বেরিয়েছিলে?”

“তখন এই গেট খোলা ছিল।” নিজের ভাষায় বলল বৃন্দ।

“বাংলোয় তখন কে কে ছিল?”

“আমরা দু'জন, মেমসাব আর দরোয়ান।” বৃন্দ জবাব দিল।

“তোমরা পালালে কেন?”

এবার নারী জবাব দিল, “ওরা আমাদের শাসাল, না পালালে খুন করে ফেলবে। চারজন লোক ছিল। বিরাট চেহারা। মুখে কাপড় বাঁধা। হাতে বন্দুক। দেখে বহুত ভয় লাগল। মেমসাবের ওপর থেকে বলল, আমার কিছু হবে না, তোরা পালা। তাই জান্ বাঁচতে আমরা পালিয়েছিলাম।”

“দরোয়ান কী করছিল?”

দু'জন মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। বৃন্দ বলল, “নিশ্চয়ই বাংলোয় ছিল। আমি দেখিনি।”

“এই গেটের চাবি কার কাছে পাওয়া যাবে?”

“দরোয়ানের কাছে।”

অর্জুন মুখ ফিরিয়ে দূরের সিঁড়ির দিকে তাকাল। এখান থেকে অবশ্য দরোয়ানের মৃত শরীর দেখা যাচ্ছে না। এই সময় মেজর জিজ্ঞেস করলেন, “গেটটা খোলা যাচ্ছে না? ওরা কেউ নেই? হোয়াট ইজ দিস?”

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “আপনি কি গেট টিপকে ভেতরে আসতে পারবেন!”

মেজর মুখ তুলে গেটের উচ্চতা দেখলেন, “এমন কিছু ব্যাপার নয়। সেবার উগান্ডায় এর চেয়ে উচু গাছের ডাল ধরে ঝুলে থাকতে হয়েছিল সারারাত। দেখা যাক।” এক-পা এগিয়ে থেমে গেলেন তিনি। বুড়ো আঙুলে পেছনে দাঁড় করানো বাইকটাকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, “চোর-ডাকাতের জায়গায় ওটাকে এভাবে ফেলে যাব?”

অর্জুন বুঝল গেট টপকাবার খুঁকি মেজর নিতে চাইছেন না । সে মাথা নাড়ল, “এটা ঠিক কথা । অবশ্য আপনি ভেতরে এসেই বা কী করতেন ? তার চেয়ে বরং চলুন, যাওয়ার পথে থানায় খবরটা দিয়ে যাই !” মেজর হাসলেন, বোঝা গেল এই প্রস্তাবে তিনি খুশি ।

অর্জুন গেটে পা দিতেই বৃন্দ বলে উঠল, “মেমসাব নেহি হ্যায় ?” নারী চেঁচিয়ে উঠল আচমকা, “ইয়ে নেহি হো সেকতা । মেমসাব অবশ্যই বাংলোয় আছেন । আমি তালা খুলছি । চল, ভেতরে গিয়ে দেখি ।” কথাগুলো হিন্দি-ঘৰ্ষণ মাতৃভাষায় বলল ।

অর্জুন দেখল নারী মাথার ভেতর আঙুল ঢুকিয়ে একটা কিছু বের করে আনল । তারপর গেটের ফাঁক দিয়ে হাত গলিয়ে তালাটাকে তুলে ধরে ফুটোর মধ্যে সেটাকে ঢুকিয়ে সাবধানে ঘোরাতে লাগল । সম্ভবত মাথার কাঁটা দিয়ে সে তালা খোলার চেষ্টা করছে । এখনওর চোখে-মুখে যে জেদ তা কেন ডাকাত পড়ার সময় ছিল না, কেন ওরা প্রাণ বাঁচাবার জন্য পালিয়ে গেল তা বুবুতে অসুবিধে হচ্ছে । মিনিট তিনিকের চেষ্টায় কাজ হল । খোলা তালাটা বৃন্দ সয়ত্বে নিয়ে গেট খুলতে নারী দৌড়ে গেল বাংলোর দিকে । অর্জুন বাধা দেওয়ার আগেই তার চিংকারে বাগানের গাছপালায় বসা পাখিরা ডানায় শব্দ করে উড়ল । বৃন্দ এবং মেজর ছুটে গিয়েছিলেন চিংকার শুনে । অর্জুন ধীরে পা ফেলে গেট থেকে বেরিয়ে বাইকটাকে ধরল । আর এখানে দাঁড়াবার কোনও মানে হয় না । সে যাঁকে খবরটা দিতে এসেছিল তিনি নেই । দরোয়ান-খুনের খবরটা থানায় পৌঁছে দিয়ে না হয় ভানুদার বাগানে চলে যাবে । ঘড়িতে এখন রাত গড়াচ্ছে ।

সে ইঞ্জিনে স্টার্ট দিয়ে হেডলাইট অন করা মাত্র মেজরের বিশাল শরীরটাকে দু'হাত তুলে ছুটে আসতে দেখল । মেজর চিংকার করে তার নাম ধরে ডাকছেন ।

মেজর কাছে এসে উত্তেজিত হয়ে বললেন, “তুমি তো ডেঞ্জারাস ছেলে । একটা লোক ওখানে খুন হয়ে পড়ে আছে তা এতক্ষণ বলনি ?”

অর্জুন বলল, “গেট বন্ধ ছিল । আপনি শুনলে আরও আপসেট হতেন । চলুন ।”

“চলুন ? যাব মানে ? মিসেস দন্তকে খুঁজে বের করতে হবে না ।”

“উনি এই বাংলোয় নেই ।”

“না । উনি আছেন । ডাকাতরা কাউকে সঙ্গে নিয়ে যায়নি ।”

“কে বলল এ-কথা ?”

“মেয়েটা বলছে । ও চা-বাগানের ভেতরে লুকিয়ে থেকে ডাকাতদের চলে যেতে দেখেছে । বুড়োটা বলছে এই বাংলোর পেছন দিক দিয়ে আর-একটা যাওয়ার পথ আছে ।”

অর্জুন বাইকটাকে নিশ্চল করে আবার বাংলোর দিকে এগোল। সে যখন জিজ্ঞেস করেছিল তখন বৃন্দ কিংবা নারী এসব কথা জানায়নি। তার মনে হয়েছিল খুন্টুন করে চলে যাওয়ার সময় ডাকাতরা গেটের ভেতরের দিকে তালা দিয়ে গেছে যাতে কেউ ট্চ করে না চুকতে পারে। পেছনের দরজার কথা তার মাথায় আসেনি।

সিঁড়িতে দরোয়ানের মৃতদেহের পাশে ওরা নেই। প্রথম ঘরটিতে বৃন্দ একা দাঁড়িয়ে আছে। নারী দৌড়ে ওপাশের একটা ঘর থেকে বের হল। সে চেঁচিয়ে জানাল নীচের তলায় মেমসাহেব নেই। নারী সিঁড়ি ভেঙে ওপরে চলে গেল।

মেজের বৃন্দকে জিজ্ঞেস করলেন, “পেছনের দরজাটা কোথায় ?”

বৃন্দ একটু নড়েচড়ে উঠল, যেন নিজেকে সামাল দিল। দরোয়ান খুন এবং মেমসাহেব নিখোঁজ হওয়ায় বেচারা খুব মুষড়ে পড়েছে। একতলার কিচেনের পাশ দিয়ে খানিকটা এগোতেই একটা দরজা দেখা গেল। এপার্শটায় মালপত্র রাখার ঘর। খোঁজার সময় অর্জুন এদিকে না এলেও একটু আগে নারী এই জায়গাগুলো ভাল করে খুঁজে গেছে।

ওরা বাংলোর পেছনে নেমে এল। এদিকে হয়তো একসময় তরিতরকারির বাগান ছিল। অন্ধকারে কিছুই বোৰা যাচ্ছে না। শুধু কিছুটা খোলা জমির পরেই যে চা-বাগান শুরু হয়ে গেছে বোৰা গেল। বৃন্দ বলল, “ওখানে তারের বেড়ার মধ্যে একটা ছেট গেট আছে।”

মেজের সেদিকে তাকিয়ে বললেন, “একটা ভাল টর্চ থাকলে কিছুটা খোঁজার্যুজি করা যেত। কী বল অর্জুন ?”

এই সময় তার কথা শেষ হওয়ামাত্র দোতলা থেকে একটা আর্ট চিংকার ছিটকে উঠল। তারপরেই নারী তার নিজস্ব ভাষায় অনর্গল কিছু চেঁচিয়ে বলতে লাগল। শোনামাত্র বৃন্দ যেভাবে ছুটে গেল তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যেত না। এক পলকেই তার সব জড়তা উধাও।

দোতলায় পৌঁছে অর্জুন দেখল নারী মিসেস দন্তের শোয়ার ঘরের দেওয়ালে একটা লস্থা টুল লাগাবার চেষ্টা করছে। ওদের দেখামাত্র সে জানাল একটু আগে সিলিং-এর ওপর থেকে একটা গোঙানি ভেসে এসেছে। সে নিশ্চিত, মেমসাব ওখানে আছেন।

মাথার ওপরে কাঠের সিলিং। আপাতদৃষ্টিতে সেখানে ওঠার কোনও রাস্তা নেই। কিন্তু অর্জুন বুঝতে পারল যেদিকে নারী টুল রেখেছে সেইদিকেই সিলিং-এর অংশটি ঠিকঠাক বসেনি। নারীকে সরে আসতে বলে সে টুলের ওপর উঠে সিলিংটায় চাপ দিতে সেটা সরে গেল। সিলিং এবং ছাদের মধ্যে অস্তত চার ফুটের ব্যবধান। দুঃহাতে তর দিয়ে শরীরটাকে ওপরে তুলতেই সে ভদ্রমহিলাকে দেখতে পেল। দুঃহাতে মুখ ঢেকে অন্দুত ভঙ্গিতে বসে আছেন।

অর্জুন চাপা গলায় ডাকল “মিসেস দন্ত, এখন আর কোনও ভয় নেই, আপনি নীচে নেমে আসুন।”

ভদ্রমহিলাকে একটু কেঁপে উঠতে দেখা গেল, কিন্তু তিনি দুটো হাত মুখ থেকে সরালেন না। সিলিং-এর ভেতরে তেমনভাবে ঘরের আলো চুকচিল না। অর্জুন আবার ডাকল, “মিসেস দন্ত, আমি অর্জুন। আপনি আমার কাছে গিয়েছিলেন। মনে পড়ছে? আসুন, ধীরে-ধীরে নীচে নামুন।”

ঠিক সেইসময় বাংলোর বাইরে মোটর বাইকের আওয়াজ হল। অর্জুন চমকে উঠে মেজরকে বলল, “জানলা দিয়ে দেখুন তো আমাদের বাইকটা কিনা।”

॥ দশ ॥

মেজর চিৎকার করতে-করতে বাইরে ছুটে গেলেন। রেগে গেলে মেজরের মুখে অস্তুত কথার খই ফোটে, কিন্তু আজকের শব্দাবলী অর্জুন কখনও শোনেনি। এই অবস্থায় কারও হাসা উচিত নয় বলেই সে গম্ভীর হওয়ার ভান করল। “কে তুই? আমি কাতলা মাছ আর তুই বাচ্চা পুঁটি, তা কি জানিস!” মেজরের গলা তখনও ভেসে আসছিল।

এই পাওবৰ্জিত জায়গায় কেউ যদি তার মোটর বাইকটা নিয়ে উধাও হয় তা হলে বিপদের শেষ থাকবে না। সে মিসেস দন্তের দিকে তাকাল। ঘেঁটুকু আলো এখানে চুঁইয়ে এসেছে তাতে ভদ্রমহিলাকে বীতিমত অস্বাভাবিক দেখাচ্ছে। ভয়ে নার্ভাস হয়ে একদম কুকড়ে গিয়েছেন উনি। শরীর কঁপছে, চোখে শূন্য দৃষ্টি।

হঠাৎ বাইরে থেকে ভেসে আসা হাসির ধাক্কায় বাংলোটা যেন কেঁপে উঠল। একটা হেঁড়ে গলার সঙ্গে আর-একটি ভদ্র হাসির শব্দ হল। পায়ের শব্দ কাছে এল। মেজর চিৎকার করে বললেন, “দ্যাখো-দ্যাখো কে এসেছে! মিস্টার ব্যানার্জি নিজের বাইক নিয়ে চলে এসেছেন আর আমরা ভাবছিলাম কেউ তোমারটা চুরি করে পালাচ্ছে।”

অর্জুন কোনওমতে নেমে আসতেই ভানু ব্যানার্জির মুখোমুখি হলেসে অবাক গলায় জিজ্ঞেস করল, “আপনি? এখানে আসবেন তা তখন তো বলেননি?”

“নাঃ। পরে ঠিক করলাম। তোমরা যেভাবে এলে তাতে মন সাড়া দিছিল না।”

“আপনি নিশ্চয়ই সিঁড়ির গোড়ায় মৃতদেহটাকে দেখেছেন?”

“হ্যাঁ। মিসেস দন্ত কোথায়?”

“আততায়ীদের হাত থেকে বাঁচার জন্যই মনে হয় উনি ওপরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন। কিন্তু এইভাবে বসে থেকে সম্ভবত খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

এক্ষুনি নামানো দরকার ওঁকে । ” অর্জুনের কথা শেষ হওয়ামাত্র ভানুবাবু এগিয়ে ফেলেন ।

মিনিট চারেকের চেষ্টায় সবাই মিলে মিসেস দত্তকে নামাতে পারল । ভদ্রমহিলা দাঁড়াতে পারছেন না । চেষ্টা করেও কথা বলা সম্ভব হল না তাঁর পক্ষে । ধরাধরি করে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হল । ভানু ব্যানার্জি বললেন, “একটু গরম দুধ খাইয়ে দেওয়ার দরকার । ” তিনি বৃক্ষ কর্মচারীটিকে মদেশিয়া ভাষায় কিছু বলতেই সে ছুটে গেল । নারী তার সঙ্গী হল । একটু বাদেই গরম দুধ এসে গেল, সঙ্গে পানীয় । চা-বাগানের মালিক অথবা ম্যানেজারের বাংলোয় এসব সুচরাচর থাকেই । ভানু ব্যানার্জির নির্দেশমতো দুধে সামান্য পানীয় মিশিয়ে নারী মিসেস দত্তকে খাইয়ে দিল একটু একটু করে । ভদ্রমহিলা এবার চেখ বন্ধ করে নিশাস ফেললেন । ওরা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল ।

সোফায় পা ছড়িয়ে বসে মেজর বললেন, “এখন তো সমস্যা বাঢ়ল । দরজায় একটা ডেডবিডি আর ডেতরে হাফডেড ভদ্রমহিলা । কী করা যায় ?

অর্জুন চিন্তা করছিল, এক্ষুনি পুলিশকে খবর দেওয়া দরকার । অন্তত মৃতদেহটাকে ওঁরা নিয়ে যাবেনই । আর মিসেস দত্তকে কোনও ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া উচিত অথবা কোনও ডাক্তারকে এখানে আনতে হবে ।

ভানু ব্যানার্জি বললেন, “ওঁর যা অবস্থা তাতে গাড়ি ছাড়া নিয়ে যাওয়া অসম্ভব । এই বাগানের ডাক্তার এবং ক্লার্করা তো অনেকদিন চলে গিয়েছেন । এক কাজ করি, আমি বাইকে নিয়ে চলে যাচ্ছি । থানায় খবর দিয়ে আমার বাগানের ডাক্তারকে তুলে নিয়ে ফিরে আসছি । ততক্ষণ ভদ্রমহিলা শুয়ে থাকুন । ”

মেজরের সভ্বত প্রস্তাবটা পছন্দ হল না । তিনি দাঢ়িতে হাত বুলিয়ে বললেন, “আপনি চলে যাবেন ? আমার আবার ডেডবিডিতে ভীষণ অ্যালার্জি আছে । ”

ভানু ব্যানার্জি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, “অ্যালার্জি ? আপনি শব্দটা ঠিক বলছেন ?”

হাত বোলান বন্ধ করে সোজা হয়ে বসলেন মেজর, “হোয়ট ডু ইউ মিন ? আমি ভয় পাচ্ছি ? নো, নেভার । এই তো বছর পাঁচেক আগে একেবারে নরখাদকদের দেশে গিয়েছিলাম । একটা প্রামে চুকে দেখি চারদিকে মানুষের কাটা মুণ্ডু । বড়টা খেয়ে নিয়ে মুণ্ডুগুলি সাজিয়ে রেখেছে স্মারকচিহ্ন হিসাবে । আমি ভয় পেয়েছি ? নো । তবে খারাপ লেগেছে । খুব খারাপ । কেন জানেন ?”

কেউ প্রশ্ন করল না । মেজর একটু অপেক্ষা করে বললেন, “মানুষের কাটা মুণ্ডু প্রিজার্ভ করলে সেগুলো ধীরে ধীরে ছোট হয়ে যায় । এই যে আমার এতবড় মাথাটা একসময় ছোবড়া ছাড়ানো নারকোলের মতো হয়ে যাবে । ”

ভানু ব্যানার্জি উঁর এই পরিচয় জানতেন না । সসঙ্গে বললেন, “আমি খুব দুঃখিত । আপনাকে আমি কিন্তু একটুও আঘাত করতে চাইনি ।”

মেজর উঠে দাঁড়ালেন, “ওকে, ওকে ! অর্জুন চলো, আমরা তিনজনই বেরিয়ে পড়ি । যে কারণে তুমি এসেছিলে সেটা তো এখন বাহ্যিক হয়ে গেছে । তাই না ?”

অর্জুন মাথা নাড়ল, “ভানুদা আপনি আর দেরি করবেন না ।”

ভানু ব্যানার্জি দরজার দিকে এগিয়ে যেতে মেজর আবার সশঙ্কে বসে পড়লেন । একটু বাদে বাইকের শব্দ হল এবং একটু একটু করে মিলিয়েও গেল । হঠাৎ অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “আচ্ছা, আপনি একটানা কতদিন না খেয়ে থেকেছেন ?”

মেজর হাতটা ওপরে তুলে পাঁচটা আঙুল ছড়িয়ে দিলেন । “গ্র্যান্ড ক্যানিয়নে বেড়াতে গিয়ে পড়ে পা ভেঙেছিল । একাই ছিলাম । দুঃ-পাশে পাহাড়, খাদ্যের মধ্যে আমি আর শনশন হাওয়া । সঙ্গের খাবার দুঁদিনেই শেষ । তার পাঁচদিন পরে একটা হেলিকপ্টার এসে আমাকে উদ্ধার করে ।”

“তাহলে আজকের রাত্রে না খেলে আপনার কোনও অসুবিধে হবে না ।”

“খাব না কেন ? যদি এখানে থাকিও, কোনও অসুবিধে নেই । এদের কিচেনে খাবারের স্টক তো খারাপ নেই ।”

মেজর কথা শেষ করতেই বৃক্ষ এসে দাঁড়াল, “মেমসাহেব বোলাতা হ্যায় ।”

অর্জুন তড়াক করে উঠে বেডরুমের দিকে ছুটল । মেজর পেছনে ।

মিসেস মমতা দস্ত এখনও শুয়ে আছেন, তবে ইতিমধ্যে তাঁর মুখে রক্ত ফিরে এসেছে কিছুটা । অর্জুন সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই দুর্বল গলায় বললেন, “সরি ।”

“না, না । ঠিক আছে । আপনি কথা বলবেন না । আমরা ডাক্তার আনার ব্যবস্থা করেছি । এখন একটু ঘুমোবার চেষ্টা করুন,” অর্জুন বলল ।

“ঘূম আসবে না । আমি আর পারছি না । এবার আমাকে সারেভার করতেই হবে । আমার জন্য একটার পর একটা লোক খুন হয়ে যাচ্ছে... ।” এক ফোটা জল চোখের কোল থেকে উপচে নেমে এল গাল বেয়ে ।

অর্জুন বলল, “আপনি এত ভেঙে পড়বেন না । ডাক্তার আসুক, তিনি অনুমতি দিলে আমরা কথা বলব । নিশ্চয়ই এর একটা বিহিত করা যাবে ।”

মিসেস মমতা দস্ত চোখ বন্ধ করতে অর্জুন ফিরে এল । দরজায় দাঁড়িয়ে মেজর কথাবার্তা শুনছিলেন । সঙ্গী হয়ে মাথা দুলিয়ে বললেন, “খুব স্ন্যাড ব্যাপার ।”

এখন ঘড়িতে রাত নটা । বাড়ির সব দরজা খোলা । আততায়ীরা যদি আবার ফিরে আসে তা হলে এবার যা ইচ্ছে তাই করে যেতে পারে । কোনও রকম প্রতিরোধের ব্যবস্থা এখানে নেই । মিসেস দস্ত কোন সাহসে এখানে একা আছেন তাই বুঝতে পারছিল না অর্জুন । সে উঠে সদর দরজা বন্ধ করতে

গেল । অস্তত ভেতরে ঢোকাটা যেন সহজ না হয় । দরজা বন্ধ করতে গিয়ে সে অস্বস্তিতে পড়ল । লোকটার মৃতদেহ সিঁড়িতে পড়ে আছে । মৃত হলেও মানুষ তো ! ওকে বাইরে রেখে দরজা বন্ধ করতে তাই অস্বস্তি । কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা উপেক্ষা করল অর্জুন ।

“কিরে আসামাৰ” মেজের বললেন, “পেছনের দরজাটা বন্ধ কৰা উচিত ।” অর্জুন মাথা নাড়ল । তারপৰ কিচেনের পাশ দিয়ে পেছনে চলে এল । দরজাটা খোলাই ছিল । স্পষ্টত এদিক দিয়েই আততায়ীরা পালিয়েছে । মিসেস মমতা হত্তের সঙ্গে কথা বললে লোকগুলোর পরিচয় জানতে অসুবিধে হৰে না । এই হত্যাকাণ্ডের সুরাহা করতে পুলিশের কোনও অসুবিধে হওয়ার কথা নয় । যারা চায় না মিসেস মমতা দস্ত বাগান আঁকড়ে পড়ে থাকুন, তারাই কাজটা কৰিয়েছে । অন্ধকার বাগানের দিকে তাকিয়ে অর্জুনের মনে হল এই কেসে কোনও আকর্ষণ নেই । সে কয়েকপা হেঁটে অন্ধকারে গিয়ে দাঁড়াল । বাংলোটাকে এখন আলোর জাহাজ বলে মনে হচ্ছে । যারা টেলিফোনের লাইন কেটেছে, তারা দয়া করেই আলোটাকে রেখে দিয়েছে । চারপাশের অন্ধকারের মধ্যে বাংলোর এই আলোটা যেন বড় চোখে ঠেকছে ।

হঠাৎ মাথার ভেতরে দ্বিতীয় একটা চিন্তা চলকে উঠল । আততায়ী কি সত্যি বাইরের লোক ? একটা অ্যাসামাড়ুর গাড়ির কথা ভানু ব্যানার্জিকে বলেছিলেন পুলিশ অফিসার । যে অ্যাসামাড়াৰটিকে শিলিগুড়ির পথে দেখে সন্দিপ্ত হয়েছিলেন অমল সোম, তার মালিকদের কি হাত আছে এইসব খুনজখনে ? কিন্তু তাই বা কী করে হবে ? হরিপদ সেনের হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে ওই অ্যাসামাড়াৰ গাড়িটির সম্পর্ক থাকতে পারে বলে একটা আলাদা ধারণা তৈরি হয়েছিল সে-সময় । অর্জুনের গায়ে কাঁচা ফুটল । হৈমন্তীপুর এবং শিলিগুড়ির মধ্যে একই দল চলাফেরা করছে না তো ! হরিপদ সেনের কালাপাহাড় রহস্য তা হলে তো অন্যদিকে বাঁক নেবে ।

অমলদাৰ বলেন, ‘কখনও আগ বাড়িয়ে সিদ্ধান্ত নেবে না । ভাল সত্যসঞ্চানী নিজেৰ কল্পনাকে পেছনে রাখেন, তা না হলে পথ ভুল হতে বাধ্য ।’ এতকিছু ভাবার তাই কোনও মানে হয় না । বাংলোৰ দিকে পা বাড়াবাৰ আগে অর্জুনের মনে পড়ল সেই লাইনগুলো, দুর্ভেদ্য জঙ্গল, বিশাল বিল, শিবমন্দিৰ, হৈমন্তীপুৰে এসব আছে নাকি ? এই বাংলোৰ দুই কৰ্মচারীকে জিজ্ঞেস কৰলেই তা অবশ্য জানা যাবে । সে পেছনের দরজাটা বন্ধ কৰতেই দেখল বৃন্দ কিচেনে চুকছে । সে হাত তুলে লোকটাকে দাঁড়াতে বলে কাছে এগিয়ে গেল ।

অর্জুন জিজ্ঞেস কৰল, “মেমসাহেব কি ঘূর্মিয়েছেন ?”

বৃন্দ মাথা নেড়ে না বলল ।

অর্জুন লোকটিকে দেখল, “তুমি কতদিন আছ এই বাগানে ?”

“আমাৰ জন্মাই এখানে । আমাৰ ঠাকুৰদাকে দালালৱা ধৰে এনেছিল

হাজারিবাগ থেকে । ”

“সেখানে তুমি গিয়েছ ?”

“না । কেউ নেই তো, কাউকেও চিনি না । গিয়ে কী হবে । ”

“এই বাগানের চারপাশে যে জঙ্গল, তা তোমার ছেলেবেলায় ছিল ?”

“এখন কী জঙ্গল দেখছেন, ছেলেবেলায় কেউ ওই জঙ্গলে চুক্তেই সাহস পেত না । ”

“এই জঙ্গলের মধ্যে কোনও বিল আছে ?”

“বিল ?” বৃন্দ ভূঁ কুঁচকে তাকাল ।

“বিল মানে বড় পুরুষ, জলাশয়... । ” ঠিক প্রতিশব্দ পাওছিল না অর্জুন, না পেয়ে বলল, “সাহেবরা যাকে লেক বলে । ”

“লেক ? না, না, এখানে লেক থাকবে কী করে । আমি তো কোনওদিন দেখিনি । জঙ্গলে দুটো ঘরনা আছে, শীতকালে শুকিয়ে যায় । ” বৃন্দ এবার বুঝতে পারল ।

হতাশ হল অর্জুন । কালাপাহাড়ের সম্পত্তি তো বিলের পাশে থাকার কথা । সে আর কথা বলল না । বাইরের ঘরে পৌঁছে দেখল মেজর দুপা ছড়িয়ে সোফায় চিত হয়ে পড়ে আছেন । তাঁর চোখ বন্ধ । মুখ হাঁ করা । চট করে মনে হবে বীভৎস এক মৃতদেহ । নাক ডাকছে না । সে গলায় শব্দ করে সোফায় বসতেই মুখ বন্ধ হল । পা গুটিয়ে নিয়ে মেজর চোখ বন্ধ করেই বললেন, “একটু ভাবছিলাম । ”

অর্জুন হাসি চাপল, “আগে আপনার এমন ভাবার সময়ে প্রচণ্ড নাক ডাকত । ”

“এখন ডাকে না । হেঁ হেঁ । নাক ডাকা বন্ধ করার একটা কায়দা বের করেছি । ”

“সে কী ? আপনি তো মিরাক্যাল করেছেন । পৃথিবীতে কেউ এর ওষুধ জানে না । ”

“ওষুধ আমিও জানি না । কায়দা জানি । ” মেজর কাঁধ নাচালেন ।

“আরে, বলুন বলুন । বিশাল আবিষ্কার এটা । ”

“সরি । এটা আমার ব্যাপার । ”

অর্জুন হাল ছেড়ে দিল । যার একবার নাক ডাকে তার বাকি জীবনে নিঃশব্দে ঘুম হয় না । এই নাক ডাকা নিয়ে কতরকমের অশাস্তি হয় । মেজরের বীভৎস নাক ডাকা সে এর আগেও শুনেছে । এখন তো দিব্যি নিঃশব্দে ঘুমোছিলেন । সে ঠিক করল পরে একসময় মেজরের মুড় ভাল থাকলে কায়দাটা জেনে নেবে ।

অর্জুন বলল, “পাশেই দুর্ভেদ্য জঙ্গল । একটা বিলের সন্ধান পেলে ভাল হতো । ”

“বিল ? মাই গড ! বিল নিয়ে কী হবে ?”

“কালাপাহাড়ের সম্পত্তি দুর্ভেদ্য জঙ্গলে বিলের ধারে শিবমন্দিরের কাছে লুকোনো আছে। শুনলাম এখানে কোনও বিলই নেই।”

“যত্নসব বাজে কথা।” মেজর দাঢ়িতে হাত বোলালেন, “লোকটা যেখানে অদির পেত সেখানেই হাতুড়ি চালাত। অসম থেকে ওড়িশা কোনও মন্দির আন্ত রাখেনি। আর সেই লোক একটা শিবমন্দিরের গায়ে সম্পত্তি লুকোবে ? ইস্পিসিবল।”

ব্যাপারটা ভাবেনি অর্জুন। সত্য তো ! কালাপাহাড় মন্দির ধৰংস করতেন। তিনি কেন বেছে বেছে একটা শিবমন্দিরের পাশে ধনসম্পদ লুকোতে বাবেন ? মেজরকে ভাল লাগল অর্জুনের। সহজ সত্যিটা সে এতক্ষণ ভুলে ছিল, যা মেজর অনায়াসে বলে দিলেন।

এই সময় বাইরে ইঞ্জিনের শব্দ হল। সেইসঙ্গে জানালার কাছে আলো এসে পড়ল। অর্জুন উঠে দেখল তিন-চারটে আলো এগিয়ে এসে গেটের সামনে থামল। মেজর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। চাপা গলায় বললেন, “ডাকাতগুলো ফিরে এল নাকি ?”

ততক্ষণে ভানুদাকে দেখতে পেয়েছে অর্জুন। দ্রুত এগিয়ে সদর দরজা খুলতেই তিনটে বাইক আর একটা অটো রিকশা সিঁড়ির নীচে পৌঁছে গেল। থানার দারোগা বাইকে বসেই জিজ্ঞেস করলেন, “ডেডবিডিটা কোথায় ?”

অর্জুনের খেয়াল হল। সে মুখ নামিয়ে সিঁড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল মৃতদেহটা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। এমনকী দারোয়ানের শরীর থেকে যে রক্ত বেরিয়ে সিঁড়িতে চাপ হয়েছিল, তাও উধাও।

ভানুদা বাইক দাঁড় করিয়ে ছুটে এলেন, “ডেডবিডিটাকে কি সরিয়েছে কোথাও।”

“না। আমরা জানিই না। আপনি বেরিয়ে যাওয়ার পরে দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে রেখেছিলাম। তখন তো ওখানেই পড়ে ছিল।”

অর্জুন হতভস্ব।

দারোগা নেমে এলেন, “স্ট্রেঞ্জ ! আপনারা বলতে চান মৃতদেহ হেঁটে অদৃশ্য হল ?”

ভানুদা ঝুঁকে সিঁড়িটা দেখলেন, “ডেজা কাপড় দিয়ে কেউ জায়গাটা মুছেছে।”

অর্জুন বাগানের দিকে তাকাল। ওরা যখন সব বন্ধ করে বসেছিল তখন আততায়ীরা নিঃশব্দে মৃতদেহ সরিয়েছে। কিন্তু একটা ভারী শরীরকে বয়ে নিয়ে যেতে অন্তত দু'জন মানুষ দরকার। তাদের পক্ষে এত অল্প সময়ে বেশিদুর যাওয়া সম্ভব নয়। যেহেতু সে বাংলোর পেছনে দাঁড়িয়েছিল তাই ওদের পক্ষে সামনের গেট দিয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক।

অর্জুন দারোগাঁকে বলল, “প্রিজ ! আমার সঙ্গে চলুন । ওরা বেশি দূরে যেতে পারেনি এখনও !”

তৎক্ষণাত ছোট দলটা গেটের দিকে ছুটল । মেজর দরজায় দাঁড়িয়ে চিন্কার করলেন, “আই অ্যাম হোল্ডিং ফোর্ট, বুবালে ? একজনের তো পেছনে থাকা দরকার !”

অর্জুন জবাব দিল না । দারোগাবাবুর হাতে শক্তিশালী টর্চ ছিল । তিনি ভানুদার সঙ্গে আরও দুজন সেপাইকে নিয়ে এসেছেন । শুধু অটোওয়ালা চুপচাপ অটোতে বসে রইল । পাঁচজনের দলটা গেট পেরিয়ে কয়েক পা হাঁটতেই টর্চের আলোয় রক্তের দাগ দেখতে পেল । পথের পাশে পাতার ওপর টকটকে রক্ত পড়ে আছে । দারোগা উল্লিখিত । বাঁ দিকে নেমে পড়লেন । আরও কিছুটা যাওয়ার পর দ্বিতীয় জায়গায় রক্ত দেখা গেল । দারোগা গভীর গলায় বললেন, “ওরা এদিক দিয়েই গেছে । বি অ্যালার্ট !”

অর্জুন দাঁড়িয়ে পড়ল । দারোগা তার মুখে টর্চ ফেলে জিজেস করলেন, “কী ব্যাপার ?”

অর্জুন মাথা নাড়ল, “এটা নিশ্চয়ই মানুষের রক্ত নয় ।”

“তার মানে ?” দারোগা বিরক্ত হলেন ।

“দারোয়ান মারা গিয়েছে অনেকক্ষণ । তার শরীর থেকে টাটকা রক্ত এখন এভাবে পড়তে পারে না । আমাদের বিআস্ট করতে কেউ রক্তজাতীয় কিছু ছড়িয়ে দিয়েছে ।” অর্জুন ঘুরে দাঁড়াল, “ভানুদা আপনি কি ডাক্তার আনতে পারেননি ?”

ভানুদা মাথা নাড়লেন, “গিয়ে দেখলাম ভদ্রলোক অসুস্থ । তাই অটো নিয়ে এসেছি ওঁকে নিয়ে যাওয়ার জন্য । ডাক্তার থাকলে বলতে পারত এটা আদৌ রক্ত কিনা ।”

॥ এগারো ॥

এই সময় শেয়াল ডেকে উঠল । চা-বাগানে শেয়াল কিছু নতুন নয়, কিন্তু একসঙ্গে অনেক প্রায় কুকুরের মতো একনাগাড়ে চিন্কার করার ঘটনা সচরাচর ঘটে না ।

দারোগা কান খাড়া করে কিছুক্ষণ শুনে বললেন, “খুব বেশি দূরে নয় । লেটস গো ।”

ভানু ব্যানার্জি একটু আপত্তি করলেন, “শেয়াল ডাকছে বলে যেতে চাইছেন কেন ?”

দারোগা হাঁটতে-হাঁটতেই বললেন, “অনেক সময় শেয়ালেরা কুকুরের মতো আচরণ করে । বাংলাদেশের প্রামে অনেকে শেয়াল পুষেছে বলে শুনেছি ।

ডেডবেডি নিয়ে ওরা যদি পালাতে চায় তা হলে শেয়ালগুলো হাঁকাহাঁকি করতেও পারে । ”

কিন্তু রাস্তা পেরিয়ে বাগানের মধ্যে কিছুটা যাওয়ার পরেও মৃত দেহের কোনও হন্দিস পাওয়া গেল না । অথবত, রাত্রে যে-কোনও জিনিস লুকিয়ে রাখা বেশ সহজ । দ্বিতীয়ত, এই বিশাল চা-বাগানের মধ্যে অনুসন্ধান চলাতে গেলে প্রচুর লোকবল দরকার । ওরা বাংলোয় ফিরে এল । এবার ভানু ব্যানার্জি জিজ্ঞেস করলেন, “মিসেস দন্ত কেমন আছেন ?”

অর্জুন মাথা নাড়ল, “অনেকটা ভাল । কথা বলতে চাইছিলেন, আমি রাজি হইনি । কিন্তু ভানুদা, দ্বিতীয় কোনও ডাক্তারকেও পেলেন না ?”

ভানু ব্যানার্জি অস্বস্তিতে পড়লেন, “আমাদের এদিকে ওই একটাই অসুবিধে । একটু বাড়াবাড়ি রকমের অসুখ হলেই ছুটতে হয় জলপাইগুড়ি, নয় শিলিগুড়ি । পুরো বাগান নির্ভর করে থাকে একজন ডাক্তারের ওপর । যাহোক, গাড়ি আছে ভাঙ্গা ব্রিজের ওপাশে । মিসেস দন্তকে কোনওমতে টেম্পোতে করে বাগানের পথটুকু পার করে নিতে হবে । তোমার কী মনে হয়, টেম্পোতে বসতে পারবেন না ?”

ভানু ব্যানার্জি অন্যমনস্ক হয় স্কুটার ট্যাঙ্কিকে টেম্পো বলছেন কিন্তু অর্জুনের মনে হলো টেম্পো বলাটাই ঠিক । ওইরকম নড়বড়ে সবল বস্তুটিকে ট্যাঙ্কির মর্যাদা দেওয়া বাড়াবাড়ি । অর্জুন জবাব দিল, “বোধ হয় পারবেন ।”

বাংলোর দরজা ইতিমধ্যে বন্ধ । তিন-চাকার যানটিতে ড্রাইভার নেই । দরজায় ধাক্কা মারতে বৃক্ষ এসে সেটাকে খুলল । ঘরে চুকে অর্জুন অবাক । একটা টুলের ওপর খাবারের প্লেট সাজিয়ে মেজের চোখ বন্ধ করে খেয়ে যাচ্ছেন । এখন বিশাল ডিমের ওমলেট পড়ে আছে প্লেটে । সে না জিজ্ঞেস করে পারল না, “আপনি খাচ্ছেন ?”

মেজের চোখ খুললেন, “ম্যাডামকে দুঃখ দিতে পারি না । তিনি অতিথিসেবা করতে চান । তা ছাড়া শেষ কথন খেয়েছি তা তুমি জান ।” ওমলেট কাটলেন মেজের, “ডেডবেডি পাওয়া গেল ?”

ভানু ব্যানার্জি মাথা নাড়লেন, “না ।”

“অ্য়াঁ ? ওয়ার্থলেশ, পুলিশ ফোর্স ভাই এ-দেশের ! একটা মৃতদেহ পালিয়ে গেল, তাকেও ধরতে পারলেন না !”

দারোগা উন্নত হলেন, “আপনি একটু সংযত হয়ে কথা বলুন ।”

মেজের আধচেবানো ওমলেট মুখে নিয়ে বললেন, “কেন ? হোয়াই ? হোয়াই ইজ ইওর কনট্রিবিউশন ? আপনি এখানকার ইনচার্জ । এই বাগানে পর-পর এত খুন হয়ে গেল, আপনি কী করেছেন ? একজন অসহায় মহিলা এখানে একা পড়ে আছেন তাঁর নিরাপত্তার কী ব্যবস্থা করেছেন ? বলুন ! খুন হওয়ার পরেও তো আপনাদের দেখা যায় না । যায় ?”

দারোগা সোজা মেজরের প্রায় নাকের ডগায় পৌঁছে গেলেন, “হ্যাঁ আর ইউ ?”

মেজর একটু পেছনে হেলে বললেন, “মানো ?”

“এই সব প্রশ্ন করার আপনি কে ? আমি কী করছি না-করছি তার জবাবদিহি আপনাকে দেব কেন ? আমাকে অপমান করার জন্য আপনাকে আমি অ্যারেল্ট করতে পারি তা জানেন ? যত দোষ নন্দ ঘোষ ? এই বিশাল জঙ্গল আর চা-বাগানের কোনখানে কে খুন-হল তা আমি থানায় বসে হাত গুনে বলতে পারব ? খবর পেয়ে আমরা ছুটে আসি না ? না জেনেশুনে যা-তা বলে যাচ্ছেন ?”

ভানু ব্যানার্জি হাত তুললেন, “ঠিক আছে, শাস্ত হোন আপনারা । এটা বগড়া করার সময় নয় । মিসেস দন্তকে নিয়ে যেতে হবে ।”

মেজর মাথা নাড়লেন । তারপর দারোগাকে বললেন, “আপনি একটু সবে দাঁড়ান তো ! লেট মি ফিনিশ মাই ডিনার । গুড !” মুখে ওয়লেট তুললেন, তিনি, “কিন্তু আমি বিশ্বাস করতে রাজি নই যে, একজন পুলিশ অফিসার ডেডবডি খুঁজে পাবে না ।”

দারোগা খিঁচিয়ে উঠলেন, “আমাকে কী ভেবেছেন ? ট্রেইন্ড ডগ ? গুরু শুকে ডেডবডির কাছে পৌঁছে যাব ? মিস্টার ব্যানার্জি, এই লোকটাকে আপনি একটু বলে দিন আমার সঙ্গে যেন উলটোপালটা কথা না বলে ।”

ভানু ব্যানার্জি বৃদ্ধকে জিজেস করলেন, “মিসেস দন্ত কি ঘুমোচ্ছেন ?”

“নেই ।”

“তা হলে বল, একটু দেখি করব ।”

বৃদ্ধ ওপরে চলে গেল । মেজর খাওয়া শেষ করলেন । পরিত্থিতির চেকুর তুলে বললেন, “জান মধ্যম পাওব, সিঙ্কাটি সেভেনে মেঞ্জিকোর জঙ্গলে একটা ঘোড়াকে সাবাড় করে দিয়েছিল মাংসখেকো পিংপড়ের দল । সক্বেলায় যে ঘোড়টাকে আমরা গাছের সঙ্গে বেঁধে রেখেছিলাম, সকালে উঠে দেখি দড়িতে তার কক্ষালটা বাঁধা রয়েছে । তুমি ভাবতে পার ব্যাপারটা ?”

ভানু ব্যানার্জি বললেন, “হ্যাঁ ! এরকম একটা ঘটনার কথা যেন আমি কোথায় পড়েছি ।”

মেজরের দিকে তাকিয়ে দারোগা জিজেস করলেন, “আপনি মেঞ্জিকোর জঙ্গলে— মানে ?”

অর্জুন জানাল, “উনি পৃথিবীর সব দেশেই অভিযান করেছেন । একবার উন্নর মেরুতে জাহাজড়ুবি থেকে বেঁচে গিয়েছেন ।”

দারোগা হতভস্ব । স্পষ্টতই তাঁর চেখে মুখে বিস্ময় এবং শ্রদ্ধা ফুটে উঠছিল ।

মেজর সেদিকে লক্ষ্য করলেন না । বললেন, “ধরো, কাল সকালে

দরোয়ানের ডেডবেডি পাওয়া গেল। তবে শুধু কঙ্কালটি আছে। এমন তো কুকুরেই পারে।”

সঙ্গে-সঙ্গে দারোগা সোজা হলেন, “না। পারে না। এখানে ওইসব অংসখেকো পিপড়ে থাকে না। ম্যানইটারও নেই।”

“তা হলে নেকড়ে নেই, হায়েনা নেই চিতা নেই। নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।” হেজের কথা শেষ করতেই বৃক্ষ ফিরে এল। না এলে আবার গোলমাল শোকাত। বৃক্ষ এসে জানাল মেমসাহেব অপেক্ষা করছেন।

মেজের উঠলেন না। বাকিরা ধীরে ধীরে ওপরে উঠে এল। দরজায় নারী দাঁড়িয়ে ছিল। ওদের দেখে সে মিসেস মমতা দন্তের মাথার পাশে সরে গেল।

মিসেস দন্ত বালিশে ঠেস দিয়ে আধশোয়া হয়ে রয়েছেন। তাঁর মুখের স্থাভাবিক চেহারা এখনও ফিরে আসেনি। মহিলাকে অত্যন্ত খ্লান্ত এবং নীরঙ মনে হচ্ছিল। দারোগা বললেন, “নমস্কার মিসেস দন্ত। খানিক আগে আমি খবরটা পেলাম।”

মিসেস দন্ত মাথা নাড়লেন। তাঁর ঠোঁট ইঁষৎ কঁপল। কিন্তু কথা বললেন না।

ভানু ব্যানার্জি এগিয়ে গেলেন সামান্য, “মিসেস দন্ত, পুরো ব্যাপারটার জন্য আমরা খুব দুঃখিত। কিন্তু আপনাকে এখনই কোনও ভাল ভাঙ্গারের কাছে নিয়ে যাওয়া উচিত। একটা ব্যবস্থাও হয়েছে। আপনি কি ধীরে-ধীরে নীচে নামতে পারবেন?”

এবার খুব দুর্বল গলায় মিসেস দন্ত বললেন, “আমি কোথাও যাব না।”

ভানু ব্যানার্জি বোঝাবার চেষ্টা করলেন, “আমি আপনার সেন্টিমেট্রের প্রতি সম্মান জানিয়েই বলছি, এইসময় আপনার চিকিৎসার প্রয়োজন।”

মিসেস দন্ত হাত নেড়ে না বলে নিশাস ফেললেন।

অর্জুন চুপচাপ শুনছিল এতক্ষণ। এবার বলল, “আপনি কি কথা বলার মতো অবস্থায় আছেন?”

মিসেস দন্ত অর্জুনের দিকে তাকালেন, “আপনি— আপনারা কি আমার কেস নেবেন?”

অর্জুন ফাঁপরে পড়ল। জলপাইগুড়ি থেকে সে অমলদার নির্দেশে এসেছিল মিসেস দন্তকে জানিয়ে দিতে যে, কেস নিতে পারছে না। কিন্তু এখানে এসে পরিস্থিতি বেভাবে বাঁক নিয়েছে তাতে না বলতে বিবেকে লাগল। সে বলল, “হ্যাঁ। আপনি যা চাইছেন তা হবে।”

তত্ত্বাবধানের মৃতদেহ কি খুঁজে পাওয়া গেল?”

দারোগা বললেন, “না ম্যাডাম। এই রাত্রে চা-বাগানের মধ্যে বেশি খোঁজাখুজি সম্ভব হল না। আমি কাল সকালে আরও লোক নিয়ে এসে

ভালভাবে সার্চ করব।”

মিসেস দন্ত চোখ বন্ধ করে বড় নিশ্চাস ফেললেন, “আপনারা কিছুই পারবেন না। আমাকে এইভাবে পড়ে-পড়ে মার খেতে হবে।”

কথটা এমন স্বরে বললেন যে, ঘরে বিষাদের ছায়া ছড়াল। অর্জুন বুঝাল এর পরে কথা এগোলে মিসেস দন্ত মেজরের কথাগুলোই বলে ফেলবেন। সেক্ষেত্রে দারোগা ব্যাপারটাকে খুবই অপছন্দ করবেন। কিন্তু সে কিছু বলার আগেই দারোগা একটা চেয়ার টেনে বিছানার পাশে গিয়ে বসলেন, “আপনি যখন বলছেন কথা বলতে পারবেন, তখন কৃতব্যের প্রয়োজনেই কয়েকটা প্রশ্ন করতে হচ্ছে। বুঝতেই পারছেন আজ এখানে একটা খুন হয়েছে এবং আততায়ীরা কাছে-পিঠেই আছে। এই ঘটনার অন্যতম সাক্ষী আপনি। আশা করি আমার কথা আপনি বুঝতে পারছেন।”

“হ্লাঙ।”

“ব্যাপারটা কখন ঘটেছিল ?”

“দুপুরে। দুটো নাগাদ।”

“কতজন লোক ছিল ?”

“চু-সাতজন।”

“আপনার বাংলোর দরজা বন্ধ ছিল না ?”

“ছিল। কিন্তু ওরা ডাকাডাকি করতে আমি দরোয়ানকে পাঠিয়েছিলাম ব্যাপারটা কী জানার জন্য। ওরা ভদ্রভাবে চুকেছিল। কিন্তু সিঁড়ির মুখেই দরোয়ানের সঙ্গে মারপিট শুরু করে দেয়। আমরা কোনও মতে সদর দরজা বন্ধ করে দিই। আমি বুঝতে পারি ওরা আমার সঙ্গানে এসেছে। তাই এদের বলি পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে যেতে। এরা আমার অত্যন্ত বিশ্বস্ত। অনেকদিন আছে। প্রথমে আমাকে একা রেখে যেতে চায়নি। আমি বাধ্য করি। তারপর ওপরে উঠে যাই।” মিসেস দন্ত হাঁপাতে লাগলেন।

দারোগা জিজেস করলেন, “ওরা বাংলোয় চুকল কীভাবে ?

“পেছনের দরজা দিয়ে। এরা যেদিক দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল। দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করার কথা সে-সময় আমার খেয়াল হয়নি।”

“বাংলোয় চুকে ওরা আপনাকে খুঁজে পায়নি। কেন ?”

“সিলিংগের ওপর একটা চোরাকুঠুরি আছে। নীচে থেকে চট করে বোঝা যায় না। কিন্তু ওখানে সোজা হয়ে বসে থাকা খুব শক্ত। আমি কোনওমতে ওখানে উঠে গিয়েছিলাম। ওরা আমাকে খুঁজতে বাংলো তোলপাড় করে শেষ পর্যন্ত ভাবল আমিও পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছি।”

“এই লোকগুলোর কাউকে চেনেন ?”

মিসেস দন্ত একমুহূর্ত ভাবলেন। তারপর বললেন, “কারও নাম জানি না।”

“মুখ দেখলে আবার চিনতে পারবেন ?”

“হ্যাঁ পারব। কিছুদিন হল ওরা এই বাগানে ঘোরাফেরা করছে। বাতায়াতের পথে এদের দু-একজনকে আমি দেখেছি।”

“ওরা কখন চলে গেল ?”

“ঘণ্টাখানেকের পর আর গলা শুনিনি।”

“আপনি নেমে এলেন না কেন ?”

“মৃত্যুভয়ে। ওই এক ঘণ্টায় আমার নার্ভ চলে গিয়েছিল। ওখানে বসে থাকা যায় না। শুতে পারছিলাম না ইন্দুরের জ্বালায়। সামান্য শব্দ হলে আমি ধৰা পড়ে যেতাম। ওইভাবে মাথা গুঁজে বসে থাকতে-থাকতে আমার শক্তি চলে গিয়েছিল। আমার ভয় করছিল ওরা হয়তো কাছেপিঠে আমার জন্য ওত্তে পেতে আছে।”

“হঁ। এই লোকগুলোর কাউকে চেনা যায় এমন কোনও চিহ্ন বলতে পারেন ?”

“আমি ওদের দেখেছি জানলা দিয়ে। দূর থেকে। বাংলোয় ওরা যখন ঢুকেছিল তখন আমি চোরাকুঠিরিতে। সেখান থেকে ওদের দেখতে চাইলে আমার ডেডবেডিও আপনারা খুঁজে পেতেন না। ওঁ ভগবান !” ভদ্রমহিলা আবার চোখ বন্ধ করলেন।

দারোগা এবার উঠে দাঁড়ালেন, “আমি আপনার কর্মচারী দু'জনকে জিজ্ঞেস করব। তুমি নীচে এসো।” নারীর উদ্দেশে শেষ কথাগুলো বলে দারোগা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। নারী এবং তানু ব্যানার্জি দারোগাকে অনুসরণ করলেন। কিন্তু অর্জুন দাঁড়িয়ে রইল। তার ক্ষেবলই মনে হচ্ছিল দারোগা টিকঠাক প্রশ্ন করলেন না। আর ভদ্রমহিলাও প্রশ্নের জবাবে কোনও বাড়ি কথা বললেন না। সে নির্জন ঘরের সুবিধে নেওয়ার জন্য দারোগার চেয়ারটিতে গিয়ে বসল।

ভদ্রমহিলা তাকালেন। তাঁর চোখের কোল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “আপনি কি নিশ্চিত যে, ডাক্তার দেখানোর প্রয়োজন নেই ?”

“আমার শরীর বেশ খারাপ। কিন্তু আমি কোথাও যাব না।”

অর্জুন একটু চুপ করে থেকে বলল, “আপনি এতক্ষণ যা বললেন শুনেছি। কিন্তু এমন কথা কি কিছু আছে যা আপনি ওঁকে বলেননি ?”

“কী কথা ?”

“আমি জানি না। এমনিই জিজ্ঞেস করছি।”

“আমার মনে পড়ছে না।”

“মনে করে দেখুন। তা হলে আমাদের তদন্তে সুবিধে হবে।”

“ওরা এতদিন আমাকে ভয় দেখিয়েছে। বাগানের লোককে খুন করেছে।

ওরা ভেবেছিল ভয় পেয়ে আমি বাগান বিক্রি করে দেব। কিন্তু তাতেও যখন কাজ হল না তখন ওরা মরিয়া হয়ে উঠেছে। এবার সরাসরি খুন করতে চায় আমাকেই। আজ দারোয়ানকে খুন করল, কাল আমাকে করবে।”

“এই ওরা কারা ?”

“জানি না। টেলিফোন চালু ছিল যখন, তখন প্রথম অনুরোধ, পরে হ্যাকি দিত।”

“লোকগুলোর কি মুখ বাঁধা ছিল ?”

“না। নর্মাল পোশাক। কিন্তু ওদের কয়েকজন বাংলায় কথা বলছিল না।”

“কী ভাষায় বলছিল ?”

“মনে হল ওড়িয়া ভাষায়।”

অর্জুন অবাক। উভরবসের এইসব এলাকায় ওড়িয়া ভাষাভাষী মানুষের সংখ্যা খুবই কম। ব্যাপারটা অস্তুত। সে জিজেস করল, “দারোগাবাবুকে আপনি একটা কথা বলেননি। অবশ্য উনিও জিজেস করেননি। ওরা যখন বাংলায় চুকেছিল তখন আপনি চোরা কুঠুরিতে। কিন্তু বাংলায় দোকার পর ওরা যেসব কথা বলেছিল তা তো আপনার শোনার কথা। কী বলছিল ওরা ?”

তদ্রমহিলা মনে করার চেষ্টা করে বললেন, “প্রথমে খুব রাগারাগি করছিল। জিনিসপত্র ভাঙ্গুর করছিল হয়তো। আমি শব্দ পাচ্ছিলাম। যারা ওড়িয়া ভাষায় কথা বলছিল তাদের সব কথার মানে আমি অবশ্য বুঝতে পারছিলাম না। শেষ পর্যন্ত আমাকে না পাওয়ার পর ওরা হঠাতে চুপচাপ হয়ে গেল। নিজেদের মধ্যে চাপা গলায় আলোচনা করছিল। একজনের কথা কানে এল— যে করেই হোক মালিকানকে খুঁজে বের করতেই হবে। ও বেঁচে থাকলে সব কাজ শুরু করতে পারছে না।”

অর্জুন জিজেস করল, “কী কাজ ?”

“জানি না। ওরা নাকি চা-বাগানের গায়ে ভাঙ্গা মন্দির দেখতে পেয়েছে। ওইরকম বলছিল।”

মহিলার কথা শেষ হতেই অর্জুন যেন ইলেক্ট্রিক শক খেয়ে লাফিয়ে উঠল।

॥ বারো ॥

এখন মধ্যরাত। অন্ধকারে ডুবে থাকা আকেজো এই চা-বাগানের শেডগুলো থেকে মাঝে-মাঝেই অস্তুত ডাক ভেসে আসছে। কৃষ্ণপক্ষের এমন রাতেও সব শাস্ত হয়ে গেলে আকাশ থেকে একরকম মায়াবী আলো চুপিসারে নেমে আসে পৃথিবীতে। ঘন চায়ের লিকারে আধা চামচ দুধের মতো

কিন্তু যায় সবার অঙ্গাণ্টে । দোতলার জানলায় বসে অর্জুন এইরকম দৃশ্যাবলী দেখে যাচ্ছিল । এই ঘরের একমাত্র খাটে পা ছড়িয়ে শুয়ে মেজের সশঙ্কে ঝুমোচ্ছিলেন । আজ রাত্রে তাঁর এখানে থাকার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে ছিল না । প্রতিবাদে কাজ না হওয়ায় রিচানায় শরীর এলিয়ে দিয়ে বসেছিলেন, খানিকক্ষণ চোখ বন্ধ করে ভাববেন, একবার ডাকলেই উঠে পড়তে দেরি করবেন না । অর্জুনের মনে হল বাইরের পৃথিবীর সব শাস্তি একা মেজরই ধ্বংস করতে পারেন । একসময় অর্জুন আর পারল না জানলা ছেড়ে এসে মেজরকে জাগাতে হল । ধড়মড়িয়ে উঠে বসে মেজের বিস্ফারিত চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন । অর্জুন বলল, “আপনার নাক থেকে এমন শব্দ বেরোচ্ছ যে, পাশে বসে থাকা যাচ্ছে না ।”

“তোমাকে বসে থাকতে কে বলেছে ?” রাগী গলা মেজরের ।

অর্জুন কাঁধ ঝাঁকাল, “আপনি বলেছিলেন নাক না ডাকার কি একটা প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেছিলেন, সেটা কাজে লাগাতে পারলে ঘুমোন, নইলে প্রিজ, জেগে থাকুন । এরকম গর্জন শুনলে সিকি মাইলের মধ্যে কোনও লোক আসবে না ।”

ঘরের কোণে একটা ছোট ডিমবাতি জুলছিল । মেজের খাট থেকে নেমে সংলগ্ন টয়লেটে ঢুকলেন । জলের শব্দ হল । তারপর বেরিয়ে এসে বললেন, “দ্যাখো অর্জুন, যে ব্যাপারে মানুষের কোনও হাত নেই সেই ব্যাপারে তাকে দায়ী করা উচিত নয় । একজন চোখে দেখতে পান না, একজন হাঁটতে পারেন না ভাল করে । এমন মানুষকে ভাল বাংলায় কী বলা হয়ে থাকে ?”

“প্রতিবন্ধী ।”

“গুড় । আমিও তাই । যখন ঘুমিয়ে পড়ি তখন আমার শরীর থেকে যে শব্দ বের হয় তার জন্য এই আমি কি দায়ী ?”

“তাহলে নাক ডাকা বন্ধ করার কোনও কৌশল আপনি জানেন না ?”

“জানি । কিন্তু এক কৌশলে দু'দিন কাজ দেয় না ।”

অর্জুন হেসে ফেলল । তারপর জানলায় ফিরে গেল । মেজের বললেন, “আমি তোমার মতলব কিছুই বুঝতে পারছি না । মিসেস দত্তকে নিয়ে ওরা সবাই চলে গেল আর তুমি কেন জিদ ধরলে আজকের রাতটা এখানে থেকে যেতে ?”

অর্জুন-চাপা গলায় বলল, “অসুবিধা কী ? আপনার খাওয়া হয়ে গেছে, বাংলার ভেতরটাও বেশ আরামদায়ক ।”

“আর আমাদের সঙ্গে তো কোনও অস্ত্র নেই !”

“একজন মহিলাকে যারা আক্রমণ করতে এসেছিল তারা দু'জন পুরুষকে ভয় পাবেই ।”

“ওই আনন্দে থাক । যে দারোয়ানটাকে ওরা খুন করেছে সে যেন পুরুষ
৭৫

ছিল না । তাছাড়া তুমি যখন এই ক্লেম নিছ তা তখন খামোকা থেকে যাওয়ার কী দরকার ছিল । মিস্টার ভানু ব্যানার্জির সঙ্গে চলে গেলেই হত । এত অনিষ্ট সঙ্গেও মিসেস দস্তও শেষ পর্যন্ত চলে গেলেন ।” মেজর আরও কথা বলতেন কিন্তু তিনি অর্জুনকে নিঃশব্দে হাত তুলে ইশারা করতে দেখলেন । তাঁর রোমাঞ্চ হল । চাপা স্বরে জিজেস করলেন, “কেউ আসছে নাকি ?”

অর্জুন হাত নামিয়ে নিল, জবাব দিল না । মেজর ধৈর্য ধরতে পারলেন না । যতটা সম্ভব নিঃশব্দে অর্জুনের পেছনে গিয়ে দাঁড়ালেন । ডিমবাতির আলোয় চোখ অভ্যন্ত থাকায় প্রথমে কিছুই ঠাওর করতে পারলেন না । বাইরেটা ঘন অন্ধকার মনে হল তাঁর হতাশ হয়ে আবার ফিরে গেলেন ঘরের মাঝখানে । বিড়বিড় করে বললেন, “নিজেকে কেমন বন্দি-বন্দি মনে হচ্ছে ।”

আকাশ আলোয় অভ্যন্ত হয়ে যাওয়া চোখে অর্জুন ছায়ামূর্তিটাকে দেখতে পেল । গেটের ওপাশে ঝুঁকে পড়ে কিছু করছে । তারপরেই নজরে এল, একজন নয়, আরও সঙ্গী আছে । এরা সবাই খুব নিশ্চার সঙ্গে ওখানে কিছু করছে । মাঝে-মাঝে পাশের জঙ্গলে চুকে যাচ্ছে লোকগুলো । জঙ্গলে চুকতেই সরু আলো জ্বলতে দেখল অর্জুন । ওরা টর্চ জেলে কিছু খুঁজছে ।

অর্জুন নিঃশব্দে জানালা ছেড়ে চলে এল । মেজর পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে ছিলেন । তাঁর সামনে এসে নিচু গলায় বলল, “আপনি ফোর্ট সামলান । আমি একটু ঘুরে আসছি । যদি কাল সকালের মধ্যে না ফিরি তাহলে অমলদাকে খবর দেবেন ।”

“তোমাকে একা ছাড়ব ভেবেছ ? আমি কি এমনি এমনি রয়ে গেছি ?”

“না । আপনার যাওয়া চলবে না । দুজনের কিছু হলে সারা পৃথিবী জানতে পারবে না !”

“মাই গড ! তা হলে তোমার যাওয়ার দরকার কী ? এই কেস তো তুমি নিছ না ।”

অর্জুন কোনও উত্তর না দিয়ে নীচে নেমে এল । মিসেস দস্তের কাজের মানুষ দুঁজন বাংলোর একতলাতেই শুয়ে আছে । বেরতে হলে দরজা বন্ধ করার জন্য ওদের ডাকা দরকার । কিন্তু শব্দ করার ঝুঁকি নিল না অর্জুন । পেছনের দরজা খুলে সে নিঃশব্দে বাইরে বেরিয়ে এল । দরজাটাকে যতটা সম্ভব চেপে বন্ধ করার চেষ্টা করল ।

আকাশ নীল । প্রচুর তারা সেখানে । তাদের শরীর থেকে আলো চুইয়ে আসছে । অর্জুন পেছনের বাউন্ডারি ডিশিয়ে জঙ্গলে চুকে গেল । হঠাৎই একটা হতচাড়া প্যাংচা চিৎকার করে মাথার ওপরের ডাল থেকে ডানা ঝাপটে উড়ে গেল । মিনিটখানেক চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে জঙ্গল ছেড়ে চা-বাগানের গলির মধ্যে চুকে পড়ল অর্জুন । শুড়ি মেরে সে অনেকটা ঘুরে বাংলোর গেটের দিকটায় চলে এল । কান পাতল । কোনও কথা শোনা যাচ্ছে না । সে আর

ଏକଟୁ ଏଗୋତେଇ ଗାଛେର ଡାଳେ ଆସାତ ପେଲ । ସାମାନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ହଲ, କିନ୍ତୁ ମେହି ସମୟ କାହିଁପିଠେ ଏକଟା ଶେଯାଲ୍ ଗଲା ଛେଡେ ଡେକେ ଉଠିତେଇ ଶବ୍ଦଟା ଚାପା ପଡ଼େ ଗେଲ । ଅର୍ଜୁନ ନିଜେର କାଁଧେ ହାତ ବୋଲାଲ । ଆର ତଥାନ୍ତି ପାତା ମାଡ଼ାବାର ଆଓୟାଜ କାନେ ଏଲ । କେଉ ଥୁବୁ କାହାକାହି ହାଁଟିଛେ । ମେ ଚା-ଗାଛେର ମଧ୍ୟେ ହାଁଟୁ ମୁଡେ ବସେ ରହିଲ । ଗାଛେର ତଳାର ଫାଁକ ଦିଯେ ହାତ ପାଁଚେକ ଦୂରେ ସକ୍ରି ଟର୍ଚେର ଆଲୋ ପଡ଼ିତେ ଦେଖିଲ ମେ । ଆଲୋଟା ଇତ୍ତତ ଘୁରେ ସେଖାନେ ଥିଲ ହଲ ସେଖାନେ ଏକଟା ଛୋଟ ପାତାଓୟାଲା ଆଗାହା ଲାଲ ହେଁ ଆଛେ । ତାରପରେଇ ଏକଟା ହାତ ମେହି ଆଗାହାଟାକେ ମାଟିସୁଦ୍ଧ ଉପଡେ ନିଲ । ଆଲୋ ନିଭେ ଗେଲ ଏବଂ ଆଓୟାଜ ଫିରେ ଗେଲ ଯେଦିକ ଥେକେ ଏସେଛିଲ ।

ବ୍ୟାପାରଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ହଲ । ଓରା ଫିରେ ଏସେହେ ରଙ୍ଗେର ନାମ କରେ ଯା ଛଡ଼ିଯେଛିଲ ତାର ଚିହ୍ନ ମୁଛେ ଫେଲିତେ । ଅର୍ଥାତ୍ ଅଭ୍ୟନ୍ତ ସାବଧାନୀ ମାନୁଷେର ବୁଦ୍ଧି ଓଦେର ନିୟାନ୍ତ୍ରି କରିଛେ । ଚା-ବାଗାନେର ଗଲିତେ ହାଁଟିଲେଇ ପାତା ମାଡ଼ାବାର ଶବ୍ଦ ହବେଇ । ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରାୟ ବୁକେ ହେଁଟେ ବାଗାନେର ଭେତର ଦିଯେ ଏଗୋତେ ଲାଗଲ । ହାତ-କୁଡ଼ି-ଯାଓୟାର ପର ସେ ଲୋକଗୁଲୋକେ ଦେଖିତେ ପେଲ । ମୋଟ ଚାରଜନ । ଏକଜନେର ହାତେ ଏକଟା ବ୍ୟାଗ । ନିଜେଦେର ମଧ୍ୟେ ନିଚୁ ଗଲାଯ କିଛୁ ବଲଲ । ତାରପରେଇ ଏକଜନ ଏକଟା ଛୋଟ ପାଥର କୁଡ଼ିଯେ ନିଯେ ପ୍ରଚାନ୍ତ ଜୋରେ ବାଂଲୋର ଦିକେ ଛୁଟେ ମାରଲ । ପାଥରଟା ଦେତଳାର ଜାଣାଲାର କାଠେ ଲାଗିତେଇ ସେଟୀ ବନିବାନ କରେ ଭେତେ ପଡ଼ିଲ ଏବଂ ତାର ସଙ୍ଗେ-ସଙ୍ଗେ ମେଜରେର ଆକାଶ ଫାଟାନୋ ଚିତ୍କାର ଭେସେ ଏଲ, “କେ ? କେ ଛେଁଢେ ଟିଲ ? ଟିଲ ଛୁଟିଲେ ପାଟକେଲ ଥେତେ ହେଁ ତା ଜାନିସ ? ମେରେ ଏକେବାରେ ହତୁମ ପ୍ରାୟୀକ କରେ ଦେବ ଶୟତାନେର ମାତିଦେର । ବଦମାଶ, ମଞ୍ଚାନି ହଜେ ଆମାର ସଙ୍ଗେ ? ସାହସ ଥାକେ ତୋ ସାମନାସାମନି ଏସେ ଲାଭ ।”

ଚାଁଚାମେଚି ଚଲିଛିଲ ବଟେ କିନ୍ତୁ ସ୍ଵରେ ଭେତର ସେ ଭୟାର୍ତ୍ତ ଭାବ, ତା ଅର୍ଜୁନେର କାନ ଏଡ଼ିଯେ ଯାଇଛି ନା । ଲୋକଗୁଲୋ ଚାପା ଗଲାଯ ହେଁ ଉଠିଲ । ଏକଜନ ହିନ୍ଦିତେ ବଲଲ, “ଓରା ଆଜ ବାଂଲୋ ଛେଡେ ବେର ହବେ ନା । ଚଲ ।”

ହେଲତେ-ଦୁଲତେ ଓରା ହାଁଟା ଶୁରୁ କରଲ । ଏଥନ ଆର ଜଙ୍ଗୁଲେ ପଥେ ନୟ, ଚାଁଚା ଯେ ରାତ୍ର ହାଇଓୟେ ଥେକେ ଭାଙ୍ଗ ସାଁକୋ ପେରିଯେ ବାଂଲୋଯ ପୌଛେଛେ ସେଟି ଧରେ ଓରା ହାଁଟିଲେ ଲାଗଲ । ଏହି ରାତ୍ର ଧରେ ଓଦେର ଅନୁସରଣ କରା ବିପଞ୍ଜନକ । ଅନ୍ଧକାରେ ଚୋଖ ଅଭ୍ୟନ୍ତ ଥାକଲେ ପେଚନ ଫିରିଲେଇ ଓରା ତାକେ ଦେଖିତେ ପାବେ । କିନ୍ତୁ ପାଶରେ ଚା-ବାଗାନ ଏତ ଘନ ସେ, ଓଦେର ସଙ୍ଗେ ତାଲ ରାଖା ଯାବେ ନା ମେଖାନ ଦିଯେ ହାଁଟାର ଚଷ୍ଟା କରଲେ । ବାଧ୍ୟ ହେଁ ଅର୍ଜୁନ ବୁକ୍କି ନିଲ । ଓଦେର ବେଶ କିଛୁଟା ଏଗିଯେ ଯେତେ ଦିଯେ ଓ ନିଃଶବ୍ଦେ ଅନୁସରଣ ଶୁରୁ କରଲ । ଯେହେତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଁ ପଡ଼ାଯ ଲୋକଗୁଲୋ ନିଜେଦେର ମଧ୍ୟେ ଗଲ୍ଲ କରତେ କରତେ ହାଁଟିଛିଲ ତାଇ ଓଦେର ଠାଓର ପେତେ ଅସୁବିଧେ ହିଲିଲ ନା ଅର୍ଜୁନେର ।

ଏକ ସମୟ ଓରା ରାତ୍ର ଛେଡେ ଚା-ବାଗାନେର ମଧ୍ୟେ ନାମଲ । ସୁବିଧେ ହଲ ଅର୍ଜୁନେର । ମେ ସଙ୍ଗେ-ସଙ୍ଗେ ଓଦେର ସମାନ୍ତରାଳ ଆର-ଏକଟି ଗଲିତେ ନେମେ ପଡ଼ିଲ ।

এদিকে চা-গাছ অব্যবহারে বেশ লম্বা হয়ে গিয়েছে। ফলে চমৎকার একটা আড়াল পেয়ে যাচ্ছে সে। ওরা এই পথে কোথায় যাচ্ছে? অর্জুন খুব কোতুহলী হয়ে পড়ছিল।

মিনিট দশক মতৰ্ক হাঁটার পরে ওরা একটা হাঁটু-জলের নদীর ধারে পৌঁছে গেল। পাহাড়ী নদী। জলে স্বেচ্ছাত আছে। অর্জুন দেখল ওদের একজন ব্যাগ উপুড় করে সংগৃহীত পাতা-ঘাস জলের স্বেচ্ছাতে ফেলে দিল। রক্তের সব চিহ্ন জল গ্রাস করে নিল তৎক্ষণাত।

চা-বাগানের শেষ এখানেই, এই নদীর পারে। ওপারে জঙ্গলের শুরু। লোকগুলোকে নদীর পাড় ধরে এবার নীচে এগোতে দেখা গেল। এবার ওদের অনুসরণ করতে হলে নদীর গায়ে ফাঁকা জায়গায় আসতেই হবে। ভোর হতে এখনও বেশ দেরি, অন্ধকারের আড়ালে যতটা সম্ভব এগিয়ে যেতে লাগল অর্জুন। ব্যবধান যা, তাতে ওরা ঘাড় ঘুরিয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে না থাকলে তাকে দেখতে পাবে না। অসর্ক মানুষ তার চোখের সামনে ঘটে যাওয়া অনেক দৃশ্য দেখতে পায় না। এক্ষেত্রে ওরা তো কাজ সফলের আনন্দে বিভোর।

এবার নদী একটু সক্রীয় এবং তার ওপরে বাঁশের সাঁকো দেখা গেল। সেই সাঁকো বেয়ে লোকগুলো ওপারের জঙ্গলে চুকে গেল। এখানে জল বেশি নয়। যদি সাঁকোর ওপরে কেউ এদের অপেক্ষায় থাকে তাহলে সহজেই সাঁকোয় উঠলে তাকে দেখতে পাবে। এমনও হতে পারে লোকগুলো অনুমান করেছে কেউ পেছনে আছে তাই সাঁকোয় ওঠার জন্য অপেক্ষা করছে। সে ঝুঁকি না নিয়ে জলে নামল। গুটিয়ে নেওয়ায় প্যান্টের প্রান্ত হাঁটু পর্যন্ত থাকলেও জল মাঝে-মাঝেই স্পর্শ করতে লাগল। জুতো ভিজছে কিন্তু কিছু করার নেই। নদীটা পেরিয়ে সে জঙ্গলে এসে দাঁড়াল। লোকগুলো চুকেছে হাত কুড়ি তফাত দিয়ে। তাদের কোনও অস্তিত্ব এখন নেই। এদিকের জঙ্গল বেশ গভীর এবং হাঁটার পক্ষে নিতান্তই খারাপ।

মিনিট দশকে অন্ধকারে হাতড়ে শেষ পর্যন্ত একটা পায়ে-চলা পথ পেল অর্জুন। সে অনুমান করল এই পথেই লোকগুলো এগিয়েছে। এই জঙ্গল অবশ্যই নীলগিরি ফরেস্টের একটা অংশ। হিংস্র জন্তুজানোয়ারের কথা প্রায়ই শোনা যায় এই জঙ্গলে। একেবারে খালি হাতে এগোন ঠিক হচ্ছে না। কিন্তু মনে হচ্ছে মানুষ এখানে নিয়মিত যাওয়া-আসা করে। হিংস্র মানুষের চেয়ে কোনও জন্তু হিংস্তর হতে পারে না।

হঠাৎ চোখে আলো এল। অর্জুন পথ ছেড়ে জঙ্গলে চুকল। মিনিট তিনেক চলার পর একটা খোলা চতুর নজরে এল। জঙ্গলের মধ্যে তাঁবু, তাঁবুর বাইরে কারবাইডের গ্যাসের আলো জ্বলছে গোটা চারেক। পাতার আড়ালে দাঁড়িয়ে সে লক্ষ করল পাশাপাশি আরও গোটা তিনেক ছেট তাঁবু আছে।

মূল তাঁবু থেকে কয়েকজন বেরিয়ে এল। যে লোকগুলোকে সে অনুসরণ

করে এখানে পৌঁছেছে তাদের দেখতে পাওয়া গেল ! খুব বিনীত ভঙ্গিতে কথা শুনছে । তাঁবু থেকে বের হওয়া নতুন দুঁজন মানুষ ওদের পিঠ চাপড়াল । এবার কাজ সেরে আসা লোকগুলো ছেট তাঁবুর দিকে চলে গেল ! অর্জুন জন্মল দুঁজন কর্তব্যাঙ্গি নিজেদের মধ্যে কথা বলে আবার তাঁবুর ভেতর ফিরে দেল । এবার সব শান্ত । শুধু গ্যাসের আলো দপদপ করে জুলছে । কোথাও কোনও পাহারাদার আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না । না থাকাটাই অস্বাভাবিক । বরং এত পরিকল্পনামাফিক কাজ করছে তারা নিজেদের নিরাপত্তার কথা ভাববে ন এমন হতেই পারে না । আর এগিয়ে যাওয়া বোকামি হবে, অর্জুন জন্মলের মধ্যে দিয়ে নিঃশব্দে হাঁটতে লাগল । মচমচ শব্দ হচ্ছে শুকনো পাতায় পাপতায়, মাঝে মাঝেই সে থেমে যাচ্ছে । হঠাতে একটা চিৎকার ভেসে এল । জন্মজানোয়ার তাড়ানোর জন্য মানুষ ওই গলায় আওয়াজ করে । যতটা সম্ভব দূরত্ব রেখে খোলা চতুরটাকে ঘুরে দেখল অর্জুন । জন্মলের মাঝখানে চমৎকার জায়গা বেছেছে এরা । ইতিমধ্যে নদীর দিকের পথ দিয়ে আরও চারজন লোক এসেছে । তারা বড় তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে সাহেবে বলে ডাকার পর একজন কর্তা বেরিয়ে এসেছে । অর্জুন শুনল লোকটা রিপোর্ট করছে ডেডবিডিটাকে নদীর জলে চুবিয়ে ভাল করে পাথর দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে । ভেসে যাওয়ার কোনও চাঙ নেই ।

কত্তাটির গলার স্বর জড়ান । অন্তত হিন্দি উচ্চারণে লোকটা বলল “খুব ভাল কাজ হয়েছে, কিন্তু তোমাদের এখানে এখন কে আসতে বলেছে । যে জায়গায় ডিউটি দেওয়া হয়েছে সেখানে ভোর পর্যন্ত অপেক্ষা করবে ।”

“সাহেব, এখন বাগানে কোনও মানুষ নেই । পুলিশ চলে গিয়েছে অনেকক্ষণ । ভয়ে কেউ বাগানে চুকবে না, তাই ভাবলাম খবরটা দিয়ে আসি ।”

“তোমাদের কিছু ভাবতে হবে না । যা ভাববার আমরা ভাবব । যাও ।” কর্তা আবার তাঁবুর ভেতর ঢুকে গেল । অর্জুনের মনে হল লোকগুলো এমন ব্যবহার আশা করেনি । তাঁবুর কাছ থেকে কিছুটা সরে এসে তারা একটু গজরাল, তারপর নদীর দিকে চলে গেল ।

এবার ফেরা উচিত । ভোর হতে মাত্র ঘণ্টা দেড়েক বাকি আছে । ভানু ব্যানার্জি অনেক করে বলেছিলেন মিসেস দত্তের সঙ্গে বাগান থেকে চলে যেতে । না গিয়ে ভাল লাভ হল । অন্তত দরোয়ানের মৃতদেহের হাদিস আর তাঁবুগুলোর অস্তিত্ব অজানা থাকত তা হলে । অর্জুন ভালপালা সরিয়ে হাঁটতে লাগল । তাঁবু ছেড়ে কিছুক্ষণ হাঁটার পর তার মনে হল সে দিক ভুল করেছে । নদীর দিকে যাওয়ার বদলে সে উঞ্চো দিকে চলে এসেছে । এখানে গাছের তলায় আগাছা বেশি । সে যত হাঁটছে তত ওপরের ডালে বসা বানরেরা হইচই শুরু করে দিয়েছে । এবং তখনই সে টিন পেটানোর শব্দ শুনতে পেল ।

দু-তিনটে টিন একসঙ্গে পেটানো হচ্ছে ।

এই ঘন জঙ্গলে মানুষ টিন পেটায় জন্মজানোয়ার তাড়াতে । কিন্তু এত গভীরে এই অসময়ে মানুষ কী করছে ? জঙ্গলে যারা চুরি করে কাঠ কাটতে আসে তারা নিজেদের অস্তিত্ব এভাবে জানাবে না । চোরা শিকারীরাও নিঃশব্দে থাকে । মাথার ওপর ঘুম-ভাঙা বানরের দল কিছুতেই শাস্ত হচ্ছিল না । অর্জুন তাদের এড়াতেই টিনের শব্দ লক্ষ করে এগোল । খুঁটিমারি রেঞ্জে থাকার সময় সে জেনেছিল বাঘজাতীয় হিংস্র পশু এলে বানরেরা এভাবে সারা জঙ্গলকে জানিয়ে দেয় । বানরের চিংকারে পাখিদেরও ঘুম ভেঙেছে । মুহূর্তেই সমস্ত নৈঃশব্দ ভেঙে বাজার হয়ে গেল জঙ্গলটা । অর্জুন অসহায়ের মতো তাকাল । সে বুঝতে পারল, যারা টিন পেটাচ্ছে তারা বানরের চিংকার শুনে ভুল করছে । জায়গাটা ছেড়ে যাওয়ার জন্য সে দ্রুত পা চালাল । বানরগুলো পেছন ছাড়ছে না । এ-ডাল থেকে আর এক ডাল অঙ্ককারেই লাফাতে লাগল তারা । অর্জুন টিনের আওয়াজ যেখানে হচ্ছে সেখানে পৌঁছে যেতেই গুলির শব্দ শুনল । আকাশ কাঁপিয়ে সেই শব্দ জঙ্গলে ছড়িয়ে পড়তেই সব চিংকার আচমকা থেমে গেল ।

একটা মানুষের হাসি শোনা গেল । সে হিন্দিতে বলল, “টিন পেটালে আজকাল কাজ হয় না । শেরগুলো সব চালাক হয়ে গেছে । গুলির আওয়াজে এবার ভাগবে ।”

দ্বিতীয় গলা প্রতিবাদ করল, “সাহেব গুলি ছুড়তে মানু করেছিল কিন্তু !”

“বাঘ খেয়ে গেলে সাহেব আমাদের বাচবে ? যা শুয়ে পড়, এখন আর কোনও ভয় নেই । আমি জেগে আছি ।”

অর্জুন আর-একটু এগোল । তারপরেই তার চোখের সামনে এই অঙ্ককারেও দৃশ্যটি অস্পষ্ট ভেসে উঠল । অনেকটা জঙ্গল পরিষ্কার করে মাটি খোঁড়া হচ্ছে । প্রায় পুরুরের আদল নিয়ে নিয়েছে জায়গাটা । পুরুরের গায়ে তাঁবু পড়েছে । মনে হচ্ছে শ্রমিকরা সেখানেই রাত্রে থাকে । একটি লোককে বন্দুক হাতে তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল । অঙ্ককারে তার নাক-চোখ বোঝা যাচ্ছে না ।

অর্জুনের চোরাল শক্ত হল । তাহলে ব্যাপারটা এই । আসল কাজটি হচ্ছে এখানে । এবং বোঝাই যাচ্ছে কাজটি এখনও সফল হয়নি । কিন্তু চারপাশে নেহাতই জঙ্গল, গভীর জঙ্গল । লোকগুলো মাটি খুঁড়ে করছে কী ?

ধীরে ধীরে সে সরে এল । অনেকটা ধূরে শেষ পর্যন্ত এক কোমর জল পেরিয়ে সে চা-বাগানে পৌঁছল যখন, সূর্যদের তখন জঙ্গলের মাথায় উঠে বসেছেন । বাংলোয় পৌঁছতে কোনও বাধা পাওয়া গেল না । গেট খুলে ভেতরে দোকার সময় সে ভট্টাচার আওয়াজ শুনতে পেল । আড়াল খুঁজতে যাওয়ার মুখে সে মোটরবাইকে বসা ভানু ব্যানার্জিকে দেখতে পেল । ভানুবাবু

হাত তুললেন। তারপর কাছে এসে বাইক থামিয়ে সিজেস করলেন, “এ কী অবস্থা? প্যান্ট ভিজে কেন? কোথায় গিয়েছিলে?”

অর্জুন বলল, “তার আগে আপনি বলুন হঠাত এত ভোরে ফিরে এলেন কেন?”

“অস্বত্তিতে। তোমাদের এখানে ফেলে রেখে স্বত্তি পাছিলাম না।

“কোনও সমস্যা হয়নি তো?”

“সমস্যা নয়, সমাধানের দিকে একটু এগোন গিয়েছে।”

হঠাত ভানু ব্যানার্জি চিংকার করে থামতে বললেন তাকে। বাইক থেকে নেমে এসে ঝুঁকে পড়ে ভানু ব্যানার্জি অর্জুনের পা থেকে টেনে-টেনে যেগুলো ফেলতে লাগলেন সেগুলো ফুলে-ফেঁপে ঢোল হয়ে আছে। অর্জুন জেঁকগুলো দেখল। অনেক রক্ত খেয়ে গেছে অসাড় করে। ভানু ব্যানার্জির জুতোর চাপেও মরছে না। ওদের জন্য নুন দরকার।

॥ তেরো ॥

সুভাবিনী চা-বাগানে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলোয় বসে চা খেতে-খেতে কথা হচ্ছিল। মিসেস ব্যানার্জি মমতা দত্তর যত্ন নিয়েছেন। এখন কিছুদিন ঘূর্ম আর বিশ্রাম। এই অবস্থায় তাঁর উচিত চা-বাগানের চিন্তা ছেড়ে নিজের বাড়িতে চলে যাওয়া। কিন্তু তিনি তাতে রাজি নন। তাঁর বন্ধুব্য, চা-বাগানটাও তো নিজের, স্বামীর ভালবাসা উদ্যম মেশানো স্মৃতি। তাকে ছেড়ে তিনি কোথাও গেলে শাস্তি পাবেন না। মিসেস ব্যানার্জি ইচ্ছেটাকে সম্মান করেছেন। ঠিক হয়েছে কিছুদিন ভদ্রমহিলা এই বাংলোতেই থাকবেন। আজ সকালে এখানে এসেই অমল সোমকে টেলিফোনে খবর দেওয়া হয়েছে। জলপাইগুড়ির থানায় ফোন করে বলা হয়েছে ওঁকে জানাতে।

মেজের চা শেষ করে বললেন, “আমি আমার সব কথা উইথড্র করছি। এই কেস আমাদের নেওয়া উচিত। তবে এইবেলাটা শরীর রেস্ট চাইছে।”

অর্জুন মেজরকে দেখল। ‘আমাদের নেওয়া উচিত’ মানে উনি নিজেকে একজন সত্যসঙ্কান্তি হিসাবে ধরে নিয়েছেন। সে কোনও কথা বলল না।

মেজরের মেজাজ চড়া হল, “হোয়াই চুপচাপ? আমরা কি কাওয়ার্ড?”

“আপনাকে কেউ কাওয়ার্ড ভাবতে সাহস পাবে না। কাল রাত্রে টিল খাওয়ার পর যেভাবে আপনি চেঁচাচ্ছিলেন, বাপস।” অর্জুন মন্তব্য করল।

“ওরা কাওয়ার্ড, তাই টিল মারচিল, সামনাসামনি এলে দেখিয়ে দিতাম।” মেজর বেতের চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিলেন।

ভানু ব্যানার্জি জিজেস করলেন, “তুমি কি মিস্টার সোমের জন্য অপেক্ষা করছ?”

অর্জুন ঘড়ি দেখল, “ঠিক তা নয়। ওঁর এখানে পৌঁছতে দুপুর হয়ে যাবে। আমি ভাবছিলাম লোকাল থানাকে কতটা বিশ্বাস করা যায়।”

“কী ব্যাপারে?”

“এঁদের শক্তি সম্পর্কে? আমাদের প্রতিপক্ষ খুব তৈরি।”

“তুমি কাল রাত্রে যা দেখেছ তা এখনও থানায় জানাওনি।”

“জানাইনি। তার কারণ এতবড় একটা ব্যাপার ওখানে একদিনে ঘটেনি। আর সেটা যদি পুলিশ না জানে তা হলে অস্বস্তি হয়। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের বিট অফিসাররা জঙ্গলে ঘোরে। তাদের চোখেও পড়বে না তা বিশ্বাস করতে পারছি না। তারা কেন পুলিশকে জানায়নি? আমি দেখেছি এটা যদি থানায় বলি তা হলে ওদের কাছে খবর যে পৌঁছে যাবে না তাই বা বিশ্বাস করব কীভাবে?”

“কিন্তু পুলিশ ছাড়া আমরা তো ওদের বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারি না।” ভানু ব্যানার্জিকে চিন্তিত দেখাল। এবং তখনই টেলিফোনটা বেজে উঠল। ভানু ব্যানার্জি রিসিভার তুললেন, “হ্যালো, ব্যানার্জি স্পিকিং, ও আপনি, বলুন। হাঁ, ওঁরা আজ সকালেই আমার এখানে চলে এসেছেন। মিসেস দত্ত ভাল আছেন। তাই নাকি? না, না, আমরাই চলে যেতে পারি। নিশ্চয়ই।” একটু চুপ করে থেকে আবার বললেন, “নিশ্চয়ই, নিন।” রিসিভারটা তিনি অর্জুনের দিকে এগিয়ে বললেন, “মেঘ না চাইতেই জল।”

ব্যাপারটা না বুঝেই রিসিভারে হ্যালো বলল অর্জুন। সঙ্গে-সঙ্গে ওপারে অমল সোমের গলা বাজল, “কী ব্যাপার হে, কোনও খবর না দিয়ে ওখানে বসে আছ!”

“আরে আপনি? কোথেকে বলছেন?”

“লোকাল থানা থেকে। কাল রাত্রে ফিরলে না, কোনও খবর নেই দেখে আজ সকালে এস. পি-র সঙ্গে হৈমতীপুরের দিকে যাচ্ছিলাম। তোমার মা ভাবছেন খুব, করে যে একটু দায়িত্বজ্ঞান হবে!” অমল সোমের গলার বিরক্তি এবার আর চাপা রইল না।

অর্জুনকে সেটাকে উপেক্ষা করল, “বিশ্বাস করুন, কোনও উপায় ছিল না। একটু আগে হৈমতীপুর থেকে ফিরেই আপনাকে খবর দেওয়ার জন্য জলপাইগুড়ির থানায় ফোন করেছি।”

“ঠিক আছে, মিস্টার ব্যানার্জিকে বল, আমরা আসছি।” লাইন কেটে দিলেন অমল সোম।

মিনিট চালিশেক পরে অর্জুন তার অভিজ্ঞতার কথা দ্বিতীয়বার জানাল। প্রথমবার বলতে হয়েছিল ভানু ব্যানার্জি এবং মেজরকে। এখন ওঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন অমল সোম এবং এস. পি। থানার দারোগাকে সঙ্গে আনেননি ওঁরা।

অর্জুন থামলে এস. পি. বললেন, “অস্তুত । এ তো সিনেমার চেয়ে সংজ্ঞাতিক । আমাদের নাকের ডগায় এমন সব কাণ্ড চলছে আর কিছুই জানতে পারিনি ?”

অমল সোম বললেন, “হৈমন্তীপুর চা-বাগানে একটা খুন কেন হচ্ছে, কেন বাগান বন্ধ, তা নিয়ে কি কথনও ভেবেছেন এস. পি. সাহেব ?”

এস. পি. একটু থিতিয়ে গেলেন, “আসলে শ্রমিক বিক্ষোভ থেকে এরকম হয় এমন ধারণা তৈরি হয়েছিল । আমাদের ফোর্স এখানে করছেটা কী ?”

অমল সোম বললেন, “মিস্টার ব্যানার্জি, একবার ডি. এফ. ও-র সঙ্গে কথা বলা দরকার । জঙ্গল এলাকাটা তাঁর । বোঝাই যাচ্ছে নীচের তলার কর্মচারীরা ওঁকে কোনও খবর দেননি । তবু... ।” ভানু ব্যানার্জি সঙ্গে-সঙ্গে অপারেটরকে বললেন জলপাইগুড়ি শহরে ডি. এফ. ও-কে ধরতে । একটু সময় নিয়ে অপারেটর জানালেন, ডি. এফ. ও. শহরে নেই, হলং বাংলোয় আছেন । সেখানকার টেলিফোন কাজ করছে না । অমলবাবুর অনুরোধে ভানু ব্যানার্জি একটা চিঠি লিখে ড্রাইভারকে পাঠিয়ে দিলেন সেখানে । সুভাষিণী চা-বাগান থেকে মাদারিহাট হলং-বাংলো মিনিট কুড়ির রাস্তা ।

কেউ কিছুক্ষণ কথা বলছিল না । অথচ মেজের ছাড়া প্রায় প্রত্যেকেই একটা চাপা উত্তেজনার শিকার হয়ে পড়েছেন । মেজেরই কথা বললেন প্রথমে, “ওরা কোন ভাষায় কথা বলছিল অর্জুন ? মানে ওদের পরিচয় জানার জন্য জিজ্ঞেস করছি ।”

“হিন্দিতে বলছিল ।”

“মাইগড । এ তো জাতীয় ভাষা ।” নিঃশ্বাস ফেললেন মেজের, “কিছুই ধরা যাবে না ।”

এস. পি. বললেন, “প্রথমে আমরা ডেডবিড়াকে উদ্ধার করব । জলে পড়ে থাকলে খুব দ্রুত নষ্ট হয়ে যাবে ।”

অমল সোম মাথা নাড়লেন, “ভুল হবে । আমরা যদি সরাসরি নদীতে গিয়ে মৃতদেহ তুলে নিয়ে আসি তা হলে ওরা অ্যালার্ট হয়ে যাবে । ওরা বুঝবে আমরা ওদের কাজকর্ম সম্পর্কে ওয়াকিবহাল । অর্থাৎ ওরা যেখানে মৃতদেহ লুকিয়ে রেখেছে সেখানে তো কেউ চট করে খুঁজবে না । তা হলে আমরা জানলাম কীভাবে ?”

ভানু ব্যানার্জি সমর্থন করলেন, “ঠিক কথা । ওদের স্পাই সব জায়গায় আছে ।”

অমল সোম বললেন, “সেইটেই মুশ্কিল । আমি ভেবে পাচ্ছি না বাইরে থেকে এসে কিছু মানুষ কীভাবে এমন নেটওয়ার্ক তৈরি করল ! আমি একবার মিসেস দপ্তের সঙ্গে কথা বলতে চাই ব্যানার্জি সাহেবে ।”

ভানু ব্যানার্জি উঠে দাঁড়ালেন । এস. পি. জিজ্ঞেস করলেন, “আমি আসতে

পারি ?”

“আসুন । তবে আপনাদের ওপর ওর আঙ্গুলিকম বলে জেনেছি ।”

অমল সোম ভানু ব্যানার্জিকে অনুসরণ করলেন । একটু ইতস্তত করে এস. পি. ওঁদের পেছনে এগোলেন । অর্জুনের ব্যাপারটা ভাল লাগল না । অমল সোম এক্ষেত্রে তাকে সঙ্গে যেতে বলতে পারতেন । সে অতখানি পরিশ্রম করল আর মাঝখানে এসে অমল সোম তাকে উপেক্ষা করছেন । চুপচাপ বলে থাকতে-থাকতে তার ঘূম পেয়ে যাচ্ছিল । গত রাত্রের ক্লাস্টি আচমকা গ্রাস করল তাকে । আধুনিক সময় কীভাবে কেটে গেছে সে জানে না ।

কাঁধে হাতের স্পর্শে জোর করে চোখ মেলল সে, অমলদা হাত সরিয়ে নিয়ে বললেন, “খুব টায়ার্ড হয়ে আছ । একটু বিছানায় গিয়ে ঘুমিয়ে নাও ।”

অর্জুন সোজা হয়ে বলল, “নাঃ ঠিক আছে ।” সে দেখল ঘরে এখন সবাই উপস্থিত । এমনকী, একজন নতুন ভদ্রলোক এসেছেন, মানুষটাকে সে দু-একবার দূর থেকে দেখেছে, এই জেলার ডি. এফ. ও. ।

অমল সোম বললেন, “তুমি ঠিক বলছ তো ?”

“হ্যাঁ, আমি ঠিক আছি ।”

“গুণ্ড ! শোন, আমি এখন জলপাইগুড়িতে ফিরে যাচ্ছি ।”

অর্জুন হতভস্ব, “ফিরে যাচ্ছেন মানে ?”

“আর এখানে কিছু করার নেই । এস. পি. সাহেবে আছেন,, ডি. এফ. ও. এসে গিয়েছেন, তুমি আছ । জাস্ট ওদের আক্রমণ করে কজ্জা করা । এর জন্য আমি থেকে কী করব । বুবালে ?” অমল সোম খুব স্বাভাবিক গলায় বললেন ।

“কিন্তু আপনার সঙ্গে আমার কিছু জরুরি কথা ছিল ।”

“ও । ঠিক আছে, এস, আমরা বারান্দায় গিয়ে কথা বলি ।” অমল সোম কারও দিকে না তাকিয়ে সোজা বারান্দায় চলে গেলেন । অর্জুনের এটা খারাপ লাগল । এত সোক এখানে দাঁড়িয়ে, অস্তত বলে যাওয়া উচিত ছিল । সে বারান্দায় এসে বলল, “ওঁদের না বলে এভাবে বেরিয়ে এলেন ।”

“না বলে মানে ? ওহো ! আমরা কেউ এখানে ভদ্রতা করতে আসিনি । মিসেস দত্ত আমাদের ক্লায়েন্ট । তাঁর কাজ করতে এসেছি । কী বলছিলে বল !”

“হৈমন্তীপুর চা-বাগানকে যিবে এই যে ব্যাপারটা চলছে তার পেছনে অন্য কারণ আছে । মিসেস দত্ত আমাকে বলেছেন যে তিনি ওদের মুখে জঙ্গলে মন্দিরের কথা শুনেছেন । আমি নিজে দেখেছি ওরা বিরাট জায়গা খুঁড়ে ফেলেছে ।”

“তাতে হলটা কী ?”

“আপনি বুঝতে পারছেন না কেন, হয়তো কালাপাহাড়ের সম্পত্তি খুঁজতে এরা এসেছে । একটা প্যানিক তৈরি করে বাগানটাকে ডেজার্টেড করে রাখলে

ওদের কাজের সুবিধে হয় এবং তাই হচ্ছে । ” অর্জুন ব্যস্ত গলায় বলল ।

“তুমি ‘হয়তো’ শব্দটা ব্যবহার করলেন্না ? ”

“হয়তো ? হ্যাঁ, মানে অনুমান করছি— । ”

“অনুমান তো প্রমাণ নয় অর্জুন । এর আগেও একথা তোমায় বলেছি । ”

“কিন্তু লোকগুলো পাহারাদার নিয়ে জঙ্গলের ডেতর মাটি খুঁড়তে যাবে কেন ? ”

“সেটা ওরাই জানে । তুমি কি কোনও মন্দির অথবা বিল দেখেছ ? ”

“বিল এদিকে নেই । কালাপাহাড়ের সময়ে যদি থেকে থাকে তা হলে চা-বাগান তৈরির সময় তা বুজিয়ে ফেলা হতে পারে । ”

“মন্দির ? ”

“না, দেখিনি । অত রাতে অন্ধকারে ভাল করে কিছুই দেখা যায়নি । মন্দির থাকলেও আমার চোখ এড়িয়ে গেছে । কিন্তু মিসেস দত্তের স্টেটমেন্ট অনুযায়ী ওরা মন্দিরের কথা বলেছে যখন, তখন সেটা থাকবেই । ”

“ঠিক আছে । আজ তোমরা দিনের আলোয় যাচ্ছ থাকলে দেখতেই পাবে । ”

“আমলদা, আপনি প্রথম থেকেই এমন ডিসকারেজ করছেন কেন ? ”

“প্রথম থেকে আবার কী করলাম ! ” অমল সোম হাসলেন, “আমাদের দু’জনের উচিত পরম্পরকে সাহায্য করা । তুমি একটা সত্য কিছুতেই ভাবতে পারছ না যে, কালাপাহাড় কোথায় কোন বনের বিলের ধারে মন্দিরের গায়ে মাটির নীচে তার সম্পত্তি লুকিয়েছিল তা এই লোকগুলো জানবে কী করে ? খড়ের গাদায় সুঁচ খোঁজার চেয়েও ব্যাপারটা কঠিন । আমি যে কাগজপত্র দেখেছি তাতে কোনও নির্দিষ্ট এলাকার কথা বলেনি । হরিপদ সেন মনে করেছিলেন উত্তর বাংলাই সেই জায়গা । তা উত্তর বাংলায় তো জঙ্গলের অভাব নেই । ওর প্রতিপক্ষ কী করে এই বৈকুঞ্চপুরকে শনাক্ত করল ? যুক্তি দাও । ”

অর্জুন জবাব দিতে পারল না । হরিপদ সেনের প্রতিপক্ষ এমন সুনির্দিষ্ট খবর পেল কী করে ? সে মাথা নাড়ল, “আপনি হয়তো ঠিকই বলছেন কিন্তু ওরা ওইরকম লুকিয়ে-চুরিয়ে মাটি খুঁড়ে যাচ্ছে কেন ? ”

“এর উত্তরটা ওখানে না গেলে পাওয়া যাবে না । বেশ, তুমি যখন চাইছ তখন আমি তোমাদের সঙ্গী হচ্ছি । আমার কাছে মৃত কালাপাহাড়ের সম্পত্তি থেকে জীবিত কালাপাহাড়কে খুঁজে পাওয়া অনেক বেশি জরুরি । ” অমল সোম ঘরের দিকে পা বাড়ালেন ।

“জীবিত কালাপাহাড় ? ” পেছন-পেছন আসার সময় প্রশ্ন করল অর্জুন ।

“হরিপদবাবুকে হমকি দেওয়া চিঠির কথা ভুলে গেলে কী করে ! ”

ঘরে ঢুকে অমল সোম বললেন, “নাঃ, যাওয়া হল না, আপনাদের আপন্তি না থাকলে আমি সঙ্গী হচ্ছি । ”

এস. পি. গন্তীর 'মুখে বসে ছিলেন। বললেন, "আমি ডি. এফ. ও-র সঙ্গে আলোচনা করছিলাম। কিছু লোক জঙ্গলের মধ্যে জোর করে জায়গা দখল করে মাটি খোঁড়াখুঁড়ি করছে। অবশ্যই এটা অন্যায়। এই অপরাধে আমরা ওদের প্রেপ্তার করতেও পারি। কিন্তু হৈমন্তীপুর চা-বাগানের খনগুলোর সঙ্গে ওদের জড়াবার কোনও প্রমাণ আমার হাতে নেই। আর ওরা তো রয়েছে চা-বাগানের সীমার বাইরে।"

অমল সোম বললেন, "ঠিক কথা। তা হলে ওদের জঙ্গল দখল করার অভিযোগেই প্রেপ্তার করুন। পুরো দলটাকেই আমাদের চাই।"

"কিন্তু কী লাভ হবে। কোর্টে তুললেই বেল নিয়ে যাবে। এটা নন বেলেবেল অফেল নয়।"

"কোর্টে তোলার আগে আমরা ওদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাব, তাই যথেষ্ট।"

ঠিক হল সাঁড়াশি আক্রমণ হবে। হৈমন্তীপুর চা-বাগান, নদী পেরিয়ে একদল চুকবে। অন্যদল আসবে বিপরীত দিকের জঙ্গল পেরিয়ে। ডি. এফ. ও-কে অর্জুন জায়গাটার আন্দজ দিতে তিনি ম্যাপ এঁকে বুঝিয়ে দিলেন জঙ্গলের কোন অংশ দিয়ে চুকতে হবে। অর্জুনের অনুমান, ওদের দলে অস্তত জনা পনেরো মানুষ আছে। এরা প্রত্যেকেই সশস্ত্র, সতর্ক। যেভাবে ওরা মৃতদেহ সরিয়েছে তাতে দক্ষতা সম্পর্কে সন্দেহ নেই। এদের কঙ্গা করতে হলে অস্তত কুড়িজন সেপাই চাই। এস. পি. এই অঞ্চলের দুটো থানার অফিসারকে নির্দেশ দিলেন। বেশ সাজসাজ আবহাওয়া শুরু হয়ে গেল। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় এই অভিযানে যেতে চাইলেন। অমল সোম আপনি প্রকাশ করলেন। তিনি বললেন, "মিস্টার ব্যানার্জি, আপনি সুভাবিষ্ণী চা-বাগানের ম্যানেজার। অন্য একটি চা-বাগানের সমস্যায় আপনি জড়াচ্ছেন কেন?"

"সমস্যাটা আমার বাগানেও ছড়াতে পারে মিস্টার সোম। তা ছাড়া যে মানুষ হিমালয়ে ওঠে সেই মানুষ অন্যায়ের বিরুদ্ধে এমন অভিযানে না গিয়ে কি পারে?"

"বেশ। তা হলে এক কাজ করা যাক। এস. পি. সাহেব, আপনি প্রথমেই হৈমন্তীপুরে যাওয়া-আসার পথটাকে সিল করুন। ওখানকার সাঁকো ভাঙ। মোটর বাইক ছাড়া যাওয়া সম্ভব নয়। এত লোকের জন্য বাইক জোগাড় করা সম্ভবও না। আপনি জনা দশেক সেপাই নিয়ে বাগান পেরিয়ে নদীর দিকে এগিয়ে যান। মিস্টার ব্যানার্জি আপনাকে সাহায্য করতে পারবেন। আমি ডি. এফ. ও-র সঙ্গে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চুকচি বাকিদের নিয়ে।"

এই প্রথম মেজর কথা বললেন, "অর্জুন কোন দলে যাচ্ছে?"

"ও আমার সঙ্গে যাবে।" অমল সোম জানালেন।

"আর আমি?" চেয়ার ছেড়ে ওঠার চেষ্টা করছিলেন মেজর।

“আপনি হেডকোয়াটাৰ্সে থাকুন। মানে এখানে। একজনের তো পেছনে
ঝাকা দৰকার।”

॥ চোদ্দো ॥

ডি. এফ. ও. যে আন্দাজ দিয়েছিলেন তাতে বৈকুঠপুর চা-বাগানের গা-ঘেঁষা
জঙ্গলের উলটো দিকের কাছাকাছি সরকারি রাস্তা অন্তত মাইল তিনেক দূৰে।
জঙ্গলের মাঝখানে সিঁথিৰ মতো পিচেৰ পথ চলে গিয়েছে। দিনে চারবাৰ বাস
বায় এই পথে।

ডি. এফ. ও-ৱ জিপে ওৱা যে-জায়গায় নামল সেখানে শুধু বিঁবিৰ ডাক আৱ
গাছেৰ ঘন ছায়া। গাছগুলো যেন আকাশছোঁয়া গা জড়িয়ে অজস্র পৱনাছা
খুলে থেকে কেমন রহস্যময় কৰে তুলেছে। ডি. এফ. ও-ৱ সঙ্গে ওই অঞ্চলেৰ
ৱেঞ্চাৰ ছিলেন। দু'জন বিট অফিসাৰ আৱ জনা আটকে সেপাই। জানা
গিয়েছিল দুটো থানায় হাতেৰ কাছে এখন পনেৱোজনেৰ বেশি সেপাই পাওয়া
যায়নি। অৰ্থাৎ সশন্ত পনেৱোজনেৰ সঙ্গে লড়াই হবে এ-পক্ষেৱ
পনেৱোজনেৰ। অৰ্জুনেৰ হাতে কোনও অন্ত নেই। ডি. এফ. ও. অথবা
অমলদাৰ সঙ্গে কিছু ৱেথেছেন কি না তা অৰ্জুনেৰ জানা নেই।

গাড়ি থেকে নেমে ডি. এফ. ও. বললেন, “ওই যে দেখুন, জঙ্গলেৰ মধ্যে
দিয়ে আমাদেৰ জিপ অথবা কন্ট্রাক্টাৱদেৰ লৱি যাওয়াৰ কাঁচা পথ আছে। ইচ্ছে
কৰলে ওই পথ ধৰে আমৱা আৱও মাইল দুয়েক এগিয়ে যেতে পাৰি।”

অমল সোম মাথা নাড়লেন, “মাইলখানেক এগিয়ে গেলেই যথেষ্ট হবে।
কাৱণ গাড়িৰ শব্দ দূৰে না যাওয়াই ভাল।”

অতএব জিপগুলো জঙ্গলে চুকল। এই দিনদুপুৱেও কেমন গা-ছমছম-কৱা
ভাৱ জঙ্গলেৰ ভেতৱে। দু'পাশেৰ ডালে বসে বানৰ আৱ পাথিৱা সমানে
চিৎকাৰ কৰে যাচ্ছে। জিপ চলছিল ধীৰ গতিতে, কাৱণ এদিকেৰ রাস্তা খুবই
অসমান। মাঝে-মাঝেই বানৱগুলো সাহস দেখিয়ে রাস্তাৰ মাঝখানে বসে
পড়ছিল। ডি. এফ. ও. হেসে বললেন, “এদেৱ সাহস দেখিছি খুব বেড়ে
গিয়েছে।”

অমল সোম বললেন, “ৱোজ আপনাদেৰ জিপ দেখছে, সাহস তো
বাড়বেই।”

ডি. এফ. ও. বলল, “আমাদেৰ জিপ ৱোজ এদিকে আসে না।”

ঠিক মাইলখানেক যাওয়াৰ পৰ ডি. এফ. ও. জিপ থামাতে বললেন।
এদিকে জঙ্গল আৱও ঘন। একটা মাঝাৱি কাগজ সামনে ৱেথে তাতে কয়েকটা
ৱেখা এঁকে বললেন, “এই জায়গাটা আমৱা জানি। আৱ অৰ্জুনবাবুৰ কথা ঠিক
হলে এধাৱে আমাদেৰ পৌঁছতে হবে। মাইল দেড়েক পথ। অবশ্য পথ কৰে

নিতে হবে । ”

অমল সোম ঘাড় নাড়লেন, “ঠিক আছে । জিপগুলো এখানেই থাক । আমরা দুটো দলে এগোব । আমি আর অর্জুন পাঁচ মিনিট আগে রওনা হচ্ছি । আপনি বাকিদের নিয়ে আসুন । ওদের ক্যাম্পের কাছাকাছি পৌঁছে যদি আমাদের দেখা না পায় তাহলে একটু অপেক্ষা করবেন । আমি তিনবার শিদ্দ দেব । শিস শুনলে আপনারা চার্জ করবেন । ”

ডি. এফ. ও. মন দিয়ে শুনছিলেন । বললেন, “কিন্তু আমরা পৌঁছবার আগেই যদি এস. পি. উপাশ থেকে অ্যাটাক শুরু করেন ?” অমল সোম ঘড়ি দেখলেন, “না । ওঁকে আমি একটা সময় দিয়েছি । তার আগে উনি বাংলো ছেড়ে নদীর দিকে এগোবেন না । আমি চেষ্টা করব একই সময়ে দু’দিক থেকে আক্রমণ করতে । আপনি বাকিদের নির্দেশ দিন যাতে নিঃশব্দে এগোতে পারে । ”

ডি. এফ. ও-র সঙ্গে সশস্ত্র মানুষেরা রয়েছে কিন্তু অর্জুন জানে না অমল সোমের সঙ্গে কোনও অন্তর্ব আছে কি না । সে নিজে তো নিরস্ত্র । কিন্তু অমলদা ইঙ্গিত করামাত্র সে এগিয়ে চলল । লতানো ডালপাতা সরিয়ে অমল সোম ক্ষিপ্রগতিতে এগোছিলেন । অর্জুনের মনে হল বয়স অমলদাকে একটুও কাবু করতে পারেনি । শ’খানেক গজ যাওয়ার পর অমল সোম দাঁড়ালেন । কান পেতে কিছু শুনে নিশ্চিন্ত হয়ে বললেন, “নিশ্চয়ই পায়েচলা পথ আছে, একটু খোঁজো তো ! এভাবে জঙ্গল ফুঁড়ে এগিয়ে যাওয়া অসম্ভব । পেলে জোরে শিস দেবে । ”

কথাটা নিজেই বলবে বলে ভাবছিল অর্জুন । ওরা এখন বেশ ঘন জঙ্গলের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে । অমল সোম এবার ডান দিকে হাঁটতে শুরু করলেন, সে বাঁ দিকে । প্রতিটি পদক্ষেপে সতর্ক থাকতে হচ্ছে যাতে জোঁক না ধরে । একটু বাদে পেছন ফিরে তাকিয়ে অমল সোমকে দেখতে পেল না অর্জুন । এদিকটায় বোধহয় বানরেরা নেই, শুধু পাখির ডাকের সঙ্গে বিঁধি পাল্লা দিচ্ছে । মিনিট দশকে জঙ্গল ভেঙে কাহিল হয়ে পড়ল সে । পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে চারপাশে তাকাল । হঠাৎ মনে হল চারপাশের এই সহজ সবুজের মধ্যে দাঁড়িয়ে সিগারেট খাওয়া আর ঠাকুরঘরের পবিত্র আবহাওয়ায় ধূমপান করা একই ব্যাপার । শহরের দূর্ঘিত পরিবেশে যে চিন্টাটা মাথায় আসে না এখানে প্রায় আদিম পরিবেশে সেটা প্রকট হওয়ায় অর্জুন প্যাকেটটা পকেটেই রেখে দিল ।

কয়েক পা এগিয়ে যেতে সরসর আওয়াজ হল । একটা সাদা খরগোশ জুলজুল করে তাকে দেখছে । অর্জুন একটু ঝুঁকতেই সেটা বিদ্যুতের মতো পাশের গর্তে চুকে পড়ল । এগিয়ে চলল সে । এই জঙ্গলে একসময় বাঘেরা সংখ্যায় বেশি ছিল । এখনও কিছু আছে, তবে সচরাচর তাদের দেখা যায় না ।

কিন্তু বাইসন, বুনো শুয়োর, চিতা আর হাতির সংখ্যা প্রচুর। সে যে এভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সেটাতে ঝুঁকি থেকেই যাচ্ছে। কিন্তু জিপে আসার সময় ডি. এফ. ও. বলেছেন সাধারণত দিনের বেলায় এই অঞ্চলে হিংস্র জন্মদের দেখা বড় একটা পাওয়া যায় না।

হঠাতে চোখের সামনে আট ফুট চওড়া একটা পথ ভেসে উঠল। জঙ্গল কেটে এই পথ করা হয়েছে কিন্তু অ্যতিরে ছাপ রয়েছে সর্বত্র। পথটা চলে গিয়েছে জঙ্গলের আরও ভেতরে। অর্জুন পথটার ওপর এসে দাঁড়াল। এবং তখন তার নজরে এল গাড়ির চাকার দাগ। সে ঝুঁকে দেখল। এই পথে প্রায়ই গাড়ি চলে, একটা দাগ রীতিমতো টাটকা। এই পথ নিশ্চয়ই হাইওয়ে থেকে বেরিয়েছে। ওরা যে পথ দিয়ে জিপে করে জঙ্গলে চুকেছে তার সঙ্গে নিশ্চয়ই কোনও সংযোগ নেই। সামনে এগিয়ে যাওয়ার আগে এই পথ ধরে একবার পিছিয়ে গিয়ে দেখে আসতে ইচ্ছে করছিল কোথায় প্রবেশ পথ। সে জোরে শিস দিল দুঁরার।

মিনিট তিনেকের মধ্যে আরও কয়েকবার শিস দেওয়ার পর অমল সোমের দেখা পাওয়া গেল। রাস্তায় পা দিয়ে তিনি বললেন, “বাহ। সুন্দর। আমি ভেবেছিলাম লোকগুলো এত কষ্ট করে তো রোজ যাওয়া-আসা করতে পারে না। প্রয়োজনেই মানুষ পথ করে নেয়। ওরাও নিয়েছে। ভাল, খুব ভাল।”

“রাস্তাটা কোথেকে বেরিয়েছে দেখা কি দরকার?”

“পেছনে তাকিয়ে কোনও লাভ নেই। আমাদের সঙ্গীরা ততক্ষণে এগিয়ে যাবেন। কিন্তু কথা হল যারা সমস্ত চা-বাগানে জাল বিছিয়ে রেখেছে তারা এমন একটা রাস্তা কি বিনা পাহারার রাখবে?”

সন্দেহ হচ্ছিল অর্জুনেরও। কিন্তু পাহারাদাররা কাছেপিঠে থাকলে ঘন জঙ্গলের আড়াল তাদের নিশ্চিন্তে রেখেছে। হাঁটি শুরু করে অমল সোম বললেন, “আমাদের ডি. এফ. ও. সাহেব নিশ্চয়ই খুব রেগে যাবেন, বুঝেছ? তাঁর জঙ্গলে বাইরের লোক গাড়ি চড়ার রাস্তা বানায় অথচ তিনি কিছুই জানেন না।”

অর্জুন অমল সোমকে একবার দেখল। আজকাল অমলদা এমন করে সাধারণ কথা বলেন যে, মনেই হয় না উনি অতবড় সত্যসন্ধানী। অমলদার কী বয়স বাড়ছে? নইলে সব জেনেশনেও তিনি সুভাষিণী বাগান থেকে চলে যেতে চাইছিলেন কেন? কথাটা সে না বলে পারল না। অমল সোম হাসলেন, “এখন তো তেমন কিছু কাজ নেই। ঘিরে ধরে আটক করা। তাই চলে যেতে চেয়েছিলাম। পরে মনে হল লোকটার সঙ্গে একটু কথা বলার জন্য থাকা যেতে পারে। এত জায়গা থাকতে ঠিক এখানেই যে কালাপাহাড় তার সম্পদ লুকিয়েছে এই খবরটা পেল কী করে? নিশ্চয়ই ওর ইতিহাস ভাল জানা আছে। আমাদের চেয়ে অনেক বেশি খবর রাখে।”

হঠাতে একটা তীব্র বাঁশির শব্দ শোনা গেল। ফুটবল ম্যাচের শেষ বাঁশির চেয়েও দীর্ঘ। তারপরেই গুলির শব্দ। খুব কাছেই। সেইসঙ্গে মানুষের আর্তনাদ। অমলদা চাপা গলায় বললেন, “চটপট কোনও গাছে উঠে পড়।”

হাতের কাছে যে গাছ তার সারা গায়ে এত শ্যাওলা যে, হাত দিতেও যেন্না হয়। সে দ্রুত রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলের গভীরে চুকে পড়ল। ওপাশে গুলির শব্দ এবং সেইসঙ্গে মানুষের চিক্কার চলছে। দুপদাপ পায়ের আওয়াজ ভেসে আসছে। অর্জুন আর-একটু এগোতেই দৃশ্যটা দেখতে পেল জঙ্গলের আড়ালে দাঁড়িয়ে। ডি. এফ. ও. সাহেব সমেত পুরো বাহিনী, যারা তাদের সঙ্গে এ-পথে এসেছিল, তারা করুণ মুখে দাঁড়িয়ে। ওদের ঘিরে রেখেছে জনা আটকে অন্ধধারী। একজন বন্দিদের হাত বাঁধার কাজে ব্যস্ত। ওদের নেতা বলে যাকে মনে হচ্ছিল সে ডি. এফ. ও-কে একটার-পর-একটা প্রশ্ন করে যাচ্ছে। ডি. এফ. ও. মাঝে-মাঝে জবাব দিচ্ছেন।

একসময় বাঁধার কাজ শেষ হয়ে গেলে বন্দিদের লাইন করিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। অর্জুন দেখল আরও দু'জন লোক পাহারায় থেকে গেল। ডি. এফ. ও. কী করে ধূরা পড়লেন। ওঁর সঙ্গীরা অন্ত ব্যবহারের সুযোগই পেল না? অর্জুন ব্যাপারটা বুঝতে পারছিল না। কিন্তু আপাতত তাদের দলগত শক্তি কমে গেল। এবার এস. পি. ওপাশ থেকে আক্রমণ করলে ওরা স্বচ্ছে এদিক দিয়ে পালাতে পারবে। হঠাতে হাত কুড়ি দূরের জঙ্গলটাকে একটু নড়তে দেখল সে। পাহারাদারদের নজর সেদিকে নেই। অর্জুন অনুমান করল সোম ওই দিক দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন। এবং এভাবে এগোনোর মানে হল ওই লোক দুটোর মুখোমুখি হওয়া।

পাহারাদারদের একজন বিড়ি ধরিয়ে বলল, “জানি না। কিন্তু এটা আমার ভাল লাগছে না। ওরা যদি কাল এই সময়ে আসত তা হলে ভাল হত। আমাদের কাউকে পেত না।”

প্রথমজন বিড়ি ধরিয়ে বলল, “জানি না। কিন্তু এটা আমার ভাল লাগছে না। ওরা যদি কাল এই সময়ে আসত তা হলে ভাল হত। আমাদের কাউকে পেত না।”

“সব ক'টাকেই তো ধরা হয়েছে। কাল অবধি থাক বন্দি হয়ে।”

“সব ক'টাই যে ধরা পড়েছে তা কে বলতে পারে!”

“যাবে কেথায়? এগোতেই নজরে পড়ে যাবে।”

“পিছিয়ে আবার থানায় খবর দিতেও তো পারে।”

“তুমি ভাই বড় বেশি ভয় পাও। রোজগার করতে গেলে অত ভয় পেলে চলে না। আজকের রাতটা কাটলেই সব চুকে যাবে যেখানে সেখানে।” লোকটা কথা শেষ করল না। অর্জুন এগোছিল। এবং সে চকিতের জন্য

অমল সোমকে দেখতে পেল ।

প্রায় একই সময়ে দু'জন আক্রমণ চালাল । লোক দুটো কিছু বোঝার আগেই মাটিতে পড়ে গেল । দু'জনেই অসতর্ক ছিল । ওদের উপুড় করে শুইয়ে ঘাড়ের পাশে মদু আঘাত করতেই চেতনা হারাল । এর পর খুব দ্রুত ওদের পোশাক ছিঁড়ে মুখের ভেতর চুকিয়ে বাকিটা দিয়ে হাত এবং পা বেঁধে ফেলা হল । অমলদাকে অনুসরণ করে অর্জুন তার শিকারকে টানতে-টানতে নিয়ে গেল বোপের মধ্যে ।

কাজ শেষ করে অমলদা জিজ্ঞেস করলেন, “তোমার কি মনে হচ্ছে ওরা রাস্তা থেকে লোক ধরে এনে হাতে বন্দুক ধরিয়ে দিয়েছে ?”

“কী জানি । এরা তো কোনও প্রতিরোধ তৈরি করতে পারল না !”

“তা হলে ডি. এফ. ও-র বাহিনীকে ধরল কী করে ? খোঁজ নিয়ে দ্যাখো এরা নিশ্চয়ই এক্স-পুলিশম্যান । এই রাজ্যের না হলো পাশের রাজ্যের । চল ।”

বোঝা যাচ্ছে এতবড় জঙ্গলের সর্বত্র ছাড়িয়ে রাখার মত পাহারাদার এদের নেই । অমলদা ঘড়ি দেখছিলেন । এমনিতে বেশ দেরি হয়ে গিয়েছে । এস. পি-র আক্রমণের সময় থেকে তাঁরা বেশ পিছিয়ে পড়েছেন । তবু অর্জুনের একটু ভাল লাগছিল । এতক্ষণ ছিল খালি হাতে, এখন লোক দুটোর অন্ত পাওয়া গিয়েছে । সবসুন্দর চারটে গুলি বন্দুক পিছু বরাদ্দ হয়েছিল বোধহয় । এরা ডি. এফ. ও-র বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করেনি বলে বাঁচোয়া ।

যে পথে বন্দিদের নিয়ে যাওয়া হয়েছে সেই পথটাই ধরেছিলেন অমলদা । প্রায় কাছাকাছি আসার পর তিনি বললেন, “তুমি ডান দিকে এগোও । ওই গাছটায় উঠে বসো । আমরা এস. পি. সাহেবের জন্য অপেক্ষা করি । আমি বাঁ দিকে আছি ।”

সময় চলে যাচ্ছিল । অর্জুন ঘড়ি দেখল । এস. পি. সাহেবের যে সময়ে আসার কথা তার থেকে প্রায় কুড়ি মিনিট ঘড়ির কাঁটা বেশি ঘুরে গেছে । ব্যাপারটা কী ঘটেছে সে বুঝতে পারছিল না । গাছের যে ডালটায় সে বসে ছিল, তার অনেকটাই পাতায় ছাওয়া । বসতেও আরাম লাগছে । কিন্তু গত রাত্রের পরিরশ্মের পর এইরকম আরামদায়ক জায়গায় বসে থাকা অত্যন্ত বুঁকি নেওয়া হবে । ঘুম এগিয়ে আসছে শুড়ি মেরে । সেটা টের পেতেই অর্জুন নিজেকে সবল করার জন্য আর-এক ধাপ ওপরে উঠল । বেকায়দায় শরীর রাখলে সবসময় সতর্ক থাকতে হয় । এবার তার দৃষ্টি গাছের মাথা ছাড়তে পেরেছে অনেকটাই । প্রথমেই দূরে সরু ফিতের মত জল চোখে পড়ল । চা-বাগানের গা মেঁষে যে নদীটা চলে গিয়েছে, যেটা পার হয়ে এই জঙ্গলে সে এসেছিল সেটা অনেক নীচে বাঁক নিয়েছে । সে চোখ সরাল । অনেকটা ন্যাড়া জায়গা, কিছু মানুষ দাঁড়িয়ে আছে । পাশে দুটো গাড়ি, একটা জিপ অন্যটা অ্যাস্বাসাড়ার । অর্জুন খুব উত্তেজিত হয়ে পড়ল । এই ঘন জঙ্গলের মধ্যে জিপ

আর অ্যাস্বাসাড়ার মানে ওটাই শত্রু শিবির। জায়গাটা মোটেই দূরে নয়। মানুষগুলোকে এখান থেকে স্পষ্ট চেনা যাচ্ছে না। অমল সোম যেদিকে আছেন সেখান থেকে এই দৃশ্য দেখা সম্ভব নয়। অর্জুনের ইচ্ছে হল গাছ থেকে নেমে অমল সোমকে ডেকে এনে দৃশ্যটা দেখায়। সে আর-একটু নজর সরাতেই চোখ ছেট হয়ে এল। ওটা কী? মন্দির-মন্দির মনে হচ্ছে। গাছের আড়ালে কি মন্দিরের চূড়ো? আবছা হলেও খানিকক্ষণ লক্ষ করার পর আর সন্দেহ রইল না। শ্যাওলা পড়ে-পড়ে প্রায় কালচে হয়ে গিয়েছে মন্দিরের চূড়ো। না, আর সন্দেহের অবকাশ নেই। দুর্ভেদ্য জঙ্গল, বিশাল বিল, শিব মন্দির। তাজ্জব ব্যাপার হল আজ দেশের সবরকমের জঙ্গল বনবিভাগের নথদর্পণে। বনবিভাগ নিশ্চয়ই জানে কোথায় কী আছে। এই মন্দিরের অস্তিত্ব তাঁদের অবশ্যই জানা আছে। কিন্তু ডি. এফ. ও-র সঙ্গে আলোচনার সময় বোঝা গিয়েছিল ব্যাপারটা তিনি জানেন না। হ্যাত বেশিদিন এ-জেলায় আসেননি অথবা জঙ্গলের কোনও প্রান্তে একটা ইটের চূড়ো আছে কি নেই তা তাঁকে জানানোর প্রয়োজন অধস্তুত কর্মচারীরা মনে করেনি। সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ব্যাপার হল এই মন্দির খুঁজে বের করা। হরিপুর যে অনুমান করেছিলেন কালাপাহাড় তাঁর সম্পদ উত্তর বাংলায় লুকিয়ে রেখে গেছেন। কোচবিহারের রাজার সঙ্গে যুদ্ধের পর সেটা সভুর বলে মনেই হতে পারে। কিন্তু উত্তর বাংলা মানে কয়েকশো মাইল জুড়ে জঙ্গল আর মন্দিরের পর মন্দির। ধীরে-ধীরে অর্জুন নীচে নেমে এল। এবং তখনই পায়ের আওয়াজ কানে এল। কেউ পাতা মাড়িয়ে আসছে। যদিও এখন সে সশন্ত তবু মুখোয়াখি হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। যতটা সভুর নিজেকে গাছের আড়ালে রেখে সে শুনল শব্দটা খুব কাছ দিয়েই তাকে পেরিয়ে চলে যাচ্ছে। অর্থাৎ যে লোকটি চলেছে সে খুব নিশ্চিন্ত, কিছু খোঁজার তাগিদ তার নেই। মুহূর্তেই সিন্ধান্ত নিয়ে নিল অর্জুন। খানিকটা দূরত্ব রেখে সে অনুসরণ শুরু করল, শব্দটির সঙ্গে পা মিলিয়ে।

মিনিটখানেক হাঁটার পরেই লোকটাকে দেখা গেল। কাঁধে একটা লাঠি নিয়ে খোশ মেজাজে হেঁটে চলেছে। একে পেছন থেকে যতটুকু বোঝা যাচ্ছে মোটেই অন্য বন্দুকধারীদের মতো মনে হল না। বরং চেহারায় এ-দেশীয় মানুষের হাপ স্পষ্ট।

লোকটা হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। এপাশ-ওপাশে তাকাল। তারপর নিচু হয়ে এগিয়ে চলল। ওর এগোবার ভঙ্গিতে যথেষ্ট সতর্ক ভাব ফুটে উঠেছে এবার। আর তখনই গুলির শব্দ শুরু হয়ে গেল। শব্দ ভেসে আসছে নদীর দিক থেকে। পোর্টেবল লাউড স্পিকারে এস. পি-র গলা অস্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। প্রতিপক্ষকে আঞ্চাসর্মর্পণ করতে নির্দেশ দিচ্ছেন তিনি। এদিক থেকে গুলি ছোঁড়া এখনও শুরু হয়নি।

অর্জুন দেখল গুড়ি মেরে এগিয়ে যেতে-যেতে এইসব শব্দ কানে যাওয়া মাত্র হক্কটকিয়ে গিয়ে মাটিতে বসে পড়েছে। দু'পাশে আগাছার ঝোপ থাকায় তাকে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু সে যে আর নড়ছে না এটা ও ঠিক। অর্জুনের মনে হল লোকটা এই দলের কেউ নয়। অর্থাৎ বাইরের লোক জঙ্গলের এত গভীরে হচ্ছলে হেঁটে আসেই বা কী করে? নিশ্চয়ই এটা ওর প্রথম আসা নয়। অন্যদিন যখন এসেছে তখন বাধা পায়ানি কেন? গোলমাল লাগছে এখানেই।

হঠাৎ অর্জুন ভূত দেখল যেন। নাকি অর্জুনকে ভূত বলে মনে হল লোকটার। যে পথে এসেছিল সেই পথে ফিরে যাওয়ার জন্য এগিয়ে আসতেই সে দেখল একজন মানুষ বন্দুক হাতে দাঁড়িয়ে। এক মুহূর্ত দেরি না করে সে হঠাৎ মুড়ে বসে কাকুতি-মিনতি শুরু করে দিল। তার গলায় দিশি ভাবা। সে কিছু জানে না। তাকে ছেড়ে দিলে সে সোজা নিজের ঘরে ফিরে যাবে।

অর্জুন জিজেস করল, “তোমার নাম কী?”

“মাংরা।”

“এখানে কী করতে এসেছ?”

লোকটা চুপ করে রইল। এবার ওদিকে প্রত্যাঘাত শুরু হয়েছে। প্রলিগোলার শব্দ থুব কাছেই এগিয়ে এসেছে। এই শব্দে লোকটা কুঁকড়ে বাচ্ছিল। অর্জুন হাতের বন্দুক ছেড়ে হকুম করল, “তুমি যেখানে যাচ্ছিলে সেখানে চল।”

“নেহি নেহি। আমাকে ছেড়ে দাও।” লোকটা প্রচণ্ড ভয় পেয়ে গিয়েছে।

“তুমি যদি আমার কথা শোন তা হলে বেঁচে যাবে। নইলে—। চল।”

লোকটা সন্তুষ্ট তার মতো করে পরিষ্ঠিতিটা বুঝল। নিতান্ত অনিচ্ছায় সে হাঁটা শুরু করল গুড়ি মেরে। অর্জুন বুঝতে পারছিল না এটা পথ সহজভাবে এসে ও এখান থেকে গুড়ি মারা শুরু করেছিল কেন? ও কি বুঝতে পেরেছিল কেউ অনুসরণ করছে। সঙ্গে সঙ্গে চলার ধরন বদলেছিল? এটা ঠিক হলে...।

অর্জুন দেখল একটা বড় পাথর দু'হাতে সরাচ্ছে লোকটা। কিছুক্ষণ চেষ্টার পর সেটা সরতেই বেশ বড় সুড়ঙ্গ স্পষ্ট নজরে এল।

॥ পনেরো ॥

সুড়ঙ্গের সামনে দাঁড়িয়ে লোকটা এবার অর্জুনের দিকে তাকাল। অর্জুন ইশারা করতে সে মাথা নুইয়ে ভেতরে ঢুকল। একটু বাদে তাকে আর দেখা যাচ্ছিল না। যে-কোনও সুড়ঙ্গের মতো এর ভেতরটা বেশ অন্ধকার। কোনওরকম আলোর সাহায্য ছাড়া ওখানে পা বাড়াতে ঠিক সাহস হচ্ছিল না অর্জুনের। সুড়ঙ্গের মুখ যদি ওপাশে কোথাও থাকে তা হলে এই লোকটি, যার

নাম মাংরা, স্বচ্ছন্দে এই সুযোগে পালিয়ে যেতে পারবে। অবশ্য ওকে ধরে রেখেই বা তার কী লাভ !

অর্জুন ইতস্তত করছিল। গুলিগোলা চলছে ওপাশে। অবিরাম শব্দ বাজছে। যুদ্ধক্ষেত্র হয়ে গিয়েছে নির্জন জঙ্গল। অর্জুন সুড়ঙ্গের দিকে তাকাল। এটা কে বানিয়েছে ? এরাই ? যেটুকু বোঝা যাচ্ছে তাতে নতুনের চেহারা নেই। হঠাতে কাছাকাছি মানুষের উত্তেজিত গলা শোনা গেল। লোকগুলো এদিকেই আসছে। কোনও পথ না পেয়ে অর্জুন দ্রুত সুড়ঙ্গে নামল। নেমেই মনে হল লোকগুলো এখানে এলেই সুড়ঙ্গটাকে দেখতে পাবে। ইন্দুরের মতো অবস্থা না হয় তখন ! পেছন থেকে মাংরার গলা পেল অর্জুন, “পাথরটা টেনে আনুন মুখে, জলাদি !”

অতএব বন্দুক রাখতে হল। সুড়ঙ্গের মুখে রাখা পাথরটাকে কোনও মতে টেনে এনে আড়াল তৈরি করতেই ভেতরটা ঘুটঘুটে অঙ্ককার হয়ে গেল। এক বিষত দূরের কোনও জিনিস দেখা যাচ্ছে না। অর্জুন হাতড়ে-হাতড়ে বন্দুকটাকে শেষ পর্যন্ত খুঁজে পেল। পেতে মনে সামান্য ভরসা এল। সে চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল, “তুমি কোথায় ?”

“এখানে বাবু।” তৎক্ষণাত সাড়া পাওয়া গেল।

“আমার দিকে এগোবার চেষ্টা একদম করবে না।”

“আপনার দিকে যাব কেন ? আপনি বরং আমার পেছনে আসুন।”

অর্জুন ঢেক গিল, “দাঁড়াও। তোমার পেছনে যাব যে, আমি তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। একটা টর্চ যদি সঙ্গে থাকত !”

“টর্চ কেনার পয়সা কোথায় পাব বাবু। আমার এখানে হাঁটা অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। একটু অপেক্ষা করুন, আপনার চোখ ঠিক সয়ে নেবে।” লোকটা হাসল।

কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছে না অথচ কথা হচ্ছে। মাটির ওপরে কী ঘটছে তা এখানে দাঁড়িয়ে বোঝার উপায় নেই। অবশ্য দাঁড়ান শব্দটা বেশ বাড়াবাড়ি হয়ে গেল। কোমর অনেকখানি ভেঙে মাথা নুইয়ে দাঁড়াতে হচ্ছে এখন। অর্জুন দেখল এখন অঙ্ককার যেন আগের চেয়ে অনেক পাতলা কিন্তু দেখে পথ চলার মতো নয়। একটা মানুষের আদল কি তার সামনে ফুটে উঠছে ? সে ঠিক নিশ্চিত হতে পারল না। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “তুমি এই সুড়ঙ্গটা তাল চিনতে কী করে ?”

লোকটা হাসল, “এখনকার কথা নাকি ? সেই ছেলেবেলা থেকে চিনি। জঙ্গলে খেলা করতে এসে একদিন খুঁজে পেয়েছিলাম।”

“সুড়ঙ্গটা কোন্দিকে গিয়েছে ?”

“মন্দিরে।”

“মন্দির মানে শিবের মন্দির ?” অর্জুনের গলার স্বর প্রতিধ্বনিত হল।

“কী জানি । দেবতা-টেবতা কিন্তু নেই ওখানে ।” লোকটা যেন পিক করে ঝুতু ফেলল ।

“এখানে যে সুড়ঙ্গ আছে তা তোমাদের গ্রামের সবাই জানে ?”

“না । আমরা দুই বন্ধু জানতাম ।”

“সে কোথায় ?”

“মরে গিয়েছে । সাপের কামড়ে । এখানে আসার সময়ে ।”

“করে ?” অর্জুনের শরীর শিরশির করল । এখানে এখনও সাপ থাকা আশচর্যের নয় ।

“সে অনেকদিন আগের কথা । আমি আর কাউকে বলিনি ।”

“কেন ?”

“বললেই তো সবাই জেনে যাবে । এটা আর আমার থাকবে না ।”

“তোমার থাকবে না মানে ?”

“এই গুহাটা এখন আমার একার ।” এবার লোকটার গলা বেশ গভীর শোনালো ।

“তুমি এখানে কী কর ?”

“মালপত্তর রাখি ।”

“কীসের মালপত্তর ?”

“সেটা বলা যাবে না ।” লোকটার হাসি শোনা গেল । “তবে এখন তো বন্দুক দেখিয়ে আপনি জেনে গেলেন ।”

“তুমি কি চুরিচামারি করো ?”

লোকটা কোনও জবাব দিল না । প্রশ্নটা করেই অর্জুনের মনে হল, না করাই ভাল ছিল । লোকটা তাকে পছন্দ করছে না । এর ওপর সে বেকায়দায় ফেলতে চাইছে বুঝে যদি হঠাতে আক্রমণ করে বসে তা হলে এই অঙ্ককারে সে কিছুই করতে পারবে না ।

কিছুক্ষণ চুপচাপ । অর্জুন একটু হাসার চেষ্টা করল, “তুমি এখানে রোজ আস ?”

“না । দরকার পড়লে আসি ।”

“এখানে কিছু বাইরের মানুষ আস্তানা গেড়েছে । তারা তোমাকে বাধা দেয়নি ?”

“দিয়েছিল । আমাকে বলেছে এদিকে না আসতে ।”

“তারপরে ?”

“আমার দরকার পড়ে তাই আসি । ওরা বললেই শুনব কেন ?”

“আজকেও তো বাধা দিতে পারত ।”

“দিলে চলে যেতাম । কালও ফিরে গিয়েছি ।”

“এরা এখানে কতদিন আছে ?”

“এক মাস হয়ে গেল !”

“তোমাদের গ্রামের সবাই জানে ?”

“জানবে না কেন ? মোড়লকে টাকা দেয় কাজ করার জন্য ।”

“ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোকজন জানে ?”

লোকটা হাসল, “আপনার পিঠে একটা পিংপড়ে হাঁটলে আপনি জানবেন না ।”

অর্জুন বুঝল লোকটা একেবারে বোকা নয় । আর এখানকার চারপাশের মানুষদের হাতে রেখে দলটা কাজ চালাচ্ছে এটা বোঝা গেল । এবার লোকটা বলল, “চলুন, আমি আগুন জ্বালিয়ে নিচ্ছি । এখানে কয়েকটা শুকনো ডাল আমি রেখে গিয়েছিলাম— ।” ফস করে দেশলাই জ্বালল লোকটা । একটু খুঁজতেই বেঁটে-বেঁটে কয়েকটা ডাল পেয়ে গেল । দ্বিতীয় এবং তৃতীয় কাঠি খরচ করে সেগুলো ধরাল, তারপর এগোতে লাগল ।

বাতাসের অস্তিত্ব বোঝা যাচ্ছে না । নাকে ডালপোড়া গন্ধ ভেসে আসছে । অর্জুন ছায়ামাখা কাঁপা আলোয় লোকটিকে অনুসরণ করছিল । এবড়োখেবড়ো পথ । কুঁজো হয়ে চলার জন্য কোমরে ব্যথা শুরু হয়ে গেল । মিনিট তিনেক হাঁটার পর লোকটা দাঁড়াল । অর্জুন দেখল সামনে দুটো পথ । সুড়ঙ্গ দুদিকে চলে গিয়েছে । লোকটা বলল, “ওইদিকে গেলে মন্দিরের গায়ে পৌঁছে যাওয়া যায় । এদিকটায় আমি মাল রাখি । আপনি কি এবার আমাকে যেতে দেবেন ?”

“কোথায় যাবে তুমি ?”

“আমার জিনিস নিয়ে বেরিয়ে যাব ।”

“বেরিয়ে যাবে কোথায় ? বাইরে গোলাগুলি চলছে ।”

“আমার কিছু হবে না ।” লোকটা হাসল, “আচ্ছা, আপনি কোন দলে ?”

“যারা অন্যায় করে তাদের বিরুদ্ধে ।”

“তার মানে, পুলিশ ?”

“আমি পুলিশ নই ।”

“সেটা অবশ্য আপনাকে দেখেও বোঝা যায় । তা হলে বলি ।”

“তোমার ওই পথটা আমি দেখব ।”

“পথ তো বেশি নেই । একটুখানি ।” লোকটা ভাবল খানিক, “শুনুন আপনি যদি আমাকে বাধা দেন তা হলে আমি ছেড়ে দেব না ।”

“আমি কিছুই করছি না ।”

লোকটা এবার বাঁ দিকে এগোল । তিন-পা যেতেই সুড়ঙ্গ শেষ । সামনে পাথরের পাঁচিল । লোকটা আর একটা ডাল ধরাল । তারপর এক কোণে রাখা একটা বস্তা তুলে নিল । অর্জুন সেটার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, “কী আছে ওর ভেতর ?”

“জিনিস।”

“কী জিনিস?”

লোকটা অস্বস্তিতে পড়ল। তার এক হাতে মশালের মতো ধরা আগুন, অন্য হাতে বস্তাটা। হঠাৎ বেশ কাতর গলায় বলল, “মাসখানেক আগে এক জোতদারের ঘর থেকে কিছু বাসন চুরি করে এখানে লুকিয়ে রেখেছিলাম। হাওয়া ঠাণ্ডা হতে নিয়ে যাচ্ছি।”

“তোমাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া উচিত।”

“তারপর?”

অর্জুন হকচকিয়ে গেল। আগুনের ছোঁয়ায় লোকটির মুখ কেমন বহস্যময়। অর্জুন বলল, “অন্যায় করেছে, তোমার জেল হবে। সেটাই শাস্তি।”

“তারপর?”

“মানে?”

“জেল থেকে একদিন ছাড়া পাব। পেয়ে কী করব?”

“কাজকর্ম করবে।”

“সেটা পেলে তো এখনই করতাম।” বলে লোকটা সোজা এগিয়ে এল অর্জুনের দিকে। আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য মুহূর্তেই তৈরি হয়ে গেল অর্জুন, কিন্তু তার গা ঘেঁষে লোকটা নির্বিকার মুখে বেরিয়ে গেল। আলো এবং বস্তা হাতে কুঁজো হয়ে হেঁটে গেল যে দিক দিয়ে তারা এতক্ষণ এসেছিল সেই পথে। লোকটা অন্যায় করছে। কিন্তু অর্জুন ভেবে পেল না সে কী করতে পারে। ওই অন্যায়ের জন্য গুলি করা যায় না। পেছনে ধাওয়া করে ওকে আটকে যে পুলিশের হাতে তুলে দেবে সেই পরিস্থিতি এখন নেই। কিন্তু একটা লোক যে এমন নির্বিকার মুখে অন্যায় করে যেতে পারে একটুও পাপবোধে পীড়িত না হয়ে, তা একে না দেখলে সে ভাবতে পারত না। হঠাৎ চারপাশ অন্ধকার হয়ে গেল। অর্জুন ফাঁপরে পড়ল। লোকটার চলে যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে আলো চলে গেছে। তার মেরুদণ্ড পর্যন্ত শিরশির করে উঠল। লোকটা তাকে ফাঁদে ফেলে গেল না তো? অন্ধকার সুড়ঙ্গে রেখে দিয়ে ও সুড়ঙ্গের মুখ বন্ধ করে চলে যেতে পারে। নাকে এখন ডালপোড়া গন্ধ লাগল। তার মানে অস্ত্রিজেন দ্রুত কর্মে আসছে। নতুন বাতাস ঢোকার যদি কোনও পথ না থাকে তা হলে এখানে দমবন্ধ হয়ে মরতে হবে। অর্জুন দ্রুত লোকটাকে অনুসরণ করতে চাইল। কিন্তু কয়েক পা যেতেই অন্ধকারে হোঁচ্ট খেয়ে ছিটকে পড়ল একপাশে। হাতের বন্দুকটা সশ্বাসে আছাড় খেল পাথরে। উঠে বসল সে। হাঁটুতে বেশ চোট লেগেছে পড়ার সময়। তার মাথায় এখন একমাত্র চিন্তা, এই সুড়ঙ্গ থেকে বের হতে হবে। সাপ দূরের কথা, একটা বিছে যদি এই অন্ধকারে তাকে কামড়ায় তা হলেও সে কিছুই দেখতে পাবে না। মিনিটখানেক

হাতড়ে-হাতড়ে সে বন্দুকটাকে খুঁজে পেলে । পড়ে যাওয়ার পর এটি কী অবস্থায় আছে তা বোঝা যাচ্ছে না । অর্জুন স্থির করল সে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করবে না । অতটা পথ অন্ধকারে হাতড়ে-হাতড়ে যাওয়ার কোনও মানে হয় না । লোকটা বলেছিল তারা সুড়ঙ্গের এই মুখের কাছেই চলে এসেছে আর একটু হাঁটলে মন্দিরের গায়ে পৌঁছে যাওয়া যাবে । অস্তত লোকটা সেইরকমই বলেছিল ।

বন্দুকটাকে লাঠির মতো ব্যবহার করল অর্জুন । এতে পথ চলতে বেশ সুবিধে হচ্ছে । তার বুকে একটা ভয় চাপা ছিলই । যদি সুড়ঙ্গের দুটো মুখই বন্ধ করে দেওয়া হয় তা হলে এখানে সারাজীবন যক্ষের মতো বন্দি হয়ে থাকতে হবে । এই ভয়টাই যেন উর্ধবশাসনে নিয়ে চলেছিল অর্জুনকে । ইতিমধ্যে দু-দু'বার আছাড় খেতে হয়েছে তাকে । মুখে মাকড়সার জাল জাতীয় কিছু জড়িয়েছে । অঙ্গুত এক ধরনের পচা গঙ্গা নাকে আসছে । যে লোকগুলো কালাপাহাড়ের সম্পদ অব্রেষণে এখানে এমন পাকা ব্যবস্থা করে জাঁকিয়ে বসেছে তারা যে এই সুড়ঙ্গের সন্ধান এখনও পর্যন্ত পায়নি সেটা বেশ বোঝা যাচ্ছে । পেলে এইরকম আদিম গৰু এখানে থাকত না । কিন্তু পেল না কেন এইটে ভাবতে অবাক লাগছে । আছাড় খেয়ে হাঁটুতে বেশ ব্যথা হয়ে গেছে এরই মধ্যে । অর্জুন খুব ধীর সতর্ক হয়ে হাঁটছিল । এবং হঠাৎ তার চোখে একফলি আলো স্লিপ্পতা ছড়াল । খানিকটা দূরে একটা ফাঁক গলে সুড়ঙ্গের মধ্যে সেই আলো এসে পড়েছে । পায়ের তলায় টুকরো পাথর । সহজভাবে হাঁটা যাচ্ছে না । মাথার ছাদ ক্রমশ আরও মীচে নেমে এসেছে । তারই মধ্যে দ্রুত জায়গাটা অতিক্রম করতে গিয়ে অর্জুন আচমকা পাথর হয়ে গেল । একেবারে কাছ থেকেই ফেঁস-ফেঁস আওয়াজ আসছে । প্রচণ্ড রেঁগে যাওয়া সেই প্রণী সাপ ছাড়া কিছু নয় এটুকু বুঝতে সময় লাগল না । এই অবস্থায় সামান্য নড়াচড়া মানে সাপটির ছোবল শরীরে নেওয়া । আবার দাঁড়িয়ে থাকলেই যে সাপটি নির্লিপ্ত হয়ে ছেড়ে দেবে এমন ভরসা কোথায় ? অর্জুন মুখ ঘুরিয়ে দেখার চেষ্টা করল । আলোর ফালি আর দূরে নয় । তাই এখানে অন্ধকার তেমন জমাট বেঁধে নেই । চোখ শব্দ অনুসরণ করতেই বিশাল ফণটাকে দেখতে অসুবিধে হল না । সাপটা মাটি ছেড়ে প্রায় সুড়ঙ্গের ছাদ পর্যন্ত ফণ তুলে দুলছে । ছোবল মারার ঠিক আগের ভঙ্গি এটা । মাথার ভেতর বিদ্যুৎ চলে যাওয়ার মতো দ্রুত কেউ বলল আক্রমণ কর এবং একইসঙ্গে বন্দুক ধরে রাখা হাতটা সচল হল । ট্রিগার নয়, লাঠির মতোই ব্যবহার করল অর্জুন এবং সেই একইসঙ্গে সাপটা ছোবল বসাল । বন্দুকের যেখানে তার মুখ ঘষটে গেল তার আধ ইঞ্চি দূরেই অর্জুনের আঙুল ছিল । যত দ্রুতই হোক অর্জুনের আগেই সাপটা দ্রুততম হতে পেরেছিল ।

সাপটাকে ছিটকে সুড়ঙ্গের অন্ধকারে নিয়ে গিয়েছিল বন্দুকের আঘাত ।

সমস্ত শরীরে বরফের কাঁপুনি নিয়ে অর্জুন কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করল। ওই আঘাত সামলে ফিরে আসা সন্তুষ্ট ছিল না বলেই বোধহয় ফেঁস-ফেঁস আওয়াজ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। অর্জুন দ্রুত এগিয়ে গিয়ে সুড়ঙ্গের মুখের কাছে উবু হয়ে বসল। তার চোখ সুড়ঙ্গের ভেতর দিকে, এবার বন্দুকের ট্রিগারে আঙুল। সাপটা যদি এগিয়ে আসতে চায় তা হলে সে সরাসরি গুলি করবে। এখন অনেকখানি জায়গা স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে।

প্রায় মিনিট তিনেকের অপেক্ষা বিফলে গেল। সাপটার ফিরে আসার কোনও লক্ষণই দেখা গেল না। অর্জুন এবার সুড়ঙ্গের মুখের দিকে তাকাল। ওপাশে কী আছে বোৰা যাচ্ছে না। সে আলো আসার পথটা ধরে চাপ দিল। একটুও নড়ল না জায়গাটা। লোকটা বলেছিল মন্দিরের পাশে গিয়ে উঠেছে এই সুড়ঙ্গ। ওপাশে যুদ্ধের ফল কী হয়েছে তা বোৰা যাচ্ছে না। যদি লোকগুলো জিতে থাকে প্রথম রাউন্ডে, তা হলে শিবমন্দির তো তাদের দখলেই থাকবে। কিন্তু এখানে অনন্তকাল এভাবে বসে থাকা যায় না। বন্দুকের বাঁটি দিয়ে আলো আসার পথটাকে আঘাত করতে লাগল অর্জুন। একটু-একটু করে ফাঁকটা বড় হচ্ছে। অর্জুনের শরীর ঘামে ভিজে যাচ্ছিল। ওপাশে একটা বড় পাথর রয়েছে। সেটাকে কিছুতেই সরান সন্তুষ্ট হচ্ছে না। দ্বিতীয় দফায় চেষ্টা করার পর যেটুকু ফাঁক হল তাতে কোনওমতে বেরিয়ে যাওয়া যায়। ওপাশে কী আছে তা নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে অর্জুন এগিয়ে যেতেই কানে মানুষের গলা ভেসে এল। আওয়াজটা আসছে সুড়ঙ্গের ভেতর থেকে। সে চটপট শরীরটাকে তুলে বাইরে নিয়ে আসতেই পাথরটা নড়ে আবার সুড়ঙ্গের মুখে সরে এসে আটকে গেল। ওঠার সময় ওটি ফিরে এলে আর দেখতে হত না। এবং তখনই অর্জুনের খেয়াল হল তার বন্দুক সুড়ঙ্গের মধ্যেই পড়ে আছে।

॥ ঘোলো ॥

বন্দুকের জন্য আবার সুড়ঙ্গে নামাটা বোকায় হবে। অর্জুন চারপাশে তাকাতেই মন্দিরটাকে দেখতে পেল। ডালপালার অজস্র পাতায় চাপা পড়ে গেছে। সেই প্রাচীন মন্দিরের মতোই সরু ইটের গাঁথুনি। তার অনেক জায়গায় ভাঙনের চিহ্ন স্পষ্ট। অর্জুন ধীরে-ধীরে এগোল। কালাপাহাড় যদি এখানে এসে থাকে তা হলে ধরে নেওয়া যেতে পারে এই মন্দির তার হিংসার শিকার হয়নি। কিন্তু কেন? -

মন্দিরটি আকৃতিতে খুব বড় নয়। তবে কয়েকশো বছর আগে মূল মন্দির চতুর কতখানি ছিল সেটা এখন আন্দাজ করা মুশকিল। এখানে ধারে কাছে কোনও বিল তো দূরের কথা জলের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। উত্তরবাংলার এই প্রান্তে বিল দেখা যায় না বললেই চলে। ভৌগোলিক কারণেই সেটা সন্তুষ্ট হয়ে ৯৯

ওঠেনি। সেই সময় ছিল কিনা তাও বোৰা মুশকিল। কিন্তু জঙ্গলের মধ্যে এমন একটা মন্দির আছে এই খবর যখন স্বয়ং ডি. এফ. ও. জানেন না তখন—সব জেনেশনে হরিপদ সেনের প্রতিপক্ষের এখানে আসার পেছনে নিশ্চয়ই যথেষ্ট যুক্তি আছে। মন্দিরের মুখটায় এসে দাঁড়াতেই গুলির শব্দ কানে এল। সুড়ঙ্গে ঢোকার সময় যেরকম ঘন-ঘন গুলি ছোঁড়া হচ্ছিল এখন আর সেটা হচ্ছে না। এই প্রায়-বন্ধ-হওয়া আওয়াজ বলে দিচ্ছে ওদিকে যুদ্ধ শেষ হয়ে এসেছে। আপাতত কোন পক্ষ জিতল সেইটেই বোৰা যাচ্ছে না। অর্জুন দেখল মন্দিরে কোনও দরজা নেই। ভেতরটা প্রায় অঙ্ককার, কারণ কোনও জানলাও নেই। যেখানে সে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে সন্তুষ্ট একসময় বারান্দা ছিল। এখন সেটা মাটির সমান রেখায় নেমে এসেছে। অর্থাৎ পুরো মন্দিরটাই বসে গিয়েছে।

ভেতরে ঢোকার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল ওৱা। কিন্তু একেবারে খালি হাতে প্রায় অঙ্ককার প্রাচীন ঘরে চুক্তে সাহসও হচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত একস্টা গাছের মোটা ডাল ভেঙে লাঠি তৈরি করে নিল সে। ওটাকে মেঝেতে চুকে আওয়াজ করতে-করতে মন্দিরের মুখটায় দাঁড়াতেই অনেকখানি চোখে পড়ল। সন্তুষ্ট ভেতরে চুকেই সে চারপাশে তাকিয়ে নিল। না, কোনও মানুষ অথবা জন্ম এখানে নেই। বরং মেঝেটা বেশ পরিষ্কার করা। এরকম বন্ধ জায়গায় একটা স্বচ্ছসেইতে গন্ধ থাকা স্বাভাবিক ছিল যেটা একেবারেই নেই। হঠাৎ তার চোখে পড়ল মেঝেতে কিছু চিকচিক করছে। কয়েক পা হেঁটে সেটি কুড়িয়ে নিতেই স্পষ্ট হল এখানে নিয়মিত লোকজন আসে। নইলে বিদেশি সিগারেটের প্যাকেট এখানে পড়ে থাকত না। হরিপদ সেনের প্রতিপক্ষ কি এই মন্দিরটাকে থাকার জায়গা হিসাবে ব্যবহার করত? তা হলে তো অন্যান্য অনেক কিছুই চোখে পড়ত। অর্জুন ভাল করে ঘুরে-ঘুরে ঘরটাকে দেখল। হাঁটার সময় লাঠিটাকে নিজের অজান্তে মেঝেতে ঠুকছিল। হঠাৎ কানে আওয়াজ যেতেই সে চমকে মুখ নামাল। শব্দটা অন্যরকম লাগছে। খুব জোরে ঠুকতেই মেঝেটা নড়ে গেল। অর্জুন উবু হয়ে বসে আবিষ্কার করল হাত দুরেক চওড়া একটা কাঠের প্ল্যাটফর্ম মেঝেতে সেঁটে রাখা হয়েছে। তার ডান কোণে চাপ না পড়লে ওটা কিছুতেই নড়বে না। সে ধীরে-ধীরে চাপ দিতে লাগল। চাপ যত বাড়ছে তত বিপরীত দিকের প্ল্যাটফর্ম ওপরে উঠে আসছে। ওটা সোজা হয়ে দাঁড়াতে গর্তা চোখে পড়ল ভালভাবে।

একটা কাঠের সিঁড়ি নেমে গিয়েছে নীচে। সিঁড়ির চেহারাটা সম্পূর্ণ নতুন। ঠিক এই সময় মন্দিরের গায়েই গুলির আওয়াজ হল। চমকে উঠল অর্জুন। প্ল্যাটফর্মটা কোনওমতে বন্ধ করেই সে এক লাফে মন্দিরের অঙ্ককার কোণে গিয়ে দাঢ়াল লাঠিটাকে শক্ত মুঠোয় ধরে।

লোকটা ছিটকে মন্দিরে ঢুকল। তাড়া খাওয়া বাঘের মতো দেখাচ্ছিল

তাকে । ডান হাতের রিভলবার দরজার দিকে তাক করে সে ধীরে-ধীরে ঘরের ভেতর এগোচ্ছিল । অর্জুন দেখল এবং সমস্ত মনোযোগে বাইরের শক্র আছে । দরজাটাকে খেয়াল রেখে লোকটা প্ল্যাটফর্মের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে । মন্দিরের বাইরে কারও ছায়া দেখেই লোকটা একটা গুলি ছুড়ল । ইতিমধ্যে সে প্ল্যাটফর্মের বাঁ দিকে পৌঁছে গিয়েছে । জুতো দিয়ে আঘাত করল সে ঠিক সেই জায়গায়, যেখানে চাপ পড়লে প্ল্যাটফর্ম সোজা হয় । আর সময় নষ্ট না করে লোকটা সিঁড়িতে পা দিল । নামবার সময় একটু বেকারদায় নামতে হচ্ছে কিন্তু দরজা থেকে চোখ আর রিভলবার সরাচ্ছে না । অর্জুন লোকটার শরীরকে নীচে নেমে যেতে দেখছিল । হঠাৎ তার ইন্দ্রিয় সজাগ হতেই সে বিদ্যুতের মতো দেওয়াল ছেড়ে এগিয়ে এসে লোকটার কাঁধে প্রচণ্ড আঘাত করল । লোকটির কাঁধ তখন মেঝে থেকে সামান্যই উঁচুতে ছিল । আঘাত লাগা মাত্র তার হাত থেকে রিভলবার ছিটকে মেঝেতে পড়ে গেল । সেই সময়ের মধ্যেই দ্বিতীয়বার আঘাত করল অর্জুন । উভেজনায় এবারের আঘাত কাঁধের নীচে পড়তেই লোকটা আচমকা এগিয়ে গেল । তার হাত প্ল্যাটফর্মের ওপর পড়তেই সেটা চট করে নীচে নেমে এসে মাথায় আঘাত করল । লোকটার শরীর এখন সিঁড়ি এবং প্ল্যাটফর্মটাকে এক হাতে সোজা করতেই বোঝা গেল লোকটা এখন অঙ্গন হয়ে আছে । ওকে টেনে ওপরে তোলা তার পক্ষে সন্তুষ্ট নয় ।

ঠিক এই সময় বাইরে থেকে এক বাঁক গুলি ছুটে এসে এপাশের দেওয়ালে লাগল । অর্জুন তড়াক করে লাফিয়ে আবার উল্টো দিকের দেওয়ালে চলে গেল । এই গুলি কারা ছুঁড়ছে ? লোকটা যখন প্রতিপক্ষ এবং তার উদ্দেশ্যেই গুলি ছোড়া হচ্ছে তখন চিংকার করে জানান দেওয়া দরকার । ভুল করে ওরা তাকেই গুলি করতে পারে । সাধারণ সেপাইরা তো এই অবস্থায় তাকে চিনতে পারবে না । হঠাৎ ঠিক করে আওয়াজ হতেই অর্জুন দেখল প্ল্যাটফর্মটা নীচে নেমে আগের মতো বসে গেছে । না জানা থাকলে ওটাকে আর আলাদা করে চেনা মুশকিল । তার মনে লোকটা এরই মধ্যে জ্ঞান ফিরে পেয়ে পালিয়েছে ।

অর্জুন চিংকার করল, “গুলি ছুঁড়ো না । আমি অর্জুন ।”

বাইরে থেকে কোনও সাড়া এল না । চারধারে এখন নিস্তর্ক ।

কিন্তু বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না, যারা বাইরে বন্দুক উঁচিয়ে রয়েছে তারা দেখামাত্রই গুলি করবে । এস. ডি. পি. এফ. ও., ভানুদা অথবা অমল সোম না আসা পর্যন্ত সে চট করে ওদের বোঝাতে পারবে না । অর্জুন প্ল্যাটফর্মটার দিকে তাকাল । সুড়ঙ্গ কোথায় আর এই প্ল্যাটফর্ম কোথায় ! নাকি দুটোর মধ্যে সংযোগ রয়েছে ? সে বুঝতে পারছিল না কী করবে । লোকটা যদি সিঁড়ি দিয়ে নেমে সেই সুড়ঙ্গটাকে পেয়ে যায় তা হলে ধরা মুশকিল হবে । তার মনে পড়ল সুড়ঙ্গ থেকে উঠে আসার সময় ভেতরে কিছু মানুষের গলার স্বর শুনতে

পেয়েছিল।

“ভেতরে যিনি আছেন বেরিয়ে আসুন, ইউ আর আন্ডার আরেস্ট।” চিৎকার ভেসে আসতেই অর্জুন স্বত্তি পেল। সে সমানে গলা তুলে বলল, “আমি অর্জুন। গুলি ছুঁড়তে নিষেধ করুন।”

কথাগুলো শেষ হওয়ামাত্র পায়ের শব্দ হল। অর্জুন এস. পি. সাহেবের মুখ দেখতে পেল, পেছনে বন্দুক হাতে সেপাইরা। এস. পি. বললেন, “মাই গড়। এখানে কী করছেন?”

“আর কী করব? আপনার সেপাইরা যেভাবে গুলি ছুঁড়ছেন যে পেছোতে পারছি না।”

“তা আপনি যদি ওদের আক্রমণ করে এখানে পালিয়ে আসেন তা হলে ওরা ছেড়ে দেবে কেন? ইট্স নট ডান। ওদের দেখে ভুল হওয়ার কথা নয়।”

“আমি ওদের দেখে গুলি ছুঁড়িনি।”

“মিথ্যে কথা বলছেন। ওরা সবাই আমাকে জানিয়েছে, যে গুলি ছুঁড়ছিল সে ওই মন্দিরের ভেতর এসে লুকিয়েছে।” এস. পি. চারপাশে তাকালেন, “এখানে আপনি ছাড়া আর কেউ নেই। যেসব উল্টোপাণ্টা ঘটনা ঘটছে তাতে কারও ওপর বিশ্বাস রাখা মুশকিল। আপনাকে এক উপযুক্ত কৈফিয়ত দিতে হবে।”

অর্জুনের হাসি পাছিল। সে বলল, “ওদের জিজ্ঞেস করুন আমাকে মন্দিরে চুক্তে দেখেছে কি না! তোমরা কি আমাকে দেখেছে?”

সে নিজেই প্রশ্নটা করল। সেপাইরা একটু থতমত খেল। দুজন বলল দেখেছে, দুজন জানায় বুবাতে পারছে না। অর্জুন কিছু করার আগে বাইরে কথাবার্তা শোনা গেল। সে ডি. এফ. ও. সাহেবের গলা পেল, “আজব ব্যাপার! এখানে এরকম মন্দির আছে তা আমাকে কেউ জানায়নি! এত বড় বড় চলছিল এখানে। এস. পি. সাহেব কোথায়?”

এস. পি. মন্দির থেকে বেরতেই অর্জুন তাকে অনুসরণ করল। এস. পি-র দেখা পাওয়া মাত্র ডি. এফ. ও. বলে উঠলেন, “আমার ডিপার্টমেন্টের যারা ওদের সাহায্য করেছে বলে প্রমাণ পাচ্ছেন তাদের স্বচ্ছন্দে গ্রেপ্তার করতে পারেন।”

“সরাসরি প্রমাণ পাওয়া খুব মুশকিল, তবে দুঁজনকে ইতিমধ্যে আইডেন্টিফাই করা গেছে আর তৃতীয়জন হলেন উনি। অবশ্য আপনার ডিপার্টমেন্টের লোক নন।” আঙুল তুলে অর্জুনকে দেখালেন এস. পি., “আমার লোকের ওপর গুলি ছুঁড়তে-ছুঁড়তে এই মন্দিরের ভেতরে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন।”

হঠাতে ভানু ধ্যানার্জির গলা শোনা গেল, “অসম্ভব, মিথ্যে কথা। অর্জুন এমন কাজ করতেই পারে না। আপনি ভুল বলছেন।”

এস. পি. হাসলেন, “আমার সেপাইদের জিজ্ঞেস করুন।”

ভানু ব্যানার্জি কিছু বলতে যাচ্ছিলেন অমনি অর্জুন হাত তুলে বাধা দিল । সে এবার সেপাইদের দিকে ঘুরে দাঁড়াল, “যে লোকটা তোমাদের ওপর গুলি ছুঁড়ে এই মন্দিরে চুকেছে তার চেহারার সঙ্গে আমার কোনও মিল আছে ?”

একজন সেপাই বলল, “ভাল করে লোকটাকে দেখার সুযোগ পাইনি আমি ।”

“লোকটার পোশাক দেখেছ ?”

“হ্যাঁ । শার্ট-প্যান্ট ।”

অর্জুন দ্বিতীয়জনকে জিজ্ঞেস করতে সে জানাল, “কোট-প্যান্ট ।”

অর্জুন এবার এস. পি.-র দিকে তাকাল, “বুঝতে পারছেন, উত্তেজনার সময় ওরা কী লক্ষ করেছে । ওই মন্দিরে আমি আগেই চুকেছিলাম । ওরা যাকে দেখেছে সে পরে চুকেছিল ।”

এস. পি. বললেন, “ওয়েল । তা হলে লোকটা গেল কোথায় ? এরা বলছে কেউ মন্দির থেকে বের হয়নি । আর কোনও দরজা নেই মন্দিরের যে, বেরিয়ে যেতে পারে । আর ওরকম একটা খুনি আপনাকে দেখে ছেড়ে দিল ! বিশ্বাস করতে বলেন ? তা ছাড়া, ওই রিভলবারটা আপনি কোথায় পেলেন ? এখানে বখন এসেছিলেন তখন কি ওটা আপনার সঙ্গে ছিল ।”

ডি. এফ. ও. বললেন, “কারেন্ট । আসার সময় আপনি রার্টবার বলছিলেন খালি হাতে আসাটা ঠিক হচ্ছে না ।”

অর্জুন এক মুহূর্ত ভাবল । তারপর জিজ্ঞেস করল, “মিস্টার সোম কোথায় ?”

ভানু ব্যানার্জি বললেন, “মিস্টার সোমকে আমরা দেখতে পাইনি ।”

“এদিকের অবস্থা কী ?”

“এরা সবাই অ্যারেস্টেড । শুধু চাঁইদের ধরা যায়নি ।”

অর্জুন বলল, “এস. পি. সাহেব, কাল রাত্রে এদের কার্যকলাপ আবিষ্কার করার পর আমি আপনাদের সমস্ত ব্যাপার জানাই । যদি আমি আপনার লোকের ওপর গুলি ছুঁড়ব তা হলে সেটা করব কেন ?”

“প্রশ্নটা তো আপনাকেই করছি ।” এস. পি. খুব কায়দা করে হাসলেন ।

“উত্তরটা দেওয়ার আগে আমার কথামতো কাজ করুন ।” অর্জুন মন্দিরের ভেতরে দলটা নিয়ে এল, “দু’জন সেপাইকে এখানে পোস্ট করুন । এটা একটা কাঠের প্ল্যাটফর্ম । খুললে নীচে যাওয়া যায় । যদি কেউ এখান দিয়ে বেরতে চায় তাকে অ্যারেস্ট করতে অসুবিধা হবে না ।” অর্জুন দেখিয়ে দেওয়ামাত্র এস. পি. প্ল্যাটফর্ম তোলার চেষ্টা করলেন, কিন্তু ঠিক জায়গায় চাপ না পড়ায় সেটা উঠল না ।

ভানু ব্যানার্জি বলে উঠলেন, “লোকটা কি এখান দিয়েই পালিয়ে গেছে ?”

অর্জুন মাথা নাড়ল, “হ্যাঁ । আমাকে দেখতে পায়নি । পেছন থেকে ওকে

আমি আঘাত করেছিলাম । পালাবার আগে রিভলবারটা পড়ে গিয়েছিল ।”

এস. পি. খুব উন্নেজিত; “তাই বলুন । চলুন এটা খোলা থাক ।”

অর্জুন বাধা দিল, “না । আসুন আমার সঙ্গে ।”

সে দলটাকে নিয়ে এল যে-পথে সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে এসেছিল সেইখানে । পাথরটা এখনও সুড়ঙ্গের মুখ আড়াল করে রেখেছে । অর্জুন বলল, “দু'জনকে এখানে পোস্ট করুন । এটাও বেরবার একটা মুখ । আমাদের এবার যেতে হবে মূল মুখটায় ।”

এস. পি. তৎক্ষণাত চারজন সেপাইকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দু'জায়গায় পাহাড়া দিতে আদেশ করলেন । অর্জুন মনে করার চেষ্টা করছিল ঠিক কোন জায়গা থেকে সে আদিবাসী লোকটিকে অনুসরণ করে সুড়ঙ্গে ঢুকেছিল । মাটির ভেতরটা ছিল অস্তরারে ঢাকা । তার সঙ্গে ওপরের প্রকৃতির কোনও মিল নেই । জায়গাটা চিনতে তার অসুবিধা হচ্ছিল ।

মিনিট কুড়ি ঘোরাঘুরি করে অর্জুন ঠাওর করতে পারল । সে এস. পি.-কে বলল, “যদি এর মধ্যে ওরা বেরিয়ে না গিয়ে থাকে তা হলে তৃতীয় মুখটায় আমরা পৌঁছে গিয়েছি ।”

ওরা জঙ্গল সরিয়ে এগোতেই শিসের আওয়াজ শুনতে পেল । এই শিস অর্জুনের চেনা । সে পাল্টা শিস দিল । একটু বাদেই অমল সোম বেরিয়ে এলেন জঙ্গলের আড়াল থেকে । তাঁর পেছনে সেই আদিবাসী লোকটি । অর্জুনকে দেখে মুখ নিচু করল সে ।

এস. পি. উন্নেজিত হলেন, “আপনি এখানে ? আর আপনাকে খুঁজছি আমরা ।”

“কেন ? কোনও জরুরি দরকার ছিল ?” অমল সোম স্বাভাবিক গলায় জানতে চাইলেন ।

“আশ্চর্য । আমরা এদের গ্রেফতার করতে এসেছি, তাই না ?”

“ঠিকই । সেটা তো করা হয়ে গেছে । অর্জুন, তুমি কি অন্য মুখগুলো বন্ধ করেছ ?

“হ্যাঁ । দুটো মুখে লোক রাখা হয়েছে ।”

“ভাল । আশা করব চতুর্থ মুখ নেই ।”

ডি. এফ. ও. বলে উঠলেন, “মানে ?”

“কার্বন্সেলের মতো ব্যাপার হলে আরও মুখ থাকত । এদিকটা আমরা বন্ধ করে দিয়েছি । এস. পি. সাহেব, এখন আপনার আসল অপরাধীরা মাটির তলায় ।”

অমল সোম হাসলেন, “এবার ওদের বের করতে হবে ।”

অর্জুন খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল । সে জানতে চাইল “অমলদা, আপনি কখন সুড়ঙ্গের হাদিস পেলেন ?”

“তুমি যখন এর সঙ্গে ঢুকলো তখনই তারপর এ একা বেরিয়ে এল এবং তিনজন মানুষ ভেতরে ঢুকে গেল পড়ি কি মরি করে। আমি তখন এই লোকটির সঙ্গে ভাব জমালাম। খুবই সাধারণ ব্যাপার।”

“সুড়ঙ্গটা কত বড় ?” এস. পি. জানতে চাইলেন।

“অর্জুন বলতে পারবে।” অমলদা অর্জুনের দিকে তাকালেন।

অর্জুন জবাব দিল, “অঙ্ককারে ঠিক বুঝতে পারিনি। তবে বেশ বড়।”

“এরকম একটা গোপন আস্তানা ওরা তৈরি করে রেখেছে আমি ভাবতে পারছি না।”

“তৈরি তো এখন হয়নি। কালাপাহাড় করেছিলেন। কয়েকশো বছর হয়ে গেল। কিন্তু ওদের বের করতে হবে। ওহে, তোমরা কী করে গর্ত থেকে খরগোশ ধর ?”

অমল সোম লোকটিকে জিজ্ঞেস করতে সে জানাল ধোঁয়া দিয়ে কাজটা করে তারা। অমল সোম হাসলেন, “বাঃ। সরল ব্যাপার। অর্জুন, আমি তোমাকে গোড়া থেকেই বলে এসেছি এই কেস খুব সরল। নিন, আপনারা ধোঁয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। এই লোকটি সুড়ঙ্গের মুখ দেখিয়ে দেবে। ততক্ষণে আমরা একটু চারপাশে ঘুরে আসি। এসো অর্জুন, আসুন মিস্টার ব্যানার্জি।”

অমলদা পা চালালেন।

॥ সতেরো ॥

অমল সোমের সঙ্গে এতদিন ঘনিষ্ঠভাবে থেকেও তাঁর অনেক আচরণের ঠিকঠাক ব্যাখ্যা অর্জুন এখনও পায়নি। এই মুহূর্তে সেটাই মনে হল। লোকগুলোকে ধরার ব্যাপারে আর কৌতুহলই যেন নেই তাঁর। এস. পি. সাহেবরা কাজে লেগে গেলেন। অর্জুন আর ভানু ব্যানার্জি অমল সোমকে অনুসরণ করল।

সেই বিশাল খাদ, যেটা গতরাতে অর্জুন দেখে গিয়েছিল, তার পাশে এসে দাঁড়াল ওরা। কিছু সেপাই জনাদশ-বারো লোককে একটা জায়গায় দড়ি দিয়ে বেঁধে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। তিনটে মৃতদেহ চোখে পড়ল। অর্জুনের মনে হল এদের দু'জনকে গতরাতে সে দেখেছে। খাদটা, যেটা খেঁড়া হয়েছে, সেটা মন্দিরের কাছেই। অমল সোম সেদিকে তাকিয়ে বললেন, “অর্জুন, এতবড় একটা কর্মকাণ্ড এখানে দিনের পর দিন চলেছে, আর কর্তারা কেউ খবর পেলেন না, এদেশেই এটা সম্ভব। কিন্তু লোকটির বুদ্ধি আছে।”

ভানু ব্যানার্জি বললেন, “এমন পাণ্ডববর্জিত জায়গার খোঁজ এরা পেল কী করে ?”

“পেয়েছে তো দেখতে পাচ্ছি। হরিপদ সেন যেটা জানতেন না এরা তা

জানত । কিন্তু মন্দির থেকে এতদূরে কেন ? সুড়ঙ্গের কথা ওরা জানত । মন্দিরের গায়েই সুড়ঙ্গ । কালাপাহাড় নিশ্চয়ই সুড়ঙ্গের ভেতরেই সম্পদ লুকিয়ে রেখেছিলেন । তা হলে এখানে খাদ খোঁড়া কেন ?” অমল সোম যেন নিজের সঙ্গে কথা বলছিলেন ।

অর্জুন বলল, “এখানে কোনও বিল নেই অমলদা ।”

“সেটাও রহস্য । কিন্তু ওরা জায়গা নির্বাচন করতে ভুল করেছে এটা কিন্তু মানতে পারছি না ।”

অমল সোম খাদের মধ্যে নেমে গেলেন । কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করে এসে বললেন, “ধারণাটা ঠিক । এখানে একসময় জল ছিল । মাটির এত নীচে গুগলি আর শামুক চাপা পড়ে সচরাচর থাকে না । তোমার কি ধারণা ওরা গুপ্তধন পেয়ে গেছে ?”

অর্জুন বলল, “ওরা আজই এখান ‘থেকে পাততাড়ি গোটাবার কথা ভেবেছিল । আগামিকাল কাউকেই পাওয়া যেত না । তার মানে ওরা কাজ শেষ করেছিল ।”

অমল সোম মাথা নাড়লেন, “কাজ শেষ হয়ে গেলে এখানে পড়ে থাকার লোক এরা নয় । খোদ কর্তা ওগুলো নিয়ে আগে হাওয়া হয়ে যেতেন । চলো, মন্দিরের ভেতরে যাই ।” অমল সোম এগোতে লাগলেন । দূরে জঙ্গলের মাথায় ধোঁয়া দেখা গেল । ওরা মন্দিরের ভেতর চুকে সেপাইদের দেখতে পেল । পাহারা দিচ্ছে ।

অমল সোম মন্দিরের ইট পরিক্ষা করে বললেন, “কালাপাহাড় নববীপের মন্দির স্পর্শ করেননি । এটির প্রতি অনুগ্রহ হল কেন তাঁর ? কোচবিহারের রাজাকে হারিয়ে এখানে এসে—, উল্ল, কেমন যেন হিসাব মিলছে না । তিনি কি নম্বলাল সেনের অনুরোধ রেখেছিলেন ? অবশ্য হতে পারে । মন্দির গুঁড়িয়ে দিলে সম্পদ লুকিয়ে রাখার জায়গাটা পরে চেনা যাবে না, তাই— ।”

ভানু ব্যানার্জি বললেন, “যে-লোক অমন ছিল সে কেন মন্দিরের গায়ে সম্পদ লুকোতে যাবে ?”

অমল সোম বললেন, “মানুষটি বুদ্ধিমান ছিলেন । তিনি জানতেন কেউ ভাবতেও পারবে না অত সম্পদ মন্দিরের গায়ে কালাপাহাড় রেখে যেতে পারে । এখন আমার বিশ্বাস হচ্ছে কিছু যদি থেকে থাকে তা হলে ওই সুড়ঙ্গেই আছে ।”

অমল সোম কথা শেষ করা মাত্র কাঠের প্ল্যাটফর্মে শব্দ হল । ওরা সঙ্গে-সঙ্গে সতর্ক হয়ে দাঢ়াল । প্ল্যাটফর্মটা ধীরে-ধীরে ঘূরছে । গর্তটা চোখে পড়ল । তারপর একটা হাত, মাথা সন্তর্পণে বাইরে বেরিয়ে আসতেই সেপাইরা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল । টেনে-হিচড়ে তাকে বাইরে বের করে আনা মাত্র নীচে থেকে গলা ভেসে এল, “কী হল শরৎ ? এনি প্রেরণ ?”

শরৎ নামের লোকটাকে কথা বলতে দেওয়া হচ্ছিল। নীচে থেকে কাসির আওয়াজ পাওয়া গেল। লোকটা আর থাকতে পারছিল না। অর্জুন এখানে নাঁড়িয়েই ধোঁয়ার গন্ধ পেল। মিনিট তিনেকের মধ্যেই আরও একজন বন্দি হল। ওদের মন্দিরের বাইরে নিয়ে যাওয়া হল। ভানু ব্যানার্জি এবং সেপাইরা তৃতীয়জনের অপেক্ষায় রইলেন।

বন্দী দু'জনের দিকে তাকিয়ে মনে হল এরা বেশ দুধে-ভাতে ছিলেন। হাত বেঁধে মাটিতে বসিয়ে রাখা হয়েছে ওঁদের। অমল সোম জিজ্ঞেস করলেন, “আপনাদের মধ্যে কার উপাধি সেন?”

লোক দুটো নিজেদের দিকে তাকাল। অর্জুন দেখল যে-লোকটিকে সে আঘাত করেছিল সে এদেরই একজন। অমল সোম ঠাণ্ডা গলায় বললেন, “জবাব দিন।”

“আমরা কেউ সেন নই।” একজন উত্তর দিল।

“সেন কোথায়?”

“নীচে।”

“আপনারা ওঁর পার্টনার?”

“হ্যাঁ।”

“সম্পত্তি পেয়েছেন?”

“না।”

“সে কী! এত খোঁড়াখুঁড়ি, খুনোখুনি—।”

লোক দুটো চুপ করে রইল। অমল সোম বললেন, “চুপ করে থেকে কোনও লাভ হবে না। আপনারা একের-পর-এক খুন করেছেন এখানে। জায়গাটা আদিম করে তুলেছিলেন। এস.পি. সাহেব ঠিক সেই কাজটা করতে পারেন। কালাপাহাড়ের সম্পত্তি কোথায়?”

একজন বলল, “নিরাপদ জায়গাটা ঠিক বেছেছিল, কিন্তু কিছুই পাওয়া যায়নি।”

“নিরাপদ কে? যিনি মাটির নীচে আছেন?”

“হ্যাঁ।”

“আপনারা শিলিঙ্গড়িতে যাওয়ার সময় আমাদের লিফট দিয়েছিলেন মনে পড়ছে? গুড়। হরিপদ সেনকে খুন করে কে?”

“আমি জানি না।”

“বাজে কথা, বিশ্বাস করি না।”

“আমরা যাওয়ার আগে খুন হয়েছিল হরিপদ সেন।”

“নিরাপদ সেন কোথায় ছিল তখন?”

“শিলিঙ্গড়িতে।”

“সে আপনাদের কিছু বলেনি?”

“না । তবে হরিপদ খুব ‘বাগড়া দিছল, অথচ ওর কোনও রাইট নেই কালাপাহাড়ের সম্পত্তির ওপর । সেটা আছে নিরাপদের ।”

“কেন ? হরিপদের দাদু তাঁকে অধিকার দিয়েছেন ।”

“মিথ্যে কথা । হরিপদের যিনি দাদু তিনি নিরাপদেরও দাদু । তিনি আমাদের এই জায়গার কথা বলেন, হরিপদকে বলেননি ।”

“আপনারা বলছেন এই জায়গার কথা তিনি জানতেন ?”

“হ্যাঁ । কারণ তিনি নিজে এসে কয়েকবার খুঁজে গিয়েছেন, পাননি । ওঁর বাবাও এসেছিলেন । নন্দলাল সেনের প্রতিটি বৎসর এসে ফিরে গিয়েছে বিফল হয়ে । এবার আমরা তাঁই তৈরি হয়ে এসেছিলাম ।”

“আপনারা কিছু পাননি ?”

“না । কারণ কিছুই ছিল না এখানে ।”

“মানে ?”

“গতরাতে আমরা আবিষ্কার করি সম্পদ এখানে নেই ! দশটা লোহার বাক্স পাওয়া গিয়েছে ওই খাদে । ভাঙচোরা, মাটিতে পৌঁতা ছিল কয়েকশো বছর ধরে । নিরাপদের ঠাকুরদা লোহার বাক্সের কথা বলেছিলেন ।”

“কে নিয়েছে সম্পদগুলো ?”

“নিরাপদ বলছে স্বয়ং কালাপাহাড় নিয়ে গেছে । পুরীতে নন্দলাল সেন উধাও হয়ে যাওয়ার পর লোকটা বোধহয় সন্দেহ করেছিল ।”

“এর কোনও প্রমাণ আছে ?”

“না, নেই । তবে লোহার বাক্সগুলো দেখলে বোঝা যায় ওগুলো কয়েকশো বছর মাটির নীচে পৌঁতা ছিল ।”

“ওই জায়গাটা আপনারা খুঁড়লেন কী করে ?”

“কাগজে লেখা ছিল, দুর্ভেদ্য জঙ্গল, বিশাল বিল, শিবমন্দির, মন্দির থেকে কুড়ি হাত দূরে বিলের ভেতরে ডুবতে হবে । মাটি পরীক্ষা করে আমরা কোথায় বিল ছিল জেনেছি ।”

অমল সোম অর্জুনের দিকে তাকালেন । হরিপদ সেন যে-কাগজ দিয়েছিলেন তাতে শেষ লাইনটা ছিল না । অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “হৈমতীপুর বাগানে এমন ত্রাস কেন সৃষ্টি করলেন । এত খুন কেন করতে হল ?”

“ওটা নিরাপদের প্ল্যান । ও বাগানটাকে কিনতে চেয়েছিল কাজের সুবিধা হবে বলে । মিসেস দন্ত বিক্রি করতে চাননি । বাগান চালু থাকলে এত নিশ্চলে কাজ করা যেত না । কিন্তু কোনও লাভ হল না ।” লোকটা নিখাস ফেলল ।

“আপনার নাম কী ?”

“শরৎচন্দ্র রায় ।”

“আপনার ?”

“গৌরাঙ্গ দাস।”

“নিবাস?”

“পুরী।”

ঠিক এই সময় মন্দিরের ভেতরের সেপাইরা চিন্কার করে উঠল। অর্জুন ছুটল। আর তারপরেই গুলির শব্দ। মন্দিরে চুকে অর্জুন দেখল, প্ল্যাটফর্মটা খাড়া হয়ে আছে আর সেখান থেকে গলগল করে ধোঁয়া বের হচ্ছে। সেপাইরা নাক চাপা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল। বাইরে এসে জিজ্ঞেস করতে জানা গেল একজন নীচ থেকে ওপরে আসতে চাইছিল। কিন্তু চিন্কার করতেই সে আবার মীচে নেমে গিয়েছে এবং তারপরেই গুলির শব্দটা ভেসে আসে।

ঘন্টাখানেক বাদে ধোঁয়া বন্ধ হলে সেপাইরা নিরাপদ সেনের মৃতদেহ নীচে থেকে তুলে নিয়ে এল। অত্যন্ত সন্ত্রাস্ত চেহারা। নিজের মাথায় নিজেই গুলি করেছেন তিনি।

অমল সোম অপেক্ষা করতে চাইলেন। নদী পার হয়ে গেলে বেশি হাঁটতে হবে বলে আবার জঙ্গল-পথ ধরতে চাইলেন না। কিন্তু ভানু ব্যানার্জি কষ্টটা করতে দিলেন না। তিনি এর মধ্যে নিরাপদের জিপ আবিষ্কার করে ফেলেছেন। জঙ্গলের আড়ালে সেটা লুকানো ছিল। ডি.এফ. ও. এবং এস.পি. সাহেব বন্দি এবং মৃতদের ব্যবস্থা করতে থেকে গেলেন পেছনে।

সুভাষিণী চা-বাগানে যাওয়ার পথে জিপটা চালাচ্ছিলেন ভানু ব্যানার্জি। অমল সোম চোখ বন্ধ করে বসেছিলেন। হঠাৎ ভানু ব্যানার্জি বলে উঠলেন, “এত করে কী লাভ হলো?”

চোখ বন্ধ অবস্থায় অমল সোম বললেন, “যারা করে তারা এটা বুঝতে চায় না। এটাই ঘটনা। কিন্তু আমি ভাবছি অন্য কথা।”

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “কী?”

“হরিপদ সেন আমাকেও বিশ্বাস করেননি। উনি চোরের ওপর বাটপাড়ি করতে এসেছিলেন। আসল বাটপাড়ি কে করেছে বুঝতে পারছ? ”

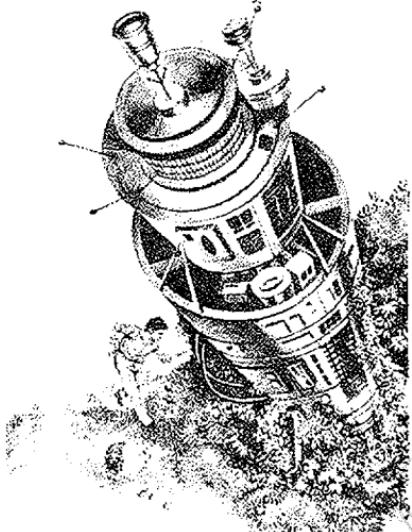
ভানু ব্যানার্জি বললেন, “নিরাপদ সেন?”

“না। কালাপাহাড়। লোকটা কাউকেই বিশ্বাস করত না। এই বেচারারা কয়েকশো বছর ধরে সেটাই বুঝতে পারেনি।” অমল সোম আবার চুপ করে গেলেন। তাঁর চোখ বন্ধ। অর্জুন দেখল নীলগিরির জঙ্গল দ্রুমশ পেছনে চলে যাচ্ছে।

Pathagor.net

অর্জুন বেড়িয়ে এল

সুব্রহ্মণ্য মুখোপাধি



অর্জুন বেড়িয়ে

এলো

পাঠ্য গ্রন্থ

Pathogener.net

অর্জুন বেড়িয়ে এলো

গত চারদিনে তুমুল বৃষ্টি পড়েছে। ঠিক বলা হল না, বৃষ্টিটা তুমুল হচ্ছে রাত্রে, দিনের বেলা টিপটিপিয়ে। আকাশের মুখ হাঁড়িচাচা পাখির চেয়েও কালো। ইতিমধ্যে করলা নদীর পাশের রাস্তাটা ডুবে গিয়েছে। সারা শহর ভিজে।

এই চারদিন বাড়ি থেকে বের হয়নি অর্জুন। স্নান এবং খাওয়া ছাড়া বিছানা থেকে নামেনি। এখন তার বৰ্ষলিশের পাশে পৃথিবীর সব বিখ্যাত গোয়েন্দা গঞ্জের বই। অবশ্য ইঁরেজিতে। সেই সঙ্গে একটা 'রিডার ডাইজেস্ট' পত্রিকা থেকে বের করা সকলন। পৃথিবীর রহস্যময় ঘটনাবলী। এই বইটাই সে পড়ছিল সকালবেলায়, বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে। গোয়েন্দা গঞ্জের চেয়ে এই বাস্তব রহস্যকাহিনী অনেক বেশি চনমনে।

এই সময় কেউ একজন কড়া নাড়ল। অর্জুন জানে, মা দরজা খুলবেন। একনাগাড়ে চারদিন ছেলেকে বাড়িতে পেয়ে মা খুব খুশি। একটু বাদেই তিনি ঘরে এলেন, “তোর চিঠি।”

হাত বাড়াল অর্জুন। সাদা খাম। মুখ আঁটা। জিজেস করল, “কে দিল ?”
“একটা ছেলে এসে দিয়ে গেল।” মা বললেন, “আজ খিচড়ি খাবি ?”
“দারুণ। বৃষ্টিটা যা জমেছে না !”

“কাল কিন্তু বৃষ্টি মাথায় করেও বাজারে যেতে হবে।” মা চলে গেলেন।

খাম খুলুল অর্জুন। জগন্দার চিঠি। “মেহের অর্জুন, আশা করি ভাল আছ। গতরাত্রে বৃষ্টির মধ্যেই বাড়ি ফিরেছিলাম। আজ তোরে যখন বেরোচ্ছি তখনও বৃষ্টি। তাই ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও তোমার সঙ্গে দেখা করতে না পেরে চিঠি লিখে যাচ্ছি। তোমার সঙ্গে জরুরি দরকার আছে। তুমি আজ বেলা একটা নাগাদ শিলিগুড়িতে আমার অফিসে আসতে পারবে ? শিলিগুড়ির সেবক রোডে আমাদের ব্যাক্স। শুভেচ্ছা রইল। তোমাদের জগন্দা।”

অর্জুন চিঠিটা দু'বার পড়ল। জগন্দার মতো মানুষ অকারণে তাকে শিলিগুড়িতে ডেকে নিয়ে যাবেন না। মিনিবাসেই প্রায় পঞ্চাশ মিনিট লাগে।

তার ওপর এই বৃষ্টি । ব্যাপারটা কী ? সে জানলো দিয়ে বাইরে তাকাল । এখন গুঁড়ি-গুঁড়ি জল ঝরছে । একটুও ইচ্ছে করছে না বাইরে যেতে । চিঠি র্হামে পুরে পাশে রেখে সে রহস্যকাহিনীতে মন দেওয়ার চেষ্টা করল । নাঃ, বারেবারে চিঠিটার কথা মনে আসছে । জগুদা খুব সিরিয়াস মানুষ । তাকে বেশ পছন্দ করেন । সে বিছানা থেকে জোরে হাঁক দিল; “মা, তাড়াতাড়ি খিচুড়ি করো, আমি বেরোব ।”

“ওমা, এই বৃষ্টিতে কোথায় যাবি ?” মায়ের গলা ভেসে এল ।

“শিলগুড়িতে । জগুদা ডেকে পাঠিয়েছেন ।”

মায়ের কথাটা নিশ্চয়ই পছন্দ হয়নি । তাই তাঁর গলার স্বর পালটাল । “কখন ফিরবি ?”

“সন্ধের মধ্যেই ।” অর্জুন জবাব দিল ।

এখন ছাতা হাতে চলা মুশকিল । যা উলটোপালটা হাওয়া বৃষ্টির সঙ্গে বইছে তাতে ছাতা সোজা রাখা যায় না । অর্জুন বষাতি চাপিয়েছিল । মাথায় বারান্দা-দেওয়া টুপি । পায়ে ছোট গামবুট । এই পোশাক পরে দু’ পকেটে হাত ঢুকিয়ে রাস্তায় চললেই নীহাররঞ্জন গুপ্তের গোয়েন্দাকাহিনীর কথা মনে আসে । বিদেশি দু’-তিনটে বইতেও এমন চরিত্র সে পড়েছে । গত বছর এখানে অর্জুনের প্রিয় লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এসেছিলেন । আলাপ করতে গিয়ে সে জিজ্ঞেস করেছিল, “আচ্ছা, আপনার সন্তুষ্টি কাকাবাবুকে ঠিক রহস্যময় গোয়েন্দা মনে হয় না কেন ?” ভদ্রলোক হেসে জিজ্ঞেস করেছিলেন “কীরকম ?”

“এই যেমন ধরন, একটা বর্ণনা, বাত তখন দুটো, টিপ্পটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে, রাস্তায় কেউ নেই । গ্যাসপোস্টের আলোও বাপসা । এই সময় লোকটিকে হেঁটে যেতে দেখা গেল । পরনে ওভারকোট, মাথায় ফেল্টহ্যাট, দু’ হাত পকেটে ঢুকিয়ে মুখ নিচ করে হাঁটায় তার চিবুক পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল না । পড়লেই কেমন একটা পরিবেশ তৈরি হয়, তাই না ?” অর্জুন বোঝাতে চেষ্টা করছিল ।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বলেছিলেন, “ওই লোকগুলোকে আজকাল রাস্তাঘাটে তেমন দেখা যায় না । এই যেমন ধরো তুমি, এত নাম করেছ, তোমাকে দেখে মনে হয় কফি-হাউসে আড়ত মারতে পারো, খেলার মাঠেও চিৎকার করতে পারো । এটাই তো ভাল ।”

রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে অর্জুনের মনে হল তার প্রিয় লেখক এখন তাকে দেখলে কী বলতেন ? সে হেসে ফেলল । কদমতলা পৌঁছে সে আবিষ্কার করল বাস নেই রিকশাও বের হয়নি শহরে । পথেঘাটে মানুষ দেখাই যাচ্ছে না । ৱৃপ্তমায়া সিনেমার পাশে একটা মিটির দেকানের শেড-এর তলায় দাঁড়াতেই শুনল ভেতরে বসা কয়েকজন বলছে ভুয়ার্সের নদীর জল বেশ বেড়ে গিয়েছে । এমনকী কার্নিশের ওপরের দিকে জল চুকে পড়েছে । এসব শুনে

সে বুবাতে পারছিল না কী করবে। এই সময় একটা মিনিবাস এসে স্ট্যান্ডে
দাঁড়াল। কন্ট্রুক্টর চিংকার করছে “শিলিগুড়ি, শিলিগুড়ি।” অর্জুন মিনিবাসে
উঠে দেখল দু'জন যাত্রী বসে আছেন পুরো গাড়িতে। টুপি আর কোট খুলে সে
সিটে বসল। জলে জলময় হয়ে যাচ্ছে বাসের ভেতরটা।

জলপাইগুড়ির মোড় ছাড়িয়ে বাসটা যখন শিলিগুড়ির পথে, তখনও অর্ধেক
সিট খালি। বৃষ্টির জন্যই খুব দ্রুত যেতে পারছে না গাড়িটা। যাওয়ার পথে
যে-ক'টা ছেট নদী পড়ল সেগুলো টাইটুম্বুর। শিলিগুড়ির থানার সামনে বাস
থেমে গেলে নেমে পড়তে হল। এখানে বৃষ্টি হচ্ছে না। বোধ যাচ্ছে সকাল
থেকেই বৃষ্টি নেই। কিন্তু আকাশের অবস্থা যা, তাতে যে-কোনও মুহূর্তেই প্রলয়
হয়ে যেতে পারে। অর্জুন একটা রিকশা নিল। টাউন স্টেশনের পাশ দিয়ে
অনেকটা পথ যেতে হবে এখনও।

ঠিক একটা বাজতে দশে সে জগন্দার ব্যাকে পৌঁছাল। জগন্দার ভাল নাম
অশোক গাঙ্গুলি। জিজ্ঞেস করতেই একজন দেখিয়ে দিল ঘরটা। ঘরে ঢুকতেই
জগন্দা হাসলেন, “যাক, এসেছ তা হলে। বোসো, বোসো। চা খাবে ?”

“থেতে পারি।” অর্জুন তার ওভারকোট আর টুপিটা চেয়ারের পেছনে
রুলিয়ে দিল। বেশ শুকিয়ে এসেছে এরমধ্যে। জগন্দা চায়ের হকুম দিয়ে ঈষৎ
রুঁকে জিজ্ঞেস করলেন, “ওখানে এখনও বৃষ্টি হচ্ছে ?”

“হ্যাঁ। শিলিগুড়িতে দেখছি বৃষ্টি নেই।”

“ফোরকাস্ট বলছে বিকেলে তাসাবে। খেয়ে এসেছ ?”

“হ্যাঁ।” অর্জুন ঠিক বুবাতে পারছিল না কেন জগন্দা তাকে ডেকেছেন।
এতক্ষণ যেসব কথা হল তাতে জরুরি কোনও প্রয়োজন আছে। সে নিজে
থেকে কিছু জিজ্ঞেস করবে না বলে ঠিক করল। ব্যাকে জগন্দার ওপরে কাজের
চাপ আছে। একের পর এক লোক আসছে খাতাপত্র নিয়ে। তাঁদের বুবিয়ে
দিতে হচ্ছে সমস্যাগুলো। জগন্দা তার মধ্যে বললেন, “আর মিনিট পাঁচেক।”

ঠিক পাঁচ মিনিট বাদে এক ভদ্রলোক ঘরে ঢুকতেই জগন্দা উঠে দাঁড়িয়ে
তাঁকে আপ্যায়ন করলেন, “আসুন, আসুন। কেমন আছেন ?”

“আর থাকা। এখনও বেঁচে আছি। বিদেশের হাজারো লোভ ছেড়ে দিয়ে
দেশে ফিরে এলাম মন দিয়ে কাজকর্ম করব বলে, তা আর হচ্ছে কই ? বসছি !”
ভদ্রলোক অর্জুনের পাশের চেয়ারটা নিজেই টেনে নিলেন।

“নিশ্চয়ই।”

তিনজনে বসামাত্র তিনকাপ চা এল। ভদ্রলোক বললেন, “আমি তো চা
খাই না। আপনারা খান। আমার চেকগুলোর কোনও খবর আছে ?”

“আমি খুব দুঃখিত ডেক্টর গুপ্ত। একটু আগেও আমি খোঁজ নিয়েছি।
আসলে বিদেশি ব্যাকের চেক বলেই দেরি হচ্ছে। আমি হেড অফিসে ফোন
করেছিলাম। ওরাও চেষ্টা করছে।” জগন্দা বললেন।

“ঠিক আছে। আমার যা আছে তাতে দিন প'নেরো চলে যাবে।”

এই স্মরণ একজন খাতা নিয়ে জগ্নীর কাছে আসতেই তিনি ‘এক মিনিট’ বলে তাতে বুঁকে পড়লেন। অর্জুন ডাক্তার গুপ্তকে দেখছিল। আশিভাগ চুলই সাদা, ছেঁট পাকা আমের মতো শরীর। চোখে পুরু চশমা। ডাক্তার হিসাবে নিশ্চয়ই ইনি খুব ভাল, নইলে জগ্নী এত খাতির করতেন না।

কাজ শেষ করে জগ্নী মুখ ফেরালেন, “ডক্টর গুপ্ত, আপনি কী স্থির করলেন? পুলিশের কাছে যাবেন না?”

“কোনও লাভ হবে না মিস্টার গাঙ্গুলি। পুলিশকে বললে তারা আমার বাড়ির সামনে পাহারা বসাতে পারে। কিন্তু ক'দিন? তা ছাড়া হাজারটা কৈফিয়ত। এসব আমার ভাল লাগে না। খবরের কাগজ জানতে পারবেই। আপনাকে আমি বলেছি যে, প্রচার চাই না। আর ক'টা দিন যদি নিশ্চিস্তে কাজ করতে পারি তা হলে আমি নিজেই প্রেসকে বলব।” ডক্টর গুপ্তের ডান হাত বারংবার নিজের মাথার চুলে চলে যাচ্ছিল। বোধ হয় কথা বলার সময় চুলে হাত বোলানো তাঁর বদ-অভ্যাস।

এবার জগ্নী বললেন, “আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব বলে ওকে জলপাইগুড়ি থেকে আসতে বলেছিলাম। খুব খারাপ আবহাওয়া সঙ্গে চলে এসেছে।”

ডক্টর গুপ্ত অর্জুনের দিকে তাকালেন, “আচ্ছা! এরই কথা সেদিন বলেছিলেন?”

“হ্যাঁ। দেখতে অল্পবয়সী হলে কি হবে এর মধ্যে দারুণ-দারুণ সমস্যার সমাধান করে বসে আছে। এমনকী ইংল্যান্ড আমেরিকায় গিয়েও অপরাধী ধরেছে।”

“তাই নাকি? বাঃ। দেখে তো মনেই হয় না। কী নাম ভাই?”

“অর্জুন।”

কি একটা বলতে গিয়েও চুপ করে গেলেন ভদ্রলোক। তারপর কিছুক্ষণ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বললেন, “বাঃ। চমৎকার নাম। কিন্তু মহাভারতটা কি ভাল করে পড়া আছে? অর্জুন চরিত্রটা কি জানা?”

অর্জুন মাথা নাড়ল, সে জানে।

“বেশ। এবার আমায় একটা সমস্যার সমাধান করে দাও তো। মহাভারতের অর্জুন একসময় স্বর্গে গিয়েছিলেন। যেখানে উর্বশীর সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। বেশ কিছুদিন ছিলেনও সেখানে। তারপর ফিরে এসেছিলেন। তা স্বর্গ মানে আউটার স্পেস। পৃথিবীর বাইরে। সেখানে কারও বয়স বাড়ে না। এমনকী উর্বশীরও বাড়েনি। অতএব অর্জুন যখন সেখানে কিছুদিন ছিলেন তাঁরও তো বয়স বাড়ার কথা নয়। তা তিনি যখন ফিরে এলেন তখন তাঁর দাদা, ভাই, স্ত্রীর বয়স পৃথিবীতে থাকার দরুন বেশ বেড়ে গিয়েছে। অর্জুন-

তো বয়সে সবার ছোট হয়ে গেলেন, তাই না ?”

অর্জুনের বেশ মজা লাগল। মহাভারতে এই ঘটনার কথা সে পড়েছে। কিন্তু এটা যে সমস্যা হতে পারে তা সে তাবেনি কখনও। কাউকে বলতেও শোনেনি। ডক্টর গুপ্ত তার উত্তরের অপেক্ষা করে আছেন দেখে সে বলল, “পুরো ব্যাপারটা নির্ভর করবে অঙ্কের ওপর।”

“অঙ্ক ? ইন্টারেস্টিং ! কীরকম ?”

“প্রথমত, অর্জুন কতদিন স্বর্গে ছিলেন ? স্বর্গের একদিন মানে পৃথিবীর কতদিন ? এখানে সূর্যের উদয়-অন্তের সঙ্গে দিনের পরিমাপ করা হয়। স্বর্গে নিশ্চয়ই তা হয় না। তা হলে স্বর্গের দিন মাপার পদ্ধতিটা কী ? সেটা বের করে স্বর্গের একটা দিনের সমান পৃথিবীর কতদিন হয় বের করে যে-ক'দিন অর্জুন সেখানে ছিলেন সেই ক'টা দিন দিয়ে গুণ করলেই পৃথিবীর সময়টা বেরিয়ে আসবে। যদি তিন-চার মাস হয় তা হলে ব্যাপারটা ধর্তব্যের মধ্যে থাকবে না।” অর্জুনের বেশ মজা লাগছিল বলতে।

“চমৎকার। কিন্তু স্বর্গের সময়টা কীভাবে মাপবে ?”

“সেটা মহাভারতে নেই। পৃথিবী থেকে স্বর্গে হেঁটে যেতে কত সময় লাগে মহাপ্রস্থানের সময় হিসাব করে জানা যেতে পারে।”

“তাতে কী লাভ ? পঞ্চপাঁওয় এবং দ্বৌপদী যদি রথে চেপে যেতেন তা হলে নন-স্টপ পৌঁছে যেতেন। হ্রম। তোমার সঙ্গে কথা বলে ভাল লাগছে। তুমি আইভেট ইনভেস্টিগেট র ?”

“হ্যাঁ। তাই বলতে পারেন।”

এবার ডক্টর গুপ্ত জগন্মকে জিজ্ঞেস করলেন, “আপনি কি একে কিছু বলেছেন ?”

“না। আপনার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। তা ছাড়া আপনিও আমাকে সব খুলে বলেননি।” জগন্ম হাসলেন, “অর্জুন, ডক্টর গুপ্ত অত্যন্ত পণ্ডিত ব্যক্তি। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক। প্রায়ই বিদেশের সায়েন্স জার্নালে ওঁর লেখা বের হয়। আমার সঙ্গে আলাপ সেই বাবদ পাওয়া চেক ভাঙানোর সুবাদে। অবশ্য উনি এখন আমাকে বেশ স্নেহ করে ফেলেছেন। উনি একটা সমস্যায় পড়ায় আমার মনে হয় তোমাকে ডেকে আলাপ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে। শুনলেই তো উনি পুলিশের কাছে যাবেন না।” জগন্ম বিস্তারিত বললেন।

“সমস্যাটা কী ?” অর্জুন জানতে চাইল।

“সেটা বুঝতে গেলে তোমাকে আমার বাড়িতে যেতে হবে।”

“মুখে বলা যায় না ?”

“বললেও স্পষ্ট হবে না। অস্তুত সন্তুরভাগ সমস্যা মানুষ অভিজ্ঞতা ছাড়া হৃদয়ঙ্গম করে না। তিরিশভাগ শুনে বা পড়ে অনুভব করা যায়।” ডক্টর গুপ্ত

হাসলেন, “আমার আস্তানা এখান থেকে কুড়ি কিলোমিটার দূরে। সঙ্গে একটা পুরনো অস্টিম গাড়ি আছে। পাহাড়ি পথ; তাই যেতে মিনিট চলিশেক লাগবে।” কথা শেষ করে উঠে দাঁড়ালেন ডক্টর গুপ্ত, “চলি মিস্টার গাঞ্জুলি।”

অর্জুন ফাঁপরে পড়ল, “কিন্তু আমি ওঁর সঙ্গে গেলে কি আজ জলপাইগুড়িতে ফিরতে পারব?” এমনিতেই বাস খুব কম।”

জগন্মা বললেন, “ইদি না পারো তা হলে আমি মাসিমাকে নিজে গিয়ে বলে আসব কোনও চিন্তা না করতে। তুমি কিছু ভেবো না।”

অগত্যা অর্জুন ডক্টর গুপ্তকে অনুসরণ করল। মানুষটিকে তার ইতিমধ্যে বেশ পছন্দ হয়েছে। মনের ভেতরে একটা খুঁতখুতানি ছিল মায়ের জন্য। তবে এখন তো সবে পৌনে দুটো। শিলগুড়ি থেকে জলপাইগুড়িতে ফেরার বাস সঙ্গে সাতটাতেও পাওয়া যায়। শুধু এখানে বৃষ্টিটা না নামলে হয়।

ডব্লু বি এ নাম্বার দেওয়া একটা কালো গাড়ি ব্যাকের সামনে দাঁড়িয়ে। এ-ধরনের প্রাচীন গাড়ি আজকাল বড় একটা দেখা যায় না। ডক্টর গুপ্ত বললেন, “এ-গাড়ি খুব বিশ্বস্ত। আমাকে কখনও বিপদে ফেলে না। চলার সময় একটু প্রতিবাদ করে, এই যা।”

গাড়িতে উঠে অর্জুন দেখল বাইরে থেকে যতটা মনে হচ্ছিল ভেতরটা কিন্তু ততটা পুরনো নয়। অথচ এই গাড়ির বয়স অন্তত পঁয়ত্রিশ হয়ে গিয়েছে। ডক্টর গুপ্ত ইঞ্জিন চালু করে চলতে আরঙ্গ করতেই রাস্তার লোকজুন তাকাতে আরঙ্গ করল। এত নামী একজন বৈজ্ঞানিক এমন গাড়ি ব্যবহার করেন কেন জিজ্ঞেস করতে গিয়েও অশোভন হবে বলে সে চুপ করে গেল।

গাড়ি এখন সেবক ব্রিজের দিকে এগোচ্ছে। শিলগুড়ি পার হওয়ার পর দু'দিকে মিলিটারি ক্যাম্পনেন্ট ছাড়িয়ে জঙ্গলে ঢোকার সময় অর্জুনের মনে হল যে-কোনও মহুর্তে আকাশ আর মাটি একাকার হয়ে যাবে। এত কালো আকাশ এমন মীচে সে কখনও দেখেনি। এই রাস্তায় অর্জুন বেশ কয়েকবার গিয়েছে এর আগে। ডান দিকে বাগরাকোটে আর ওদিকে তিস্তবাজারের কাছে বেশ কিছু বসতি আছে। সে জিজ্ঞেস করল, “আপনি কোথায় থাকেন?”

ডক্টর গুপ্ত বললেন, “কালীঝোরা বাংলোটা পেরিয়ে খানিক ওপরে। এক ইংরেজ ভদ্রলোকের বাংলো ছিল ওটা। আমি নিজের মতো করে নিয়েছি।”

“জগন্মা মানে মিস্টার গাঞ্জুলি আপনার সমস্যার কথা বলছিলেন!”

“হ্যাঁ ভাই। বছরখানেক আছি আমি এখানে। গত বছর আমার এক বক্স আমেরিকা থেকে এসেছিল নেহাত গায়ে পড়েই। এখানে আসার পর কাউকে আমি আসতে বলিনি। লোকটার নাম রবার্ট সিন্ক্রেয়ার। একটা সায়েন্স জার্নালের সম্পাদক। লেখা পাঠাই, ছাপলে চেক পাঠায়, তাই ঠিকানা ওর জানা ছিল। তা বলা কওয়া নেই চলে এল দুম করে। আমি কী নিয়ে গবেষণা করছি তা জানার জন্য খুব কৌতৃহল ওর। তিনদিন ছিল, আমি জানাতে চাইনি।

করণ জানতে পারলেই গবেষণা শেষ হওয়ার আগেই ও ওর জার্নালে ছেপে দেবে। কিন্তু মুশকিল করল তাতান।”

“তাতান কে?” অর্জুন জানতে চাইল।

“আমার কুকুর। ওকে দেখে বব, মানে ব্যাটের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল।”

“কেন? অস্তুত ধরনের কুকুর বুঝি?”

“একটু অস্তুত। লম্বায় দুই ইঞ্চি, প্রস্তে ইঞ্চিতিনেক।”

অর্জুনের মনে হল সে নিশ্চয়ই ভুল শুনেছে। ওটা ইঞ্চি না হয়ে ফুট হবে।

ডষ্টর গুপ্ত হাসলেন, “কী, বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? ববেরও বিশ্বাস হয়নি। কিন্তু যখন বুঝল ওটা ইন্দুর নয়, সত্যিকারের কুকুর, তখন নিয়ে যাওয়ার জন্য কী বুলোবুলি। দশ হাজার ডলার দাম দিয়েছিল সে তাতানের। তার মানে আমাদের দেশের দু' লক্ষ টাকা। আমি দিইনি। এমনকী তাতানের ফোটো তুলতেও অনুমতি দিইনি। ব্যাটা করল কী, দেশে ফিরে গিয়ে এ-সবই তার জার্নালে ছেপে দিল। আর তারপর থেকেই সমস্যা শুরু হয়ে গেল।”

“কীরকম?” অর্জুনের মনে হচ্ছিল সে আষাঢ়ে গল্প শুনেছে।

“লোক আসতে লাগল একের পর এক। সবাই তাতানকে দেখতে চায়, কিনতে চায়। প্রথম দিকে বুঝিনি, দেখিয়েছি। দু' দু'বার চুরির চেষ্টা হল। শেষপর্যন্ত বাড়ির চারধারে ইলেক্ট্রিক তার লাগলাম। দুটো লোক শক খেয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। এদিকে এখন দাম উঠেছে দশ লক্ষ টাকা। এ পর্যন্ত ঠিক হয়েছিল। একাই সামলে নিছ্লাম। তাতানকে আর বাইরে বের করি না। কিন্তু এখন ঘটনা ঘটছে আরও খারাপ।”

“কী ঘটনা?”

“সেটা মুখে বললে তুমি বুঝবে না। চলো, গিয়ে দেখবে।”

সেবক বিজের গা ঘেঁষে গাড়ি উঠছিল ধীরে-ধীরে। জায়গাটা এর মধ্যেই অঙ্ককার-অঙ্ককার হয়ে গিয়েছে। নীচ থেকে তিস্তার আওয়াজ উঠে আসছে। নিশ্চয়ই জল আরও বেড়েছে। কালীঘোরা বাংলো দেখা গেল। অর্জুন দেখল ডষ্টর গুপ্ত প্রশান্তমুখে গাড়ি চালাচ্ছেন। ভদ্রলোকের কুকুরের নাম তাতান। তার উচ্চতা দুই ইঞ্চি। ভাবা যায়? হঠাৎ ডষ্টর গুপ্ত বললেন, “ওই যে প্রীমানন্দা এখানে আমার জন্য অপেক্ষা করছে। মহা মুশকিল।”

নিজেন পাহাড়ি রাস্তার একটা মারুতি জিপসি দাঁড়িয়ে। তার সামনে একজন সাহেব আর দু'জন ভারতীয় হাত তুলে তাদের থামতে বলছে। ডষ্টর গুপ্ত বাঁ হাত বাড়িয়ে ড্র্যায়ার থেকে একটা সাইলেক্সার লাগানো রিভলভার বের করে ডান হাতে নিয়ে মারুতি গাড়ির টায়ার লক্ষ করে ট্রিগার টিপলেন চল্স অবস্থায়। লোকগুলো হকচকিয়ে গেল। তার মধ্যেই তিনি পেরিয়ে এলেন জায়গাটা। রিভলভার রেখে দিয়ে বললেন, “এ ছাড়া কোনও উপায় ছিল না।

থামলে ওরা ঝামেলা করত না থামলে ওভারটেক করে এসে গাড়ি আঁটকাত ।
ওরা চাকা বদলাতে-বদলাতে আমি বাংলোয় চুকে যেতে পারব । ”

“এরা কী চাইছে ? ”

“আমাকে ব্যবহার করতে । ” ডষ্টের গুপ্ত চুপ করে গেলেন ।

শেষ পর্যন্ত পিচের রাস্তা ছেড়ে গাড়ি বাঁ দিকের কাঁচা পথ ধরল । একটু চড়াই উঠতে গাড়িটা বেদম হয়ে যাচ্ছিল । তবু তাকে তুলে নিয়ে আসতে পারলেন ডষ্টের গুপ্ত । লম্বা-লম্বা গাছের পর বাংলোটা দেখা গেল । এককালে সাদা রং ছিল এখনও বোঝা যায় । বাংলোর চারপাশে খালি জমি, তারপর লোহার বিম দিয়ে বেড়া তৈরি করা হয়েছে । পনেরো ফুট উচ্চতার বেড়ার ওপরে অন্তত ফুটচারেক তারের সারি চলে গেছে । অর্জুন বুরুল ওখান দিয়েই বিদ্যুৎ যাচ্ছে । মাঝখানে একটা গেট আছে । ভেতরে থেকে জেনারেটারের আওয়াজ ভেসে আসছে, যদিও এই বাংলোয় সরকারি বিদ্যুৎ পৌঁছে গেছে । ডষ্টের গুপ্ত পকেট থেকে একটা রিমোট কন্ট্রোলার বের করে কয়েকটা নম্বর টিপিতেই গেট খুলে গেল । অর্জুন বুরুতে পারল গেট খোলার জন্য সাক্ষেত্রিক নম্বর আছে যা জানা না থাকলে ওটা খুলবে না । ভেতরে চুকে আবার নম্বর টিপিই গেট বন্ধ করলেন তিনি । গাড়িটাকে সোজা নিয়ে এলেন বাংলোর গাড়ি বারান্দার নীচে । রিভলভারটা পকেটে ফেলে বললেন, “এই আমার আস্তানা ।
দাঁড়াও দরজা খুলি । ”

দরজায় কোনও তালা নেই । কিন্তু রিমোট টিপে ধরতেই সেটা খুলে গেল ।
ডষ্টের গুপ্ত বললেন, “পেছনের সিটে সারা সপ্তাহের বাজার আছে, তুমি যদি
একটু হাত লাগাও তা হলে তাড়াতাড়ি হয় । ”

বড়-বড় প্যাকেট ভর্তি সবজি, মাংস ইত্যাদি জিনিস । অর্জুন সাহায্য
করল । আর এই সময় হাওয়া ছাড়তেই শীতশীত করে উঠল অর্জুনের ।
টুপটাপ বৃষ্টির শব্দ শোনা গেল । গাড়ি বন্ধ করে মালপত্র নিয়ে ডষ্টের গুপ্ত
ভেতরে চুকে বললেন, “নীচতলাটা বসা আর থাকার ঘর । কিচেন টয়লেটও
এখানে । ওপরটা আমার কাজের জন্য । ওখানে আমি ছাড়া কারও যাওয়া
নিষেধ । নীচটাকে নিজের মতো মনে করো । ”

॥ দুই ॥

বসার ঘরটি সুন্দর । বাহ্য কিছু নেই । দুটো বেডরুম আছে । ডষ্টের গুপ্ত
মালপত্র কিচেনে রেখে গরম জল চাপিয়ে দিলেন স্টোভে । অর্জুন চুপচাপ
দেখছিল । বৃষ্টি নেমেছে । পাহাড়ি গাছের ঝুঁটি ধরে নাড়াচ্ছে খ্যাপা বাতাস ।
ডষ্টের গুপ্ত বললেন, “সরকারি কারেন্ট যখন আছে তখন জেনারেটারটাকে একটু
বিশ্রাম দেওয়া দরকার । অবশ্য ওটি খুব শক্তিশালী । এক নাগাড়ে চরিষ্ণ ঘণ্টা
১২০

চলতে পারে ! ” চোখের আড়ালে চুলে গেলেন ভদ্রলোক । তারপরেই শব্দটা থেমে গেল । অর্জুন কাচের জানলা দিয়ে বাইরে তাকাল । এরকম অবস্থা যদি বিকেল পর্যন্ত চলে তা হলে আজ ফেরার কথা ভুলে যেতে হবে । এমনিতেই ঘরে আলো জ্বলছে এখন ।

সে বাইরের ঘরের সোফায় এসে বসল । ব্যাকে ডষ্টর গুপ্ত টাকার কথা বলছিলেন । কিন্তু এই বাড়ির পেছনে যাঁর এত খরচ হয় তাঁকে কি গরিব বলা যায় ? কখনও নয় । এত খরচ করে নিরাপদে থেকে উনি কী করছেন ? একা থাকতে হাঁকিয়ে ওঠেন না ? এই সময় ডষ্টর গুপ্ত একটা জুতোর বাল্ল নিয়ে নেমে এলেন ওপর থেকে । বললেন, “এবার কফিটা বানিয়ে ফেলি, তুমি ততক্ষণ তাতানের সঙ্গে ভাব করো । ” জুতোর বাক্সটা অর্জুনের সামনের টেবিলে রেখে তিনি চুলে গেলেন ।

অর্জুন দেখল বাক্সটা একটু অন্যরকমের । গোল-গোল সিকি সাইজের গর্ত আছে ওপরে । একপাশে হক লাগানো আছে, মানে সেটি দরজা । হক ধরে টানতেই দরজা খুলে গেল । তারপর অর্জুনের অবাক হওয়া চোখের সামনে এসে দাঁড়াল তাতান । ডষ্টর গুপ্ত যেমনটি বলেছিলেন ঠিক তেমনটি । তাতানের গায়ের রং খয়েরি । কান ঝোলা । বাইরে বেরিয়ে এসে পেছনের পা মুড়ে বসে সে অর্জুনকে দেখতে লাগল । তার লেজ নড়ছে । পৃথিবীর কোথাও কেউ এত ছোট কুকুরের কথা শুনেছে ? অর্জুন ডাকল, “তাতান ? ”

তাতান উঠে দাঁড়াল, তারপর মুখ তুলে ডাকল । খুব মিহি ডাক । অন্যমনক্ষ থাকলে এমন ডাক কানেও ঢুকবে না । অর্জুন আঙুল বাড়াতেই চারপায়ে পিছিয়ে যেতে লাগল তাতান । তারপর ঘুরে একদৌড়ে বাস্তৱের ভেতর ।

এই সময় একটা ট্রেতে কফি আর বিস্কুট নিয়ে ঘরে ঢুকলেন ডষ্টর গুপ্ত, “কি, ভাব হল তাতানের সঙ্গে ? কোথায় গেল ? ”

ট্রে নামিয়ে কফি দিয়ে তিনি চেয়ার টেনে বসে ডাকলেন, “তা-তান ! ”

সঙ্গে-সঙ্গে ভেতর থেকে ছুটে এল কুকুরটা । টেবিলের ওপর হাত পেতে দিতেই সে উঠে পড়ল সেখানে । হাত না ভাঁজ করে ডষ্টর গুপ্ত তাকে নিয়ে এলেন নিজের মুখের সামনে, “আই অ্যাম সরি তাতান । তোর এই দশা আমার জন্যই হয়েছে । কিন্তু আমি যে এখনও অভিমন্যু । ঢুকতে জানি, বেরতে জানি না । ” বিস্কুটের কুচি ভেঙ্গে তাতানকে খাওয়ালেন তিনি ।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “ও কি অন্য কুকুরদের মতোই খায় ? ”

“হ্যাঁ, সব খায় তাতান । খুব ভাল । ” তিনি কুকুরটাকে নামিয়ে দিলেন টেবিলের ওপরে । অর্জুনের মনে হল একটা পুতুল-কুকুর হেঁটে বেড়াচ্ছে । এই পুতুলের দাম এখন দশ লক্ষ টাকা উঠেছে ? সে জিজ্ঞেস করল, “তাতানকে আপনি কী করে পেলেন ? ”

“তিস্তাবাজারে এক বুড়ো নেপালি কয়েকটা পাহাড়ি কুকুরের বাচ্চা বিক্রি

করছিল। কালিম্পং থেকে ফেরার পথে দেখতে পেয়ে কিনে এনেছিলাম। তখন ওর বয়স হবে মাসদুয়েক। নাম রাখলাম তাতান। বছর দেড়েকের মধ্যে বেশ তাগড়াই হয়ে গেল। পাহাড়ি কুকুর বেশি লস্থা হয় না। তাতান ফুট দেড়েক হয়েছিল। ভারী সুন্দর গায়ের লোম। ওই যে দেওয়ালে ছবি দেখছ, ওই হল তাতান।”

অর্জুন দেওয়ালের ফটোটা দেখল। স্বাভাবিক চেহারার একটা কুকুরের ছবি। অবিকল এই তাতানের মতো দেখতে, কিন্তু বহুগুণ বড়। সে প্রচণ্ড অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, “অতবড় কুকুর এত ছোট হল কী করে ?”

“আমার ভূলে।”

“আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি না।”

ডক্টর গুপ্ত কফির কাপে চুমুক দিলেন। তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, “আমার সমস্যাটা তো এখানেই।” বব ওর জানালে ছাপিয়েছে, আমি এমন কিছু আবিক্ষার করেছি যে, বড় জিনিস ছোট করতে পারি। এবার ধরো, একটা জায়গায় বিরাট বস্তি আছে। জমির মালিক কাউকে উচ্ছেদ করতে পারছে না, কিন্তু সেটাই তার বাসনা। লোকটা আমাকে বলল আমি যদি পুরো বস্তিটাকে দুই ইঞ্চি করে দিই তা হলে সে আমাকে অনেক টাকা দেবে। জমির মালিক বেলচায় তুলে ডাস্টবিনে ফেলে দেবে। এক ইঞ্চি সাইজের মানুষগুলো প্রতিবাদও করতে পারবে না। আমি কাউকে বোঝাতে পারছি না এটা আমার গবেষণার বিষয় নয়। তাতানের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা দুর্ঘটনাক্রমে হয়ে গিয়েছে।”

“কী করে হল ?”

“সেটাও আমি বুঝতে পারিনি এখনও। তবে অনুমান করতে পারি। তার আগে বল পৃথিবীতে আমাদের বয়স কীভাবে বাড়ে ?”

“মিনিট ঘণ্টা দিন সপ্তাহ মাস বছর হিসাব করে।”

“গুড়। পৃথিবী যে সময়টায় সূর্যের চারপাশে ঘুরে আসে তা মোটামুটি তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে। আমার বলি এক বছর। কিন্তু আমাদের এক বছর আর চাঁদে বাস করলে যে এক বছর হবে তা এক নয়। একই সময়ে সেখানে বয়স বেশি বাড়ে। অর্থাৎ তুমি যদি চাঁদে গিয়ে থাকো তা হলে দশ বছর পরে তোমার সমান বয়সী কোনও ছেলের সঙ্গে একটুও মিল থাকবে না। তেমনই সাতশো দিনে সূর্যকে যে গ্রহ প্রদক্ষিণ করে, সেখানে বাস করলে পৃথিবীর থেকে কম বয়স বাড়ে। এটা অঙ্ক। আমি আবিক্ষার করতে চলেছি এমন একটি প্রহের, যেখানে বাস করলে বয়স আদৌ বাড়বে না। সেটা করতে গিয়ে তাতানকে আমি এমন একটা জায়গায় পাঠিয়ে দিয়েছিলাম যেখানে স্থির হয়ে যাওয়ার পরের স্টেজ, অর্থাৎ বয়স কমতে থাকে।”

অর্জুনের মাথার ভেতরে সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল। সে জিজ্ঞেস করল, “বয়স কমলে আকৃতি ছোট হয়ে যাবে কেন ?”

“বয়স বাড়লে একটা সময় পর্যন্ত আকৃতি বাড়ে ?”

“হ্যাঁ, তা বাড়ে ।” অর্জুন স্বীকার করল ।

“তাতান যতটুকু বেড়েছিল তার থেকে অনেক বেশি বাড়ত স্বাভাবিক অবস্থায় । সেই ততটুকু কমে যেতে ওর এই অবস্থা হয়েছে ।” ডষ্টের গুপ্ত বললেন ।

ঠিক এই সময় ওপরের ঘর থেকে একটা কুঁ-কুঁ শব্দ ভেসে এল । অর্জুন দেখল শব্দটা শোনামাত্র তাতান লাফাতে লাগল । ভয় হচ্ছিল, তাল সামলাতে না পেরে বেচারি টেবিল থেকে হয়তো পড়ে যাবে । ডষ্টের গুপ্ত টেবিলের কাছাকাছি মুখ নামিয়ে বললেন, “নো, ঘরে ঢুকে যাও তাতান । অত উন্মেজিত হওয়ার কোনও কারণ নেই ।”

কিন্তু কে শোনে কার কথা ! ওই পুঁচকে কুকুর যেন পাগল হয়ে উঠেছিল । অনর্গল তার খুদে গলায় ডেকে যাচ্ছিল সে । ডষ্টের গুপ্ত এবার গভীর হয়ে বললেন, “কুকুরটাকে একটু নজরে রেখো, আমি আসছি ।”

উনি ওপরে চলে যেতে অর্জুন নিজের কড়ে আঙুলটাকে তাতানের কাছে নিয়ে গেল । সঙ্গে-সঙ্গে তাতান ছুটে এল সেটাকে কামডাতে । আঙুল সরিয়ে নিল অর্জুন চট করে । কুকুর কামডালে চোদ্দটা ইঞ্জেকশন নিতে হয় । তা সাধারণ মাপের কুকুর হোক আর এই পুঁচকে কুকুরই হোক । দুটোই তো কুকুর । হঠাৎ কুঁ-কুঁ শব্দটা থেমে গেল । তাতান কান খাড়া করে ওপরের দিকে তাকাল । যেন খুব হতাশ হয়েছে সে । একটু পরে শান্ত হয়ে বসল নিজের ঘরের সামনে । পায়ের শব্দে মুখ তুলে অর্জুন দেখল ডষ্টের গুপ্ত নেমে আসছেন । এসে তাতানের দিকে তাকিয়ে বললেন, “তোর জন্য আমাকে কাজকর্ম ছাড়তে হবে দেখছি । এ তো বড় জালা হল ।”

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “আপনি কিন্তু এখনও আপনার সমস্যা বলেননি ?”

“উৎপাত । আমাকে কাজ করতে দিচ্ছে না ।”

“কী করে সম্ভব সেটা ? আমি যা দেখলাম বিনা অনুমতিতে এই বাংলোয় কোনও মানুষ ঢুকতে পারবে না । উৎপাত করবে কীভাবে ? হ্যাঁ, আপনি যখন বাইরে যাবেন তখন সমস্যায় পড়তে পারেন । কিন্তু আত্মরক্ষার জন্য তো বন্দুক রেখেছেন ।”

“তোমার কি মনে হচ্ছে এখানে আমি খুব নিরাপদে আছি ?”

“নিশ্চয়ই । কেউ আপনাকে বিরক্ত করতে পারবে না, নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারবেন ।”

হাসলেন ডষ্টের গুপ্ত, “তুমি বাইরের দেওয়াল আর তার ওপরের ইলেক্ট্রিক তার দেখেছ । কিন্তু মাথার ওপরে তো খোলা আকাশ রয়েছে হে । উৎপাত হচ্ছে সেখান দিয়েই । রিভলভার ছুঁড়ব তারও তো কোনও উপায় নেই ।”

অর্জুন চিন্তিত হল । মাথার ওপর আকাশ দিয়ে কেউ আসছে নাকি ?

আশেপাশের গাছ থেকে লাফিয়ে নামছে ? যদি নামেও, তা হলে ফিরে যাওয়ার তো উপায় নেই। সে উঠে জানলার কাছে গেল। বেশ জোরে বৃষ্টি পড়ছে। আজ জলপাইগুড়িতে ফিরে যাওয়া আর সন্তুষ্ট হবে না। সে গাছগুলোকে দেখল। না, দেওয়াল থেকে অনেক দূরে রয়েছে তারা। কোনও মানুষের পক্ষে ওই গাছে উঠে এদিকে লাফিয়ে পড়া সন্তুষ্ট নয়। তা হলে ? জানলার কাচের এপাশে দাঁড়িয়ে সে ডষ্টের গুপ্তের গাড়িটির দিকে তাকাতেই হতভম্ব হয়ে গেল। ডিকিটা খুলে গেল ধীরে-ধীরে। তারপর বাড়তি টায়ার যা ডিকিতে থাকে সেটা বেরিয়ে এল বাইরে। মাটিতে পড়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রাইল খানিক। নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারছিল না অর্জুন। সে দেখল টায়ারটা বৃষ্টির মধ্যে সামনের লনে পাক থাচ্ছে। ঠিক যেভাবে বাচ্চা ছেলেরা ঢাকা নিয়ে দোড়য়ে সেইভাবে পাক খেয়ে চলেছে। অর্জুনের গলা শুকিয়ে কাঠ। সে কোনওদিন ভূত দ্যাখেনি, ভূত আছে বলে বিশ্বাসও করে না। কিন্তু এ যদি ভূতের কাণ্ড না হয় তা হলে...। সে চোখ ফেরাল। ডষ্টের গুপ্ত তাতানকে বাস্তবনি করছেন। চাপা গলায় অর্জুন ডাকল, “একবার এখানে আসুন।”

ডষ্টের গুপ্ত অর্জুনের মুখ দেখে সন্তুষ্ট অনুমান করেছিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে চলে এলেন জানলার পাশে। টায়ার তখনও ঘুরে চলেছে। জলে ভেজা যাসে এলোমেলো দাগ পড়ে যাচ্ছে। ডষ্টের গুপ্ত বললেন, “যা বলছিলাম তা তো নিজের চোখেই দেখছ। এ তো কিছুই নয়। আপনমনে খেলছে। উৎপাত যখন করে তখন মাথা খারাপ হয়ে যায়।”

“কী ব্যাপার বলুন তো ?” অর্জুন কথা খুঁজে পাঞ্চিল না।

“তোমার কী মনে হয় ?”

“এ তো ভুতুড়ে কাণ্ড।”

“যা আমরা যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারি না তাকে ভুতুড়ে বলি। তবে তোমার দেখছি সাহস আছে ছোকরা। অজ্ঞান হয়ে যাওনি।”

হয়তো ডষ্টের গুপ্ত সঙ্গে আছেন, দিনের আলোও নিতে যায়নি বলেই অর্জুন ভয় পায়নি। এখন শোনামাত্র কেমন গা ছহচম করতে লাগল। সে তো ডষ্টের গুপ্তকেও ভাল করে চেনে না। জগ্নীও বা কতটা চেনেন ? এটি একটি হন্টেড বাংলো হতে পারে। ডষ্টের গুপ্ত নিজে একজন ড্রাকুলা হতে পারেন। এমন কত গল্পই তো শোনা যায়। অর্জুনের গায়ে কাঁটা ফুটল। সে আড়চোখে দেখল ডষ্টের গুপ্তের ছায়া পড়েছে দেওয়ালে। যাক ইনি তা হলে ভূত নন। ভূতদের ছায়া পড়ে না। অর্জুন দেখল টায়ারটা গড়িয়ে সোজা চলে এল গাড়ির পেছনে। যেভাবে নেমেছিল সেইভাবে লাফিয়ে উঠে পড়ল ডিকিতে। কাত হয়ে শুয়ে পড়তেই ডিকি বন্ধ হয়ে গেল। এসব কাণ্ড ঘটল অথচ কোনও মানুষ গাড়ির ধারে কাছে নেই।

ডক্টর গুপ্ত জিজ্ঞেস করলেন, “ইনি কখন যাবেন কে জানে কিন্তু এবার দুর্বলেন উৎপাত কীভাবে এখানে আসে ?”

অর্জুনের গলার স্বর কেঁপে উঠল, “কে এটা করল ?”

“তাতানের বন্ধু । এখন পর্যন্ত আমার কোনও ক্ষতি সে করেনি কিন্তু ওর উপস্থিতি আমি সহ্য করতে পারছি না । তুমি বসো আমি তাতানকে ওপরে রেখে আসি ।” ডক্টর গুপ্ত টেবিল থেকে বাস্ত্রা তুলে নিলেন ।

অর্জুন পাশে এসে দাঁড়াল, “আমি আপনার কথা বুঝতেই পারছি না । তাতান একটা কুকুর । ওর বন্ধু এভাবে অদৃশ্য হয়ে অমন কাণ্ড কীভাবে করতে পারে ?”

“বন্ধুটি দেহধারণ করতে পারছে না কোনও কারণে ।”

“বিদেহী ?”

“বিদেহী মানে আমাদের ধারণায় ভূত । ও তা নয় । তাতানকে আমি যে এছে পাঠিয়েছিলাম, মানে যেখানে গিয়ে তাতানের আকৃতি ছোট হয়ে গেছে, ওর বন্ধু সেখান থেকেই এসেছে । দাঁড়াও, আমি আগে তাতানকে রেখে আসি ।” ডক্টর গুপ্ত দ্রুতপায়ে ওপরে চলে গেলেন ।

অর্জুন ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল ! একী ভূতুড়ে কাণ্ড বাবা ! অন্য গ্রহের প্রাণী একটা কুকুরের জন্য এখানে স্বীরঘূর করছে ? পৃথিবী ছাড়া অন্য গ্রহেও প্রাণী আছে বলে সন্দেহ করেন বৈজ্ঞানিকরা । কিন্তু সেটা তো শুধুই সন্দেহ । ডক্টর গুপ্তের কথা যদি সত্যি হয়... । মায়ের কথা মনে পড়ল । তাঁর দেশের বাড়ির অনেক ভূতুড়ে গঞ্জ তিনি শুনিয়েছেন । ঝড় নেই হাওয়া নেই হঠাতে মড়মড় করে গাছের ডাল ভেঙে পড়ল । অথবা দরজা-জানলা হট্টেট করে খুলেই আবার বন্ধ হয়ে গেল । এ তো প্রায় সেইরকম ব্যাপার । অর্জুন অন্যমনশ্ব ছিল । হঠাতে দেখল চায়ের কাপ টেবিল থেকে উঠে যাচ্ছে । ঠিক চার ফুট উচুতে উঠল কাপটা । ধীরে-ধীরে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল । অর্জুনের গলা শুকিয়ে কাঠ, চোখ ছানাবড়া । সিঁড়ি পর্যন্ত গিয়ে কাপটা সিঁড়ির ধাপে বসে পড়ল ।

একটু-একটু করে সাহসী হল অর্জুন, নিচুগলায় জিজ্ঞেস করল, “আপনি কে ?”

কেউ উন্নত দিল না । অর্জুন একটু অপেক্ষা করে আবার বলল, “আপনাকে আমি দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু আমার কথা কি শুনতে পাচ্ছেন ?”

এবারও কোনও জবাব নেই । এই সময় ডক্টর গুপ্ত ওপর থেকে খালি হাতে নেমে আসছিলেন । অর্জুন তাঁকে সতর্ক করতে যাচ্ছিল কিন্তু তার আগেই ওঁর পা পড়ল প্লেটের ওপর । ছিটকে গেল সেটা । মেঝেতে পড়ে দু' টুকরো হল । উলটে পড়তে-পড়তে কোনওমতে সামলে নিলেন ডক্টর গুপ্ত । বেশ বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, “এখানে কাপ রাখতে গেলে কেন ? এটা কি

রাখার জায়গা ?”

সত্যি, বড় অ্যাকসিডেন্ট হয়ে যেতে পারত । . অর্জুন বলল, “আমি রাখিনি । ”

ডক্টর গুপ্ত চোখ ছোট করলেন, “ও । সবি । এভাবে তোমাকে বলা ঠিক হয়নি । ” কাপ তুলে নিয়ে কিচেনে নিয়ে গেলেন । ফিরে এসে বললেন, “আমার বেসিনটা প্রায় সাড়ে চার ফুট ওপরে । ও নাগাল পাবে না । ”

“কাপ ফুট চারেক ওপরে উঠেছিল । ” অর্জুন জানাল ।

“ঠিকই । আমার বিশ্বাস ওর হাত মাথার ওপরে তুললে চার ফুটের ওপরে যায় না । মুশকিল হল আমি ওর সঙ্গে কোনওরকম কম্বুনিকেট করতে পারছি না । ও বাংলা হিন্দি ইংরেজি অথবা জর্মান ভাষা বোঝে না । ”

“কিন্তু এই ঘরে চুকল কী করে ?”

“হয়তো শরীরটাকে খুব ছোট করতে পারে । আমার কিচেনের জল যাওয়ার গর্তটা বেশ বড় । তাই দিয়েই আসে । ” ডক্টর গুপ্ত চারপাশে তাকিয়ে নিলেন ।

“এই সিদ্ধান্তে এলেন কী করে ?”

“বললাম তো চার ফুটের ওপরে যেমন জিনিস আছে সেগুলোতে ও কখনওই হাত দেয় না । আমার দোতলায় ওঠার দরজাটায় এক চিলতেও ফাঁক নেই । ঘরটাও এয়ারটাইট । সেখানে কখনওই ও যায় না । ”

“এয়ারটাইট মানে সার্টিফিকেট ?” অর্জুন কুঁ-কুঁ শব্দটাকে মনে করতে পারল ।

“না, সার্টিফিকেট নয় পুরোপুরি । এই হল আমার সমস্যা । পুলিশের পক্ষে এর সমাধান করা সম্ভব নয় । তোমার কী মনে হয় ? পারবে ?”

এমন সমস্যা এর আগে কোনও সত্যসন্ধানী সমাধান করেছেন বলে অর্জুনের জানা নেই । স্বয়ং অঘল সোম থাকলেও পারতেন কি না সন্দেহ । কিন্তু ব্যাপারটা দারুণ ইন্টারেস্টিং । চট করে না বলতে ইচ্ছে হল না অর্জুনের । সে বলল, “খুব কঠিন ব্যাপার, কিন্তু আমি চেষ্টা করতে পারি । তবে ক'দিন এখানে থাকতে হবে । ”

“অফকোর্স । স্বচ্ছন্দে থাকো । তোমার দক্ষিণা কত ?”

অর্জুন হেসে ফেলল; “সেটা নিয়ে এখন কথা না বললেই ভাল হয় । ”

“নো । তুমি কাজ করবে আর আমি জানতে পারব না কত পারিশ্রমিক নেবে ? না না, এভাবে হবে না । ”

“বেশ । আপনি যা স্থির করবেন তাই নেব । কিন্তু সফল হলে । ”

“কবে থেকে এসে থাকছ তুমি ? আমি না হয় শিলিঙ্গড়িতে গিয়ে নিয়ে আসব । ”

“আমি কাল থেকেই আসতে চাই । কিন্তু এই প্রলয়ের মধ্যে ফিরব কী

করে ?”

“হ্ম। আমি ভাবিনি এরকম বৃষ্টি পড়বে। ঠিক আছে, চলো আমি তোমাকে না হয় পৌঁছে দিয়ে আসি।” ডক্টর গুপ্ত উঠে দাঁড়ালেন।

সেই সময় মেঝেতে শব্দ হল। ওরা দু’জনেই দেখল একটা চেন সাপের মতো এগিয়ে আসছে। চেনটা যে তাতানের ছিল তাতে সন্দেহ নেই। এবার চেনটা মাটি থেকে খানিক ওপরে দুলতে লাগল। ডক্টর গুপ্ত বলে উঠলেন, “অর্জুন, সাবধান, ও বোধ হয় আমাদের মারতে চাইছে।” বলতে-বলতে তিনি ছুটে ঘরের কোণে রাখা লম্বা টুলের ওপর উঠে বসলেন। অর্জুন নড়ল না। ঠিক করল চেনটা তাকে আঘাত করতে এলেই সে ওটাকে ধরবে। দেখা গেল চেনটা টুলের দিকে সামান্য এগিয়ে গিয়ে থেমে গেল শুন্যে। তারপর ঘরের এক কোণে ছিটকে পড়ল। অর্থাৎ যে ওটাকে এতক্ষণ নাচাচ্ছিল সে বিরক্ত হয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল।

অর্জুন উঠে চেনটাকে কুড়িয়ে নিতে ডক্টর গুপ্ত নেমে এলেন, “ভয়ঙ্কর, এই প্রথম ও এমন ব্যবহার করল। আক্রমণাত্মক।”

এই সময় বাইরে কড়-কড় করে বাজ পড়ল। এবং সেইসঙ্গে সারা বাড়িতে এলার্ম বাজতে লাগল। অর্জুন চমকে ডক্টর গুপ্তের দিকে তাকাতেই তিনি গাঁটীর মুখে বললেন, “ঘড়ে বোধ হয় কোনও গাছের ডাল ইলেক্ট্রিক তারের ওপর ফেলেছে।”

অর্জুন জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই দেওয়ালটা দেখতে পেল। না, এদিকের তারে কিছু জড়িয়ে নেই। সে বষাতিটা পরে নিয়ে টুপি মাথায় দিয়ে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল। বৃষ্টিতে চারধার সাদা হয়ে গিয়েছে। বাঁ দিকের দেওয়ালের দিকে এগোতেই সে হতভম্ব হয়ে গেল। এই বৃষ্টির মধ্যেই একটি মানুষের শরীর দেওয়ালের ওপরে তারের গায়ে ছটফট করছে। সে দ্রুত ফিরে এসে ডক্টর গুপ্তকে বলল, “তাড়াতাড়ি দেওয়ালের কারেন্ট অফ করে দিন। একটা মানুষ মারা যাবে।”

“মানুষ ?” দরজায় দাঁড়ানো ডক্টর গুপ্ত চেঁচিয়ে উঠলেন, “আবার চেষ্টা করেছে বুঁধি ? যারা ওখান দিয়ে ভেতরে চুকতে চায় তাদের মরাই উচিত।”

“প্লিজ এখন ওসব বলবেন না। অফ করুন তাড়াতাড়ি।” অর্জুন ধমকে উঠল।

ডক্টর গুপ্ত ভেতরে চলে গেলেন। এবং তার খানিক বাদেই অর্জুন দেখল শরীরটা তার থেকে খসে ওপাশে পড়ে গেল। লোকটা নিশ্চয়ই সাঞ্চাতিক রকমের আহত হয়েছে। নিশ্চয়ই ভোটেজ বেশি নয় তাই এতক্ষণ ছটফট করছিল। অর্জুন দেখল ডক্টর গুপ্ত আবার দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন। সে বলল, “মেইন গেট খুলে দিন। লোকটাকে দেখা দরকার।”

কিন্তু ঠিক তখনই কানে একটা গাড়ির শব্দ ভেসে এল। দ্রুত নেমে

যাচ্ছে । এর মানে লোকটা একা ছিল না । যারা ওকে পাঠিয়েছিল তারাই চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাচ্ছে । অর্জুনের মনে হল ডক্টর গুপ্তের ঘরে-বাইরে বিপদ । এই সময়টাকু বৃষ্টিতে দাঁড়াতেই অর্জুনের মনে হল জলপাইগুড়িতে যাওয়া যাবে না । অন্তত আজ তো নয়ই ।

ঘরে দেকার আগে ওভারকোট আর টুপি খুলতেই অনেকটা জল ঝরল । ডক্টর গুপ্ত বললেন, “কি হে, চেষ্টা করবে নাকি ?”

“আপনার এখানে ফোন নেই ?”

“আছে । কিন্তু অর্ধেক দিন সাড়া দেয় না । বড়বৃষ্টি হলে কথাই নেই ।”

“তবু দেখুন তো । মিস্টার গান্ধুলিকে এখনও ব্যাকে পাওয়া যাবে ।”

ওপাশে আর-একটি ঘর রয়েছে । সন্তুষ্ট গেস্ট রুম । ফোনটা সেখানে । এখানে ডায়াল করে লাইন পাওয়া যায় না । অপারেটারের সাহায্য নিতে হয় । দেখা গেল টেলিফোনে কোনও সাড়া নেই ।

অতএব সিদ্ধান্ত নেওয়া হল অর্জুন এখানে আজকের রাতটা থাকবে । কাল সকালে শিলিগুড়িতে গিয়ে কাজের ব্যাপারটা মাকে জানানোর জন্য জগ্নদাকে বলে আসবে । ডক্টর গুপ্ত বললেন, “এই ঘরটি তোমার । আমি ঠিক তোমার মাথার ওপরে শোব । প্রয়োজন পড়লে বিছানার পাশে এই যে বোতাম আছে চাপ দিও, আমার ওখানে অ্যালার্ম বাজবে । যাই, আবার বিদ্যুৎ চালু করি ।”

॥ তিন ॥

ত্বরিতে চলে গেলে অর্জুন চেয়ারে বসল । থাকার কথা তো ঠিক হল কিন্তু সঙ্গে যে একটা পাজামাও নেই । রাত্রে শোবে কী পরে ? হঠাৎ তার খেয়াল হল তাতানের বন্ধুর কথা । অনেকক্ষণ তার কোনও সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না । সে চারপাশে তাকাল । অন্যথারে সেই ছেট্ট প্রাণী হয়তো এই ঘরেই দাঁড়িয়ে আছে এখন । সে জিজ্ঞেস করল, “তুমি কি এখানে আছ ?”

কেউ সাড়া দিল না ।

“তুমি আমার সঙ্গে কথা বলতে পারো । আমি লোক খারাপ নই । মানে, আমরা বন্ধু হতে পারি । বুঝতে পারছ ? আচ্ছা, এবার বলো, তুমি কীভাবে এখানে এসেছ ? তোমার কি কোনও মহাকাশ্যান আছে ?”

কোনও জবাব নেই । হাল ছেড়ে দিল অর্জুন । এইভাবে একা শূন্যঘরে কাউকে কথা বলতে দেখলে সে তাকে পাগল ভাবত । প্রাণীটা কত ছেট ? ডক্টর গুপ্ত বললেন হাত তুললে চার ফুটের বেশি হবে না । ধরে নেওয়া যেতে পারে মাথায় সে আড়াই থেকে তিন ফুট । ওঃ, এর চেয়ে ছেট প্রাণী পৃথিবীতে ছিল । গালিভার যাদের লিলিপুট বলেছেন । হাজার-হাজার ছিল তারা । হয়তো অন্যগ্রহ থেকে এসেছিল । প্রাকৃতিক নিয়মে প্রাণীদের আকৃতি ছেট

হয়। একসময় এই পৃথিবীতেই বিশাল-বিশাল প্রাণী দাপটে ঘুরে বেড়াত। ডাইনোসরাস এখন কোথায়? এমনকী এখন যে হাতি দেখে আবাক হতে হয় সেকালে এর আকৃতি ছিল প্রায় দ্বিগুণ। আদিম মানুষের যে পায়ের ছাপ পাওয়া গিয়েছে তার পাশে আমাদের পায়ের ছাপ লিলিপুট। আজ থেকে তিন হাজার বছর পরে একটা হাতি যদি গোঁফের উচ্চতায় নেমে যায় তা হলে মানুষ তিন ফুটের বেশি লম্বা থাকবে না। এদিক দিয়ে দেখতে গেলে পৃথিবীর বিবর্তনকালের অনেক আগে বিবর্তন শুরু হওয়া অন্য কোনও গ্রহের প্রাণীই আজ ডক্টর গুপ্তের বাড়িতে ঘুরে বেড়াচ্ছে বলে ধরে নিলে একটা সহজ সমাধান তৈরি হয়।

কিন্তু সেই প্রাণী কোথা থেকে আসছে এবং কেমন ভাবে, তা বোঝা যাচ্ছে না। ডক্টর গুপ্ত কি জানেন? লোকটা বেশ রহস্যময় বলে মনে হচ্ছে অর্জুনের। অথচ কুকুরের চেনটাকে শুন্যে ভাসতে দেখে কীরকম ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। এ থেকে বোঝা যায় আগন্তকের সঙ্গে ডক্টর গুপ্তের সম্পর্ক ভাল নয়। ভেবেচিস্তে কোনও সুরাহা করতে পারছিল না অর্জুন। আজ জলপাইগুড়িতে যেতে পারলে অমল সোমের সঙ্গে এ-নিয়ে কথা বলা যেত।

বৃষ্টি পড়ছে একনাগাড়ে। সেই সঙ্গে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। গাছেরা মাথা দোলাচ্ছে পাগলের মতো। অর্জুন চুপচাপ বসে দেখল দিন ফুরিয়ে আসছে। অথচ ঘড়িতে এখন মাত্র তিনটে বাজে। এদিকে ডক্টর গুপ্ত সেই যে ওপরে গিয়েছেন আর নামেননি। ভদ্রলোক তাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন অন্য কেউ ওপরে যাক তা তিনি পছন্দ করেন না। অর্জুন উঠল।

অন্যান্যের মানুষটি এখন এ-বাড়িতে আছে কি না বোঝা যাচ্ছে না। কারণ দীর্ঘ সময় সে তার অস্তিত্ব জানাচ্ছে না। কিছুদিন আগে অর্জুন রূপশ্রী সিনেমায় একটা খুব পুরনো ছবি দেখেছিল। ইনভিজিব্ল ম্যান। ব্যাপারটা কি সেইরকম? সে নীচের তলার ঘরগুলো দেখতে লাগল। এ-বাড়িতে কাজের লোক পর্যন্ত নেই। সব কিছুই ডক্টর গুপ্তকে করতে হয়। ফলে একটু অগোছালো ভাব চারধারে।

ঠিক চারটের সময় দপ করে আলো নিতে গেল। ঘরের ভেতর এখন পাতলা অঙ্ককার। ওপর থেকে ডক্টর গুপ্তের গলা ভেসে এল, “এক মিনিট, জেনারেটর চালিয়ে দিচ্ছি।”

জেনারেটর চালু হওয়ামাত্র আলোকিত হল বাংলো। ডক্টর গুপ্ত নেমে এলেন ওপর থেকে। সোফায় বসে বললেন, “মনে হচ্ছে আজকের রাতটায় আর উপদ্রব হবে না।”

অর্জুন বলল, “কেন মনে হচ্ছে?”

“খুব সোজা ব্যাপার। পৃথিবীর আকাশে এখন মেঘে-মেঘে ঘষা লেগে বিদ্যুৎ তৈরি হচ্ছে। এই স্তর ভেদ করে আসাটা খুব ঝুঁকির কাজ। কেউ

ବୋକାମି କରବେ ନା । ”

“ଆପଣି ନିଶ୍ଚିତ, ଯେ ଆସଛେ ମେ ଅନ୍ୟଗୁହରେ ବାସିଲା ?”

“ଅବଶ୍ୟକ । ”

“କୋନ ପ୍ରହ ?”

“ଆମରା! ଏର ଅନ୍ତିମ ଜାନତାମ ନା ଯେ ନାମକରଣ କରବ । ସୂର୍ଯ୍ୟର ଚାରପାଶେ ଯେମନ ପୃଥିବୀ ସମେତ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହଗୁହା ସୁରହେ ତେବେନାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟର ମତୋ ଆରା ଅନେକ ନକ୍ଷତ୍ର ତାଦେର ପରିବାର ନିଯେ ମହାକାଶେ ସୁରେ ବେଡ଼ାଛେ । ସେଇରକମ ଏକଟି ପରିବାର ଥେକେ ଏହି ଉପଦ୍ରବଟି ଏଖାନେ ପୌଛେଛେ । ”

“ପୃଥିବୀତେ ଆସତେ ଓର କତ ସମୟ ଲାଗଛେ ?”

“ଏହିଟେଇ ଆମାକେ ଭାବାଛେ । ଆମି ଆଲୋର ଚେଯେ ଦୃତଗାମୀ ଏକଟା ରକେଟେ ତୈରି କରେଛିଲାମ । ଟ୍ୟାକିଯନ ରକେଟ । ସେଇ ରକେଟେ କରେ ତାତାନକେ ମହାକାଶେ ପାଠିଯେଛିଲାମ । ରକେଟେର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଛିଲ ୭-୫ ଆଲୋକବର୍ଷ ଦୂରେର ଏକଟି ନକ୍ଷତ୍ରେ ଗ୍ରହଜଗଣ । ମାତ୍ର ଘଣ୍ଟା ଦଶେକେର ମଧ୍ୟେଇ ତାତାନ ସେଇ ନକ୍ଷତ୍ରେର ଏକଟି ଗ୍ରହେ ପୌଛେ ଯାଯ ।

...ତୁ ମି ନିଶ୍ଚଯାଇ ଆଲୋର ଗତି ଜାନୋ ?” ଡକ୍ଟର ଗୁପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ କରଲେନ ।

ବ୍ୟାପାରଟା ଜାନା ଛିଲ ଅର୍ଜୁନେର, “ଏକ ବହରେ, ମାନେ ଆମାଦେର ଏକ ବହରେ ଆଲୋ ମହାକାଶେ ଯାଯ ପ୍ରାୟ ହୟ ମିଲିଯନ ମାଇଲ । ”

“ଗୁପ୍ତ । ” ଖୁଲି ହଲେନ ଡକ୍ଟର ଗୁପ୍ତ ।

“ଆପଣି ଯେ ତାତାନକେ ରକେଟେ କରେ ମହାକାଶେ ପାଠାଲେନ, ଏଖାନେ କି ସେଇରକମ ପାଠାନୋର ବ୍ୟବହାର ଆଛେ ? ଆର ତାର ଜନ୍ୟ ତୋ ପ୍ରଚୁର ଟାକା ଲାଗେ । ”

ଅର୍ଜୁନ ଅକପଟେ ତାର ମନେର କଥା ବଲେ ଫେଲଲ ।

ଡକ୍ଟର ଗୁପ୍ତ ମାଥା ନାଡିଲେନ, “ତୁ ମି ଠିକ ବଲେଛ । ଆମାର ମତୋ ସାଧାରଣ ମାନୁଷ ଅତ ଟାକା ପାବେ କୋଥାଯ ? ତା ଛାଡ଼ା ଏକଜନ ସାଧାରଣ ନାଗରିକକେ ସରକାର ରକେଟେ ଛୋଡ଼ାଇ ଅନୁମତି ଦେବେମ କେମ ?”

“ତା ହଲେ ?” ଅର୍ଜୁନ ବେଶ ବିଶ୍ଵିତ ହଚିଲ ।

ଏକ ମୁହଁତ ଭାବଲେନ ଡକ୍ଟର ଗୁପ୍ତ । ସନ୍ତ୍ରବତ ଅର୍ଜୁନକେ ନିଜେର କଥା ବଲବେନ କି ନା ତାଇ ଚିନ୍ତା କରଲେନ ! ଏବାର ତାଙ୍କେ ହାମତେ ଦେଖୋ ଗେଲ, “ଅର୍ଜୁନ, ଏକକାଳେ ଲୋକେ ଗୋରୁର ଗାଡ଼ି-ଘୋଡ଼ାଯ ଚେପେ ଯାତାଯାତ କରତ । କଲକାତା ଥେକେ ଦିଲ୍ଲିତେ ଏକଦିନେ ଯାଓଯାର କଥାଇ ଭାବତେ ପାରତ ନା । ତାରପରେ ସଥନ ଟ୍ରେନ ଚଲଲ ତଥନ ଦୁ’ ଘଣ୍ଟାଯ ଯାଓଯାର କଥାଓ କେଉ ବିଶ୍ଵାସ କରେନି । ଏଥନ ତୋ ସେଟାଇ ଜଲଭାତ । ଏମନ ଦିନଓ ତୋ ଆସତେ ପାରେ, ହ’ ମିନିଟେ ଆମରା କଲକାତା ଥେକେ ଦିଲ୍ଲି ପୌଛେ ଯେତେ ପାରି । ତାଇ ନା ?”

“ହୟତୋ !” ଅର୍ଜୁନ ଆର କି ବଲତେ ପାରେ !”

“ରକେଟେ ଚାଲିଯେ ମହାକାଶେ ଯାନ ପାଠାନୋ ଏଖନକାର ରୀତି । ଏଟାଇ ସାଭାବିକ । କିନ୍ତୁ ଆମାର ଯେ ଦୁଟୋ ଆବିଷ୍କାର ତା ଏହି ରୀତି ଥେକେ ଅବଶ୍ୟ

এগিয়ে । কিন্তু সেটা জানার আগে বল যে জন্য তোমায় নিয়ে এলাম তার কী করলে ?”

অর্জুন তাকাল । তারপর বলল, “এত অল্প সময়ে কিছু করা সম্ভব ? আপনি বলছেন অন্য গ্রহ থেকে জীবন এখানে আসছে । কীভাবে আসছে ?”

“ঠিক প্রশ্ন করেছ তুমি । না, সে সাধারণ মহাকাশযানে চেপে আসছে না । এই ব্যাপারটা অন্য অনেক প্রহে খুব পুরনো বলে বাতিল হয়ে গিয়েছে । আমি বিশ্বাস করি, যেভাবে তাতানকে পাঠিয়েছিলাম সেভাবে এই উপদ্রবটি যাওয়া-আসা করছে । তাতানকে সাধারণ মহাকাশযানে পাঠালে ওর সঙ্গে দেখাই হত না । সম-স্তর বলেই যোগাযোগ হয়েছিল । ঠিক আছে, তুমি আমার সঙ্গে ওপরে চলো ।

“ওপরে ?” অর্জুন প্রশ্ন না করে পারল না ।

“হ্যাঁ । আমি কাউকে ওপরে নিয়ে যাই না । কিন্তু তোমাকে আমার পছন্দ হয়েছে ।”

আচমকা অর্জুন প্রশ্ন করল, “আপনি তো আজই আমাকে প্রথম দেখলেন, ভাল করে চেনেনও না । আপনার গোপন গবেষণার ঘরে আমাকে নিয়ে যাওয়া কি উচিত হচ্ছে ?”

ডক্টর গুপ্ত মাথা ঘোরালেন । তাঁকে খুব হতভস্ত দেখোল প্রথমটায় । তারপর অকস্মাতই অট্টহাস্যে ভেঙে পড়লেন, “গুড় । গুড় । আমার মন আরও পরিষ্কার হয়ে গেল ।”

“কীরকম ?”

“খুব সাধারণ ব্যাপার । তোমার মনে অন্য কিছু থাকলে এই প্রশ্ন করতে না । তা ছাড়া তোমাকে নিয়ে আমার কোনও ভয় নেই । যে কোনও দিন মোটরগাড়ি দেখেনি তাকে ড্রাইভিং সিটে বসিয়ে দিলেও সে গাড়ি নিয়ে পালাতে পারবে না । চলো ।”

ডক্টর গুপ্তর পেছন-পেছন অর্জুন ওপরে উঠল । সিঁড়ির শেষ ধাপে পৌঁছে তিনি বললেন, “একটু সাবধানে আসতে হবে । আমি কোনও বুঁকি নিতে চাই না । যদিও মনে হচ্ছে উপদ্রবটি তার প্রহে ফিরে গেছেন তবু কে জানে এখানেই ঘাপটি মেরে পড়ে আছেন কি না । তুমি যখন ভেতরে ঢুকবে তখন তোমার শরীর একটি বিদ্যুৎপ্রবাহের মধ্যে দিয়ে যাবে । সামান্য চিনচিন করবে । অশরীরী অন্তিমের কাছে সেটা খুবই মারাত্মক অবশ্য । এসো ।”

দরজা খুলে ডক্টর গুপ্ত এগিয়ে গেলেন । অর্জুন পা বাঢ়াতেই মনে হল সমস্ত শরীরে রিংবি ধরে গিয়েছে । অর্থাৎ সে বিদ্যুৎপ্রবাহের ভেতরে দাঁড়িয়ে আছে । কোনওমতে শরীরটা সামনে ঠেলে দিয়ে আসার পর দরজা বন্ধ হয়ে গেল । ডক্টর গুপ্ত জিজ্ঞেস করলেন, “কোনও অসুবিধে হ্যানি তো ? একটু চিনচিন ? প্রত্যহ এক-দু'বার নিলে জীবনে বাত হবে না তোমার । আমি তো

অনেকবারই নিই, দ্যাখো, কী ফিট বডি আমার !”

এসব কথায় মন ছিল না অর্জুনের। তার চোখ এখন ঘরের চারপাশে। বেশ লম্বা হলঘর এটি। চারপাশে নানা যন্ত্রপাতি ছড়ানো। এক কোণে জানলার পাশে ফ্রেমের মতো কিছু যার মুখে আয়না জাতীয় বস্তু লাগানো। তার পাশেই অঙ্গুত টেবিল-চেয়ার। প্রতিবন্ধীদের জন্য যে-ধরনের ছাইল চেয়ার তৈরি করা হয় তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে একটি ছোট টেবিলও। ডক্টর গুপ্ত জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়ালেন। কাচের জানলার ওপাশে বিদ্যুৎ চমকে বারংবার পৃথিবী আলোকিত হচ্ছে। ভদ্রলোক দু' হাত মাথার ওপরে তুললেন, “আমাদের পৃথিবীর আর মহাকাশের মধ্যে যোগাযোগ এখন সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। রুকাউয়াট কে লিয়ে খেদ নেহি হ্যায়।”

অর্জুনের মজা লাগল। তা হলে এই ভদ্রলোক টিভিও দেখেন !

ডক্টর গুপ্ত ঘুরে দাঁড়ালেন, “এই হল আমার জায়গা। আমার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস। সারাজীবন ধরে তিল-তিল পরিশ্রম করে এটিকে আমি তৈরি করেছি। এখানে দাঁড়িয়ে আমি মহাকাশের অনেকটাই ঘুরে আসতে পারি। ববকে, মানে রবার্ট সিনক্রেয়ারকে এই ঘরে চুকতে দিইনি আমি। সে এই লাইনের লোক। আমার এই ভাঙ্গচোরা যন্ত্র নিয়ে কোনওমতে যে কাজ করছি আমি, তা দেখতে পেলে সে দেশে ফিরেই বেশ সফিসটিকেটেড মেশিন তৈরি করে ফেলতে পারত। কিন্তু তোমাকে নিয়ে আমার সেই ভয় নেই। বোসো, বোসো !” হাত বাড়িয়ে সেই চেয়ারটিকে দেখিয়ে দিলেন তিনি। চেয়ারের তলায় চাকা আছে। সাবধানে না বসলে পিছলে যেতে পারে। অর্জুন অস্বস্তি নিয়ে সেখানে বসল। ডক্টর গুপ্ত তখন সেই বাক্স থেকে তাতানকে বের করে একটা গামলার মধ্যে রেখেছেন। ঝুঁকে পড়ে চুক-চুক করে তাকে ডাকছেন। তারপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, “ব্যাটার খুব মন খারাপ দেখছি। একবার গিয়ে এমন মন খারাপ হয়ে যাওয়া ঠিক নয়। নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে উপদ্রবটি এখানে এসেছিল।”

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “কিছু মনে করবেন না, একটা প্রশ্ন করব ?”

“নিশ্চয়ই।”

“এসব তো সায়েন্স ফিকশনে হয়ে থাকে। স্পিলবার্গ নামের একজন চিরপরিচালকও এমন বিষয় নিয়ে ছবি করেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকেরা পৃথিবী ছাড়া অন্যগ্রহে প্রাণীর অস্তিত্ব আবিষ্কার করতে পেরেছেন বলে শুনিনি।”

মাথা নাড়েন ডক্টর গুপ্ত, “কারেন্ট। পৃথিবী ছাড়া সূর্যের চারপাশে যারা ঘুরছে তাদের আবহাওয়ায় প্রাণের জন্ম হওয়া সম্ভব নয়। মঙ্গলে তবু একটু সম্ভাবনা ছিল কিন্তু সেখানে জলের অভাবই বোধ হয় এর অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।”

“তা হলে ?”

ডক্টর গুপ্ত বললেন, “দ্যাখো বাবা, বিরাট মহাকাশে সূর্য এবং তার পরিবার এন্টুস্থানি জায়গা নিয়ে থাকে। ওরকম কত সূর্য আর তাদের ঘিরে কত গ্রহ হুমাগত পাক থেকে চলেছে। সেই রকম অনেক গ্রহেই দেখা যাবে আমাদের পৃথিবীর মতো আবহাওয়া। সূর্য থেকে যতটা দূরত্বে থাকায় পৃথিবীতে এমন আবহাওয়া তৈরি হয়েছে সেই গ্রহগুলো তাদের সূর্য থেকে ঠিক একই দূরত্বে থাকলে সমান আবহাওয়া পাবে এবং পাচ্ছে। ফলে প্রাণের অস্তিত্ব একশো ভাগ সম্ভব।”

“এর কোনও প্রমাণ আছে ?”

“নিশ্চয়ই। সূর্য থেকে ছিটকে আসা গ্রহগুলো হিতাবস্থায় আসার পর যখন পৃথিবীতে অ্যামিবার জন্ম হল, সেই সময় থেকে মানুষের জন্ম পর্যন্ত বিবর্তনের ইতিহাস আমরা জানি। মহাকাশের অন্য সূর্যগুলো থেকে একই প্রক্রিয়ায় এমন অনেক গ্রহের উৎপত্তি হয়েছে এবং তাদের অধিকাংশই পৃথিবী থেকে কয়েক কোটি বছর বয়স্ক। ফলে সেখানে প্রাণ এসেছে আমাদের অনেক আগে। বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় মানুষজাতীয় প্রাণী জন্ম নিয়েছে বহু বহু আগে। তাই তাদের বোধবুদ্ধি এবং কার্যক্ষমতা আমাদের চেয়ে অনেকগুণ বেশি। এটাই তো স্বাভাবিক। তারা ইচ্ছে করলে তাদের বিজ্ঞানের সাহায্যে সমস্ত মহাকাশে ঘুরে বেড়াতে পারে। আমরা শুধু চাঁদে মানুষ নামাতে পারি, মঙ্গল গ্রহে পাঠাতে পারি। হাঁ, বলতে পারো আমি তার থেকে এক ধাপ এগিয়েছি। কিন্তু সেখানে কোন গ্রহের অস্তিত্ব তার নাম জানি না। তাতান যদি কথা বলতে পারত তা হলে সেটা জানা যেত।”

অর্জুন একমনে শুনছিল। ডক্টর গুপ্তের কথায় যুক্তি আছে। কিন্তু সঠিক প্রমাণ বলতে যা বোঝায় তা তিনি দিতে পারেননি। সে জিজ্ঞেস করল, “মহাকাশে যে মানুষজাতীয় বুদ্ধিমান প্রাণীর কথা আপনি বলছেন তারা কি আমাদের মতো দেখতে ?”

“অস্বত্ব। হতে পারে না। দাঁড়াও, তোমাকে ছবিগুলো দেখাই।” ডক্টর গুপ্ত এগিয়ে গেলেন দেওয়ালের দিকে। সেখানে দেওয়াল-আলমারি জুড়ে প্রচুর বই রয়েছে। তার একটি বের করে পাতা খুলতে-খুলতে এগিয়ে এলেন, “এটা কীসের ছবি ?”

অর্জুন দেখল বিশাল চেহারার হাতি, সারা শরীরে লোম। ডক্টর গুপ্ত বললেন, “এটি হল ম্যাথথ। আদিকালের হাতি। এখনকার হাতির চেয়ে দেড়গুণ বড় শরীর। এর পাশে চিড়িয়াখানার হাতিদের শিশু বলে মনে হবে। যতদিন যাচ্ছে তত আকার ছেট হচ্ছে। তুমি যদি কয়েকশো বছর পিছিয়ে যাও তা হলে দেখবে তখনকার মানুষ যেসব পোশাক ব্যবহার করত তাতে তোমার

মতো দুঁজন ঢুকে যাবে । আমাদের মুগল সম্রাট যেসব অন্ত স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করতেন তা আমাদের পক্ষে তুলে ধরাই বেশ কষ্টকর । তার মানে ওঁদের শরীর আমাদের চেয়ে বড় ছিল । আবার যদি কয়েকশো বছর এগিয়ে যাও তা হলৈ দেখবে সব কিছু কেমন ছোট-ছোট অর্থচ তোমার থেকে বেশি বুদ্ধিমুণ্ড । এটাই নিয়ম । পৃথিবীর বাইরে যে প্রাণ, তার জন্ম হয়েছে আমাদের অনেক, অনেক আগে । ফলে সেখানকার প্রাণীর আকার, বিবর্তন মেনে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হয়ে গেছে । হয়তো মস্তিষ্ক, উদর, হাত-পা ছাড়া আর কিছুই নেই তাদের । ”

সত্যি, অতবড় হাতি ছবিতেও দেখেনি অর্জুন । শুধু শুঁড় এবং চারটি পা ও লেজ ছাড়া এখনকার হাতির সঙ্গে তেমন মিল নেই । বিশাল লোম, একটা বিকট আকৃতির জন্য ম্যামথকে বেশ বীভৎস বলে মনে হচ্ছিল । বই রেখে দিয়ে ডক্টর গুপ্ত বললেন, “অর্জুন, তোমার নামের সেই বিখ্যাত পাণ্ডবটি স্বর্গে গিয়েছিলেন একথা মহাভারতে আছে । স্বর্গে সময় স্থির হয়ে আছে । স্বর্গটি কোথায় ? কাউকে জিজেস করো, সে যত নিরক্ষরই হোক স্বর্গ বললে মাথার ওপরে হাত তুলে দেখাবে । অর্থাৎ স্বর্গ ওই মহাশূন্যে, মাটির নীচে বা পাশাপাশি কোথাও নেই । মানুষকে কিন্তু কেউ বলেনি স্বর্গ মাথার ওপরে আছে । জন্মজন্মান্তর থেকে একটা ধারণা তার রক্ষে সে বয়ে নিয়ে আসছে । নিশ্চয়ই এর কারণ আছে । সে পড়েছে দেবতারা স্বর্গ থেকে নেমে আসেন । নেমে আসা মানে আমাদের ওপরে তাঁরা থাকেন । আর ওপর বলতে তো আকাশ, মহাকাশ । অর্থাৎ, মহাকাশেই কোথাও স্বর্গ আছে যেখানে সময় স্থির হয়ে থাকে । নিশ্চয়ই সূর্যের সংসারের কোনও গ্রহে স্বর্গ নেই । সেখানে তো প্রাণের অস্তিত্ব অস্তিত্ব । তা হলে অন্য কোথাও, অন্য সূর্যের সংসারে স্বর্গ বেশ জাঁকিয়ে বসে আছে । সেখান থেকে মাঝে-মাঝে দেবতারা এই পৃথিবীতে নেমে আসেন । ”

অর্জুন চুপচাপ শুনছিল । এবার বলল, “আসতেন । ”

“আসতেন ? নো । আসতেন কেন ? এখনও আসেন । ওই যে উৎপাতটা তাতানের খোঁজে আসছে, ওকে নিশ্চয়ই আমাদের গ্রামবন্দুরা উপদেবতা বলতেন । ”

অর্জুনের খেয়াল হল সে কিছুদিন আগে দানিকেন সাহেবের লেখা কয়েকটা বই পড়েছে এবং ডক্টর গুপ্তের মতো এতবড় বিজ্ঞানী সেইরকম কথাই বলছেন । দানিকেন সাহেবের কথা তুলতেই ডক্টর গুপ্ত হাত নাড়লেন, “যা বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না তাই অন্য গ্রহের মানুষের কাজ বলে চাপাতে আমি রাজি নই । অর্জুন, আমার গবেষণা দুটো বিষয় নিয়ে । এক, মহাকাশের অন্য গ্রহের সঙ্গে যোগাযোগ করা । অংশত আমি সফল । তাতানকে আমি পাঠিয়েছিলাম, ওর পেছন-পেছন যে নেমে এসেছে সেই প্রমাণ দিচ্ছে মহাশূন্য

প্রাণীহীন নয়।”

“আপনি কীভাবে তাতানকে পাঠিয়েছিলেন ?”

“সেটা তোমাকে বলব না। যতক্ষণ না গবেষণা সফল হচ্ছে ততক্ষণ বলা ঠিক হবে না। আমি পৃথিবীকে একবারেই চমকে দিতে চাই।”

“কিছু মনে করবেন না, এটা কি বিশ্বাসযোগ্য ?”

ডক্টর গুপ্ত যেন রেগে গেলেন। তারপর বললেন, “তুমি মহাশূন্যে যেতে চাও ?”

অর্জুন তাতানের দিকে তাকাল। মহাশূন্যে গেলে যদি তার অবস্থা ওই তাতানের মতো হয়ে যায় ? লম্বায় চার ইঞ্চি। অসম্ভব। সে মাথা নাড়ল।

ডক্টর গুপ্ত এবার হাসলেন, “তব পাচ্ছ মনে হচ্ছে ! আরে মহাশূন্যে যাওয়া মানে তাতান হয়ে যাওয়া এমন ভাবছ কেন ? তাতান এমন একটা গ্রহে গিয়ে পড়েছিল যেখানে গেলে ওই অবস্থা হয়। তুমি এই সূর্যের সংসারগুলো দেখে এলে পারতে। অবশ্য চাঁদের বাইরে কিছুটা বাদে আমাদের বৈজ্ঞানিকরা তেমন কোনও প্রতিক্রিয়ার ব্যবর এখনও পাননি।”

ডক্টর গুপ্ত এগিয়ে গেলেন সেই ক্রেনের মতো দেখতে মেশিনটার কাছে। মেশিনটার গায়ে হাত রেখে বললেন, “এইটে আমার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। আমি মানুষকে তার ভবিষ্যৎ জানাতে চাই। আজ তুমি যে সময়টায় দাঁড়িয়ে আছ সেই সময়টাকে স্থির রেখে আমি, ধরো, দুশো বছর এগিয়ে নিয়ে গেলাম। অর্থাৎ দুশো বছর বাদে কী ঘটবে তা দেখতে চাইলাম এখনকার মানসিকতা নিয়ে। এটা করতে পারলে ভবিষ্যতে যাঁরা হাত দেখে কুষ্টি বিচার করে চলে তাদের জন্ম করা যাবে। আবার মানুষ তার ভবিষ্যতের কাজকর্ম দেখে বর্তমানের ভুল শুধরে নিতে পারবে।”

“এই গবেষণায় কতটুকু এগিয়েছেন ?”

“তেমন কিছু না। এক-দু’ পো মাত্র। এদিকে এসো, এই যে সুইচটা দেখছ, এটা টিপলে ঘন্টা চালু হবে এবং তোমার চারপাশের সময়টা চাপ বেঁধে স্থির হয়ে যাবে। এবার দ্বিতীয় বোতামটা টিপলে তোমার ওই সময় সচল হবে। এখানে দ্যোখো, মিটার আছে। বৰ্মিটার। তুমি পাঁচ থেকে পাঁচশো পর্যন্ত মিটার ঘোরাতে পারো। অর্থাৎ, ইচ্ছে করলে পাঁচ থেকে পাঁচশো বছর ভবিষ্যতে চলে যেতে পারো। কিন্তু এ-জায়গায় আমি সবসময় সাফল্য পাচ্ছি না। একবার হয়েছিল ! নাইন্টি ফোরে আমেরিকায় ওয়ার্ল্ড কাপ ফুটবল হচ্ছিল, সেখানে গিয়ে পৌঁছেছিলাম। ইতালিকে দু’ গোল দিয়েছিল জামানি। ফিরে এলাম। কিন্তু দ্বিতীয়বার আর মেশিনটা কাজ করছে না। প্রথমবারে যা-যা করেছিলাম তা করেও নয়। এটাই দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।”

অর্জুন হতত্ত্ব। নাইন্টি ফোর আসতে এখনও তিনি বছর বাকি আছে। হ্যাঁ, সেই সময় আমেরিকায় ওয়ার্ল্ড কাপ হওয়ার কথা। কিন্তু ডক্টর গুপ্ত গোল

দিয়েছিল বললেন ? সে-কথাটা কলতেই ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন, “আসলে খেল শেষ হওয়া অবধি আমি লস অ্যাঞ্জেলিসের স্টেডিয়ামে ছিলাম।” গোল দেওয়া হয়ে গেলে, গিয়েছিল তো বলবই !”

“তার মানে আপনি বলছেন ওই টুর্নামেন্টে জামানি দু’ গোলে ইতালিকে হারাবেই ? এটা এখন থেকে আপনি জানতে পারছেন ?” অর্জুন উত্তোলিত।

মাথা নাড়লেন ডক্টর গুপ্ত, “হ্যাঁ, জানতে পারছি কিন্তু কাউকে জানাতে চাইছি না। পৃথিবীর কিছু মানুষ সেটা জেনে গেলে ফাটকা খেলবে। লক্ষ-লক্ষ মানুষকে ভুয়ো জুয়ায় হারাবে। জুয়াড়িরা যদি জেনে যায় জামানি জিতে যাবেই, তা হলে ইতালির সমর্থকদের কোটি-কোটি টাকা তারা বেমালুম হজম করে ফেলবে।” হাসলেন তিনি, “এ তো গেল খুব সামান্য দিক। এর বড় দিকটাই আসল চিন্তার ব্যাপার।”

ঠিক এই সময় ঘরের এক কোণে লাল আলো জ্বলে উঠে বিপ-বিপ শব্দ শুরু হল। অর্জুনের গায়ে কাঁটা ফুটল। তার মনে হল মহাকাশ থেকে নিশ্চয়ই কেউ কোনও সঙ্কেত পাঠাচ্ছে। কিন্তু ডক্টর গুপ্তকে বেশ হতাশ দেখাল, “একটু একা থাকতে দেবে না। এই বাড়বাদলে অঙ্ককারে আবার কে এল ?”

“আপনি বললেন মেঘের আস্তরণ, বিদ্যুতের বালকানি থাকায়...।”

“এসেছে নীচের গেটে। অবশ্যই গাড়িতে। এখানে হেঁটে কে আর আসবে। চলো, নীচে যাই। দেখি গিয়ে।” ডক্টর গুপ্ত দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন।

এতক্ষণ এই পরিবেশে বেশ ভাল লাগছিল অর্জুনের। বিজ্ঞানের মাধ্যমে কতৃক কাণ্ড ঘটছে পৃথিবীতে। জলপাইগুড়িতে বসে সেসব কথা জানাই যেত না। জলপাইগুড়ির অনেক মানুষ এখনও বলতে পারবে না কীভাবে টিভি-র পর্দায় ছবি ফোটে, রেডিওতে গান বাজে অথবা টেলিফোনে কথা শোনা যায়। সে ক্রেনের মতো দেখতে যন্ত্রটার দিকে তাকাল। যন্ত্রটা গোলমাল করছে। নইলে সে ডক্টর গুপ্তকে বলত কাছাকাছি সময় থেকে তাকে ঘুরিয়ে নিয়ে আসতে।

সদর দরজা খুলে বাইরের আলো জ্বালাতেই বৃষ্টিভেজা বাগানটার সামান্য অংশ দেখা গেল। ডক্টর গুপ্তের গায়ে অরোরে জল পড়ছে। কারণ গাড়িটা এখন গাড়ি-বারান্দার বাইরে দাঁড়িয়ে। ওটা আগে ওখানে ছিল না।

গাড়ি-বারান্দার নীচে দাঁড়িয়ে ডক্টর গুপ্ত চিৎকার করলেন, “হ্যাঁ ইজ দেয়ার ? কে এসেছেন ? আগে নিজের পরিচিতি জানান।”

পনেরো ফুট দেওয়ালের ওপর, কাঁটাতরের বেড়া, মজবুত গেট, তার ওপর বৃষ্টির শব্দ, ডক্টর গুপ্তের গলা আগস্তক শুনতে পেল কি না সন্দেহ। ডক্টর গুপ্ত বললেন, “লাউড স্পিকারের কথা কখনও ভাবিনি, এখন মনে হচ্ছে সেরকম একটা কিছু থাকলে ভাল হত।”

কেউ যে এসেছেন তা বোঝা যাচ্ছে। বৃষ্টি ভোদ করে একটা গাড়ির হেডলাইটের আলো পড়ছে ওপাশের গাছের ওপর। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “এত রাত্রে আপনার কাছে এর আগে কেউ এসেছেন ?”

ডক্টর গুপ্ত মাথা নাড়লেন, “সচরাচর নয়। তবে শিলিঙ্গড়ির কে পুলিশ অফিসার এ-পথ দিয়ে যাওয়ার সময় মাঝে-মাঝেই খেঁজখবর নিয়ে যান।”

এই সময় বৃষ্টিটা একটু ধরল। ঘোড়ো বাতাস শব্দ বাড়াচ্ছে গাছের পাতায় আঘাত করে। ডক্টর গুপ্ত চেঁচালেন আবার, “হ্যাঁ ইজ দেয়ার ?”

“প্লিজ ওপেন দ্য গেট। দিস ইজ বিলঁ।”

ডক্টর গুপ্ত অর্জুনের দিকে তাকালেন, “বিল ? মানে ? উইলিয়াম উইলিয়াম জোন ?” বলেই তিনি ছুটে গেলেন বৃষ্টির মধ্যে আচমকা।

অর্জুন কোনও বাধা দিতে পারল না। উইলিয়াম জোন নিশ্চয়ই তাঁর খুবই ঘনিষ্ঠ কেউ, নইলে ছুটবেন কেন ? কিন্তু একটা ছাতা সঙ্গে নিয়ে গেলে পারতেন। গেট খুলে যাচ্ছে। হয়তো রিমেট ডক্টর গুপ্তের পকেটেই ছিল। গাড়ির হেডলাইটের সামনে এখন ডক্টর গুপ্তের শরীর শিলুট হয়ে গিয়েছে। হঠাৎ অর্জুন ভদ্রলোককে ঘুরে দাঁড়াতে দেখল। তিনি টিংকার করে কিছু বললেন। গাড়ি স্টান এগিয়ে আসছে তাঁকে চাপা দেওয়াব জন্য। ডক্টর গুপ্ত একপাশে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। গাড়িটা এবার তার দিকে এগিয়ে আসছে। অর্জুন দ্রুত ঘরের ভেতর চুকে দরজা বন্ধ করে বসল। সঙ্গে-সঙ্গে গুলির আওয়াজ এবং বান-বান শব্দ শুরু হয়ে গেল। অর্জুন কী করবে বুঝতে পারছিল না। ডক্টর গুপ্ত নিশ্চয়ই আহত হয়ে বৃষ্টির ভেতর পড়ে আছেন। তাঁকে সাহায্য করতে গেলে বন্দুকবাজদের সামনে পড়তে হবে।

দরজায় আঘাত শুরু হল। ওরা স্টোকে ভাঙতে চাইছে। গাড়িতে ঠিক ক'জন মানুষ ছিল, অস্কার এবং বৃষ্টির কারণে বোঝা যায়নি। অর্জুনের মনে হল, আপাতত ডক্টর গুপ্তকে দেখার বদলে তাঁর গবেষণার জিনিসগুলো বাঁচানো বেশি জরুরি। সে দ্রুত দোতলায় উঠে এল। দরজা খুলে ভেতরে চুকে স্টোকে প্রথমে বন্ধ করতেই শরীরে চিনচিনে অনুভূতি হল। অর্থাৎ কারেন্ট পাস হচ্ছে এখান থেকে। সে ঘরের ভেতর চুকে ভাল করে তাকাল। নীচে তখনও সমানে গুলির আওয়াজ হয়ে যাচ্ছে। ডান দিকের দেওয়ালের গায়ে রেগুলেটরের মতো একটা নব। ওটার গায়ে লেখা আছে এক দুই তিন চার। রেগুলেটরের মার্কিংটা এক নম্বের রয়েছে। যদি ওটাকে দুই বা তিনে নিয়ে যাওয়া হয় তা হলে কি এখানকার কারেন্ট আরও তীব্রতর হবে ? সেক্ষেত্রে কেউই এ-ঘরে চুকতে পারবে না। অর্জুন নবটাকে ঘোরাল। দরজার সামনে গিয়ে নিজের শরীর নিয়ে পরীক্ষা করার বিন্দুমাত্র চেষ্টা সে করল না। এক নম্বরেই যদি অমন চিনচিনানি হয় তা হলে... !

এই সময় নীচের দরজা খোলার আওয়াজ কানে এল। হয়ে গেল। ওরা

এবার একতলায় চুকে পড়বে। ডক্টর গুপ্ত এত সাবধানতা অবলম্বন করে এখানে ছিলেন কিন্তু কী লাভ হল তাতে? সামান্য একটা ভুলে সব নষ্ট হতে চলেছে। অর্জুন চুপচাপ দরজা ছেড়ে জানলার কাঠের পাশে চলে এল। কিছুই দেখা যাচ্ছে না বাইরের।

এরার দেতলার সিঁড়ির গায়ে ধাক্কা। এবং সঙ্গে-সঙ্গে চিন্কার। কেউ যেন ছিটকে সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়ল নীচে। মানুষের গলা শোনা যাচ্ছে। দ্বিতীয়বার ধাক্কা হওয়ামাত্র আবার চিন্কার। অর্জুন একটু নিচিন্ত হল। নব ঘুরিয়ে কারেন্ট বাড়ালে নিশ্চয়ই সমস্ত দরজাটাই ইলেক্ট্রিফাইড হয়ে গিয়েছে।

একটু চুপচাপ। হঠাৎ গুলির আওয়াজ হল। দরজা ভেদ করে একটা গুলি এসে লাগল ঘরের ছাদে। খানিকটা কাঠের চুকরো পড়ল মেঝেতে। দ্বিতীয় গুলিটা দরজা ফুটো করে ছুটে এল অনেকটা নীচ দিয়ে। প্রায় অর্জুনের কান ধোঁয়ে সেটা লাগল ক্রেনের মতো দেখতে যন্ত্রটায়। অর্জুন চমকে গেল এমন যে, মাটিতে না বসে পারল না। তৃতীয় গুলিটা ছুটে গেল ছাদে। কিন্তু ততক্ষণে অস্তুত একটা আওয়াজ শুরু হয়েছে ঘরের ভেতর। অর্জুন মুখ তুলে শুনল। আওয়াজটা আসছে ওই ক্রেন জাতীয় যন্ত্রটার শরীর থেকে। গুলিটা লাগার পরই ওর পিস্টন চালু হয়ে গিয়েছে। সে এক লাফে উঠে দাঁড়িয়ে ইঞ্জিনটাকে দেখতে লাগল। ক্রেনের ভেতরে একটা বসার জায়গা আছে। তার সামনে মোটরগাড়ির হাইল। ড্যাশবোর্ডের মতো জায়গায় নানারকম আলো জলছে। ডক্টর গুপ্ত ইঞ্জিনটাকে চালু করতে পারছিলেন না, কিন্তু একটা বন্দুকের গুলি আচমকা সঠিক জায়গায় আঘাত করায় ওটা চালু হয়ে গেল। কী তাজ্জব ব্যাপার!

যিনি বাইরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে গুলি ছুড়ছেন তিনি সহজে হাল ছাড়ার পাত্র নন। এবার তাঁর গুলি লাগল দরজার ভেতরে তালার গায়ে। ভাল শব্দ হল। অর্জুন জানে লোকটার উদ্দেশ্য এই ঘরে চুকে যন্ত্রপাতির দখল নেওয়া। যদি বুঁদি করে ইলেক্ট্রিকের লাইন কেটে দিয়ে দরজা ভেঙে ঢোকে তা হলে বন্দুকের সাহায্যে সেই উদ্দেশ্য সফল করতে একটুও বেগ পেতে হবে না ওদের। এ-অবস্থায় সে কী করতে পারে?

ইতস্তত ভাবতে-ভাবতে অর্জুন মেশিনটার দিকে তাকাতেই দ্বিতীয় মতলব মাথায় এল। সে চুপচাপ মেশিনের মাঝখানের ড্রাইভিং সিটে উঠে বসল। এটিকে কী করে চালু করতে হয় তা সে জানে না। মেশিন থেকে যেরকম শব্দ বের হচ্ছে তাতে মনে হয় ওটা ইতিমধ্যেই সচল হয়েছে। কিন্তু এখন কী করা যাবে? অর্জুন সামান্য ঝুঁকে ড্যাশবোর্ডের আলোগুলো দেখল। দশ-বিশ-ত্রিশ পঞ্চাশ-একশো-হাজার-দশ হাজার লেখা রয়েছে যেখানে, তার নীচেই একটা বোতাম। অর্জুন বোতামটাকে টিপতেই বিপ্-বিপ্ শব্দ বাজতে লাগল এবং নম্বরগুলোর একপাশে একটা একটাকে ভেসে উঠতে দেখা গেল। অর্জুন

সেটিকে ঘোরাবার চেষ্টা করতেই কাঁটাটিকে এক লাফে কুড়ি এবং ত্রিশের মাঝখানে চলে আসতে দেখা গেল। অর্জুনের সমস্ত শরীর থর-থর করে কাঁপছিল। মেশিনটা যেন পাগলের মতো আচরণ করছে এখন। এবার তার নজরে এল পাশাপাশি দুটো সুইচ রয়েছে। তার একটাতে চাপ দিল সে উদ্ভ্রান্তের মতো।

॥ চার ॥

প্রবল একটা ঝাঁকুনি, মনে হল হাড়গোড় সব ভেঙে যাচ্ছে, অর্জুন বন্ধ চোখে অঙ্ককার দেখল। এবং তারপরেই শরীরে ঠাণ্ডা বাতাসের ছাঁয়া লাগল। বাইরে বৃষ্টি হলেও এই ঘরে তো হাওয়া ঢেকার উপায় নেই। সে চোখ খুলতেই হতভস্ব হয়ে গেল। ওগুলো নিশ্চয়ই তারা। একফোটা মেঘ নেই কোথাও। তার মানে বৃষ্টি থেমেছে কিন্তু ঘরের ছাদটা কোথায় গেল! সে তারা দেখে কীভাবে? মাথা ঘোরাতেই সেটা ভোঁ-ভোঁ করে উঠল। ঘর কোথায়? তার চারপাশে তো গাছগাছালি। মাথার ওপরে আকাশ। সামনে সেই ড্যাশবোর্ড, যেখানে এখনও আলো জ্বলছে। শব্দ বাজছে। সে কোথায় চলে এল? চটপট মেশিন থেকে নেমে মাটিতে দাঁড়াল অর্জুন। একটা রাতের পাখি বেশ ভয় পেয়েই ডাকতে-ডাকতে উড়ে গেল দিগন্তে। দু-তিন পা জঙ্গল ভেঙে এগিয়েও কোনও দিশা পেল না সে। শুধু যন্ত্রটা থেকে আসা আওয়াজ রাত্রের নিষ্ঠকাতাকে চূর্ণ করছে। অর্জুন আবার ফিরে এল ওটার কাছে। কীভাবে আওয়াজটাকে বন্ধ করা যায়। তার মনে পড়ল শেষবার সে যে সুইচটাকে টিপেছিল তার কথা। পাশাপাশি আর-একটি সুইচ আছে। সেটিকে টিপতেই সব শব্দ আচমকা থেমে গেল। সুইচটির গায়ে দ্বিতীয়বার চাপ দিতেই আবার শব্দ চালু হল। বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে সে তৃতীয়বার চাপ দিয়ে ইঞ্জিন বন্ধ করল।

কিছুক্ষণ সে সময় নিল ব্যাপারটা বুঝতে। যন্ত্রটায় সে বসে ছিল। সে ছিল ঘরের মধ্যে। এখন জঙ্গলে। তার মানে সে খুবই বিস্ময়কর এক জায়গায় চলে এসেছে মেশিনের কল্যাণে। এখান থেকে ফিরে যাওয়ার একমাত্র বাহন হল ওই মেশিনটি। অতএব একে হারালে চলবে না। অর্জুন ডালপালা ভেঙে পাতার আড়ালে মেশিনটাকে এমনভাবে ঢেকে রাখল যাতে চট করে কারও নজরে না পড়ে। অনেকটা নিঃসন্দেহ হওয়ার পর সে মেশিনটাকে পেছনে রেখে সোজা হাঁটতে লাগল। জায়গাটায় এত বুনো বোপ যে, বোঝাই যায় অনেককাল কেউ এদিকে আসেনি। হাঁটতে বেশ অসুবিধে হচ্ছিল। মিনিটচারেক হাঁটার পর চোখের সামনে একটা বিশাল রাস্তা দেখতে পেল। তার মনে পড়ল এতবড় রাস্তা সে যখন আমেরিকায় গিয়েছিল তখন দেখেছিল। রাস্তার দু'দিক দিয়ে একসঙ্গে আটখানা গাড়ি স্থচন্দে যেতে

পারে । মাঝখানে তিরিশ গজ অন্তর তীব্র আঙ্গো ঝুলছে ।

সে নিজের কবজির দিকে তাকাল । এখন সঙ্গে সাতটা, সেপ্টেম্বর মাসের বারো তারিখ, উনিশশো একানবইঁ । এই সঙ্গেবেলায় আকাশ নির্মেষ । অথচ সেখানে আকাশ দেখা যাচ্ছিল না । কাছাকাছি জনবসন্তি আছে কি না তাও বোঝা যাচ্ছে না । রাস্তায় নেমে বাঁ না ডান, কোনদিকে হেঁটে যাবে ঠাওর করতে পারছিল না অর্জুন ।

হঠাৎ মাথার ওপরে এয়ারবাসের ইঞ্জিনের আওয়াজ শোনা যেতে সে চোখ ওপরে তুলল । কী আশ্চর্য, ওটা কী ? নীল আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে এমন একটা আকাশযান যার আকার গোল টুপির মতো, ওই শব্দ করতে-করতে উড়ে গেল পশ্চিমে । খানিক বাদে পশ্চিম থেকে ওই একই ধরনের যান ওপরে উঠে শুন্যে মিলিয়ে গেল । এগুলো কি প্লেন ? তা হলে তার ডানা কিংবা লেজ কোথায় ?

অর্জুনের সব গুলিয়ে যাচ্ছিল । ডষ্টের গুপ্তের মেশিনটা যদি সঠিক কাজ করে তা হলে সে আর তিস্তাপারের ওই বাংলোয় নেই । কিন্তু কোথায় আছে ? এতবড় চওড়া রাস্তায় এই সঙ্গেবেলায় গাড়ি ছুটছে না কেন ? সে ঠিক করল রাস্তায় নামবে না । পাশের জঙ্গল দিয়ে সোজা হাঁটতে লাগল । শুধু জায়গাটা ছাড়ার আগে ভাল করে দেখে রাখল যাতে পরে চিনতে অসুবিধে না হয় । তিন-তিনটে সিডিঙ্গে গাছ অঙ্গুতভাবে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে । তাদের গাঁথে সোজা গেলেই ডষ্টের গুপ্তের মেশিনটা পাওয়া যাবে ।

অর্জুনের ঘড়িতে যখন নঁটা, মানে বাস্তির নঁটা, তখন পুবের আকাশে সূর্যদেব দেখা দিলেন । খুব স্বাভাবিক ভোর, নরম রোদে গাছগাছলি ঝলমল । অর্থাৎ সে সময়ের দিক থেকে অন্তত আট ঘণ্টা পিছিয়ে আছে, একটি দিনের পরিমাপে ।

দিন শুরু হতেই অন্তুত চেহারার গাড়িতে রাস্তাটা ভরে গেল । ঘাট কিলোমিটার শিপড়ে গাড়িগুলো ছুটছে, একটার সঙ্গে পরেরটার ব্যবধান দশ-বারো ফুটের । পাশাপাশি দু'মুখো রাস্তার সবকটা লেন এখন একটু-একটু করে ভরে উঠেছে । এই গাড়িগুলোকে যেন কেউ এতক্ষণ আটকে রেখেছিল, ছাড়া পেয়ে সবাই ছড়মুড়িয়ে চলছে । জঙ্গলের আড়ালে দাঁড়িয়ে অর্জুনের মনে হল ছড়মুড়িয়ে শব্দটায় একটা বিশৃঙ্খল মানে বোঝায় কিন্তু গাড়িগুলো যাচ্ছে খুবই শিষ্ট হয়ে । সবচেয়ে বড় কথা, এতগুলো গাড়ি রাস্তায় ছুটছে, কিন্তু একটিও হর্নের আওয়াজ নেই, গাড়ির বিকট শব্দ অথবা ধোঁয়া বেরোচ্ছে না । মাঝে একটি টু-হাইলার বেরিয়ে গেল । জলপাইগুড়িতে অর্জুনের লাল বাইক হলে এতক্ষণে কান ফাটাত । এই রাস্তায় কোনও ফুটপাত নেই । আমেরিকার হাইওয়েগুলোকে যেমন সে দেখেছিল তার সঙ্গে ত্ববহু মিল । অর্জুনের মনে হল সে নির্ঘাত আমেরিকায় এসে পৌঁছেছে । ওখানকার হাইওয়েতে কেউ হাত দেখিয়ে গাড়ি থামাতে যায় না । চাইলেও গাড়ি থামবে না । অতএব এখানে

অর্জুনও সেই চেষ্টা করল না । জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে লাগল ।

ঘড়িতে যখন রাত এগারোটা; এখানে তখন চনমনে রোদুর । হঠাৎ জঙ্গলটা শেষ হয়ে গেল । একটু ঢালু মাঠের পরে কিছু রঙিন ঘরবাড়ি, তাদের সামনে গাড়ি দাঁড়িয়ে । দূর থেকে বোৰা যায় মানুষজন আছে । অনেকটা কৌতুহল নিয়ে অর্জুন এগিয়ে যেতে বিপ-বিপ শব্দ কানে এল । সে মুখ ফিরিয়ে দেখল দুটো বাচ্চা মেয়ে ক্রতগতিতে সাইকেল চালিয়ে তার পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল । সাইকেল দুটো সন্তুষ্ট ফাইবার প্লাসের । চলে যাওয়ার সময় দুটো মেয়েই তার দিকে খুব অবাক হয়ে তাকিয়ে গেল ।

অর্জুন বাড়িঘরগুলোর কাছাকাছি আসতেই ভেতর থেকে কেউ একজন বেরিয়ে এল । লোকটি দুষৎ খাটো, পরনে শর্টপ্যান্ট কিন্তু তার সেলাই অন্যরকম । চোখাচোখি হতে লোকটিকেও অবাক হতে দেখল সে । কী ভাষায় কথা শুরু করবে বুঝতে না পেরে অর্জুন হাসল । তারপর ইংরেজির আশ্রয় নিল, ‘গুড মর্নিং’ ।

লোকটি ঠোঁট কামড়াল । তারপর ঘুরে ভেতরে চলে গেল । অর্জুন ফাঁপরে পড়ল । নিশ্চয়ই ও ইংরেজি জানে না । ইংরেজি না-জানা সভ্য দেশ ইউরোপে অনেক আছে । কিন্তু এই লোকটিকে দেখে মোটেই ইউরোপিয়ান বলে মনে হচ্ছে না । চিন বা জাপানের সাধারণ মানুষও ইংরেজিতে কথা বলা দরকার বলে মনে করে না । সাধারণত যেসব দেশ এককালে বিপ্রিদের অধীনে ছিল তারাই ইংরেজি শিখেছে বাধ্য হয়ে ।

অর্জুন দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকবে কি না ভাবছিল এমন সময় সেই লোকটি আবার বেরিয়ে এল এক বৃক্ষকে সঙ্গে নিয়ে । বৃক্ষের পাকা দাঢ়ি, লম্বা চুল আবার জিনসের প্যান্ট এবং কায়দা-করা শার্ট, সব মিলিয়ে অন্যরকম দেখাচ্ছে । অর্জুন খুব বিনয়ের সঙ্গে নমস্কার করল ।

বৃক্ষ হাসলেন এবং নমস্কার ফিরিয়ে দিলেন । তারপর হাত নেড়ে তাঁকে অনুসরণ করতে বললেন । অর্জুন ওঁদের পেছন-পেছন ভেতরে ঢুকল । সুন্দর সাজানো একটি ঘর । এবং দেওয়ালের একটি ছবির দিকে তাকাতেই সে খুব অবাক হয়ে গেল । ছবিটা কাচে বাঁধানো নয়, পুরো দেওয়াল জুড়ে আঁকা ।

সে প্রশ্ন না করে পারল না, “রবীন্দ্রনাথ টেগোর ?”

বৃক্ষ মাথা নাড়লেন, “টেগোর ? না । ঠাকুর । আমাদের পরমপিতা ।”

“আ-আপনি বাঙালি ?”

“বাঙালি ? হ্যাঁ, আমরা বঙ্গভাষাভাষী । প্রায় দুশো বছর আগে পরমপিতা পৃথিবীতে এসেছিলেন । আমাদের যা কিছু গৌরব তা ওঁরই দান ।” বৃক্ষ হাসলেন, “আপনি বঙ্গভাষা জানেন খুশি হলাম । আপনার নিবাস ?”

“আমার বাড়ি জলপাইগুড়ি শহরে ।”

বৃক্ষ যেন খুব অবাক হলেন । তিনি সঙ্গীর দিকে তাকালেন । সঙ্গীর চোখ

ଛୋଟ ହଲ । ବୃଦ୍ଧ ଇଙ୍ଗିତେ ଅର୍ଜୁନକେ ବସତେ ବଲଲେନ, “ମନେ ହଚ୍ଛ ଆପଣି ଆପାତତ ଅନେକଦୂର ପଥ ଭରଣ କରେଛେ । ନିଶ୍ଚୟାଇ ଥିଲେ ପେଯେଛେ ?”

ଅର୍ଜୁନ ଏକଟି ସୁଦୃଶ୍ୟ ଚେଯାରେ ବସଲ । ତାରପର ମାଥା ନେଡ଼େ ହାଁ ବଲଲ ।

ବୃଦ୍ଧ ତାଁ ସଙ୍ଗୀକେ ଇଶାରା କରତେ ମେ ଭେତରେର ଦରଜା ଦିଯେ ଚଲେ ଗେଲ । ବୃଦ୍ଧ ଏବାର ଜିଜ୍ଞେସ କରଲେନ, “ଆପନାର ପୋଶାକ ଦେଖାଇ ପ୍ରାୟ ନତୁନ । ଆମାଦେର ବାଲକ ସାଥେ ଓହିରକମ କାପଡ଼େର ପୋଶାକ ଦେଖେଛି । ଆପଣି କୋଥେକେ ଏଣ୍ଟଲୋ ସଂଗ୍ରହ କରଲେନ ?”

ଏହି ବୃଦ୍ଧ ତାର ଛେଲେବେଳାୟ ଏମନ ଜାମାପ୍ଯାନ୍ଟ ଦେଖେଛେ ? ଲୋକଟାର ମାଥା ଠିକ ଆଛେ ତୋ ? ମେ ହେସ ବଲଲ, “ଆମି ଦୋକାନ ଥେକେଇ କିମେଛି ।”

ଏହି ସମୟ ମେହି ଯୁବକ ବେରିଯେ ଏମେ ବୁନ୍ଦେର ପାଶେ ଦାଁଡ଼ିଯେ ନିଚୁ ଗଲାଯ କିଛୁ ବଲଲ । ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟଞ୍ଜନ କରିଲେନ, “ଆପନାକେ ଦେଖେ ଖୁବ ଭାଲ ଲାଗିଲ । ଆପାତତ ଏହି ସାରେ ବିଶ୍ଵାସ ନିନ । ବାହିରେର ରୋଦ ହୟତୋ ଆପନାର ପଙ୍କେ କ୍ଷତିକର ହବେ । ଆମାକେ ଏଖନଇ ଏକଟୁ ବିଶେଷ କାଜେ ବେରୋତେ ହବେ । ତତକଣ ପୁତ୍ର ଆପନାକେ ଦେଖାଶୋନା କରବେ ।” ବୃଦ୍ଧ ତଡ଼ିଘଡ଼ି ସାର ଥେକେ ବେରିଯେ ଗେଲେନ ।

ଅର୍ଜୁନକେ ଅବାକ ହତେ ଦେଖେ ଯୁବକ ବଲଲ, “ବାବା ଏକଟା ଜରାର କାଜ ଆଛେ ମିନିଟ ଦଶେକେର ମଧ୍ୟେ । ଉନି ସେଟା ଖେଳାଲ କରେନନି ।”

ଏହି ସମୟ ସାରେ ମିଟି ବାଜନା ବାଜିତେ ଲାଗିଲ । ଯୁବକ ଉଠି ଗିଯେ ଦେଓଯାଲେର ଗାୟେ ଲାଗାନୋ ଏକଟା ସୁହିଚ ଟିପତେଇ ମେଖାନେ ସିନ୍ମୀର ପଦର୍ମ ମତୋ ଆଲୋ ଫୁଟେ ଉଠିଲ । ବାଜନା ବସି ହୟେ ଗେଛେ । ଚୌକୋ ଆଲୋର ମଧ୍ୟେ ସୁନ୍ଦରୀ ମେଯେର ମୁଖ ଭେସେ ଉଠିଲ, “ବାବା ବେରିଯେ ଗେଛେ ଦାଦା ?”

“ହାଁ, ଏଇମାତ୍ର । ଆମି ମନେ କରିଯେ ଦିଲାମ ।” ଯୁବକେର ଦେଓଯାଲେର ଦିକେ ମୁଖ ।

“ଆଜକାଳ ବାବାର ଯେ କୀ ହଚ୍ଛ ! ତୁମି କୀ କରଛ ?”

“ଏକଜନ ଅତିଥି ଏମେହେନ, ତାଁର ସଙ୍ଗେ କଥା ବଲାଇ ।”

“ଅତିଥି ? କେ ? ଆମି ଚିନି ?”

“ନା । ମାନେ ସନ୍ତ୍ଵନ୍ତ ନା । ତିନି ବଲଛେନ ଜଲପାଇଣ୍ଡି ଥେକେ ଆସଛେ ।” କଥାଟା ବଲେଇ ଯୁବକ ହାସଲ । ସୁନ୍ଦରୀ ବେଶ ଅବାକ, “କୀ ଯା-ତା ବଲାଇ ?”

“ଆମି ଠିକଇ ବଲାଇ ।”

ଅର୍ଜୁନ ଶୁନିତେ ପେଲ ସୁନ୍ଦରୀ ଚାପା ଗଲାଯ ଜିଜ୍ଞେସ କରଲ, “ମାଥା ଠିକ ଆଛେ ?”

“ଏଖନେ ବୁଝାତେ ପାରାଇ ନା । କଥନ ଛୁଟି ହଚ୍ଛ ?”

“ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମଧ୍ୟେଇ । ଠିକ ଆଛେ !”

“ଠିକ ଆଛେ ।” ଦେଓଯାଲେର ଆଲୋ ମିଲିଯେ ଗେଲ । ଯୁବକ ସୁହିଚ ଅଫ କରେ ଫିରେ ଏମେ ହାସଲ, “ଆମାର ବୋନ । ଓର ରାତରେ ଚାକରି ।”

ଅର୍ଜୁନ ହତଭସ୍ତ ହୟେ ପଡ଼େଛିଲ । ତାର ମୁଖ ଥେକେ ପ୍ରଶ୍ନ ଛିଟକେ ବେର ହଲ, “ଉନି ଆପନାର ସଙ୍ଗେ କୀଭାବେ କଥା ବଲଲେନ ?”

“কেন? এই পদ্ধতি আপনি আগে দেখেননি?”

“না। আমরা টেলিফোনে কথা বলি। সেখানে শোনা যায়, দেখা যায় না।”

“আমরা শ্রবণ এবং দর্শন একই সঙ্গে বাস্তবায়িত করতে পেরেছি। আচ্ছা, আপনি মনে করার চেষ্টা করুন তো, এখানে আসার ঠিক আগে কোথায় ছিলেন?”

“কোথায় ছিলেন মানে?”

“কোনও চিকিৎসালয়ের কথা আপনার কি মনে পড়ে?”

হঠাৎ অর্জুনের খেয়াল হল। এদের কাছে তার কথা, পোশাক, আচরণ নিশ্চয়ই অন্যরকম লাগছে। স্বত্বাবতই এরা ভাবতে পারে সে কোনও মানসিক হসপাতাল থেকে পালিয়ে এসেছে। এই ভাবনাটা ওদের বেশি বিচলিত না হতে সাহায্য করছে। অতএব এদের ভুল না ভাঙানোই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

সে অভিনয় করল, “আমার মাথায় যন্ত্রণা হত খুব। তবে আজ সকাল থেকে সেই যন্ত্রণা আর নেই।”

“আপনার বাবা-মা-স্ত্রী অথবা বাড়ির ঠিকানা মনে আছে?”

“না। কিছুই মনে করতে পারছি না। তবে শরীর খুব ভাল লাগছে।”

“এই পোশাকগুলো আপনি পেলেন কী করে? কোনও চিকিৎসালয়ে তো এমন পোশাক ব্যবহার করতে দেবে না। সেখানে কি মজাদার পোশাক পরার কোনও অনুষ্ঠান হয়েছিল। মনে করে দেখুন!”

অর্জুন মাথা নাড়ল, “হ্যাঁ, মনে পড়ছে। সেরকম একটা কিছু...।”

যুবক এবার গভীর হল, “দেখুন, একজন নাগরিক হিসাবে আমার কর্তব্য এখনই জনস্বাস্থ্য বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করে আপনাকে ঠিক জায়গায় ফিরিয়ে দেওয়া। কিন্তু আপনি আমার বাবার অতিথি। তাছাড়া বলছেন আপনার শরীর ভাল আছে। অনেক সময় অবশ্য বাহিরের আলো হাওয়া খুব কাজে দেয়। দাঁড়ান, আপনার খাবার নিয়ে আসি।” যুবক ভেতরে চলে গেল।

অর্জুন কিছুক্ষণ একা-একা আকাশপাতাল ভাবল। তার নিজেকে উচ্চাদ ভাবতে কিছুতেই ভাল লাগছিল না। যুবক ফিরল একটা সুন্দর ট্রেতে খাবার নিয়ে। অর্জুনের সামনের টেবিলে ট্রেটা বসিয়ে দিয়ে বলল, “মোটামুটি এই বাড়িতে ছিল।”

অর্জুন দেখল এক বাটি সুপ, অনেকখানি সবজি সেক্ষেত্রে আর গোল ফুলকো কষ্টি দুঃখানা প্রেটে রয়েছে। সে চুপচাপ খেয়ে গেল। খিদে যে মারাঞ্চক পেয়েছিল তা খাবার মুখে দিতে মালুম হল। এমন স্বাদহীন খাবার শেষ করতে বেশি সময় লাগল না। খাবার শেষ করা মাত্র দরজায় শব্দ হল। এবং দেওয়ালে যার ছবি দেখেছিল সেই সুন্দরীকে ভেতরে ঢুকতে দেখল সে।

সুন্দরী ঘরে ঢুকতেই তাকে দেখতে পেয়েছিল। যুবক বলল, “আসুন, আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। আমার বোন বলাকা। আর্পনার নামটা জান হয়নি।”

“অর্জুন।” সে দুই হাত যুক্ত করল নমস্কার জানাতে। বলাকা স্বচ্ছলে এগিয়ে এসে ডান হাত বাড়িয়ে অর্জুনের আঙুল স্পর্শ করল, “আপনার বাড়ির লোক নিশ্চয়ই চিত্রাঙ্গদার খুব ভক্ত।”

“চিত্রাঙ্গদা?” অর্জুন হতভস্ব।

“নইলে অর্জুন নামটি তাঁরা রাখতেন না, তাই না?”

এবার বুঝল অর্জুন। বলাকা রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যের কথা বলছে।

বলাকা এবার তার দাদার দিকে তাকাল, “আমি দুটো প্রবেশপত্র পেয়েছি। আর ঠিক এক ঘণ্টা বাদে লঙ্ঘনে খেলা শুরু হবে।”

যুবক বলল, “ক্রিকেট আমার ভাল লাগে না। ফুটবল হলে যেতাম।” সে এবার অর্জুনের দিকে তাকাল, “আপনি ক্রিকেট ম্যাচ দেখতে যাবেন?”

“কোথায় হচ্ছে?” অর্জুন ভয়ে-ভয়ে জানতে চাইল।

“লঙ্ঘনে। ভারত বনাম ইংল্যান্ড।” বলাকা বলল, “এ-খবর আপনি জানেন না?”

যুবক নিচু গলায় বলল, “ওর জানার কথা নয়।”

“আমার কাছে একটি অতিরিক্ত প্রবেশপত্র আছে। যেতে চাইলে সঙ্গে আসুন।”

এই ঘর থেকে বেরনো যাবে, প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে না, অর্জুন তাই উঠে দাঁড়াল। যুবক জিজ্ঞেস করল, “তোমরা কখন ফিরছ?”

বলাকা জবাব দিল, “দু’ ঘণ্টার তো খেলা, শেষ হলেই ফিরব।”

বলাকাকে অনুসরণ করে অর্জুন হাঁটতে-হাঁটতে ভেবে পাছিল না ক্রিকেট কী করে দু’ ঘণ্টার খেলা হবে? পাঁচদিনের টেস্ট, তিনদিনের ম্যাচ থেকে এখন ওয়ান ডে-তে এসেছে। অথচ বলাকা বলছে দু’ ঘণ্টার খেলা।

পার্কিং লটে একটা লাল গাড়ি দাঁড়িয়ে। দরজা খুলে সেটায় উঠে বসে পাশের দরজা বোতাম টিপে খুলে দিল বলাকা। অর্জুন দেখল গাড়িতে গীয়ার নেই, ক্ল্যাচ নেই। সুইচ অন করে একটা বোতাম টিপতে গাড়ি ভুস করে ছুটে চলল। কয়েক সেকেন্ডেই হাইওয়ে। হঠাতে মাথার ওপরে একটা বিরাট হের্ডিং নজরে এল, “জলপাইগুড়ি শহরে সুস্থাগতম।”

জলপাইগুড়ি শহর? অর্জুন সোজা হয়ে বসল, এটা জলপাইগুড়ি শহর নাকি? যে-শহরে সে জন্মেছে, বড় হয়েছে, তার কিছুই চেনা মনে হচ্ছে না? এতবড় হাইওয়ে করে জলপাইগুড়িতে ছিল? শহরের মধ্যে সরু ঘিঞ্জি কিছু রাস্তায় যাতায়াত করত সবাই।

সে জিজ্ঞেস করল, “তিঙ্গা নদীটা কোন দিকে?”

বলাকা হাসল, “শুনলাম আপনি বলেছেন যে, জলপাইগুড়িতে আপনার গাড়ি, তিস্তা নদীর কী অবস্থা তা জানেন না।”

অর্জুন বুঝল। কেন বৃক্ষ এবং যুবক তার কথা শুনে অমন অবাক হয়েছিল। তাকে চুপ করে থাকতে দেখে বলাকা জিজ্ঞেস করল, “আচ্ছা, আমাকে সত্যি কথা বলুন তো? আপনার পরিচয় কী?”

অর্জুন হাসল। সত্যি কথা বলে কোনও লাভ নেই। কেউ তাকে বিশ্বাস করবে না। সে মাথা নাড়ল, “আমার কোনও কথাই মনে পড়ছে না।”

“কোনও কষ্ট হচ্ছে?”

“বিন্দুমাত্র নয়।”

পিলপিল করে গাড়ি ছুটে চলেছে। নানা ধরনের গাড়ি, কিন্তু কোনও শব্দ নেই। দিনটা ভালই। বলাকা বলল, ‘আমরা স্টেডিয়ামের দিকে যাচ্ছি। আপনি তিস্তার কথা বলছিলেন, এই দেখুন।’

বলাকার আঙুল অনুসরণ করে অর্জুন দেখল একটা বড় নোটিস বোর্ডে লেখা আছে, “আপনারা তিস্তার ওপর দিয়ে যাচ্ছেন।”

মানে? বলাকা যা বলল তা হল, এককালে তিস্তা নাকি সারা বছর শুকিয়ে থাকত। অনেকখানি জায়গা শহরের পাশে বালির চর হয়ে পড়ে নষ্ট হত। মাঝে-মাঝে বর্ষায় বন্যা হত এই যা। বেশ কিছু বছর আগে পাহাড় থেকে যেখানে তিস্তা নীচে নামছে সেখান থেকেই মাটির তলায় বিশাল টানেল করে নদীর জল নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ছড়িয়ে পড়ার সুযোগ না থাকায় সারাবছর সেখানে জল থাকে। শ্রোতও। ফলে ভাল বিদ্যুৎ তৈরি হচ্ছে। আর ওপরের সালি জমিকে নানান কাজে লাগানো সম্ভব হয়েছে। শহরের পাশে সেই বিরাট চরেই গড়ে উঠেছে খেলাধুলোর নানান ঘেরা মাঠ।

পেটের ভেতর চিনচিন করতে লাগল অর্জুনের। সেই বিখ্যাত চর উধাও? তিস্তা-গ্রিজের দরকার নেই। এখানে স্টেডিয়াম হয়েছে। জলপাইগুড়িতে স্টেডিয়াম বলতে ছিল কয়েকটা গ্যালারি নিয়ে হাকিমপাড়ার টাউন ক্লাব। আর বলাকা যেখানে গাড়ি পার্ক করল, লম্বা ট্রলি জাতীয় গাড়ি তাদের তুলে নিয়ে যেদিকে এগিয়ে যাচ্ছে সেদিকে অর্ধেকটা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে বিশাল স্টেডিয়াম। কবে হল এসব? এত লোক আজ খেলা দেখতে এসেছে তবু আমেলা হচ্ছে না এতক্ষুণ্ণ! প্রবেশপত্র দেখিয়ে মাঠে ঢোকা হতে চোখ জুড়িয়ে গেল অর্জুনের। এমন সবুজ মাঠ, ঝকঝকে স্টেডিয়াম সে কখনও দেখেনি। মাঠের দু'দিকে স্কোরবোর্ড রয়েছে। আর একপাশে বিশাল একটা ক্যামেরাজাতীয় যন্ত্র মাঠের দিকে মুখ করে রাখা হয়েছে। গ্যালারি ইতিমধ্যেই ভরে উঠেছে।

এই সময় আকাশবাণী শোনা গেল, “প্রিয় বঙ্গুগণ, আর কিছুক্ষণ বাদেই ইংল্যান্ডের লর্ডস মাঠে ভারত বনাম ইংল্যান্ডের ক্রিকেট খেলা শুরু হবে। দুই

দলে যাঁরা খেলছেন তাঁদের নাম নিশ্চয়ই আপনারা জানেন। তবু আর-একবার জানানো হচ্ছে। ভারতীয় দলের অধিনায়ক স্পন্সর। দলে আছেন...।”

অর্জুন কান পেতে শুনল। একটি নামও তার চেনা বলে মনে হল না। পাশে বসা বলাকাকে সে না জিজ্ঞেস করে পারল না, “শ্চীন খেলছে না?”

“কে শ্চীন?”

“শ্চীন তেঙ্গুলকর। বিস্ময়-বালক।”

“বিস্ময় বালক মানে? এরকম নাম তো কখনও শুনিনি।” বলাকা অবাক।

অর্জুনের ডান দিকে বসা এক বৃদ্ধ বললেন, “শ্চীন তেঙ্গুলকর? নামটা কিছু কোথায় পড়েছি বলে মনে হচ্ছে।”

তাঁর ওপাশে বসা এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক গভীর গলায় বললেন, “অনেকদিন আগে ওইরকম নামের এক ভদ্রলোক নাটক লিখতেন। মারাঠি ভাষায়।”

“কতদিন আগে?” প্রথম বৃদ্ধ জানতে চাইলেন।

“সময়টা ঠিক মনে নেই। নাটকের ওপর একসময় পড়াশোনা করেছিলাম। তখন পড়েছিলাম। তবে প্রথম নামটা নিশ্চয়ই শ্চীন নয়।” দ্বিতীয় বৃদ্ধ জবাব দিলেন।

অর্জুন আর কথা বাড়াল না। হঠাৎ বাজনা বেজে উঠল। আকাশবাণী হল, “খেলা শুরু হচ্ছে। এখন আমরা আপনাদের সামনে লর্ডস মাঠকে উপস্থিত করছি।”

সঙ্গে-সঙ্গে মাঠের একপাশে দাঁড় করানো ক্যামেরাজীয় যন্ত্রটা চালু হল। অর্জুন অবাক হয়ে দেখল স্টেডিয়ামের মাঝখানে মাঠটা মুহূর্তেই বদলে গিয়ে লর্ডস মাঠে পরিণত হল। আম্পায়ার দুই অধিনায়ককে দিয়ে টস করাচ্ছেন। ইংল্যান্ড টসে জিতে প্রথম ঘন্টার ব্যাটিং নিল। এই মুহূর্তে লর্ডসে বসে থাকলে সে যেমনটি দেখত, জলপাইগুড়িতে বসে ঠিক তেমনই দেখছে। মাঠ, খেলোয়াড়। এক শুধু দর্শকরা পালটে গেছে। সে বলাকাকে না জিজ্ঞেস করে পারল না, “অত হাজার মাইল দূরে যে খেলা হচ্ছে তা এই মাঠে কী করে দেখানো সম্ভব?”

বলাকা হাসল, “আপনি সত্যি সব ভুলে গেছেন! আমার ঠাকুর্দার ঠাকুর্দার ঘরে বসে লর্ডসের খেলা দূরদর্শন যন্ত্রে দেখতেন। সেটা কী করে সম্ভব হয়েছিল? শুধু চারচোকে বাস্তুর পরদায় ছবিটাকে না রেখে এই বড় মাঠে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এতে মেজাজটা ভাল পাওয়া যায়। পৃথিবীর অস্তত তিনশোটা মাঠে একই সঙ্গে মানুষ খেলাটা দেখতে পাচ্ছে।”

খেলা চলাকালীন এমন ময় হয়ে গিয়েছিল অর্জুন যে, অন্যদিকে মন ছিল না। প্রথম ঘন্টায় ইংল্যান্ড আশি রান করল তিন উইকেট হারিয়ে। ভারত বল করেছে কুড়ি ওভার। দ্বিতীয় ঘন্টার জন্য ভারত নেমেই একটা উইকেট খোয়াল। সমস্ত স্টেডিয়াম জুড়ে হাহাকার। ইংল্যান্ড উনিশ ওভার বল করলে

ভারত রান তুলল তিন উইকেটে ছিয়ান্তরে । খেলা শেষ । কিন্তু যেহেতু ইংল্যান্ড এক ওভার কম বল করেছে তাই ভারত চার রান বোনাস পেল । ফলে দুই দলের স্কোর হয়ে গেল সমান-সমান, আশি । ম্যাচ ড্র । বলাকা বলল, “আজকাল প্রায়ই দেখছি ম্যাচ ড্র হচ্ছে । চলুন ।”

অর্জুন নিজের ঘড়ির দিকে তাকাতে পুরনো সময় দেখতে পেল । বলাকার চোখ পড়েছিল তার ঘড়ির ওপর । সে প্রায় চেঁচিয়েই উঠল, “ও মা, এ কীরকম ঘড়ি আপনার ? দেখি, দেখি ।”

বাধ্য হয়ে নিজের কবজিটাকে তুলে ধরল অর্জুন । বলাকা সেটাকে দেখতে-দেখতে বলল, “খুব দাম হবে ঘড়িটার । পুরনো জিনিস সহজে পাওয়া যায় না । কিন্তু আপনার ঘড়ি যে উলটোপালটা সময় দিচ্ছে ।”

অর্জুন মাথা নাড়ল, “ঠিক করা হয়নি ।”

“কিন্তু তারিখটা ? কী লেখা আছে ?”

অর্জুন ইংরেজিতে তারিখটা দেখল । এবং তখনই খেয়াল হল এখানে আসার পর থেকে সে একটিও ইংরেজি শব্দ শুনতে পায়নি । বলাকাদের পরিবারের কেউই কথার মধ্যে ইংরেজি বলেনি । হয়তো এখানে কেউ ইংরেজি শেখে না । এই কারণেই বলাকা পড়তে পারছে না তারিখটা, সে দেখল অন্তু দৃষ্টিতে বলাকা তাকে দেখছে । একটা কিছু জবাব দিতেই হয় । কিন্তু তার আগেই বলাকা বলল, ‘নিশ্চয়ই এটাও আপনার মনে পড়ছে না । চলুন ।’

বলাকার পেছন-পেছন হাঁটতে-হাঁটতে অর্জুনের মনে হল মেয়েটা তার অস্তিত্ব সম্পর্কে এবার বেজায় সন্দেহ করছে, সে কী করে এদের বোঝাবে উনিশশো একানবই খ্রিস্টাদে শিলিঙ্গড়ির কাছে একটা বাংলোয় ছিল ! আর এখন ঠিক কোন সাল তাই তো বোঝা যাচ্ছে না ।

গাড়িগুলো ফিরছিল । হাইওয়ের গায়ে মাঝে-মাঝে লেখা, ডান দিকের সরু পথ দিয়ে জলঘোংকেন্দ, বিশ্বামুলয় । তিন নম্বর বাহিরপথ বিমানবন্দরের জন্য । বিমানবন্দর ? জলপাইগুড়ি শহরে এয়ারপোর্ট আছে নাকি ?

হঠাতে বলাকা বলল, “আপনি এতক্ষণ আমাদের সঠিক কথা বলেননি । হতে পারে আপনার মন্তিক স্থির নেই কিন্তু আপনার পোশাক, ঘড়ি, কথবার্তায় এখনকার কিছুই ধরা পড়ছে না । আপনাকে সরকারি কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেওয়া উচিত । কিন্তু তার আগে আপনাকে আমি জলপাইগুড়ি শহরটা ঘূরিয়ে দেখাব ।” কথা বলতে-বলতেই বলাকা হাইওয়ে থেকে শহরে যাওয়ার পথ ধরে ডান দিকে বাঁক নিল । অর্জুনের মনে পড়ল আমেরিকার হাইওয়েতে এইরকম পথগুলোকে এগজিট বলে । গঠনটা ঠিক একই ধাঁচের, বাঁ দিকের কার পার্কিং-এ গাড়ি দাঁড় করিয়ে বলাকা গাড়ির বোতাম টিপল । সঙ্গে-সঙ্গে চার ইঞ্জিটাক টিভি ক্রিন বেরিয়ে এল ড্যাশ বোর্ডের একধারে । বাজনা বাজছে কোথাও । এবারে সেই ক্রিনে বলাকার দাদাকে দেখা গেল, “কী ব্যাপার ?”

“বাবা ফিরেছেন ?”

“হ্যাঁ । একটু আগে । তোমরা কোথায় ?”

“ছয় নম্বর বাহির পথে । আমরা একটু শহরে যাচ্ছি ।”

“কেন ?”

“অর্জুনকে শহর দেখাব ।”

“একটু সতর্ক থেকো । বাবা ইতিমধ্যে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেছেন । তাঁরা অত্যন্ত কৌতুহলী হয়েছেন । ঠিক এক ঘন্টা বাদে ওঁর সঙ্গে কথা বলতে সবাই এখানে আসছেন । এর ভেতরেই চলে এসো ।” আলো নিভে গেল । বলাকা সুইচ টিপে ক্রিন্টাকে আবার ভেতরে চালান করে দিয়ে বলল, “শুনলেন তো ? এরার সত্যি কথা না বলে আপনার কোনও উপায় নেই । এই শহরের কোথাও আপনি লুকিয়ে থাকতে পারবেন না । আপনি আমাকে সব কথা খুলে বলতে পারেন ।”

অর্জুনের গলা শুকিয়ে গিয়েছিল । বলাকা যে একটুও মিথ্যে বলছে না তা সে বুঝতে পারছিল, কিন্তু কী করে সঠিক ব্যাপারটা সে বোঝাবে । বলাকা আবার গাড়ি চালু করে গুনগুন করে সুব ধরল, “আর আমি যে কিছু চাহিনে ।” হঠাতেই সে থেমে গিয়ে অশ্ব করল, “পরের লাইনটা কী বলুন তো ?”

অর্জুনের মনে পড়ল দেবৰত বিশ্বাসের গলায় রবীন্দ্রনাথের এই গানটি সে শুনেছে । মনে করেই সে জবাব দিল, “জননী বলে শুধু ডাকিব ।”

“বাঃ । খুব ভাল । এবার বলুন ।”

গাড়ি এখন শহরের মধ্যে চুক্কে সব পালটে গেছে, সব । যদি অতবড় তিণ্টা নদীকে ছেট করে পাতালনদী করে দেওয়া সম্ভব হয়ে থাকে তা হলে শহরটার ভোল পালটাবেই । সে জিজ্ঞেস করল, “করলা নদী কোথায় ?”

“করলা ? সেটা আবার কী ?”

অর্জুন এবার মরিয়া হল । যা হওয়ার হোক, বলাকাকে ব্যাপারটা বলা দরকার । সে বলল, “অনুগ্রহ করে কোথাও গাড়ি দাঁড় করাবেন যেখানে আমরা কথা বলতে পারি ?”

বলাকা ওর দিকে তাকাল, তারপর মাথা নাড়ল । দু'পাশে বড়-বড় ঝকঝকে বাড়ি । মাঝখানে নিয়ন্ত্রিত যানবাহন চলছে । সব আধুনিক গাড়ি । একটা সিঁড়ি দিয়ে কিছু লোক নীচে নেমে গেল, তার মানে এখানে পাতালরেলও রয়েছে, জলপাইগুড়ি শহরের একটি বাড়ি বা দোকানকে সে এখন কোথাও দেখতে পাচ্ছে না ।

এখন পার্কিং প্লেস পাওয়া খুবই মুশকিল, বলাকা আধ ঘন্টার জন্য একটা জায়গায় গাড়ি রেখে পাশের রেস্টুরেন্টে তাকে নিয়ে চুকল । রেস্টুরেন্টে একজনই কর্মচারী । থরে-থরে খাবার সাজানো আছে । মানুষজন সেগুলো প্লেটে তুলে কর্মচারীটিকে দাম দিয়ে টেবিলে গিয়ে বসছে । এমন ঝকঝকে

ରେସ୍ଟୁରେନ୍ଟ ଜଲପାଇଣ୍ଡିତେ କଥନ୍ତି ଛିଲୁ ନା ।

ଦୁ' କାପ କଫି ନିଲ ବଲାକା ; ନିଲ ମାନେ କଫିର ଲିକାର କାପେ ଢେଲେ ତିନି ମିଶିଯେ ନିଲ, ଦୁଧ ଢାଲି ନା । ତାରପର ଟ୍ରେ ହାତେ ଏଗିଯେ ଗେଲ ଦାମ ଦେଓଯାର ଜନ୍ୟ । ଅର୍ଜୁନେର ମନେ ହଲ ବଡ଼ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ହେୟ ଯାଛେ । ଏରା ଏର ମଧ୍ୟେ ପ୍ରଚୂର ଉପକାର କରେଛେ ତାର । ଅତ୍ରେବ କଫିର ଦାମ ତାରଇ ଦେଓଯା ଉଚିତ ।

ପକେଟ ଥେକେ ଏକଟା ଦଶ ଟାକାର ନୋଟ ବେର କରେ ବଲାକା କିଛୁ ବଲାର ଆଗେଇ ମେଲେ କର୍ମଚାରୀଟିର ସାମନେ ଗିଯେ ଦାଁଡାଳ, “ଦୁଟୋ କଫିର ଦାମ କତ ?”

“ଦୁ' ହାଜାର ।” କର୍ମଚାରୀ ଜବାବ ଦିଲ ।

ହକ୍କକିଯେ ଗେଲ ଅର୍ଜୁନ । ଦୁ' ହାଜାର ଟାକା ଦୁ' କାପ କଫିର ଦାମ ? ତାର କାହେ ତୋ ଅତ ଟାକା ନେଇ । ପେଛନ ଥେକେ ବଲାକା ବଲଲ, “ଆପନି ସରେ ଦାଁଡାଳ, ଆମି ଦିଛି ।” ଟ୍ରେ-ଟାକେ ପାଶେର ଟେବିଲେ ରେଖେ ମେଲେ ନିଜେର ବ୍ୟାଗ ଖୁଲେ ଏକଟା କାର୍ଡ ବେର କରେ କର୍ମଚାରୀଟିକେ ଦିତେଇ ଭଦ୍ରଲୋକ ମେଶିନେ ସେଟା ପାଞ୍ଚ କରେ ଫିରିଯେ ଦିଲ ।

ରେସ୍ଟୁରେନ୍ଟେର ଏକ କୋଣେ ମୁଖୋମୁଖୀ ଦୁଟୋ ଚେଯାରେ ବସେ ବଲାକା ଜିଜ୍ଞେସ କରଲ, “ଆପନାର ହାତେ ଓଟା କୀ ?”

ଦଶ ଟାକାର ନୋଟ ତଥନ୍ତି ହାତେଇ ଛିଲ, ସେଟା ନିଃଶ୍ଵରେ ଏଗିଯେ ଦିଲ ଅର୍ଜୁନ । ବଲାକା ସବିଶ୍ୱାସେ ସେଟାକେ ଦେଖଲ । ତାରପର ଜିଜ୍ଞେସ କରଲ, “ଏଟା କୋଥାୟ ପେଲେନ ?”

“ଆମାର କାହେଇ ଛିଲ । ଆମାଦେର ସମୟ ଏହି ଦଶ ଟାକାଯ ପାଁଚ କାପ କଫି ପାଓଯା ଯେତ ।”

“ଆପନାଦେର ସମୟେ ମାନେ ?”

“ଉନିଶଶ୍ଚୋ ଏକାନବଇ ଖିସ୍ଟାବ୍ଦ । ଆପନାକେ ଆମି ସବ କଥା ଖୁଲେ ବଲାଇ । ତାର ଆଗେ ବଲୁନ, ଏଟା କୋନ ସାଲ, ମାସ, ଖିସ୍ଟାବ୍ଦ ?”

“ଆପନାର କଥା ଆମି କିଛୁଇ ବୁଝିତେ ପାରାଇ ନା । ଆଜ ଚବିବିଶେ ବୈଶାଖ, ପନ୍ଦରୋଶୋ ଆଟ୍ସଟି-ସାଲ ।” ବଲାକା ଜବାବ ଦିଲ ।

“ତାର ମାନେ, କାଲ ପାଞ୍ଚଶିଶେ ବୈଶାଖ ? ରବିଶ୍ଵନାଥେର ତିନଶ୍ଚୋ ବଛର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବେ ?”

“ହ୍ୟା । କାଲ ଆମାଦେର ବିରାଟ ଉଂସବ ।”

ଅର୍ଜୁନ ମନେ-ମନେ ହିସାବ କରଲ, ବଲାକାର କଥା ଯଦି ଠିକ ହ୍ୟ ତା ହଲେ ମେଲେ ଏକଶୋ ସନ୍ତର ବଛର ପରେର ଜଲପାଇଣ୍ଡି ଶହରେ ବସେ ଆହେ । ତାର ମାନେ ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀପ୍ରେମ ତାକେ ଏକଶୋ ସନ୍ତର ବଛର ଭବିଷ୍ୟତେ ନିଯେ ଏସେଛେ । ସେ ଧୀରେ-ଧୀରେ ସବ କଥା ବଲାକାକେ ଖୁଲେ ବଲଲ ।

ଶୁନତେ-ଶୁନତେ ବଲାକା ଖୁବ ଉତ୍ୱେଜିତ, “ଆପନି ପ୍ରଧାନ ଦିତେ ପାରବେନ ?”

“ନିଶ୍ଚୟାଇ । ଏହି ପୋଶାକ ଉନିଶଶ୍ଚୋ ଏକାନବଇ ଖିସ୍ଟାବ୍ଦେ ଆମରା ପରି । ଏହି ସତି ତଥନ ସ୍ଵାଭାବିକ ଛିଲ । ଏହି ଯେ ନୋଟ ଦେଖିଛେନ, ଏଟା ଦଶ ଟାକାର, ତଥନ ସାରା ଭାରତବର୍ଷେ ଏଟାଇ ଚାଲୁ ଛିଲ ।” ଅର୍ଜୁନ ବୋଖାତେ ଚାହିଲ ।

বলাকা কী বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। সে জিজ্ঞেস করল, “আপনার এখন বয়স কত ?”

অর্জুন জবাব দিল, “তেরোশো আটানবই সালে বাইশ বছর ছিল।”

“তা হলে তো এখন একশো বিরামবই হয়েছে ?”

“হয়নি, কারণ আমি এক মুহূর্তে এখানে এসেছি। আপনি মহাভারত পড়েছেন ? মহাভারতে অর্জুন নামে একজন বীর ছিলেন। তিনি স্বর্গে গিয়েছিলেন আচমকাই, জীবিত অবস্থায়। সেখানে থাকার সময় তার বয়স বাড়েনি।”

“মহাভারত ? নাম শুনেছি। আসলে রবীন্দ্রনাথের নাম ছাড়া আর কিছু পড়ার সময় আমাদের নেই। ওর গানই আমাদের পুজোর মন্ত্র। কী অঙ্গুত লাগছে আপনাকে দেখে, সবাইকে ডেকে বলতে ইচ্ছে করছে।”

“প্রিজ, সেটা করবেন না, আমার বিপদ হবে।”

“প্রথম শব্দটা কী বললেন ?”

“প্রিজ, মানে অনুগ্রহ করে। এটি ইংরেজি শব্দ।”

“ও, ব্রিটিশদের ভাষা। আমরা বাংলা ছাড়া অন্য ভাষা বলি না।”

“কিন্তু ভারতবর্ষ তো বিরাট দেশ, তার ভাষাও অনেক...।”

“নিশ্চয়ই। শুনেছি এই কারণে এক সময় ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে দাঙ্গা হত। কেউ-কেউ বিচ্ছিন্ন হতে চেয়েছিল। শেষপর্যন্ত ঠিক হল প্রত্যেক প্রদেশকে একমাত্র বৈদেশিক ব্যাপার ছাড়া অন্য সব ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধিকার দেওয়া হবে। এর পরে আর কোনও সমস্যা নেই। দেশের মধ্যে আমরা সাধারণত নিজেদের নিয়ম মেনে চলি। কিন্তু আপনার কথা যদি সত্য হয় তা হলে আপনি আমার পূর্বপুরুষ ?” অঙ্গুত চোখে তাকাল বলাকা।

অর্জুনের লজ্জা হল। বলাকা তার সমবয়সী বলা যায়।

“আপনি সত্যি এই শহরে ছিলেন ?”

“হ্যাঁ। শহরটা তখন এরকম ছিল না।”

“কী রকম ছিল ?”

“মফস্বল শহর যেমন হয়। হাইওয়ে ছিল না। একটা বাইপাস ছিল। নদী ছিল বিশাল এবং প্রায়ই জল থাকত না। উনিশশো আটবিংক স্টান্ডের বন্যার পর শহরটা প্রায় নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। তিন-চারতলা বাড়ি হাতে গোনা যেত। মানুষজন ছিল ভাল, কিন্তু জীবনের বেশিরভাগ সুযোগ-সুবিধে থেকে বঞ্চিত ছিল। তখন লক্ষনে খেলা হলে আমরা টিভিতে দেখতে পেতাম।”

বলাকা বলল, “আমি আপনার এসব কথা অনুমানও করতে পারছি না। ঠিক আছে, আপনি আমার সঙ্গে ইতিহাস-ঘরে চলুন।”

“ইতিহাস-ঘর ?”

“হ্যাঁ। আমাদের শহরের যাবতীয় অতীতের তথ্য সেখানে রাখা আছে।

বাদি আমার হাতে বেশি সময় নেই, তবু আপনার কথা জানার পর যেতে ইচ্ছে করছে । ”

কফির কাপ এবং ট্রে একটি বিশেষ বাল্কে তুকিয়ে দিয়ে বলাকা অর্জুনকে নিয়ে বের হল । গাড়ি মিনিট-তিনেকের মধ্যেই পৌঁছে গেল একটা দশ তলা বাড়ির সামনে । নিজের পরিচয়পত্র দেখিয়ে বলাকা সেখানকার ছুটস্ট সিঁড়িতে চেপে অর্জুনকে নিয়ে সাত তলায় পৌঁছে গেল । দরজার ওপর লেখা আছে, অতীত দুঃশো বছর । নিস্তুর বিশাল হলঘর । শীর্ণদেহ কিন্তু খুব স্মার্ট এক বৃক্ষ ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন, “কোনও সাহায্যে আসতে পারি ?”

“হ্যাঁ । আমরা এই শহরটার অতীত সম্পর্কে জানতে চাই ।”

“কী জানতে চান আপনারা ?”

“শহরটা তৈরি হয়েছিল কবে ?”

“জলপাইগুড়ির মূল শহর তৈরি হয় কয়েকশো বছর আগে, পুনর্গঠিত হয় আশি বছর ।” বৃক্ষ ওদের নিয়ে একটা বড় ডেঙ্কের সামনে চলে এলেন ।

অর্জুন জিজাসা করল, “উনিশশো একানবই মানে তেরোশো আটানবই সালের জলপাইগুড়ি সম্পর্কে কিছু বলুন ।”

বৃক্ষ মাথা নাড়লেন । তারপর নামারকম বোতাম টিপতে লাগলেন । ধীরে-ধীরে বোর্ডের ওপর একটা ম্যাপ ফুটে উঠল । অর্জুন উত্তেজিতভাবে তাকাল । হ্যাঁ, শহরের ম্যাপ । বাড়ি, রাস্তা । বৃক্ষ বললেন, “অনেকটাই অনুমান-নির্ভর ম্যাপ । কিছু ছবি আর বইপত্র ঘেঁটে তৈরি । তখন তিস্তা শহরের পাশে ছিল অনেকটা জায়গা নিয়ে । এই যে ।”

বৃক্ষের স্টিক অনুসরণ করে অর্জুন তাকাতে নদীর চিহ্ন দেখতে পেল । তিস্তা যদি ওটা হয়, তা হলে পাশেই সেনপাড়া এবং হাকিমপাড়া । সে জিজেস করল, “তিস্তা সেতুটা কোথায়, যার ওপর দিয়ে ডুয়ার্সে যাওয়া যেত ?”

“সেতু ? শহরের ছবিতে তিস্তার ওপরে কোনও সেতু নেই । রাস্তাগুলো ছিল খুব সরু । কিছু ব্যক্তি চা-ব্যবসার কল্যাণে ধনী ছিলেন, কিন্তু অনেকেই দরিদ্র ।”

হঠাতে অর্জুন চিন্কার করে উঠল, “ওই তো করলা নদী !”

বৃক্ষ ফিরে তাকালেন, “হ্যাঁ, তখন ওই নামে একটা খাল ছিল কিন্তু এ-তথ্য আপনি জানলেন কী করে ?”

অর্জুন হকচকিয়ে গেল । উত্তেজিত হওয়াটা ঠিক হ্যানি । বলাকা বলল, “উনি ওই সময় সম্পর্কে অনেক কিছু জানেন ।”

“তাই নাকি ? আমাদের এই ইতিহাস-ঘরের বাইরে তথ্য আছে ? বেশ, তখন অঞ্চলগুলোকে কীভাবে ভাগ করা হত বলুন তো ?”

“পাড়া হিসাবে । আলাদা নাম ছিল পাড়ার । এই যে তিস্তার পাশে আর করলার মধ্যে জায়গাটা, এর নাম ছিল হাকিমপাড়া । এইটে স্টেডিয়াম । আমরা

টাউন ফ্লাব স্টেডিয়াম হিসাবে জানি।” অর্জুন উজ্জ্বল মুখে বলল।

“আপনি ঠিক বলছেন। এত বিশদ আমিও জানি না।”

“এই ইতিহাস-ঘর ওই ম্যাপের কোনখানে হবে?”

বৃন্দ তাঁর স্টিকটি যেখানে রাখলেন সেদিকে তাকিয়ে অর্জুন বলল, “আরে, এটা তো জলপাইগুড়ির রাজবাড়ি। পাশে একটা মন্দির ছিল, মন্দিরের পাশে বিরাট বিল। দাঁড়ান, এই সোজা চলে এলাম, দিনবাজারের পুল পেরিয়ে সোজা কদমতলার রাস্তায়, হ্যাঁ, এই জায়গাটাকে এখন কী বলে?”

“পাতালরেল দফতর।”

অর্জুন হতভম্ব। বাড়িটা যেখানে সেখানে একশো সপ্তর বছর বাদে পাতাল রেলের দফতর হবে। রাজবাড়ির চিহ্ন থাকবে না। সে জলপাইগুড়ির জেলা স্কুলটাকে খুঁজল। শ্যামাপ্রসাদবাবু এখন হেডমাস্টারমশাই। খুব ভাল লোক। সে জায়গাটা দেখিয়ে বলল, “এইটে একটা বড় স্কুল।”

বৃন্দ মাথা নাড়লেন, “ওটিকে মহাবিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা হয়েছে। কিন্তু মহাশয়, আপনি এত তথ্য জানতে পারলেন কী করে?”

অর্জুন হাসল, “জেনেছি। আচ্ছা, মোটে তো একশো সপ্তর বছর। এমন কোনও প্রবীণ মানুষের কথা কি জানেন, যিনি তাঁর পিতা বা পিতামহের কাছে অতীত দিনের কথা শুনে মনে রেখেছেন?”

বৃন্দ হাসলেন, “আমিই শুনেছি। আমার পূর্বপুরুষের চা-বাগান ছিল। আপনি যে সময়ের কথা বলছেন তার একটু আগে একজন পূর্বপুরুষ ছিলেন যাকে নাকি জলপাইগুড়ি শহরের পিতা বলা হত।”

অর্জুন আচমকা জিজ্ঞেস করল, “তাঁর নাম কি এস পি রায়?”

“এস পি ? হ্যাঁ তিনি রায় ছিলেন। সত্যেন্দ্রপ্রসাদ রায়।”

“আপনি সত্যেন্দ্রপ্রসাদের বৎসর কি?” অর্জুন হতভম্ব।

“আপনি এমনভাবে কথা বলছেন যেন তাঁকে চেনেন?” বৃন্দ এবার বেশ অবাক হলেন। এই সময় বলাকার হাতের ঘড়িতে বিপ্র বিপ্র শব্দ শুরু হল। সে বৃন্দকে জিজ্ঞেস করল, “আপনার দুরাতাব আমি ব্যবহার করতে পারি?”

“অবশ্যই।” দূরের একটি ডেক্স দেখিয়ে দিলেন।

বলাকা সেদিকে এগিয়ে গেল। ডেক্সের উলটোদিকে দূরদর্শনের পরদার মতো একটা পরদায় আলো জ্বলে উঠল বলাকা বোতাম টিপতেই। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “আচ্ছা, সেই সময় যে-সমস্ত মানুষ বিখ্যাত ছিলেন তাঁদের নাম জানা যাবে?”

বৃন্দ বললেন, “নিশ্চয়ই। কলকাতার বিখ্যাত মানুষদের সংখ্যা অনেক। সেসব তথ্য পেতে কষ্ট হয়নি। বিভিন্ন জেলার মানুষদেরও আমরা যতটা সপ্তর এই সংগ্রহে রেখেছি।” ভদ্রলোক বোতাম টিপতেই ম্যাপ মুছে গেল। এবার তিনি জিজ্ঞেস করলেন, “আপনি কী ধরনের মানুষের কথা জানতে চান?”

“ভাল খেলোয়াড় ?”

বোতাম টেপা হল। অর্জুন দেখল দুটো নাম ফুটে উঠেছে। তেরোশো পঞ্চাশের পর দু'জন বিখ্যাত খেলোয়াড় হলেন, রংগু গুহ্ঠাকুরতা এবং মণিলাল ঘটক। এঁরা ফুটবলে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন।

“শিল্পী ?”

বোতাম টেপা হল। না। সেই সময় জলপাইগুড়িতে ভারতবিখ্যাত শিল্পী ছিলেন না।

হঠাতে অর্জুনের মাথায় ডক্টর গুপ্তের কথা ভেসে উঠল। ডক্টর গুপ্ত নিশ্চয়ই বিখ্যাত মানুষ। যদিও অনেকেই তখন তাঁর নাম জানত না। কিন্তু শিলিগুড়ির কাছে যেখানে ওঁর গবেষণাগার সেটা জলপাইগুড়ি জেলায় পড়ে না। সে একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করল, “দার্জিলিং জেলার বিবরণ আছে ?”

বৃদ্ধ তাকে পাশের টেবিলে নিয়ে গেলেন। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “তেরোশো আটানবই সালে ডক্টর গুপ্ত নামে একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ছিলেন...।”

বৃদ্ধ বোতাম চিপলেন। পরদায় ফুটে উঠল দার্জিলিং জেলার দুশো বছরের বিখ্যাত বিজ্ঞানী—ডক্টর এস. বি. গুপ্ত এবং তাঁর পরে অনেক নাম।

অর্জুনের মনে পড়ল না, ডক্টর গুপ্তের প্রথম নাম এস বি কি না। তবে এই মানুষটি যে তিনিই, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। সে বলল, “ওই ডক্টর এস বি গুপ্ত সম্পর্কে বেশি কিছু জানলে ভাল লাগবে।”

ডক্টর গুপ্তের নামের পাশের একটা নীল আলো দপদপ করতে লাগল। তারপর পরদায় লেখাগুলো ফুটে উঠল, ডক্টর সুরুবত গুপ্ত। মহাকাশ নিয়ে গবেষণা করে চোদশো সাত সালে নোবেল পুরস্কার পান। তিনি অকৃতদার ছিলেন। তেরোশো আটানবইতে এক দুর্ঘটনায় তাঁর মস্তিষ্কে আঘাত লাগে এবং কিছুদিন চিকিৎসাধীন থাকেন। সুস্থ হওয়ার পর দেখা যায় তিনি অসাধারণ মেধাসম্পন্ন হয়েছেন। চোদশো দশ সালে তিনি আত্মহত্যা করেন। তাঁর গবেষণার জন্যই এখন সূর্যের সংসারের বাইরে অন্য একটি গ্রহের সঙ্গে পৃথিবীর যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু হয়েছে। গ্রহটির নামকরণ তাঁর সম্মানে করা হয়েছে সুরুবত।

অর্জুনের কথা বৰ্ত হয়ে যাওয়ার উপক্রম হল। তার মানে ডক্টর গুপ্ত মারা যাননি। আরও কয় বছর গবেষণা করার পরে উনি নোবেল পাবেন। এই উত্তেজনাপূর্ণ খবর তিনি নিজেও জানেন না।

কতক্ষণ এইসব নিয়ে সে মঞ্চ ছিল জানে না। চৈতন্য হল যখন সে দেখল, বলাকার সঙ্গে আরও চারজন প্রোঢ় তার দিকে এগিয়ে আসছে। একজন তাকে বলল, “আপনি অর্জুন ? বেশ ! আপনাকে আমাদের সঙ্গে আসতে হবে।”

“কোথায় ?”

“প্রধান তদন্তকেন্দ্রে ।”

“কেন ?”

“আপনাকে আমরা জিজ্ঞাসাবাদ করব । তারপরে যদি প্রয়োজন হয় আপনি আইনের সাহায্য নিতে পারেন । আসুন ।”

অর্জুন অসহায় হয়ে বলাকার দিকে তাকাল । বলাকা মাথা নিচু করল । অগত্যা প্রৌঢ়দের অনুসরণ না করে উপায় রাইল না অর্জুনের ।

যেভাবে হাতকড়া না পরিয়ে বন্দিদের গাড়িতে বসিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় প্রায় সেইভাবেই ওরা অর্জুনকে নিয়ে চলল শহরের প্রান্তে । রাস্তাঘাট চিনতে পারল না সে । মূল প্রবেশদ্বারে কোনও রক্ষী নেই । ড্রাইভার মাইক্রোফোনে সাক্ষেতিক শব্দ বলতেই গেট খুলে গেল । গাড়ি চলল সরু পথ দিয়ে । আরও দুটো গেট পার হওয়ার পর সবাই গাড়ি থেকে নামল । বিশেষ একটি ঘরে ওদের সঙ্গে চুকে অর্জুন দেখল আরও দু'জন মানুষ সেখানে তাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন ।

একজন প্রশ্ন করল, “ইনিই সেই অবাঞ্ছিত অতিথি ? কী নাম ?”

দাঁড়িয়ে থেকেই অর্জুনকে জবাব দিতে হল, “অর্জুন ।”

“আপনি বলেছেন, জলপাইগুড়িতে আপনার বাড়ি । কোথায় ?”

“এখন সেই বাড়ি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে । আপনাদের পাতাল রেলের যেখানে দফতর সেখানেই আমাদের বাড়ি ছিল”, অর্জুন নির্বিকার মুখে জবাব দিল ।

জবাবটা শোনামাত্র সবাই নিজেদের মধ্যে চোখাচোখি করল । একজন বলল, “আপনি বোধহয় ভুলে যাচ্ছেন, পাতাল রেলের দফতর প্রতিষ্ঠিত হয় অন্তত একশো বছর আগে ।”

“আমি আপনাদের সময়ের একশো সন্তুর বছর আগে ওখানে থাকতাম ।”

“আপনি যা বলছেন তা আপনার ধারণায় সত্যি ?”

“অবশ্যই ।”

“তার মানে আপনি অতীতের মানুষ, এই বর্তমানে কীভাবে এলেন ?”

“ডক্টর গুপ্ত বাংলোয় তাঁর তৈরি মেশিনে চড়ে ।”

“ডক্টর গুপ্ত কে ?”

“তিনি একশো সন্তুর বছর আগে সময়, মহাকাশ ইত্যাদি নিয়ে গবেষণা করতেন ।”

অর্জুন দেখেনি, ইতিহাসঘরের সেই বৃদ্ধকেও নিয়ে আসা হয়েছে এখানে । ইঙ্গিতমাত্র তিনি এগিয়ে এসে নিচু গলায় কিছু জানালেন । সন্তুত একটু আগে ডক্টর গুপ্ত সম্পর্কে জানা কিছু তথ্য । এবার যেন সত্যি অর্জুনের অস্তিত্ব বিশ্বাস করল ওরা । সঙ্গে-সঙ্গে হইচই পড়ে গেল । একজন প্রশ্ন করল, “আপনি তরুণ ! ওই সময়ে জলপাইগুড়িতে আপনি কি করতেন ?”

“প্রচলিত অর্থে তেমন কিছু নয় ।”

“ডেক্টর গুপ্ত একজন বৈজ্ঞানিক। তাঁর সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠতা হল কী করে ?”

“তাঁকে আমি সাহায্য করতে গিয়েছিলাম। তিনি গবেষণার কাজে নিরাপত্তার অভাব বোধ করছিলেন। দুঃখের বিষয়, আমি সেটা সম্ভব হইনি তাঁরই আচরণের জন্য।”

“আপনার সাহায্য তিনি কেন চেয়েছিলেন ?”

“আমি একজন সত্যসন্ধানী।”

“এজন্য আপনি শিক্ষা নিয়েছেন ?”

“হ্যাঁ। আমার গুরু অমল সোমের সহকারী হিসাবে আমি অনেকটা শিখেছি।”

“তিনি কি বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন ?”

“যে-কোনও শিক্ষিত ব্যক্তি তাঁকে চিনতেন।”

সঙ্গে-সঙ্গে ইতিহাসঘরের বৃন্দকে নির্দেশ দেওয়া হল, অমল সোম সম্পর্কে তথ্য জানার জন্য। তিনি টেলিফোন-ডেস্কের সামনে গিয়ে বোতাম টিপে সংযোগ করতেই ইতিহাসঘরের সহকারীকে পরদায় দেখা গেল। সেই ভদ্রলোক নির্দেশ শুনে সেটা পালন করতেই টেলিফোনের উলটো দিকের পরদায় ফুটে উঠল, “অমল সোম—বিস্তারিত বিবরণ শূন্য।”

প্রশ্নকারীর একজন হাসল, “কীরকম বিখ্যাত সেটা বুঝাতেই পারছি। গুরুর মখন কিছুই পাওয়া গেল না তখন একবার শিম্যের খোঁজ করুন।”

ইতিহাসঘরের বৃন্দ অর্জুনের নাম জানাতেই তাঁর সহকারী পরদায় ফুটিয়ে তুলল, “অর্জুন, সত্যসন্ধানী, নামান রহস্য উদ্ধার করেছেন। বর্তমান থেকে অতীতে তিনি পরিক্রমা করে এসেছেন। পঞ্চাশ বছর বয়সে দুর্ঘটনায় মারা যান।”

এবার এই ঘরে কেনও কথা নেই। বৃন্দ টেলিফোন সংযোগ বিছিন্ন করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে। হঠাৎ মুখ্য প্রশ্নকর্তা অর্জুনের দিকে এগিয়ে এলেন, “আমি জানি না আপনি খুব বড় প্রতারক কি না। হয়তো এসব তথ্য জেনেই আপনি আমাদের বিভ্রান্ত করতে এখানে এসেছেন। আবার এও হতে পারে, আপনি যা বলছেন তা সত্যি। সেক্ষেত্রে আপনি আমাদের পূর্বপুরুষদের একজন। আপনার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে একটু সময় লাগবে। সেই সময় পর্যন্ত আপনাকে আমাদের অতিথি হিসাবে থাকতে হবে।” ভদ্রলোক ইঙ্গিত করতে দুঃজন রক্ষী অর্জুনকে নিয়ে বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

যে-ঘরটিতে তাকে নিয়ে আসা হল তার একটিমাত্র জানলা। কিন্তু তার কাচ অঞ্জ। ঘরটি শীতাতপনিয়ন্ত্রিত। রক্ষীরা চলে গেলে অর্জুন বুরাল তাকে ওরা বন্দি করে রেখে দিল। হয়তো আরও খোঁজখবর করবে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সেসব জানার পর রায় দেবেন। সেই রায় যদি তার বিপক্ষে যায় তা হলে ?

এরা কি তাকে মেরে ফেলবে ? এখানে এখন শাস্তির পরিমাপ কী ? সে তে কোনও অন্যায় করেনি ।

সে ঘরাটিকে খুঁটিয়ে দেখল । একটি সুন্দর বিছানা, বিছানার পাশেই টেলিফোন-ডেস্ক । দেওয়ালে কিছু বই । সে এগিয়ে গেল । প্রথম বইটি গীতবিতান । অন্য বইগুলো গীতবিতানের গান নিয়ে লেখা প্রবন্ধ । রবীন্দ্রনাথের গীতবিতান যাদের কাছে বেদ অথবা মহাভারতের মতো, তারা কি তার সম্পর্কে ভয়ঙ্কর হতে পারে ?

অন্যমনস্ক অর্জুন পকেটে হাত ঢোকাতে সিগারেটের প্যাকেটের স্পর্শ পেল । সিগারেট সে খুবই কম খায় । গত আট-দশ ঘণ্টায় তো খায়নি । সে সিগারেট ধরাল । নার্ভের যে অবস্থা তাতে সিগারেট সাহায্য করবে হয়তো । অর্জুন ধোঁয়া ছাড়তেই অস্তুত কাণ হল । ঘরের ভেতর দপ করে আলো জ্বলে উঠে সোঁ-সোঁ শব্দ শুরু হল । কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে দরজা খুলে গেল এবং বেশ কিছু উত্তেজিত মুখকে উকি মারতে দেখা গেল । অর্জুন হতভব । লোকগুলো তার দিকে অস্তুত চোখে তাকাচ্ছে । দরজা খোলা থাকায় কানে আসছে সাইরেন জাতীয় কিছু একটা তীব্রস্বরে বাজছে । এই সময় একজন কর্তব্যক্তি ছুটে এলেন, “আপনি ওটা কী করছেন ?”

“আমি ? সিগারেট খাচ্ছিলাম ।”

“সিগারেট ? ওর ভেতর কী আছে ?”

“তামাক । সাধারণ তামাক ।”

“নিভিয়ে ফেলুন । চটপট । তামাক পোড়ার ধোঁয়া মানুষের স্বাস্থ্যের শক্র । আপনি নিজে মরবেন, আমাদেরও মরবেন ।”

“এখানে কেউ তামাক খায় না ? সিগারেট বিক্রি হয় না ?”

“ওসব এখানে আইন করে নিষিদ্ধ করা হয়েছে । কেউ ওসব খাচ্ছে জানলে তাকে কড়া শাস্তি দেওয়া হয় । নিভিয়ে ফেলুন বলছি ।”

অর্জুন সিগারেট নেতোল । ওরা এবার একটা যন্ত্র নিয়ে এসে ঘরে যেটুকু ধোঁয়া ছিল সব টেনে নিল । তারপর একটা পাত্রের ভেতর সিগারেট, দেশলাই ফেলে দিতে বলল অর্জুনকে । হকুম পালন না করে কোনও উপায় ছিল না । ওরা দরজা বন্ধ করে চলে যাওয়ার আগে বলে গেল একজন চিকিৎসক আসবেন ওর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে । অর্জুন খাটের পাশে রাখা একটা চেয়ারে গিয়ে চুপচাপ বসল ।

সিগারেট খাওয়া নিয়ে এমন কাণ হবে কে জানত ! উনিশশো একানবইতে সিগারেটের প্যাকেটের গায়ে সতকীকরণ লিখে ছেড়ে দেওয়া হত । দেশের ভেতর প্রেমে চাপলে সিগারেট খাওয়া যেত না, হাসপাতালে নয়, ট্রাম-বাস অথবা সিনেমা হলে নিষিদ্ধ ছিল । কিন্তু এমন আতঙ্ক তখন সৃষ্টি হয়নি । হঠাৎ অর্জুনের মনে হল, সেই সময় যদি এটা হত তা হলে মানুষের উপকারে

କୀ ଆଶର୍ଯ୍ୟ ! ଏର ମଧ୍ୟେଇ ସେ ସେଇ ସମୟ ବଲେ ଭାବତେ ଆରନ୍ତ କରେଛେ । ବ୍ୟାପାରଟା ଠାଙ୍ଗୀ ମାଥାଯ ଚିନ୍ତାଓ କରା ଯାଇ ନା । ଏଥନ ଯଦି ସେ ଓଥାମେ ଥେକେ ଯାଇ ତା ହଲେ ତାର ବସ ଏକଶୋ ସନ୍ତର ବଛର ବେଶି ହେଁ ଯାବେ ? ଅସନ୍ତବ । ଅର୍ଜୁନ ନିଜେର ଗାଲେ ହାତ ବୋଲାଲୋ । ଗତକାଳ ସକାଳେ ସେ ଦାଡ଼ି କେଟେଛେ । କୋଥାଓ ହାତ୍ୟାର ନା ଥାକଲେ ସେ ଏକଦିନ ଅନ୍ତର ଦାଡ଼ି କାଟେ । କିନ୍ତୁ ଚବିବିଶ ସନ୍ଟା ବାଦେ ହତୁକୁ ଦାଡ଼ି ସାଧାରଣତ ବାଡ଼େ ତାର ଅର୍ଧେକୁ ବାଡ଼େନି । କେନ ଏମନ ହଲ ? ତାର କି ଏଥାନେ ଥାକାର ସମୟ ବସ ବାଡ଼ିଛେ ନା ? ସେ ଯଦି ଦଶ ବଛର ଏଥାନେ ଥାକେ ତା ହଲେଓ ବସ ବାଡ଼ିବେ ନା ?

ଏଇ ସମୟ ଦରଜାଯ ଶବ୍ଦ ହଲ । ସେଟା ଖୁଲେ ଯେତେ ଦୁ'ଜନ ମାନୁଷ କରେକଟା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ନିଯେ ସରେ ଚୁକଲେନ । ତାଦେର ଆପାଦମନ୍ତକ ମହାକଶଚାରୀଦେର ମତୋ ପୋଶାକେ ଢାକା । ଏକଜନ ବଲଲେନ, “ଆମରା ଚିକିତ୍ସକ । ଆପନାର ଶରୀର ପରୀକ୍ଷା କରବ । ଦୟା କରେ ଉଠେ ଆସୁନ ।”

ଅର୍ଜୁନ ଉଠେ ଦାଁଡାଳ, “ଏମନ ଅନ୍ତ୍ରୁତ ପୋଶାକ ଆପନାରା ପରେଛେନ କେନ ?”

“ସଂକ୍ରାମିତ ହତେ ପାରେ ଏମନ ରୋଗ ଥେକେ ସତର୍କ ଥାକତେ ଚାଇ ।”

“କିନ୍ତୁ ଆମି ତୋ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁହୁ ।”

“ଆପନି ଧୂମପାନ କରେନ । ଏଟା ଜାନାର ପର ଏଇ ସତର୍କତାର ପ୍ରୟୋଜନ ହେଁବେ ।”

ଅର୍ଜୁନେର ସମ୍ପଦ ଶରୀର ବନ୍ଧିଯାନ୍ତ ଦିଯେ ପରଦାୟ ଫୁଟିଯେ ତୁଲେ ବିଶ୍ଲେଷଣ କରା ହଲ । ତାର ରଙ୍ଗଚାପ, ହୃଦୟତ୍ତ, ରଙ୍ଗେର ଘନତ୍ତ ଇତ୍ୟାଦି ପରୀକ୍ଷା କରାର ପର ଚିକିତ୍ସକ ବଲଲେନ, “ଏଥନେ ଆପନାର ଫୁସଫୁସ ନିକୋଟିନେର କବଲେ ପଡ଼େନି । କିନ୍ତୁ ଆପନି ଯଦି ଆର କିଛୁଦିନ ଧୂମପାନ କରେନ ତା ହଲେ ସେଇ ଆଶକ୍ଷା ଥାକଛେ ।”

ଓରା ଆବାର ଦରଜା ବନ୍ଧ କରେ ଚଲେ ଗେଲ । ଏବାର ଚେଯାରେ ବସେ ଅର୍ଜୁନେର ମନେ ହଲ, ଅନେକ ହେଁବେହେଁ, ଏବାର ଦେଇର କଥା ଭାବା ଦରକାର । ସେ ଚିରକାଳ ଏଥାନେ ପଡ଼େ ଥାକତେ ପାରେ ନା । ବାଡ଼ିତେ ମା ଆଛେନ । ତା ଛାଡ଼ା, ଏଦେର ରେକର୍ଡ ଯଦି ଠିକ କଥା ବଲେ ତା ହଲେ ସେ ପୃଥିବୀତେ ପଞ୍ଚଶ ବଛର ବସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଁଚିବେ । ତାକେ ମରତେ ହବେ ଏକଟା ଦୁର୍ଟିନାୟ ପଡ଼େ । ଅର୍ଜୁନେର ଏଥନ୍ତି ଶିରଶିର କରଲ ଶରୀର, ଯଦିଓ ପଞ୍ଚଶିଲେ ପୌଛିବେ ତାର ଦେଇ ଆଛେ । କିନ୍ତୁ ତାକେ ଫିରେ ଯେତେ ହଲେ ସେଇ ହାଇଓୟେର ପାଶେର ଜଙ୍ଗଲେ ଯେତେ ହବେ । ଏଥାନେ ଥେକେ ମୋଜା ବେରିଯେ ଯେତେ ଏରା ନିଶ୍ଚଯିତା ଦେବେ ନା । ଅର୍ଜୁନେର ମନେ ହଲ, ଏଥାନକାର ମାନୁଷଜନ ଏକଟୁ ଆଲାଦା ଧରନେର । ଆବେଗ କମ, କେମନ ଛାଡ଼ା-ଛାଡ଼ା ଭାବ ।

ତବେ ହୁଁ, ଏଥାନେ ଏସେ ତାର କରେକଟା ଲାଭ ହେଁବେ । ପ୍ରଥମତ, ଡଟ୍ଟର ଗୁପ୍ତ ତାଁର ଗବେଷଣା ଶେଷ ନା ହୁଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଁଚେ ଥାକବେନ ଏଇ ତଥ୍ୟ ଜାନା ଗେଲ । ଭଦ୍ରଲୋକ ନୋବେଳ ପୁରକ୍ଷାର ପାବେନ । ଦ୍ଵିତୀୟତ, ସେ ନିଜେ ପଞ୍ଚଶ ବଛରେ ଆଗେ ମାରା ଯାବେ ନା । ତୃତୀୟତ, ଏକଶୋ ସନ୍ତର ବଛର ପରେ ଜଲପାଇଗୁଡ଼ିର କୀ ଅବସ୍ଥା

হবে সেটাও নিজের ঢোকে দেখা গেল ।

চুপচাপ কতক্ষণ কেটে গিয়েছে খেয়াল নেই, হঠাৎ মিষ্টি বাজনার আওয়াজ কানে আসতেই সে সোজা হল । ঘরের এককোণে টেলিফোন-ডেস্কে আলো ফুটে উঠেছে । অর্জুন পারে-পারে এগিয়ে গেল । যেভাবে এর আগে কথা বলার সময় অন্যদের কোতাম টিপতে দেখেছে সেইভাবে সে একমাত্র বোতামটি টিপতেই পরদায় একটি পুরুষের ছবি ভেসে উঠল । ভদ্রলোক বললেন, “শুভসন্ধ্যা । তথ্য ও জনকল্যাণ দফতর থেকে বলছি । আজ দুপুরে আমাদের আপনার কথা জানানো হয়েছে । দেশবাসী আপনার সম্পর্কে জানতে অত্যন্ত কোতুহলী হয়ে পড়েছেন । আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই ।”

“কুরন । কিন্তু আমার খুব খিদে পেয়েছে ।”

“আচ্ছা । এখনই সেই ব্যবস্থা হয়ে যাবে । আপনি... ।”

“দাঁড়ান । এখানে আসার পর আমি সুপ আর সবজিসেদ্ধ খেয়েছি । আসলে ওতে আমার মন ভরে না, খিদেও মেটে না ।”

“আপনি কী ধরনের খাবার খেতে চাইছেন ?”

“একদম দিশি । ভাত-ডাল-তরকারি-মাছ কিংবা মাংসের বোল । অবশ্য এখন যদি সঙ্গেবলো হয়, আপনি শুভসন্ধ্যা বললেন বলেই বলছি পরোটা আর কাবাব পেলেও চলবে । সঙ্গে এক কাপ ভাল চা ।”

“এক মিনিট দাঁড়ান ।” ভদ্রলোক সময় চেয়ে নিয়ে কাউকে ইঙ্গিত করলেন দেখা গেল । তারপর জিজ্ঞেস করলেন, “হ্যা, আপনি অর্জুন । একশো সপ্তর বছর আগে এই শহরে বসে সত্যসন্ধান করতেন । হঠাৎ ভবিষ্যতে এসে আপনার কেমন লাগছে ? কী-কী পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছেন ?”

“সব কিছুই পরিবর্তিত । এসব আমরা ভাবতে পারতাম না ।”

“তখনকার জীবন আর এখনকার জীবনের মধ্যে কোন্টা ভাল ?”

“জীবন্যাপনের সুবিধেগুলো এখানে বেশি ।”

“আমাদের পূর্বপুরুষ ডষ্টের গুপ্ত মহাকাশ এবং সময়সম্পর্কিত আবিক্ষার এখনকার বৈজ্ঞানিকদের খুব সাহায্য করছে । আমরা এখন স্বচ্ছন্দে সময়কে নিয়ন্ত্রণে রেখে অন্য গ্রহে যেতে পারি । ডষ্টের গুপ্তকে আপনি দেখেছেন । একজন মানুষ হিসাবে তিনি কেমন ছিলেন ?”

“আমি তাঁকে মাত্র একটি সঙ্গে দেখেছি । সেই সময় তিনি আতঙ্কিত ছিলেন, কারণ, তাঁর ভয় ছিল, কেউ তাঁর গবেষণা নষ্ট করে দিতে পারে ।”

“কারা ?”

“আমি জানি না ।”

“ওহো, এইমাত্র আমাদের খাদ্য দফতর জানিয়েছে, আপনি যেসব খাবার খেতে চেয়েছেন তা স্বাস্থ্যের পক্ষে মোটেই ভাল নয় । ভাত-ডাল-তরকারি বা মাছের বোলে শুধু উদর ভর্তি হয় কিন্তু কর্মক্ষমতা বাড়ে না । আর পরোটা,

কাবাব সুপাচ্য নয়, আপনার পেটের পক্ষে ক্ষতিকর। আসলে এই অনাবশ্যক খাবারগুলো অনেকদিন হল বাতিল করে দেওয়া হচ্ছে। মানুষের সেইসব খাবার খাওয়া উচিত যা তার শরীরকে পরিপূর্ণ করবে। আপনি মুরগির মাংস সেঁকা অবস্থায় খেতে পারেন এবং তাই আপনাকে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং সেই সঙ্গে ভাল দুধ।” ভদ্রলোক হাসলেন।

অর্জুন বিমর্শ হল, “এভাবে বেঁচে থাকার কোনও মানে হয় না।”

“আপনি কি কিছু বলছেন?” ভদ্রলোক যেন ঠিক বুঝতে পারেননি।

“আমি যা বলছি তা আপনি বুঝতে পারবেন না।”

“কেন?”

“যে পায়েস, মালপোয়া বা গোকুল পিঠে খায়নি সে শীতকালের খাবার কত ভাল হতে পারে জানবে কী করে?”

ভদ্রলোক গভীর হলেন, “হ্যাঁ, এবার আপনার সঙ্গে একটি পরিবারের পরিচয় করিয়ে দেব। সারা দুপুর সন্ধিনামকাজ চালিয়ে এঁদের আমরা আবিক্ষা করেছি। চেয়ে দেখুন, একেবারে বাঁ দিকে যিনি বসে আছেন তাঁর নাম মধুসূদন। মধুসূদনের পাশে তাঁর স্ত্রী লাবণ্য। লাবণ্যের পাশে ওঁদের ছেলে ক্ষেমকর এবং পুত্রবধূ মালিনী।”

অর্জুন দেখল পরিবারের চারজনই অস্তুত চোখে তাকিয়ে ছিল, এবার নমস্কার করল। তথ্য দফতরের ভদ্রলোক বললেন, “এই পরিবার আপনার উত্তরপুরুষ। আপনার রক্ত এঁদের দু'জনের শরীরে বর্তমান।”

অর্জুন হতভস্ব। বৃক্ষ, যাঁর নাম মধুসূদন বেশ উত্তেজিত এখন, “আপনি, আপনি আমার প্রপিতামহের প্রপিতামহ? এভাবে আপনার দর্শন পাব আমি স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারিনি।”

“আপনি, আপনি আমার উত্তরপুরুষ?” কথা খুঁজে পাচ্ছিল না অর্জুন।

“আজ্ঞে হ্যাঁ, দয়া করে আমাকে আপনি বলবেন না। আমি কত ছেট।”

“কিন্তু কী করে নিশ্চিন্ত হলেন?”

“মানে? আমার প্রপিতামহের ডায়েরি আমার কাছে আছে। তাতে তিনি তাঁর আটজন পূর্বপুরুষের নাম লিখে গিয়েছেন। তাঁর পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহের সম্পর্কে বিশদ লেখা আছে। আপনি সত্যসন্ধানী ছিলেন। দেশে-বিদেশে বিখ্যাত হয়েছিলেন। আপনার দুই পুত্র-সন্তান। একজন সন্ন্যাসী হয়ে যান। দ্বিতীয়জনের বংশধর আমরা। আপনার যখন পঞ্চাশ বছর বয়স তখন পথ-দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়। এসব আমি জানি। গল্ল পড়ার কৌতুহলে পড়েছি। কিন্তু আপনাকে চোখে দেখতে পাওয়ার সৌভাগ্য হবে আমরা তা ভাবিন। এই হল আমার পুত্র ক্ষেমকর। ওকে আশীর্বাদ করুন।” বৃক্ষ মধুসূদন হাত বাড়িয়ে নিজের ছেলেকে দেখিয়ে দিতে সে আশীর্বাদ নেওয়ার ভঙ্গিতে মাথা নিচু করল। অর্জুনের অবস্থা তখন অবর্গনীয়। যে-বংশধরদের

মানুষ কখনওই দ্যাখে না তাদের সামনে-অনেক কমবয়স্ক শরীর নিয়ে সে বসে আছে।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “আপনার নাম মধুসূদন, কিন্তু ওঁর ক্ষেমক্ষে, কেন ?”

“আসলে রবীন্দ্রনাথের চরিত্রাবলী থেকে নামকরণ করা এখন নিয়ম।”

“কিন্তু ক্ষেমক্ষেরের স্তী তো মালিনী ছিলেন না ?”

এবার সুন্দরী মহিলা যাঁর নাম মালিনী, জবাব দিলেন, “না, ছিলেন না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ লিখে গিয়েছেন, মালিনী ক্ষেমক্ষেরকেই ভালবাসত।”

নাটকটি দেখেছে অর্জুন। কিন্তু এমন কিছু ছিল কিনা মনে পড়ল না। তাকে অবাক হয়ে তাকাতে দেখে মালিনী বললেন, “একেবারে শেষে মালিনী বলেছেন, মহারাজ, ক্ষমো ক্ষেমক্ষে। তারপরেই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন পতন এবং মূর্ধা। ওটা হয়েছিল ভালবাসার কারণেই।”

এবার লাবণ্য জিজ্ঞেস করলেন, “আপনি কি আমাদের বাড়িতে আসবেন ?”

“আমি কোথায় যেতে পারি তা জানি না। এঁরা আমার গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করছেন।”

তথ্য দফতরের ভদ্রলোক বললেন, “আপনার মঙ্গলের জন্যই তা করা হচ্ছে। সাধারণ মানুষ যদি জানে আপনি বিংশ শতাব্দীর মানুষ তা হলে আপনি বিপদে পড়তে পারেন। সেটা আমরা চাই না।”

“বিপদে কেন পড়ব ?”

“ইতিহাস বলে বিংশ শতাব্দীর মানুষেরা অত্যন্ত সন্দেহপ্রায়ণ ছিল। তারা অকারণে বিশ্বজুড়ে দু-দু'বার মারাত্মক যুদ্ধ করেছে। সেই যুদ্ধে নৃশংসভাবে তারা শক্রপক্ষের মানুষকে হত্যা করতে দ্বিধা করেনি।”

“সেটা জামানি, বিটেন এবং আমেরিকার রাষ্ট্রনায়কেরা করেছিলেন। সাধারণ মানুষ কখনওই সেটাকে মেনে নিতে পারেনি।”

“দেখুন, আপনাদের ইতিহাসে সবসময় রাষ্ট্রনায়কদের কথাই লেখা থাকত, সাধারণ মানুষকে অবহেলা করা হত। যা হোক, আপনাকে অনেকক্ষণ ধরে কথা বলতে হল। এবার আপনি বিশ্রাম করুন।”

চট করে আলো নিতে গেল। অর্জুন সুইচ অফ করতেই ঘরের দরজা খুলে গেল। দু'জন মানুষ একটা ট্রলিতে করে খাবারের দিশ, প্লাস নিয়ে ঘরে চুকল। কেনও কথা না বলে তারা আবার বেরিয়ে গেল। অর্জুন দেখল এক প্রেট রোস্টেড মুরগি আর একপ্লাস দুধ রয়েছে ট্রলির ওপরে। মুরগির মাংসের পরিমাণ প্রচুর। একটুও সময় নষ্ট না করে সে খাবারে মন দিল। নরম মাংস, কিন্তু লবণের পরিমাণ খুব কম। এরা নূনও কম খায় বোধ হয়। পেট ভরে না যাওয়া পর্যন্ত খেয়ে গেল সে। তারপর বিছানায় শরীর এলিয়ে দিল। যেখানে যাই হোক, এখন তার শরীর একটু ঘূর চাইছে।

অথচ ঘূর এল না। ওর খুব অস্বস্তি হচ্ছিল। লোকে নাতি কিংবা পুতির

মুখ দেখে, ও দেখল কয়েক প্রজন্মের পরের মানুষগুলোকে। দেখে অবাক হয়েছিল কিন্তু কোনও রকম টান যা স্নেহ-ভালবাসা থেকে তৈরি হয় তা মনে আসেনি। ওদের কেমন বানানো-সাজানো মানুষ বলে মনে হচ্ছে এখন।

এরা তাকে নিয়ে ঠিক কী করতে চায় ভেবে পাঞ্চিল না অর্জুন। কিন্তু আর নয়, এবার তার ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করা দরকার। সে এখন ঠিক কোথায় আছে তা জানা নেই। হাইওয়ের পাশে জঙ্গলের মধ্যে ডট্টুর গুপ্তের মেশিনটাকে সে লুকিয়ে রেখে এসেছে। ওই মেশিনটার সাহায্য ছাড়া তার পক্ষে ফেরা অসম্ভব। যেমন করেই হোক, মেশিনটার কাছে সবার অলঙ্কে তাকে পৌঁছতেই হবে।

অর্জুন উঠে বসল। তাকে একই সঙ্গে উত্তেজিত এবং চিন্তিত দেখাচ্ছিল। কী করে সেই জায়গাটায় যাওয়া যায়? বলাকা যখন তাকে গাড়িতে নিয়ে হাইওয়ে ধরে যাচ্ছিল তখন তো কোনও জঙ্গল চোখে পড়েনি। অথচ সেই জঙ্গল থেকে হাঁটা শুরু করেই সে বলাকাদের বাড়িতে পৌঁছেছিল। অতএব, সেই নির্দিষ্ট হাইওয়েতে যেতে হলে বলাকাদের বাড়ির দিকে যেতে হবে। অর্জুনের মনে পড়ল, দুপুরের পর থেকে বলাকার দেখা সে পাচ্ছে না।

কিন্তু কী করে সেই জায়গায় যাওয়া সম্ভব হবে? প্রথম কথা, তাকে একটি ঘরে বন্দি করে রাখা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, এই বাড়ির অন্য দরজাগুলোয় নিশ্চয়ই ভাল পাহারা আছে। এখানে কোনও ট্রায়ম-বাস চোখে পড়েনি। হয়তো পাতাল রেল সেই জায়গাটার কাছাকাছি যায়। কিন্তু কীভাবে যেতে হয় তা সে জানে না। খুবই অসহায় হয়ে পড়ল অর্জুন।

ঘূর্মিয়ে পড়েছিল অর্জুন। সেটা কতক্ষণ তা বোবার উপায় নেই। কারণ, সে আবিষ্কার করল ঘড়ির কাঁটা অনেকক্ষণ বন্ধ হয়ে আছে। কী করে একটা অটোমেটিক ঘড়ি হাতে পরে থেকেও বন্ধ হয়ে যায় কে জানে!

অর্জুনের বাথরুমে যাওয়ার প্রয়োজন হচ্ছিল। ঘরের ওপাশে একটা দরজা আছে, ঢোকার পরেই চোখে পড়েছিল। সে বিছানা ছেড়ে সেই দরজায় চাপ দিতে একটা মাঝারি ঘর দেখতে পেল। হালকা আলো জ্বলছে। বকবকে তকতকে আধুনিক ট্যালেট। লোকগুলোর তা হলে রুটি আছে।

শরীর হালকা হওয়ার পর সে জানলাটার দিকে তাকাল। কাচের জানলা। ডেতর থেকেই বন্ধ। সে একটু চেষ্টা করতেই জানলাটা খুলে গেল। চোখের সামনে নীল আকাশ। অনেক তারার ভিড় সেখানে। তার মানে এখন রাত অনেক। কোথাও কোনও শব্দ নেই। সে রয়েছে বেশ কয়েক তলা ওপরে। এই জানলা দিয়ে নীচের দিকটা আদৌ দেখা যাচ্ছে না। জানলার গরাদ ডেঙে পালাবার চেষ্টা করেও কোনও লাভ নেই। অত ওপর থেকে পড়লে আর দেখতে হবে না।

ফিরে আসছিল অর্জুন। হঠাৎ খেয়াল হল, তার মৃত্যু হবে পঞ্চাশ বছর

বয়সে । পঞ্চাশ হতে তো বহুত-বহুত দেরি । অতএব ওই জানলা দিয়ে
বেরতে গিয়ে পড়ে গেলেও তার বেঁচে থাকার কথা । কিন্তু মরবে না এ-কথা
বলা হয়েছে, হাত-পা ভেঙে জবুথু হয়ে বেঁচে থাকবে না এমন কথা তো ওর
বলেনি ।

তবু মারা যাবে না যখন, তখন একবার চেষ্টা করা উচিত । অর্জুন টয়লেটে
চুকে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে জানলার গরাদে হাত দিল । অসম্ভব । সমস্ত
জানলাটাই ইস্পাতের মোটা জালে মোড়া । তার একার চেষ্টায় সামান্য
নড়ানোও সম্ভব নয় ।

অর্জুন ফিরে এসে ঘরে একটা পাক খেল । তারপর সদর দরজায় ধাক্কা
মারল । তৃতীয়বারের পর সেই দরজাটা খুলল । যে-লোকটি দাঁড়িয়ে আছে, সে
রক্ষী ছাড়া কেউ নয় । অর্জুন তাকে জিজ্ঞেস করল, “আমাকে এখানে কতক্ষণ
বন্দি থাকতে হবে ?”

রক্ষী গভীর গলায় জবাব দিল, “ওসব বিষয় আমার জানার কথা নয় ।
আপনি আগামিকাল সকাল সাতটা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন ।”

“এখন কটা বাজে ?”

“রাতের তৃতীয় প্রহর সবে শেষ হল ।” কথাটা বলেই রক্ষী দরজা বন্ধ করে
দিল । ঠোঁট কামড়ে বিছানার দিকে এগিয়ে যেতে-যেতে মনে-মনে প্রহরের
হিসাব করছিল অর্জুন । তুলসীদাসের গান আছে । ‘প্রথম প্রহরে সবাই জাগে,
দ্বিতীয় প্রহরে ভোগী, তৃতীয় প্রহরে তক্ষর জাগে, চতুর্থ প্রহরে যোগী ।’ তার
মানে তিন ঘণ্টায় এক প্রহর হলে তৃতীয় প্রহর শেষ হচ্ছে নয় ঘণ্টায় । সঙ্গে
ছাঁটা থেকে নয় ঘণ্টা মানে এখন সবে তিনটে বেজেছে । সে ঘড়ির কাঁটা
তিনটেতে নিয়ে গেলেও সেটা চালু হল না । হঠাৎ খেয়াল হতে সে দিন এবং
বছরের কাঁটা ঘুরিয়ে একশো সন্তুর বছর এগিয়ে নিয়ে আসা মাত্র
আশ্চর্যজনকভাবে ঘড়ি চালু হল । অর্থাৎ, ঘড়িও ঠিক সময়ের সঙ্গে তাল রেখে
চলতে চায় ।

হঠাৎ কানে একটা শব্দ হল । কোনও কিছু যেন ঘষটে গেল । অর্জুন
চারপাশে তাকাল । সবই তো স্বাভাবিক । সে বাথরুমের দরজায় এসে
দাঁড়াতেই দেখতে পেল গরাদের ইস্পাত অঙ্গুতভাবে বেঁকে গিয়েছে । একটু
আগেও ওরকম ছিল না । এখন অন্তত এক ফুট ফাঁক হয়ে গিয়েছে । কী ভাবে
হল ? অর্জুন এগিয়ে গিয়ে জায়গাটা পরীক্ষা করল । এখনই কেউ এমন কর্ম
করেছে । কে করল ! এই সময় তার কানে মদু স্বরে একটা ডাক পৌঁছল । খুব
মদু । কিন্তু ডাকটা যে কুকুরের, তাতে কোনও সন্দেহ নেই । এখানে আসার
পর সে কোনও জীবজন্তু দেখতে পেয়েছে কি না খেয়াল করতে পারল না ।
এত ওপরে কুকুরের ডাক ? ওরা কি তার ওপর নজর রাখার জন্য কুকুর
রেখেছে ? অর্জুন অন্যমনস্কভাবে ঘরে ফিরে বিছানায় বসতে যেতে খুব কাছ

থেকে কুকুরের ডাক শুনতে পেল। ভাল করে তাকাতেই চক্ষুষ্ঠির। এ তো তাতান! ডষ্টের গুপ্তের সেই ছোট হয়ে যাওয়া কুকুর, যার সন্ধানে অন্য গ্রহ থেকে উপদ্রব আসত!

সেই ছোট কুকুর সমানে ডেকে যাচ্ছে। অর্জুন অনেকটা ঝুঁকে আদুরে গলায় ডাকল, “তাতান। তা-তান।” সঙ্গে-সঙ্গে কুকুরটা ডাক থামিয়ে কুই-কুই শব্দ করতে লাগল লেজ নাচিয়ে। অর্জুন ওকে হাতে তুলে নিল, “তাতান, তুই এখনও বেঁচে আছিস? অদ্ভুত ব্যাপার! তুই এখানে এলি কী করে?”

তাতান পেছনের দু' পায়ে ভর দিয়ে সামনের পাদুটো তুলে লাফাবার চেষ্টা করল। মনে হচ্ছিল অনেককাল পরে সে একটা চেনা মানুষকে দেখতে পেয়েছে। অর্জুন কোনও ব্যাখ্যা পাচ্ছিল না। সে যখন মেশিনে উঠে বসেছিল তখন তাতান ছিল বাঞ্ছে। সময়স্ত্রের মাধ্যমে এতদূর আসা ওর পক্ষে সন্তুষ্ট নয়। তাহাড়া ওই ছোট কুকুর এত ওপরে উঠে এসে ইস্পাত বাঁকাতেও পারবে না।

অর্জুন তাতানের গলায় আঙুল বুলিয়ে আদর করল, “তাতান, আমি এখন বন্দি। কীভাবে ফিরে যাব জানি না। তোকে দেখে খুব ভাল লাগছে।”

হঠাৎই খাটের খানিকটা দূরে রাখা চেয়ারটা ঘমটে একটু এগিয়ে এসে দুলতে লাগল। অর্জুন হতভম্ব। এরকম ভৌতিক ব্যাপার দেখে অন্য সময় কী করত সে জানে না কিন্তু তাতান সঙ্গে থাকায় সে শক্ত হয়ে তাকাল। তার মনে পড়ল ডষ্টের গুপ্তের গাড়িটার কথা। ডষ্টের গুপ্ত যাকে উপদ্রব বলতেন সেই ভিন্ন গ্রহের প্রাণীটি এসে গাড়ির ডিকি খুলে কত না ভৌতিক কাণ্ড করেছিল সেই বিকেলে।

এখানেও তেমনই কিছু ঘটছে? অর্জুন সন্ধিক্ষণ চোখে তাকাল। চেয়ারটা চুপচাপ এখন। তাতান তার মুখের দিকে তাকিয়ে। অর্জুনের মনে হল সেই “উপদ্রব”টি নিশ্চয়ই তাতানকে নিয়ে এসেছে, নইলে এর এখানে আসার কোনও উপায় ছিল না। কিন্তু তাতান একশো সন্তুর বছর পরেও বেঁচে আছে?

অর্জুন চেয়ারটির দিকে তাকিয়ে বলল, “আপনি কে জানি না, তবে মনে হচ্ছে আপনি তাতানের বন্ধু। আপনারা কোথেকে এসেছেন?”

কোনও জবাব এল না। শুধু চেয়ারটা সামান্য সরে গেল। অর্জুন আবার জিজ্ঞেস করল, “আপনি কি আমার ভাষা বুবাতে পারছেন না?”

কোনও প্রতিক্রিয়া নেই।

এবার তাতানকে দেখা গেল উভেজিত হয়ে বিছানার ধারে চেয়ারের দিকে ছুটে যেতে। একেবারে কিনারে পৌঁছে চেয়ারের দিকে মুখ করে সে সমানে চিংকার করতে লাগল। সঙ্গে-সঙ্গে চেয়ারটা সরে এল বিছানার পাশে। তাতানের গলা থেকে গোঁ-গোঁ শব্দ বের হচ্ছিল এবার। রাগী কুকুরকে আদর করলে এমন শব্দ বের করে তারা। অর্থাৎ ওই আদরে তাতান খুশি হচ্ছে না।

ঘরের ভেতর এখন তিনটি প্রাণী, যার একজন অদৃশ্য। অর্জুন ঝুঁকে তাতানের গায়ে হাত বাথতেই মনে হল কিছু যেন চট করে সরে গেল হাতের তলা থেকে। আন্তুত অস্বস্তিকর অনুভূতি হল সেই মুহূর্তে। অর্জুন তাতানকে কোলে তুলে নিল, “তাতান, তোমার বন্ধুকে বল আমি খুব বিপদে পড়েছি, আমি সাহায্য চাই।”

কুকুরের কাছে প্রশ্নের জবাব চায়নি অর্জুন, যার কাছে চেয়েছিল সে রইল চুপচাপ। অর্জুন মরিয়া হল, “যদি আমাকে সাহায্য করতে ইচ্ছে থাকে তা হলে ওই চেয়ারটাকে খাটের নীচের দিকে সরিয়ে দেওয়া হোক।”

প্রায় দশ সেকেন্ড কিছুই হল না, তারপর সবিস্ময়ে অর্জুন দেখল চেয়ারটা সরে গেল খাটের একপাশে। আর তারপরেই বাথরুমের জানলায় মটমট করে শব্দ হতে লাগল। শব্দ থেমে যাওয়ার পর অর্জুন এগিয়ে গেল তাতানকে খাটের ওপর রেখে বাথরুমের ভেতর। গিয়ে সে দেখল জানলার অনেকটাই ফাঁকা হয়ে গিয়েছে। এখন সে স্বচ্ছন্দে জানলা দিয়ে বাইরে বেরতে পারে। অর্জুন ঘরের দরজায় ফিরে অবাক, তাতান নেই। কিন্তু তার ডাকটা কানে আসছে জানলার দিক থেকে। অর্থাৎ তাতানকে আড়ালে নিয়ে তার জন্য অপেক্ষা করছে ‘উপদ্রব’টি। অর্জুনের মনে হল এই মুহূর্তে আর ভিন্ন গ্রহের অধিবাসীকে উপদ্রব বলাটা ঠিক হবে না। সে দু’ হাতে ভর রেখে জানলায় উঠে শরীরটাকে গরাদের বাইরে নিয়ে এল। অনেক নীচে রাত্রের রাজপথ। সেখানে কোনও মানুষ অথবা যানবাহন দেখা যাচ্ছে না। সেদিকে তাকিয়ে মাথা ঘুরে যাওয়ার উপক্রম হল। এত ওপর থেকে নীচে নামবে কী করে?

অর্জুন পাশের দেওয়ালগুলো দেখল। না, জলের পাইপ বা ওই জাতীয় কোনও বস্তু নেই যা বেয়ে নীচে নামা যায়, কার্নিসে দাঁড়িয়ে সাতপাঁচ ভাবছে যখন, তখনই একটা বড় ধাক্কা খেল সে। ধাক্কা এমন আচমকা ছিল যে, তার পদস্থলন হল এবং প্রায় ডিগবাজি খেয়ে শূন্যে ছেঁহ করে নামতে লাগল। অর্জুন বাঁচার জন্য মরিয়া হল। কোনওরকমে মাথাটাকে ওপরে নিয়ে যেতে পারল সে। কিন্তু যে গতিতে সে নামছে তাতে হাড়গোড় গুঁড়িয়ে যেতে বিন্দুমুক্ত সময় লাগবে না। মাটির কাছাকাছি যখন পৌঁছে গেছে তখন দুই কাঁধ এবং কোমরে মাধ্যাকর্ষণের বিপরীত একটা টান অনুভব করল সে। শরীরে প্রবল ঝাঁকুনি লাগল, কিন্তু নিজের শরীরটাকে ধীরে-ধীরে ফুটপাথে নেমে আসতে দেখল সে। প্রায় তিরিশ সেকেন্ড সে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইল। তার কোমর, কাঁধ টন্টন করছে। অত ওপর থেকে পড়ার পরেও বেঁচে থাকার বিস্ময়টা সেইসঙ্গে প্রবল, সে এখন বুঝে গিয়েছে ডেন্টার গুপ্তের সেই উপদ্রবটা এবার তাকে বাঁচাল। কিন্তু তারা ধারেকাছে নেই বা থাকলেও সে দেখতে পাচ্ছে না।

অর্জুন ভেবেছিল পা বাড়ালেই পড়ে যাবে, কিন্তু পড়ল না। এক পা এক পা ১৬৪

করে সে ফুটপাথের ধারে এসে দাঁড়াল। পেছনের ঘরবাড়িগুলো এখন অঙ্ককার, দরজা বন্ধ। এখান থেকে কিভাবে হাইওয়ের ধারের জঙ্গলে পৌঁছনো কার? সে হাঁটা শুরু করল। কোথায় যাচ্ছে, রাস্তাঘাট কী, তা সে জানে না। হাঁটাঁ চোখে পড়ল একটা চিহ্ন, তার নীচে লেখা, পাতাল রেল। পাশ দিয়ে নীচে নামার সিঁড়ি।

সেখানে পা দিয়ে ও জলপাইগুড়ির ম্যাপ দেখতে পেল। একটু খুঁটিয়ে দেখে সে স্টেডিয়ামটাকে চিনতে পারল, ওইখানে বলাকা তাকে নিয়ে গিয়েছিল। বলাকার বাড়ি থেকে বেরিয়ে স্টেডিয়ামে যাওয়ার সময় 'সুস্রাগতম' লেখা দেখতে পেয়েছিল। তার মানে বলাকার বাড়ি শহরের বাইরে, স্টেডিয়ামের বিপরীত দিকে। অনেকক্ষণ দেখার পর আন্দাজে মনে হল জায়গাটাকে সে চিনতে পারছে। বলাকাদের বাড়ি ছাড়িয়ে যে হাইওয়ে চলে গিয়েছে, সেইখানে তাকে যেতে হবে। মূল শহরের ম্যাপের পাশে পাতাল রেলের ম্যাপ। অর্জুন দেখল সেদিকটায় পাতাল রেলের একটা লাইন শেষ হয়েছে। লাইনের নাম, মুন্তধারা। এদের পাতাল রেলের বিভিন্ন লাইনের নামকরণ হয়েছে কবিণ্ডুর নাটক থেকে।

কিন্তু পাতাল রেলে চড়তে গেলে টিকিট লাগবে। অঙ্গিঙ্গতা আছে তার। টিকিট যন্ত্রের ভেতর না ঢেকালে দরজা খোলে না। টিকিট কেনার পয়সা তার নেই। একশো সপ্তাহ বছর আগেকার নেট যে এখন বাতিল হয়ে গেছে। এ-ব্যাপারে কারও সঙ্গে কথা বলাও বিপদ। মুহূর্তেই কর্তৃপক্ষ তার অঙ্গিঙ্গ জেনে যাবে। এখন কি পাতাল রেল চলছে? অর্জুন ইতস্তত করছিল এমন সময় একটা লোককে অঙ্ককার ফুঁড়ে এগিয়ে আসতে দেখল। লোকটার রকমসকম খুব চেনা হিন্দি সিনেমায় যে গুগুদের দেখা যায় এর ভাবভঙ্গি তাদের মতন।

লোকটা ঠিক তার সামনে এসে দাঁড়াল, “বাঁচতে চাও তো পকেটে যা আছে দাও।”

অর্জুন এমন অবাক যে, না বলে পারল না, “এখানে এখনও গুগুমি হয়?”

“আবার বাজে কথা! দাও?” রীতিমতো ধমকে উঠল লোকটি।

অর্জুন বিনা বাক্যব্যয়ে পকেটের সব টাকা লোকটার হাতে দিয়ে দিল। আধা-অঙ্ককারে লোকটা বলল, “এসব কী হাবিজাবি দিচ্ছ? তোমার ক্রয়পত্র নেই?”

“না।” অর্জুনের মনে পড়ল বলাকা একটা কার্ড নিয়ে ঘোরে।

“এগুলো কী?”

“টাকা।”

“দুস।” লোকটা খুব বিরক্ত হয়ে টাকাগুলো ফেরত দিয়ে বলল, “কপালটাই খারাপ। তা ক্রয়পত্র সঙ্গে না নিয়ে বেরিয়েছে, পাতাল রেলে চড়বে কী করে

বুদ্ধুরাম ?”

“সে-কথাই ভাবছি ।”

“বুবোছি, তুমি আমারই মতন শিকার খুঁজছ । নাম কী ?”

“অর্জুন ।”

“আমি রঘুপতি, তোমার দলে কেউ আছে-?”

“না, আমি একা ।”

“আমিও । এখনও ধরা পড়িনি । তুমি পড়েছ ?”

“না ।”

“বেশ ভাল হল । কোথায় যাবে ?”

“মুক্তধারার শেষ প্রান্তে ।”

“আরে, ওখানেই তো আমার বাড়ি । তোমাকে আগে দেখিনি কেন ? চলো, আজ বাবে আর কিছু হবে না । তবে ক্রয়পত্র সঙ্গে না নিয়ে এলে কী করে ?”
লোকটা হাঁটতে-হাঁটতে প্রশ্ন করল ।

“এসে গেলাম ।” অর্জুন সমানে তাল দিচ্ছিল ।

“উচিত হয়নি । পাতাল রেলকে ঠকানো উচিত নয় । এবার আমি তোমার প্রবেশপত্র কিনে নিছি ।” লোকটা এগিয়ে গেল একটা মেশিনের দিকে । ওরা তখন পাতাল রেলের মূল দ্বারে পৌঁছে গিয়েছে । অর্জুন দেখল, মেশিনে কার্ড পাঁও করে লোকটা দুটো টিকিট বের করে নিল । সেই টিকিট গেটের গর্তে ঢুকিয়ে ওরা প্ল্যাটফর্মে চলে এল । এখন প্রায় ডোর পাঁচটা । মাটির নীচে পাশাপাশি আটটি প্ল্যাটফর্ম এই ডোরে দু-তিনজন যাত্রী দাঁড়িয়ে । রঘুপতি বলল, “এখানে কিছু করবে না । চারধারে জাল পাতা আছে ।”

ঠিক পাঁচটা দশে ওরা ট্রেনে উঠল । ট্রেনের ভেতরটা রবীন্দ্রনাথের নানা লাইন ছবির মতো লেখা । কিছু চারিত্রের ছবিও আছে ।

অর্জুন ছুটত্তে ট্রেনে বসে জিজ্ঞেস করল, “তুমি কী করো ?”

“মাংস বিক্রি করতাম । পাঁচ মাস আগে ওরা আমার লাইসেন্স কেড়ে নিয়েছে ।”

“কেন ?”

“মাংসটা ভাল ছিল না ।”

“এখন চলে কী করে ?”

“বেকার ভাতা দেয় । তাতে চলে নাকি ? তাই সপ্তাহে একদিন বেরিয়ে এসে এই কাগু করি । ক্রয়পত্র হাতিয়ে সঙ্গে-সঙ্গে তাই দিয়ে জিনিসপত্র কিনে সেটাকে ফেলে দিয়ে বাড়ি ফিরে যাই । তুমি কী করো ?”

“সত্যসন্ধান ।”

“সেটা কী জিনিস ?”

“তুমি বুবাবে না । ধরা পড়লে কী হবে তোমার ?”

“কুড়ি বছর । তোমার ?”

“আজীবন ।” অর্জুন হাসল ।

“তা হলে তো তুমি আমার চেয়েও বড় কিছু করো ?”

এক-একটা স্টেশনে পাতাল রেল দাঁড়াচ্ছিল আর যাত্রীদের সংখ্যা বেড়ে চলছিল । তারা উঠে অর্জুনের দিকে তাকাচ্ছিল বারেবারে । কিন্তু সে একজন যাত্রীর সঙ্গে কথা বলছে দেখে চোখ সরিয়ে নিচ্ছিল ।

রঘুপতি হাসল, “এই পোশাক কোথায় পেলে ?”

“পেয়ে গেলাম ।”

“খুব মজাদার পোশাক ।”

মুক্তধারার শেষ প্রান্তে ওরা ট্রেন থেকে নামল । গেট থেকে বাইরে পা দিতেই আকাশবাণী হল, “জলপাইগুড়ি শহরের অধিবাসীদের জানানো হচ্ছে গতকাল অতীত-থেকে-আসা একটি মানুষকে গ্রেফতারের পর যখন পর্যবেক্ষণের জন্য রাখা হয়েছিল তখন সে বিভ্রম তৈরি করে পালিয়ে গিয়েছে । তার পোশাক মজাদার কিন্তু সে অতীব বুদ্ধিমান । ইস্পাতের গরাদ ভেঙে বহুতল বাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়েও সে জীবিত অবস্থায় এই শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছে । আমাদের পক্ষে বিপজ্জনক ওই ব্যক্তিকে দেখামত্র কর্তৃপক্ষকে খবর দিলে পূরক্ষৃত করা হবে ।”

রঘুপতি দাঁড়িয়ে পড়েছিল ঘোষণাটা শুনতে । স্টেশনের মাইকে ঘোষণাটা শোনা যাচ্ছিল । হঠাৎ রঘুপতি সাঁ করে অর্জুনের দিকে ঘুরে দাঁড়াতেই কেউ তাকে নির্দেশ দিল আঘাত করো । অর্জুনের হাত এবং পা একই সঙ্গে রঘুপতির শরীরে আঘাত করতেই সে ছিটকে পড়ল মাটিতে । কে দেখছে না দেখছে লক্ষ না করে অর্জুন দ্রুত হাঁটতে শুরু করল ।

এদিকের রাস্তাঘাট পরিকার এবং বাড়িয়রের সংখ্যা কম । এখন ভোর বলেই সন্তুষ্ট রাস্তায় মানুষ নেই । বেশ কিছুটা যাওয়ার পর সে দেখল একজন বৃদ্ধা তাঁর বাড়ি থেকে বেরিয়ে সামনে দাঁড় করিয়ে রাখা গাড়ির দিকে এগোচ্ছেন । গাড়িতে কোনও ড্রাইভার নেই । সন্তুষ্ট বৃদ্ধাই চালাবেন । অর্জুন একেবারে বৃদ্ধার সামনে পৌঁছে গেলে তিনি মুখ ফেরালেন । ভদ্রমহিলা প্রচণ্ড স্তুলকায় । কিন্তু হাসিখুশি ।

তিনি অর্জুনকে বললেন, “সুপ্রভাত ।”

“সুপ্রভাত ।” অর্জুন চটপট জবাব দিল ।

বৃদ্ধা এবার ঝুঁকে গাড়ির দরজা খুলতে গেলেন । চাবি নয়, দরজার গায়ের চাকতির নম্বর ঠিক জায়গায় নিয়ে এলে দরজা খুলে যাবে । বৃদ্ধা সেটা মন দিয়ে করার চেষ্টা করতেই তাঁর হাত থেকে ব্যাগ পড়ে গেল । অর্জুন সেটা কুড়িয়ে ফেরত দিতে বৃদ্ধা খুব খুশি হলেন, “অনেক ধন্যবাদ । আজ-কাল করে চোখের ভাঙ্গারের কাছে যাওয়া হচ্ছে না । আপনি খুব ভাল মানুষ । বাতের

ব্যথার জন্য ঝুঁকে কিছু কুড়োতে আমার কষ্ট হয় । ”

অর্জুন বলল, “আমাকে আপনি বলবেন না, আমি অনেক ছোট । ”

“বাঃ । এরকম কথা তো এখনকার যুবকদের মুখে শুনি না । ” বৃন্দা গাড়িতে উঠে স্টিয়ারিং-এ বসলেন, “তুমি এদিকে থাকো ? ”

“না । হাইওয়ের ওপাশে থাকি । ”

“হাইওয়ের ওপাশে ? সে তো অনেকদূর । এলে কী করে ? ”

“আমার এক বন্ধুর গাড়িতে । এখন ফিরব কী করে তাই ভাবছি । ”

“আহা ! এসো, এসো, আমার যদিও অতদূরে যাওয়ার কথা ছিল না, তবু চল, তোমাকে খানিকটা এগিয়ে দিচ্ছি । কী নাম তোমার ? ”

তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠে বসে সে জবাব দিল, “অর্জুন । ”

“চমৎকার নাম । আমার মেয়ের নাম চিত্রাঙ্গদা । ” বৃন্দা গাড়ি চালাতে আরম্ভ করলেন । অর্জুন লক্ষ করল, এই গাড়িটা বলাকার গাড়ির মতনই, তবে ড্যাশবোর্ডে সেই টিভির পরদাটা নেই । শাস্ত সকালে গাড়ি ধীরে-ধীরে শহর থেকে বেরিয়ে আসছিল । অর্জুনের চোখে পড়ল রাস্তার মোড়ে-মোড়ে সাদা ইউনিফর্ম-পরা পুলিশেরা দাঁড়িয়ে । বৃন্দাও সেটা দেখলেন । নিজের মনেই বললেন, “হঠাতে এত রক্ষী কেন ? আমার বাপু ওদের ভাল লাগে না । ”

অর্জুন সিঁটিয়ে ছিল । তার মনে হচ্ছিল, এত পুলিশ রাস্তায় শুধু তাকেই খুঁজে বের করার জন্য । হঠাতে একটা বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড় করালেন বৃন্দা । বাড়িটার মাথার ওপরে লেখা রয়েছে, “উপাসনা মন্দির” । বৃন্দা জিজেস করলেন, “আমি কিছুক্ষণ মন্দিরে থাকব । তুমি কি আমার সঙ্গে যেতে চাও ? ”

‘হ্যাঁ’ বললে বৃন্দা খুশি হতেন । কিন্তু আশেপাশে গাড়ির সংখ্যা দেখে অর্জুন বুঝল, মন্দিরে ভাল ভিড় হবে । ইতিমধ্যে যোষণা শুনে ফেলা কোনও লোক তাকে দেখে সন্দেহ করলেও দফা রফা হয়ে গেল । সে হাসল, “আমি না হয় অপেক্ষা করি । ”

“বেশ । ” বৃন্দা নেমে গেলেন । থপথপ করে এগিয়ে গেলেন দরজার দিকে, হাতে ব্যাগ নিয়ে । অর্থাৎ ব্যাগটির ব্যাপারে তিনি বেশ সতর্ক ।

অর্জুন গাড়িতে বসে ছিল চুপচাপ । তারপর কী মনে হতে গাড়ির ড্যাশবোর্ড খুঁটিয়ে দেখতে লাগল । এইটে ইঞ্জিন চালু বা বন্ধ করার সুইচ । বৃন্দা এইটে নিচে নামিয়ে ইঞ্জিন বন্ধ করেছিলেন । এইটে কী ? পাশে কিছু লেখা নেই । গোটা-আটেক নানা ধরনের সুইচ সে টিপতে লাগল ইঞ্জিন চালু করার সুইচটিকে বাদ রেখে । হঠাতে রেডিও বেজে উঠল । গান হচ্ছে ‘ও আমার সোনার বাংলা’ । বাঃ, চমৎকার । অর্জুনের মনে হল, রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পঞ্চাশ বছর পরে যাঁরা উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন কপিরাইট আইনের সময় শেষ হওয়ায় তাঁর গান নিয়ে যাচ্ছেতাই কাণ্ড হবে, তাঁদের এখানে এসে শোনা উচিত । মৃত্যুর একশো সত্ত্বে যোগ পঞ্চাশ বছর পরেও কী সততার সঙ্গে গাওয়া হচ্ছে ।

গান শেষ হতেই ঘোষক বললেন, “সতর্কীকরণ ! আজ ভোরবেলায় জাতির পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক এক ব্যক্তি আমাদের সুরক্ষা দফতরের জোনলা ভেঙে পালিয়ে গিয়েছে । লোকটির পোশাক বিংশ শতাব্দীর মানুষের মতো, ধূমপান করে এবং নিজের নাম অর্জুন বলে পরিচয় দেয় । লোকটি একা কি না তা জানা নেই । তবে যেভাবে সে নিখেঁজ হয়েছে তাতে বোঝা যায়, তার সঙ্গী থাকতে বাধ্য । যে-কেউ এই লোকটির সন্ধান পাবেন তাঁকেই কালবিলম্ব না করে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে ।”

অর্জুনের শিরদাঁড়া কনকন করে উঠল । ওরা এখন তাকে খুঁজে বের করতে নিশ্চয়ই মরিয়া হয়ে উঠেছে । উপাসনা মন্দিরে যদি ওই ঘোষণা শোনা যায় তা হলে বৃক্ষ এতক্ষণে... ! সে রেডিওর সুইচ অফ করল । তারপর জায়গা পরিবর্তন করে স্টিয়ারিংয়ের সামনে বসল । স্টিয়ারিং বলতে একটা গোল চাকতি । ক্ল্যাচ নেই, গিয়ার নেই শুধু অ্যাক্সেল্যারেইটর আর ব্রেক । সে ইঞ্জিন চালু করে অ্যাক্সেল্যারেইটর চাপ দিতেই গাড়ি চলতে শুরু করল । প্রথমে হাত কাঁপছিল । কিন্তু মোটরবাইক চালানোর অভ্যাস থাকায় গাড়ির চলাকে আয়ত্ত করতে অসুবিধে হল না । এমন মজার ড্রাইভিং যদি বিংশ শতাব্দীতে জলপাইগুড়ির মানুষ করতে পারত ! প্রথম মোড় এগিয়ে এল । দু'জন পুলিশ তার দিকে অলস চোখে তাকিয়ে আছে । দমবন্ধ করে অর্জুন মোড়টা পার হতেই ‘বাহির পথ’ লেখা বোর্ড দেখতে পেল । সে দ্রুত গাড়ি সেই পথে নিয়ে যেতে-যেতে গতি সামলালো । সামনে এখন প্রচুর গাড়ি । এভাবে চালিয়ে অ্যাকসিডেন্ট করে কোনও লাভ নেই । এ-জীবনের জন্য এখানেই থেকে যেতে হবে ।

ধীরে-ধীরে সে অন্য গাড়িদের অনুসরণ করে হাইওয়েতে উঠে এল । ওঠার পরেই মনে হল সে জানে না কোন দিকে যেতে হবে । ডান না বাম । বামে যেতে হলে ফ্লাইওভারে উঠে ওপাশে গিয়ে গাড়ির স্রোতে মিশতে হবে । অর্জুন অনুমান করল তাকে ডান দিকেই যেতে হবে, কারণ সে শহর থেকে বেরিয়ে এসেছে ।

হাইওয়েতে যে-গতিতে গাড়ি যাচ্ছে, আনাড়ি হাতে তার সঙ্গে তাল রাখা মুশকিল । দু'-দু'বার দুটো গাড়ির ধাক্কা লাগতে-লাগতে বেঁচে গেছে । লেন ঠিক রাখা মুশকিল হয়ে পড়ছে । তবু স্পিড বাড়াতে দ্বিদ্বা করছে না অর্জুন । হঠাৎ চোখে পড়ল মাথার ওপর সাইনবোর্ড, “বিদ্যায় অতিথি, জলপাইগুড়ির স্মৃতি সুখকর হোক !” সাইনবোর্ডটার তলা দিয়ে বেরিয়ে এসে সে দেখল এপাশে সুস্থাগতম লেখা । আঃ । সে ঠিক পথেই যাচ্ছে । বলাকা তাকে এই পথেই নিয়ে গিয়েছিল ।

হঠাৎ পেছন থেকে বিপ-বিপ শব্দ ভেসে এল । গাড়ির আয়নায় অর্জুন দেখল একটা লাল আলো জালানো গাড়ি তার পেছন-পেছন আসছে ওই শব্দ

করতে-করতে । এটা নিশ্চয়ই পুলিশের গাড়ি । পুলিশ তার খবর পেল কী করে ? বুংকা কি তাঁর গাড়ি হারানোর ব্যাপারটা পুলিশকে জানিয়েছেন ? অর্জুন আরও গতি বাড়াল । তার গাড়িই একমাত্র হৰ্ন দিচ্ছে । ফলে অন্য গাড়ি সামনে থেকে সবে গিয়ে পথ করে দিতে লাগল । এঁকেবেঁকে অর্জুনের গাড়ি ছুটতে লাগল সামনে । পেছনে পুলিশের গাড়িটা একটু হকচকিয়ে গিয়ে গতি বাড়াল । খানিকটা যাওয়ার পর অর্জুন বুঝতে পারল পুলিশের গাড়িটা অনেক শক্তিশালী । প্রায় তার গায়ের কাছে চলে এসে পুলিশ অফিসার হাত-মাইকে আদেশ করলেন “গাড়ি থামাও নইলে গুলি করব ।”

অর্জুন কান দিল না । এদিকটায় রাস্তার দু'পাশে ফাঁকা জমি । হঠাৎ ডান দিকে জঙ্গল দেখতে পেল । পুলিশের গাড়ি এবার তার ঘাড়ের কাছে এসে পড়েছে । রিভলভারটাকে প্রায় নাকের ডগায় দেখতে পেয়ে ঘাবড়ে গেল অর্জুন । তার হাত কেঁপে উঠল । ব্রেকে পা দেওয়ার বদলে চাপ বাড়ল অ্যাক্সেল্যারেইটরে । দড়াম করে একটা আওয়াজ হল । অর্জুনের গাড়ির ধাক্কায় পুলিশের গাড়ি ছিটকে গেল রাস্তার একপাশে । অর্জুনের গাড়ি পাক খেতে-খেতে শেষ পর্যন্ত সামলে নিয়ে ছুটল আরও জোরে । পেছনে কাত হয়ে থাকা পুলিশের গাড়ির দিকে তার নজর দেওয়ার সময় নেই ।

মিনিটখানেকের মধ্যেই বিপ্-বিপ্ আওয়াজে কান ঝালাপালা হওয়ার অবস্থা । অর্জুন বুঝল আরও পুলিশের গাড়ি ছুটে আসছে তার দিকে । এরা সম্ভবত হাইওয়ের ধারে দাঁড়িয়ে ছিল । এবার ওরা গুলি করবেই । অর্জুন পাশের জঙ্গলের দিকে তাকাল । এই জঙ্গলটাই তো ? তিনটে সিডিঙ্গে গাছ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছিল । সেগুলো কোথায় ? বুলডগের মতো গাড়িগুলো ছুটে আসছে পেছনে । অর্জুন দেখতে পেল হাইওয়ে থেকে একটা সরু পথ চলে গেছে জঙ্গলের মাঝখান দিয়ে । সে চকিতে স্টিয়ারিং ঘোরাল । ব্রেক করেও শেষরক্ষা করতে পারল না, গাড়িটা প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা মারল রাস্তার পাশের রেলিঙে । ঘেরে স্থির হয়ে গেল ।

দরজা খুলে লাফিয়ে নেমে অর্জুন জঙ্গলের দিকে দৌড়তে লাগল । পুলিশের গাড়িগুলো ব্রেক করে থামতে-থামতে সে জঙ্গলে চুকে পড়ল । এবং তখনই তার কানে খুব নিচু পরদায় ঘেউ-ঘেউ ডাক ভেসে এল । অর্জুন চিৎকার করে উঠল, “তাতান !”

কিন্তু চিৎকারটা এবার পেছন থেকে । অর্জুন দেখল একগাদা পুলিশ চেনবাঁধা কুকুর হাতে নিয়ে ছুটে আসছে । কুকুরগুলো হিংস্র, ডাকছে তারাই । অর্জুন ছুটল । একটা সময় কুকুরের ডাক মিলিয়ে গেল, কিন্তু খুব কাছ থেকে নিচু গলার ডাক ভেসে এল । অর্জুনের মনে হল তাতানকে নিয়ে সেই অন্য গ্রহবাসী তার সামনে এগিয়ে চলেছে । এর মানে ওরা সারাক্ষণ তার সঙ্গে ছিল ।

মাথার ওপর এখন বিমানের আওয়াজ। অন্তুত চেহারার বিমানগুলো এখন জঙ্গল খুঁজে বেড়াচ্ছে। হঠাতেই তাদের একটা অর্জুনকে দেখতে পেল। সঙ্গে-সঙ্গে জোরালো আগুনের একটা রশ্মি নেমে এল ওপর থেকে। অর্জুন দৌড়ে সময়মতো সরে গিয়ে দেখল সেই জায়গার গাছপালা পুড়ে কালো হয়ে গেল।

স্তুমিত হয়ে আসা কুকুরের ডাক অনুসরণ করে কিছুটা যেতেই সে তিনটে সিডিঙে গাছ দেখতে পেল। অর্জুন এতটা উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল যে, খেয়াল করেনি একজন পুলিশ অফিসার তার দিকে এগিয়ে আসছে। যখন দেখতে পেল তখন মেশিনটার উদ্দেশ্যে না দৌড়ে কোনও উপায় নেই।

মাথার পাশ দিয়ে দু-দু'বার গুলি ছুটে গেল। মেশিনটার কাছে পৌঁছে দরজা খুলে সে পেছনে তাকিয়ে হিংস্র পুলিশটিকে দেখতে পেল। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে তার দিকে বন্দুক তাক করেছে। হঠাতেই লোকটা হতভস্ত হয়ে পাশে ঘুরে দাঁড়াল। অদৃশ্য কিছু তাকে ধাক্কা মেরেছে বলে মনে হল। অর্জুন আর অপেক্ষা না করে মেশিনে উঠে বসে ইঞ্জিন চালু করার সুইচে হাত দিয়ে নব ঘোরাতে লাগল। একশো সন্তুর বছর পিছিয়ে যেতে হবে তাকে।

প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনিতে শরীরের হাড়গোড় ভেঙে যাওয়ার মতো অবস্থা। অর্জুন চোখ মেলে দেখল চারপাশ কেমন অঙ্ককার-অঙ্ককার। সে কোথায়, প্রথমে ঠাওর করতে পারল না। শরীর একটু স্থির হতে সে মেশিন থেকে নামার চেষ্টা করল। কয়েক সেকেন্ড বাদে সে বুঝতে পারল এটা ডষ্টের গুপ্তর গবেষণাগার। কোনও পুলিশ অফিসার সামনে নেই বন্দুক উঁচিয়ে।

অর্জুন ধীরে-ধীরে দরজার কাছে এগোল। না। বিদ্যুতের ছোঁয়া নেই ওখানে। দরজা টেলল সে। ধীরে-ধীরে খুলে গেল সেটা। সেই সিডি এখন অঙ্ককারে ঢাকা। নীচের ঘরে একটা হাজার জুলছে। কিছু লোক কথাবার্তা বলছে। অর্জুন হ্যাজাকের আলো লক্ষ করে নীচে নেমে আসতেই একজন চিৎকার করে উঠল, “কে? কে ওখানে?” অর্জুন দেখল, খাঁকি পোশাক পরা পুলিশ অফিসার।

ভদ্রলোক একা নন, সঙ্গে আরও তিনজন সেপাই আছেন। চারজনেই উঠে এসেছেন অর্জুনের সামনে। প্রত্যেকের চোখেমুখে বিস্ময়।

অর্জুন বলল, “আমি অর্জুন। ডষ্টের গুপ্ত আমাকে এখানে নিয়ে এসেছিলেন।”

অফিসারটির চোখ ছোট হল, “কখন নিয়ে এসেছিলেন?”

“সক্ষেবেলায়। ঠিক সক্ষে হয়নি তখনও।”

“আপনি ওপরে ছিলেন সেই থেকে?”

“হ্যাঁ।”

“মিথ্যে কথা বলার জায়গা পাননি? আমরা তন্ম-তন্ম করে খুঁজেছি এই বাড়ি। ওপরের ঘরে কেউ ছিল না। এই, একে অ্যারেস্ট করো।” অফিসার হ্রস্ব করলেন।

এর কিছুক্ষণ বাদে, গভীর রাত্রে অর্জুন শিলিঙ্গড়ির থানায় বসে ছিল। দারোগাবাবু বাইরে গিয়েছেন কাজে। তিনি না ফেরা পর্যন্ত কেউ তার কথা শুনবে না।

অর্জুন হতাশ হয়ে পড়েছিল। একশো সপ্তর বছর আগে গিয়ে তাকে পুলিশের হাতে পড়তে হয়েছিল। প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেও সেই একই অবস্থা?

দারোগাবাবু এলেন রাত দুটোর সময়। রিপোর্ট নিশ্চয়ই আগেই পেয়েছিলেন, ঘরে চুকে বললেন, “কে হে তুমি? ওই বাংলোয় কোন মতলবে চুকেছিলে?”

অর্জুন বলল, “আপনারা খুব ভুল করছেন আমি একজন সত্যসন্ধানী। আমার নাম অর্জুন। জলপাইগুড়ি শহরে থাকি। ডক্টর গুপ্তে আমাকে ওখানে নিয়ে যান।”

হঠাৎ দারোগাবাবুর মুখচোখ বদলে গেল, “আরে তাই তো! আপনি এতক্ষণ কোথায় ছিলেন? ডক্টর গুপ্তকে যখন হসপিটালাইজড করা হয় তখনও তিনি আপনার নাম বলছিলেন!”

“উনি কেমন আছেন?”

“খুব খারাপ। বাঁচার কোণও চাল নেই। হেড ইনজুরি। মৃত্যুর সঙ্গে দড়েছেন।”

“বেঁচে যাবেন।” অর্জুন বলল।

“মানে?”

“কিছু না। আর কী হয়েছে?”

“যারা এসেছিল ডাক্তানি করতে তারা নীচের তলাই তচ্ছন্দ করেছে, ওপরের ঘরে চুকতে পারেনি। কিন্তু একটা খবর আমরা ডক্টর গুপ্তকে দিতে পারিনি। ওর যা কন্ডিশন!”

“কী খবর?”

“কারেন্ট অফ করে ওপরের ঘরে চুকে আমরা কোনও কুকুরের দেখা পাইনি। আপনিও ছিলেন না। ডাক্তার গুপ্ত কেবলই তাতান-তাতান করছিলেন!” দারোগার আবার মনে পড়ল, “আপনি কোথায় ছিলেন?”

“ওপরের ঘরে অনেকগুলো যন্ত্র ছিল, তার একটাতে চুকে ঘূমিয়ে পড়েছিলাম। অঘোরে ঘূমিয়েছি।” অর্জুন হাসল।

“আচ্ছা। হ্যাঁ, যন্ত্রগুলো দেখেছি কিন্তু কী থেকে কী হয়ে যাবে ভেবে আর খুলে দেখিনি। তা হলে কুকুরটাও তার একটাতে থাকতে পারে!” দারোগা চক্ষু হয়ে উঠলেন।

“না, নেই। তাতান এখানে নেই।” মাথা নাড়ল অর্জুন।

দারোগাবাবুই রাত্রে শোওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। ঘুম ভাঙার পর হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে তাজ্জব অর্জুন। ঘড়ি বক্ষ হয়ে গেছে। ঘড়ির তারিখ একশো সপ্তাহ বছর এগিয়ে। সে কাঁটা ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে সময়টাকে সঠিক জায়গায় ফিরিয়ে আনতেই ঘড়ি আবার চালু হল। প্রায় ঘণ্টা-চবিশ সে এই সময়ে ছিল না। কিন্তু কেমন যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। সে রওনা হয়েছে এক সকালে, পৌঁছল রাতের বেলায়। যাওয়ার সময় তো এমন কাণ্ড হয়নি। পৃথিবীর পর্শিম থেকে পুবে এলে সময় বেড়ে যায়, সেইরকম কিছু?

সকালবেলায় দারোগাবাবুর সৌজন্যে লুচি-তরকারি আর চা খেতে যে কী আরাম লাগল তা কাউকে বোঝাতে পারবে না অর্জুন। আহা, একশো সপ্তাহ বছর পরের মানুষগুলো এসবের স্বাদ জানবে না।

ঠিক ন'টা নাগাদ শিলিঙ্গড়ির হাসপাতালে গিয়ে শুনল কলকাতা থেকে বড়-বড় চিকিৎসকরা এসেছেন। ডক্টর গুপ্তের মাথায় অপারেশন হবে। অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়ার সময় সে এক মুহূর্তের জন্য ডক্টরের দেখা পেল। অজ্ঞান হয়ে আছেন। অর্জুন বিড়বিড় করল। পাশে দাঁড়ানো দারোগাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, “কি বলছেন?”

অর্জুন বলল, “আর কয়েক বছর বাদে উনি নোবেল পুরস্কার পাবেন।”

“তার মানে? উনি ভাল হয়ে যাবেন?” দারোগা অবাক।

“অবশ্যই। মাথার এই আঘাতটা ওঁকে সাহায্য করবে।”

অর্জুন আর দাঁড়াল না। হাসপাতালের বাইরে বেরিয়ে এসে রিকশায় উঠল। জলপাইগুড়ি শহরের কদম্বতলায় রূপমায়া সিনেমার সামনে বাস থেকে নেমে কিন্তু ওর মন খুব খারাপ হয়ে গেল। কী ঘিঞ্জি রাস্তা, রিকশা, গাড়ি মানুষের ভিড়ে হাঁটা মুশকিল। একশো সপ্তাহ বছরের পরে এই জায়গাটাকে চেনা যাবে না। এখনকার ভাল আর তখনকার ভালগুলোকে যদি এক করা যেত!

হঠাৎ তাতানের কথা মনে পড়ে গেল। তাতানকে সেই রাত্রেই তার ভিন্নগ্রহের বক্ষু নিয়ে গেছে। নিশ্চয়ই সেই গ্রহে বয়স বাড়ে না। তাই তাতান একশো সপ্তাহ বছর পরেও একই রকম আছে। ইচ্ছেমতন মাঝে-মাঝে বক্ষুর সঙ্গে পৃথিবীতে ঘূরে যায়। ডক্টর গুপ্ত ব্যাপারটা জানতে পারলে খুশি হবেন।

অর্জুন নিজের গালে হাত বোলাল। যাঃ, এর মধ্যেই খরখরে দাড়ি বেরিয়ে গেছে। ভাল ভাবে শেভ করে স্নান করা দরকার। সে বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগল।

penhagor.net

কার্ভালোর বাক্স

এখন কোনও কাজকর্ম নেই। তিন-তিনটে মাস শুধু বই পড়ে আর ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিয়ে মন মেজাজ বিশ্রী হয়ে গিয়েছিল অর্জুনের। থানার দারোগা অবনীবাবু হেসে বলেছিলেন, “মানুষের স্বভাব বড় অস্তুত। এই যে আমার জেলায় কোনও বড় ক্রাইম হচ্ছে না, চার-পাঁচ মাসে কিছু চুরি ডাকাতি ছাড়া কোনও প্রলেম নেই, এতে সবার খুশি হওয়ায়র কথা কিন্তু হাঁপিয়ে উঠছেন আপনি। ধরুন, এই শহরে ছ’ মাস ধরে কারও কোনও অসুখ করল না, এমনকী সর্দিজুরুও নয়, সবাই হঠাতে একদম ফিট হয়ে গেল তাতেও একদল মানুষ অখুশি হবে। ডাক্তাররা। তাঁরা বেকার হয়ে যাবেন।”

অর্জুন হেসে ফেলেছিল। ব্যাপারটা হয়তো তাই। কিন্তু দুটো সমস্যার চেহারা একরকম নয়। তবে অবনীবাবু ভাল মানুষ। থানার দারোগা হয়েও দেশ-বিদেশের খবর রাখেন। শহরে এসেছেন বছরখানেক হল। অমলদা, অমল সোমের সঙ্গে আলাপ করার খুব ইচ্ছে ছিল ওঁর, কিন্তু হয়নি। অমলদা বেশ কিছুদিন মৌনী নিয়ে ছিলেন, কারও সঙ্গে দেখা করতেন না। তারপর একদিন হাবুর হাতে একটা চিঠি ধরিয়ে আগের বারের মতো দেশ ঘূরতে বেরিয়ে গেছেন।

বিকেলবেলায় অবনীবাবুর ঘরে বসে কথা হচ্ছিল। এর মধ্যে একবার চায়ের প্রস্তাৱ করেছেন ভদ্রলোক, অর্জুন রাজি হয়নি। থানার চা এত খারাপ যে, মুখে দেওয়া যায় না। কথাটা সে ভদ্রলোককে বলতে পারেনি। ওই চা মুখে দিয়ে প্রতিবার অবনীবাবু “আঃ” বলে শব্দ তোলেন।

থানার বিল্ডিংটার উপর লেখা রয়েছে কোতোয়ালি। এই নিয়ে কথা হচ্ছিল। কোতোয়ালি হল কোতোয়ালের অফিস। কোতোয়াল মানে কেটাল, নগরপাল। শব্দগুলো এখন শোনা যায় রবীন্দ্রনাথের শ্যামা ন্ত্যনাট্যে, ‘বলরে নগরপালে’। বাস্তবের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ নেই। অবনীবাবু বললেন, “হিন্দিভাষাভাষী মানুষেরা শব্দটাকে এখনও ব্যবহার করেন মশাই। আফটার অল হিন্দি তো আমাদের রাষ্ট্রভাষা। ভাবুন, তখন, কী দিন ছিল! আমি কেটাল, নগরপালক। কী খাতির। তখন টিয়ার গ্যাস ছিল না, বন্দুক ছিল না, শুধু অসির ঝানঝানি।”

“অবজেকশন!” পেছন থেকে একটা হেঁড়ে গলা ভেসে এল। অর্জুন দেখল, ঘরের এক কোণে একজন বসে আছেন। ভদ্রলোকের বয়স সতরের কাছে গায়ে ময়লাটে সাদা পাঞ্জাবি, গায়ের রং বেশ কালো। অবনীবাবু ভদ্রলোকের দিকে পিটাপিট করে তাকালেন, “মানে?”

“আজ পর্যন্ত আসি হাতে কোটালের ঘুরে বেড়ানোর গল্প পড়ার

সুযোগ হয়নি। তখন একটা লাঠি আর দড়িই ছিল সাফিসিয়েন্ট। আর কোতোয়াল শব্দটি এসেছে ফারসি 'কোংরাল' থেকে। বাংলা ভাষায় সেখানে-কোনও অভিধানে পেয়ে যাবেন।" ভদ্রলোক একটানা বললেন।

"অ। আপনি যেন কী কাজের জন্যে এখানে এসেছেন?" অবনীবাবু একটু বিরক্ত।

"ছোট দারোগাকে বলেছি। তিনি এখানে আসতে বললেন। এসে ইস্তক আপনাদের কথা শুনছি।"

"ঠিক আছে। এবার বলতে পারেন।"

"আগে আমার পরিচয়টা দিয়ে নিই। দেওয়ার মতো অবশ্য কিছু নয়। পিতৃদেব নাম রেখেছিলেন রাম, রামচন্দ্র রায়। এককালে ভাল ফুটবল খেলতাম। রাইট ইনে। তখন তো ওইসব আধুনিক ছক চালু হয়নি। ফরোয়ার্ড লাইনেই পাঁচজন থাকত। আমি পুরো মাঠ চৰতাম। প্রচণ্ড দম ছিল তো?"

অবনীবাবু হাত তুলে ভদ্রলোককে থামিয়ে বললেন, "ওটা নিশ্চয়ই আপনার ছেলেবেলার ঘটনা। আমরা আপনার এখনকাব পরিচয় জানতে চাইছি।"

রামচন্দ্র বললেন, "ঠিক ছেলেবেলা বলা যাচ্ছে না। আমি আঠারো বছরে খেলা ছেড়েছি। একটু বেশি কথা বলছি বোধ হয়, শর্টকাট করি, জাহাজে চাকরি করতাম। পৃথিবীটা চক্র দিয়েছি। আর জাহাজে জানেনই তো, সমুদ্রে ভাসলে হাতে অফুরন্ত সময়। তখন বই পড়েছি। পছন্দ বলে তো কিছু ছিল না, হাতের কাছে যা পেয়েছি। দু-দুটো অভিধান মুখস্থ হয়ে গেল ওই সময়।"

অর্জুন অবাক হয়ে গেল। ভদ্রলোকের শরীরের গঠন বেশ মজবুত হলেও চেহারায় বোঝা যায় বেশ অর্থকল্পে আছেন। সে না বলে পারল না, "আস্তুত"

"আস্তুত কেন? আপনার হাতে যদি কোনও কাজ না থাকে, যদি একটা ঘরে কয়েক মাস বন্দি থাকেন এবং প্রচুর উল আর কাঁটা ধরিয়ে দেওয়া হয় তা হলে আপনিও সোয়েটার বুনতে শিখে যাবেন। পরিস্থিতি আপনাকে বাধ্য করবে শিখতে।"

"ইটারেস্টিং।" অর্জুন বলল, "আপনি একটু এপাশে এগিয়ে আসুন না।"

রামচন্দ্র উঠে দাঁড়ান, "ধন্যবাদ, না বললে আমি আগ বাড়িয়ে কাছে যাই না।" একটা চেয়ার ফাঁকা রেখে বসলেন ভদ্রলোক। কাছাকাছি হওয়ার পর অর্জুন ভদ্রলোককে লক্ষ করল। গম্ভীর দাদু-দাদু চেহারা। মুখে বেশ সৌম্য ভাব, মানুষটিকে একটুও কুটিল বলে মনে হয় না।

অবনীবাবু বললেন, "আপনার পরিচয়টা এখনও জানলাম না। আপনি ফুটবল খেলতেন, জাহাজে চাকরি করতেন। এখন আপনি কী করেন?"

রামচন্দ্রবাবু মাথা নাড়লেন, "ওইটাই মুশকিল হয়ে গিয়েছে। ওরা আমাকে মিডিয়াম বানিয়ে ফেলেছে। প্রথম-প্রথম মজা লাগত, এখন এক্ত অসহায় মনে

হয় নিজেকে...।”

“মিডিয়াম ? কিসের মিডিয়াম ?” অবনীবাবু সন্দিগ্ধ হয়ে উঠলেন।

“আমি যা করতে চাই না, তাই ওরা আমাকে দিয়ে করায়।” রামচন্দ্র নিচুস্থরে বললেন।

“আই সি ! তার মানে এখন আপনি ক্যারিয়ার ! আপনার মতো বয়স্ক সরল চেহারার মানুষ ক্যারিয়ার হলে পুলিশের বাবার সাধ্য নেই যে সন্দেহ করবে। ওদের হয়ে কী ক্যারি করেন আপনি ? ড্রাগ না স্মাগলড গুডস ?” অবনীবাবু সোজা হয়ে বসলেন।

“আজ্জে, ঠিক তা নয়, আপনি...।” রামচন্দ্র বিড়বিড় করলেন।

“বুঝতে পেরেছি। কিন্তু হঠাতে আপনি নিজেকে সারেন্ডার করতে এলেন কেন ? এই সুমতি কি স্বাভাবিক ? ঠিক আছে, তার আগে বলুন আপনি কোথায় থাকেন ?” কলম খুললেন অবনীবাবু।

“আপনি ভুল করছেন। আমি স্মাগলার বা ড্রাগকারবারিদের ঘৃণা করি। খবরের কাগজে আমি এই নিয়ে প্রচুর লিখেছি। কলকাতার লিডিং ড্রাগকারবারি পাশা আমার রিপোর্টের জন্যে ধরা পড়ে। তা ছাড়া যে অভিধান মুখ্য বলতে পারে সে ওই কাজ করতে পারে না।” বেশ রাগত ভঙ্গিতেই প্রতিবাদ জানালেন রামচন্দ্রবাবু।

“খবরের কাগজ ? খবরের কাগজে আপনি কী করতেন ?”

“সাব এডিটোর ছিলাম। কিন্তু প্রায়ই ফিচার লিখতাম, মাঝে-মাঝে স্কুপও।”

“ভাবা যায় না। আপনি ফুটবল খেলতেন, জাহাজে চাকরি করতেন, আবার খবরের কাগজে চাকরি করেছেন। অন্তুত জীবন তো। তা হলে এই যে বললেন আপনাকে ক্যারিয়ার হতে ওরা বাধ্য করছে, সেটা তা হলে কী ?” অবনীবাবু ধাঁধায় পড়ে গেছেন বোঝা গেল।

“আমি একবারও বলিনি কেউ আমাকে ক্যারিয়ার করেছে। আমি বলেছি আমাকে ওরা মিডিয়াম বানিয়ে নিয়েছে এবং এতে আমার কিছুই করার নেই।” গন্তব্য গলায় বললেন ভদ্রলোক।

“কারা আপনাকে মিডিয়াম বানিয়েছে ?” অবনীবাবুর গলার স্বরে একটু হালকা হাসি মিশল।

“আমি ঠিক জানি না কিন্তু অনুভব করতে পারি। মুশকিল হল, এ-ব্যাপারে আমি অসহায়। আমার ইচ্ছের কোনও মূল্য নেই। ওরা যা চাইবে তাই আমাকে করতে হবে। শেষপর্যন্ত ভেবে দেখলাম আপনার কাছে আসাই ভাল। আমি একটা ডায়েরি করতে চাই।”

“ডায়েরি ? কার বিরক্তে ?” হাসি চাপতে পারলেন না অবনীবাবু। আর সেটা দেখে বেশ গন্তব্য হয়ে গেলেন রামচন্দ্র রায়, “সত্যি বলতে কি, কারও বিরক্তে নয়। আমি চাইছি ব্যাপারটা রেকর্ডে হয়ে থাক। ধরুন, ওরা আমাকে

দিয়ে কাউকে খুন করালো, তখন এই রেকর্ডটা কাজে লাগবে । ”

এই সময় টেলিফোন বাজল । বাঁ হাতে রিসিভার তুলে অবনীবাবু সাড়া দিলেন । ওপাশের বক্তব্য শুনতে-শুনতে তিনি সোজা হয়ে বসলেন, তারপর “আসছি” বলে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন । অর্জুন ওঁর এই ভঙ্গি টিনে ফেলেছে । কোথাও কিছু ঘটেছে এবং অবনীবাবুকে এখনই সেখানে যেতে হবে ।

“সরি, মিস্টার রায়, আমি আপনাকে ঠিক এই মুহূর্তে সাহায্য করতে পারছি না । আপনি বাড়িতে গিয়ে আর একবার ভাবুন । তারপরেও যদি মনে হয় এখনকার ভাবনাটাই ঠিক তা হলে আর একদিন আসবেন । আমাকে এখনই তিস্তার চরে যেতে হচ্ছে । ” অবনীবাবু উঠে দাঁড়ালেন ।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “সিরিয়াস কিছু ঘটেছে নাকি ?”

“না । জায়গাজমি নিয়ে ঝামেলা । আপনি কি বসবেন ?”

“না । আর বসে কী করব । আপনি এগোন, আমি আসছি । ”

অর্জুনের কথা শুনে চোখে এমন একটা ইশারা করলেন অবনীবাবু রামচন্দ্রবাবুকে উদ্দেশ করে যে, তার একটাই অর্থ হয়, পাগলের পাল্লায় পড়বেন না মশাই । অবনীবাবু ঘরের বাইরে চলে গেলে অর্জুন রামচন্দ্রবাবুকে জিজ্ঞেস করল, “আপনি কোনদিকে যাবেন ?”

“আমি ? রাজবাড়ির কাছে । ” রামচন্দ্রবাবু উঠে দাঁড়ালেন, “আচ্ছা, আমার কথাবার্তা কি খুব অ্যাবন্মাল শোনাল ? মানে, পাগলের প্রলাপ বলে মনে হল ?”

হকচিকিয়ে গেল অর্জুন, “না, না । একথা আপনার মনে হচ্ছে কেন ?”

“মনে হল । ” মাথা নাড়লেন ভদ্রলোক, “আপনি পুলিশের লোক ?”

“আজ্জে না । আমি মাঝে-মাঝে এখানে গল্ল করতে আসি । ”

“আশ্চর্য ! থানাতে কেউ গল্ল করতে আসে বলে শুনিনি । ”

“আসলে অবনীবাবু, মানে উনি, মানুষ ভাল । আর আমার প্রোফেশনের সঙ্গে উনি জড়িয়ে আছেন । এখানে এসে নানান ধরনের মানুষের কথা শুনি, সেটা কাজেও লাগে । ”

“কী প্রোফেশন আপনার ?”

“সত্যসন্ধান । ”

অদ্ভুত চোখে তাকালে রামচন্দ্রবাবু । যেন শব্দটির মানে বোঝার চেষ্টা করলেন । তারপর বললেন, “নাম কী ভাই ?”

“অর্জুন । ”

“ও, আপনিই অর্জুন । নাম শুনেছি কিন্তু বয়স এত অল্প, আন্দাজ করিনি । আচ্ছা, আমাদের বোধ হয় এই ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়া উচিত । চলুন, বাইরে যাই । ” রামচন্দ্র রায় দরজার দিকে এগোলেন । এই মুহূর্তে ভদ্রলোককে যথেষ্ট

সুস্থ এবং বিবেচক বলে মনে হচ্ছে । অর্জুনের মনে হল, মানুষটি একটু আলাদা ধরনের । হঠাৎ সে আকর্ষণ বোধ করতে লাগল ।

বাইরে বেরিয়েই রামচন্দ্র রায় বললেন, “সঙ্গে হয়ে গেল । মুশকিল ।”

“মুশকিল কেন ?”

“আমি রাতের বেলায় ঘরের বাইরে থাকতে চাই না । যতক্ষণ আলো থাকে ততক্ষণ আমি নিরাপদ ।”

“কী আলো ? আপনি সূর্যের আলোর কথা বলছেন ?” অর্জুন মোটরবাইকের চাবি বের করল ।

“হ্যাঁ । সূর্যালোক । সেই আদিকাল থেকে মানুষকে বাচিয়ে রেখেছে । আমরা যে এককালে প্রকৃতিকে উপাসনা করে তাদেরই দেবদেবী বানিয়েছিলাম সেটাই ঠিক ছিল । আচ্ছা, চলি ।” রামচন্দ্রবাবু হাত জোড় করলেন ।

“আপনি কি বাড়িতে ফিরে যাচ্ছেন ?”

“হ্যাঁ । তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে পড়তে চাই ।”

“যদি কোনও অসুবিধে না হয় আপনাকে আমি লিফ্ট দিতে পারি ।” অর্জুন নিজের লাল মোটরবাইকটাকে দেখাল । তার অবশ্য সঙ্কোচ হচ্ছিল । অনেকক্ষেত্রে সে বাইকের পেছনে বসিয়েছে কিন্তু রামচন্দ্র রায়ের বয়সী কোনও বৃদ্ধকে পেছনে বসিয়ে বাইক চালায়নি ! সে ভেবেছিল বৃদ্ধ আপনি জানাবেন কিন্তু উলটো হল । রামচন্দ্রবাবু সোৎসাহে বললেন, “তা হলে তো ভালই হল । আগে পৌঁছে যাওয়া যাবে ।”

বাইকে স্টার্ট দিয়ে অর্জুন ইশারা করতেই বৃদ্ধ ধূতি সামলে পেছনে উঠে বসলেন । তাঁর হাত অর্জুনকে আঁকড়ে ধরতেই সে আপনি জানাল, “আমাকে নয় । আপনার আর আমার মাঝখানে একটা হাত আছে, সেটা ধরুন । খুব ইঞ্জি হয়ে বসে থাকুন । পাদানিতে পা রেখেছেন ? গুড় ।”

রামচন্দ্রবাবু বললেন, “এত টেন্সড হওয়ার দরকার নেই । আমি প্রশান্ত মহাসাগরে একা-একা প্যাডলিং করেছি । অমন চেউ বঙ্গোপসাগরে ওঠে না ।”

জাহাজে যিনি চাকরি করেছেন তিনি সমুদ্রে অনেক কিছু করতে পারেন । অর্জুন আলো জ্বালিয়ে থানা থেকে বের হতে-না-হতেই বুরল রামচন্দ্রবাবু স্বাভাবিকভাবে বসে নেই । তাঁর শরীর শক্ত হয়ে গেছে এবং একদিকে হেলে আছেন । সে সর্তক হয়ে চালাতে লাগল । একটুও গতি না বাড়িয়ে শহরের জনাকীর্ণ এলাকা বাদ দিয়ে একটু ঘুরে করলা নদী পেরিয়ে রায়কতপাড়ার দিকে এগোতে লাগল । বাইক চলার পর থেকে মাঝে-মাঝে ঘোঁত-ঘোঁত করে খাস নেওয়া ছাড়া রামচন্দ্রবাবু কোনও শব্দ করেননি । রাজবাড়ির গেটের কাছে পৌঁছে সে বাইক থামাল, “এবার কোনদিকে যাব ?”

কোনও সাড়া এল না । অর্জুন মুখ ফিরিয়ে দেখল বৃদ্ধ চোখ বন্ধ করে বসে আছেন । সে আবার জিজ্ঞেস করল, “আপনার বাড়ি কোন দিকে ?”

এবার চোখ খুললেন বৃন্দ, “আমরা কোথায় এসেছি ?”

“ঠিক রাজবাড়ির গেটের সামনে ।”

“আর একটু এগিয়ে, ডান দিকে ।” রামচন্দ্রবাবু নিশাস ফেললেন, “নীল রঙের বাড়ি ।”

অর্জুন বাইকটাকে খানিকটা এগিয়ে নিয়ে যেতেই একটা নীল রঙের বাড়ি দেখতে পেল । সেই বাড়িতে কোনও আলো জ্বলছে না । কোনও মানুষ আছে বলেও মনে হচ্ছে না । সাদাসাপটা একতলা বাড়ি । অর্জুন স্টার্ট বন্ধ করে বলল, “নামুন ।”

রামচন্দ্রবাবু যেভাবে নামলেন তাতে মনে হল ওঁর শরীরে বিন্দুমাত্র শক্তি অবশিষ্ট নেই । দাঁড়ানোর পরও তিনি টলতে লাগলেন । অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “আপনার শরীর খারাপ লাগছে ?”

“সেরকম নয় । আসলে ভেতরে-ভেতরে খুব দুর্বল হয়ে গেছি দেখছি । এই একমাসে ওরা আমাকে এতটা কাহিল করে দিয়েছে বুঝতে পারিনি । কী ছিলাম, কী হয়ে গেলাম ।”

অর্জুন বৃন্দকে ধরে ধীরে-ধীরে বাড়িটার দরজায় নিয়ে গিয়ে দেখল দরজায় তালা ঝুলছে ।

রামচন্দ্রবাবু পাঞ্জাবির পকেট থেকে একখোকা চাবি বের করে বাস্তার আলোর সামনে তুলে ধরলেন । তারপর একটাকে বেছে নিয়ে তালা খুললেন । ভেতরে চুকে আলো জ্বালার পর তাঁকে অনেক স্বাভাবিক দেখাল । অর্জুন বলল, “তা হলে এবার আমি যাই ।”

“যাই মানে ? এতদূরে পৌঁছে দিলেন, একটু কফি না খাইয়ে ছাড়ব কেন ?”

“কী দরকার— ।”

“নাথিৎ । কোনও দরকার নেই । আসলে এখন আপনি থাকলে আমার ভাল লাগবে ।” দরজা বন্ধ করে বেতের চেয়ার দেখিয়ে দিলেন রামচন্দ্রবাবু ।

“বাড়িতে আর কেউ নেই ?”

“কে থাকবে ? নান् । এই পৃথিবীতে আমি একা । আরে ভাই নাবিকের কাজ করতাম । নিজের কাজ নিজে করার অভ্যেস এমন তৈরি হয়ে গেছে যে, কারও অভাব অনুভব করিন না । শুধু এই একমাস ধরে । আর ওই কার্ডলোটাই আমার সর্বনাশ করল ।”

“কার্ডলো কে ?” অর্জুনের মনে পড়ল সেই ঐতিহাসিক চরিত্রটির কথা, যাকে নিয়ে নাটক হয়েছে ।

“আমার বন্ধু । জাহাজে একসঙ্গে কাজ করতাম । দাঁড়ান, জল বসিয়ে আসি ।” রামচন্দ্র চলে গেলেন ভেতরে । অর্জুন তাকিয়ে দেখল এই ঘরে চারটে বেতের চেয়ার আর গোল টেবিল ছাড়া অন্য কোনও আসবাব নেই । শুধু পেছনের দেওয়ালে একটা বিরাট ছাবি ঝুলছে । ছবিটি জাহাজের ।

নাবিকের বাড়ি বলেই সম্ভবত জাহাজের ছবি । হয়তো ভদ্রলোক ওই জাহাজেই অনেকদিন কাজ করেছেন । রামচন্দ্রের বন্ধু কার্ডলো । অন্তুত ব্যাপার । অর্জুন হনে-মনে হাসল । এতক্ষণ ধরে ভদ্রলোককে যা দেখেছে তাতে পাগল বলে মনে করার মতো কিছু ঘটেনি । কথায়-কথায় অবশ্য একমাসের কথা শোনাচ্ছেন, কেউ বা কারা নাকি ওঁকে মিডিয়াম বানাচ্ছে । এই কারণেই তিনি ধানায় গিয়েছিলেন ডায়েরি করতে । ব্যাপারটা পুরো না শুনলে হাস্যকর লাগা হতাহিক । অপরাধ করে বা না করে গ্রেফতারের সম্ভাবনা থাকলে কেউ-কেউ কোর্টে যান আগাম জামিন চাইতে । এই প্রথা চালু আছে । কিন্তু কেউ আমাকে দিয়ে কোনও অপরাধ করিয়ে নিতে পারে বলে আশঙ্কা করে আজ পর্যন্ত কেউ কোথাও ডায়েরি করছে বলে সে শোনেনি । অর্জুনের কেবলই মনে হচ্ছিল রামচন্দ্র রায় মিথ্যে কথা বলেননি । তা হলে উনি কার মিডিয়াম হচ্ছেন ?

কফির ট্রে নিয়ে ঘরে ঢুকে বেতের চেয়ারে রাখলেন রামচন্দ্রবাবু । চিনি আলাদা পাত্রে রয়েছে । পাশের ছোট কাপে সামান্য দুধ । বললেন, “আমি চিনি-দুধ খাই না । আপনার যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু মিশিয়ে নিন।”

চুপচাপ রান্নার কাজটা সেরে কফিতে চুমুক দিয়ে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “এই বাড়িতে আপনি কাদিন আছেন ? নিজের বাড়ি ?”

“আছি বছরখানেক । হ্যাঁ, নিজের বাড়ি । কিনেছিলাম বছর কুড়ি আগে । এতদিন ভাড়াটে ছিল । অনেক কষ্টে তাদের তুলে এখানে এলাম । এই বাড়ির একটা গল্ল আছে ।”

“কী রকম ?”

“এই জমিটা ছিল আমার বাবার । জলপাইগুড়ির রাজার কাছ থেকে পেয়েছিলেন তিনি । আমি জন্মাবার পরে তিনি মারা যান । অভাবের তাড়নায় মা এই জমিটাকে বিক্রি করতে বাধ্য হয়ে আমাকে নিয়ে চলে যান মামার বাড়িতে । মায়া থাকতেন বালুরঘাটে । সেখানেই আমার শৈশব কাটে । মায়ের মনে খুব দুঃখ ছিল জমিটা বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছিলেন বলে । কুড়ি বছর আগে আমি এই শহরে ফিরে এলাম জমিটাকে আবার কিনে নেব বলে । নিজেদের জমি অনেক বেশি দাম দিয়ে কিনতে হল । তখন অবশ্য মা পৃথিবীতে নেই । এই বাড়ি বানিয়ে ভাড়া দিয়ে চলে গিয়েছিলাম সে-সময় ।”

রামচন্দ্রবাবু চোখ বন্ধ করে মুখ ওপরে তুললেন, “কিছু শুনতে পাচ্ছেন ?”

অর্জুন অবাক হয়ে শোনার চেষ্টা করল, “কই না তো !”

“একটা মেটালিক সাউন্ড । টানা ?”

“না । আমার কানে কিছু আসছে না ।”

“আপনি তো সত্ত্বের সঙ্কান করেন । আমার চেয়ে বয়সে অনেক ছোট । পুলিশ কী করবে জানি না, আপনি আমাকে সাহায্য করতে পারেন ?”

“আপনি কী সাহায্য চাইছেন ?”

“আমাকে বাঁচান। গত এক মাস ধরে, ওই কার্ভালো আসার পর থেকেই এই ব্যাপারটা আরম্ভ হয়েছে। রোজ রাত্রে কেউ বা কারা আমাকে অথর্ব করে দিচ্ছে। তখন আমার কোনও ইচ্ছাশক্তি থাকে না। আমি তাকাই কিন্তু কিছু দেখি না, আমি শুনি কিন্তু বলতে পারি না।”

“আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে সেইসব ভৌতিক গঞ্জের মতো।”

হাত তুলে বাধা দিলেন রামচন্দ্রবাবু, “না, না। ভুল করবেন না। এরা ভূত নয়। কর্মজীবনে আমি অনেক ভূতের গঞ্জ শুনে খুঁজতে গিয়ে কিছুই পাইনি। অবশ্য তারা সবাই সামুদ্রিক ভূত। ইন ফ্যান্ট, ভূত বলে কিছু আছে আমি বিশ্বাস করি না।”

“যারা আপনাকে অবশ করে দেয়, তাদের আপনি দেখতে পান?”

“না! কিন্তু অনুভব করতে পারি। আর অনুভব মানে পুরো দেখা নয়। মনে হয় প্রচণ্ড শক্তিহীন ওরা। আমাকে যা বলছে তা না করে আমার উপর নেই। ধরুন, ওরা যদি আমাকে বলে কাউকে খুন করে আসতে, তা হলে সেটা আমি নিজের অজান্তেই করে ফেলব। তারপর দিনের বেলায় পুলিশ যখন আমাকে অ্যারেস্ট করবে তখন বোঝাতে পারব না ওটা স্ব-ইচ্ছায় করিনি। আমি বাড়ি, জল, উত্তল সমুদ্রের সঙ্গে লড়াই করেছি। একবার অতলাস্তিকে দশদিন লাইফবোটে ভেসে ছিলাম। কিন্তু এখানে আমি অসহায়, লড়াই করার কোনও সুযোগই নেই।” বলতে-বলতে হঠাৎ চুপ করে গেলেন রামচন্দ্র বায়, “শুনতে পাচ্ছেন এবার? সিগন্যালিং টিউন?”

অর্জুন কিছুই শুনতে পেল না। কিন্তু ওর মনে হল বৃদ্ধ বানিয়ে গঞ্জ বলছেন না। ব্যাপারটার পেছনে সত্যতা আছে। সে জিজ্ঞেস করল, “কার্ভালোর বয়স কত?”

“অলমোস্ট মাই এজ। আমার তিন মাস বাদে কাজ ছেড়েছে সে।”

“উনি কেন এসেছিলেন আপনার কাছে?”

“একসঙ্গে জাহাজে কাজ করেছি। ভালই সম্পর্ক ছিল। ও অবশ্য বিবাহিত। দর্শনে নিজের বাড়ি। যে লাইফবোটে আমরা ভাসতে বাধ্য হয়েছিলাম তাতে ও আমার সঙ্গী ছিল। আমার ঠিকানা কার্ভালো জানত। হঠাৎ এক দুপুরে সে আমার কাছে এসে হাজির।”

“তারপর?”

“খুব অন্যমনক্ষ দেখাচ্ছিল ওকে। একটা রাত ছিল। তার পরদিন হঠাতই চলে গেল। যাওয়ার আগে বলে গেল অসমের দিকে যাচ্ছে। ফেরার সময় দেখা করে যাবে। আর হ্যাঁ, ওর সঙ্গে কিছু লাগেজ ছিল, তার একটা রেখে গেল ঝামেলা করাতে।”

“কী লাগেজ?”

“একটা সুটকেস।”

“দেখতে পারি সেটা ?”

“মানে ? কার্ভলোর সুটকেস তার অনুমতি ছাড়া খোলা ঠিক হবে ?”

“উনি একমাস হল অসমে চলে গেছেন । থাকেন সেই দমনে । এর মধ্যে আপনাকে কোনও চিঠি লেখেননি । যদি আর কখনও ভদ্রলোক ফিরে না আসেন তা হলে কী করবেন ?”

“তা কেন ? ফিরে আসবে না কেন ?”

“আপনিই বললেন ভদ্রলোককে খুব অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল । ওই সুটকেসে কী জিনিস তিনি রেখে গিয়েছেন তা কে বলতে পারে । হয়তো বেআইনি কিছু, যার জন্যে পুলিশ আপনাকে গ্রেফতার করতে পারে ।”

“আমাকে কেন করবে ? সুটকেস তো আমার নয় ।”

“কী করে প্রমাণ করবেন ? ওটা তো আপনার হেফাজতে পাওয়া যাবে ।”

“আচ্ছা !” রামচন্দ্র রায় গালে হাত বোলালেন, “কিন্তু ওর চাবি তো আমার কাছে নেই ।”

“সুটকেসটা কোথায় ?”

“পাশের ঘরে ।”

“চলুন ।” অর্জুন কফির কাপ রেখে উঠে দাঁড়াল ।

নিতান্ত অনিচ্ছায় রামচন্দ্রবাবু পাশের ঘরে ঢুকলেন । এ-ঘরে একটা খাট, আলমারি এবং কিছু নিত্য ব্যবহারের জিনিসপত্র আছে । ঘরের কোণে একটা সুটকেস দাঁড় করানো । বাজারে চলতি এক নামী কোম্পানির দামি সুটকেস । কোনও ঢাকনা না থাকায় দীর্ঘ যাত্রার চিহ্নস্বরূপ প্রচুর দাগ সুটকেসের শরীরে । রামচন্দ্রবাবু বললেন, “এইটি কার্ভলোর সুটকেস ।”

অর্জুন হাঁটু মুড়ে বসে সুটকেসের লক পরীক্ষা করল । না, চাবি দিয়ে খোলার ব্যবস্থা নেই । নম্বর স্বুরিয়ে-ঘুরিয়ে কোড মিললে ওটা খুলবে । সুটকেসটি যথেষ্ট মজবুত । এই সুটকেস খোলা তার পক্ষে সম্ভব নয় । হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে নিশ্চয়ই খোলা যাব কিন্তু সেটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে । অর্জুন উঠে দাঁড়াল, “ল্যাংড়া-পাঁচুকে ডেকে আনতে হবে ।”

“ল্যাংড়া-পাঁচু ?”

“এই শহরের সবচেয়ে ওস্তাদ তালা-খুলিয়ে ! আগে এটাই ব্যবসা ছিল । আমি একবার ওকে বাঁচিয়েছিলাম । কিন্তু ল্যাংড়া-পাঁচুকে এখন পাওয়া যাবে না । কাল সকালে ওকে নিয়ে আসব । আমি এখন চলি, আপনি বিশ্রাম করুন ।”

“কিন্তু কিন্তু আজ রাত্রেও ওরা আসবে ।”

“নাও আসতে পারে ।”

“অসম্ভব । আমি সিগ্ন্যাল শুনতে পাচ্ছি । ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে ।”

“আপনি কি চাইছেন আমি এখানে থাকি ?”

ରାମଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ତାକାଲେନ, “ନାହିଁ । ଥାକ । ଆପନି କାଳ ସକାଳେ ଆସବେଳ ବଲଲେନ ?”

“ହୁଁ ।”

“ତା ହଲେ ଏକଟୁ ତାଡ଼ାତାଡ଼ି ଆସବେଳ । ଆର ଯାଓଯାର ସମୟ ବାଇରେର ଦରଜାଯ ତାଳା ଦିଯେ ଯାନ । ଆମି ଯଦି ଏଇ ବାଡ଼ି ଥେକେ ବେର ହତେ ନା ପାରି ତାହଲେ ନିଜେର ଅଜାନ୍ତେ କୋନ୍ତା ଅନ୍ୟାଯ କରା ସନ୍ତ୍ରବ ହବେ ନା ।” ଚାବିର ଥୋକଟା ଏଗିଯେ ଧରଲେନ ବୃଦ୍ଧ ।

ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ଵେଣ ଓର କଥା ମାନ୍ୟ କରଲ ଅର୍ଜୁନ । ବାଇକ ଚାଲୁ କରେ ଘାଡ଼ ଘୁରିଯେ ଦେଖିଲ ବାଡ଼ିଟାର ଜାନଲାଗୁଲୋ ଖୋଲେନନି ରାମଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ । ଆଲୋ ବେରିଯେ ଆସଛେ ଘୁଲଘୁଲି ଦିଯେ । ମେ ଗତି ବାଡ଼ାଲ ।

ଜେଲଖାନାର କାହେ ଏସେ ବାଇକ ଥାମାଲ ଅର୍ଜୁନ । ତାର ମନେ ହଲ, ଏଟା ଟିକ ନୟ । ଏକଜନ ମାନୁସକେ ତାଁର ଇଚ୍ଛାନ୍ୟାୟୀ ସାରାରାତ ବାଡ଼ିତେ ବନ୍ଦି କରେ ରାଖା ଉଚିତ ହଚ୍ଛେ ନା । ଶୀରି ଖାରାପ ହଲେଣ ବାଡ଼ି ଥେକେ ବେରୋତେ ପାରବେଳ ନା ଭଦ୍ରଲୋକ । କେଉ ଏଲେ ଦରଜା ଖୁଲେ ଦିତେ ପାରବେଳ ନା । ମେ ବାଇକଟାକେ ବାଁ ଦିକେ ଘୋରାଲ ।

ଲ୍ୟାଂଡା-ପାଁଚୁ ଏକ ସମୟ ଏଇ ଶହରେର ଖୁବ ନାମି ଅପରାଧୀ ଛିଲ । ସେ-କୋନ୍ତା ତାଳା ଖୁଲେ ଦିତେ ତାର ଜୁଡ଼ି ଛିଲ ନା । ଚୋର-ଡାକାତେର କାହେ ତାଇ ଓର ଖୁବ ଚାହିଦା ଛିଲ । ନିଜେ ଚରି ବା ଡାକାତି ନା କରଲେଓ ଟାକା ନିଯେ ଦଲେର ସଙ୍ଗେ ଗିଯେ ତାଳା ଖୁଲେ ଦେଓଯାର ଅପରାଧେ ଅନେକବାର ଜେଲ ଥେଟେହେ ମେ । ଶେଷବାର ଏକଟା ଡାକାତିର କେମେ ତାଳା ଖୋଲାର ଅଭିଯୋଗେ ପୁଲିଶ ଓକେ ଗ୍ରେଫତାର କରେ । ଡାକାତରା ବାଡ଼ିର ଦାରୋଯାନଟିକେ ମେରେ ଫେଲେଛିଲ । ମେଇ ଖୁନେର ଦାୟ ଲ୍ୟାଂଡା-ପାଁଚୁର ଘାଡ଼େଣ ଚେପୋଛିଲ । କିନ୍ତୁ ପୁଲିଶ ଡାକାତଦେର ଧରତେ ପାରେନି, ଲ୍ୟାଂଡା-ପାଁଚୁକେ ଧରେଛିଲ ଅନୁମାନେର ଓପର ନିର୍ଭର କରେ । ଲ୍ୟାଂଡା-ପାଁଚୁର ବଟ୍ ଛୁଟେ ଗିଯେଛିଲ ଅମଲଦାର କାହେ । ତାର ସ୍ଵାମୀ ନିରାପରାଧ, ଅନ୍ତତ ଏଇ ଡାକାତିର ସଙ୍ଗେ କୋନ୍ତା ସମ୍ପର୍କ ନେଇ, ଡାକାତିର ରାତ୍ରେ ପେଟ ଖାରାପ ହୋଇଯାଇ ମେ ବାଡ଼ିତେଇ ଶୁଯେଛିଲ, ଏହିଦିବ ବଲେ ଅମଲଦାର ସାହାଯ୍ୟ ଚେଯେଛିଲ ପାଁଚଜନେର ପରାମର୍ଶ । ଅମଲଦା ମେଇ ମହିଳାକେ ପ୍ରଶ୍ନ କରେଇ ନିଶ୍ଚିତ ହନ ଲ୍ୟାଂଡା-ପାଁଚୁ ନିରାପରାଧ । ତିନିଇ ଅର୍ଜୁନକେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେନ ଲ୍ୟାଂଡା-ପାଁଚୁ ସମ୍ପର୍କେ ପୁଲିଶେର ଭୁଲ ପ୍ରମାଣ ଦାଖିଲ କରେ ଭାଙ୍ଗିରେ ଦିତେ । ବେଶ ପରିଶ୍ରମ କରତେ ହେଯେଛିଲ ମେବାର ଅର୍ଜୁନକେ । ଆର ତାରପର ଥେକେଇ ଲ୍ୟାଂଡା-ପାଁଚୁ ଓକେ ଖୁବ ସମୀହ କରେ । ଅର୍ଜୁନେର କାହେ କଥା ଦିଯେଛିଲ ତାଳା ଖୋଲାର କାଜ ମେ ହେବେ ଦେବେ । ଲ୍ୟାଂଡା-ପାଁଚୁ ଏଥିନ ଲଟାରିର ଟିକିଟ ବିକ୍ରି କରେ କଦମ୍ବତଳାର ମୋଡ଼େ । କିନ୍ତୁ ସଙ୍କେ ହଲେଇ ଲୋକଟା ଖାରାପ ଆଜାଧୀୟ ଚଲେ ଯାଯ । ଏଇ ସମୟ ତାକେ ଦିଯେ କିଛୁ କରାନୋ ଅସନ୍ତ୍ବ । ଏଇ ନେଶାର ପେଛନେ ତାର ଯୁକ୍ତି ହଲ, ଓଖାନେ ଗେଲେଇ ମାଥାର ଭେତରଟା ଫାଁକ୍ବା ହେଁ ଯାଯ, ତଥନ କୋନ୍ତା ପାର୍ଟି ଏସେ ହାଜାର ଟାକା ଦିଲେଓ ମେ ତାଳା ଖୁଲାତେ ପାରବେ ନା । ଚୋର-ଡାକାତରା

ব্যাপারটা জেনে যাওয়ায় এখন আর ল্যাংড়া-পাঁচুকে বিরক্ত করে না ।

ল্যাংড়া-পাঁচুকে এই সময় বাড়িতে পাওয়া যাবে না । দু'দিন রাত দশটার পরে তাকে বুঁদ হয়ে বাড়ি ফিরতে দেখেছে সে । কিন্তু কোথায় কোন আড়ায় যায় তা নিশ্চয়ই ওর বউ জানে । বাইক নিয়ে অর্জুন সোজা ল্যাংড়া-পাঁচুর বাড়িতে চলে এল । শহরের একপাস্তে খুবই গরিব পরিবেশে ল্যাংড়া-পাঁচু থাকে । ভেতরে হ্যারিকেন জুলছে । বাইকের আওয়াজ পেয়ে কিছু কৌতুহলী মানুষের সঙ্গে ল্যাংড়া-পাঁচুর বউও বেরিয়ে এসে ওকে দেখে ঘোমটা টানল, “ওমা আপনি ?”

“পাঁচবাবু আছে ?”

“আজ্জে, এই সময়—আপনি তো সব জানেন !”

“হ্যাঁ, কোথায় গিয়ে থায় ওসব ? আমার খুব দরকার ওকে ।”

ল্যাংড়া-পাঁচুর বউ ঠিকানাটা বুঝিয়ে দিয়ে বলল, “একটু দাঁড়ান ।”

অর্জুন বাইকে বসে দেখল মহিলা ঘরের ভেতর চলে গেল টোড়ে । ছেলে, বুড়ো, মহিলারা তাকে দেখেছে । নিজেদের মধ্যে কথা বলছে তাকে নিয়ে । একটু পরে মহিলা ফিরে এসে একটা কাগজের মোড়ক দিল, “কথা বলতে না পারলে এইটে দেবেন । আপনার উপকার আমি জীবনে ভুলতে পারব না বাবু । শুধু এই খারাপ আড়াটা যদি ওকে ছাড়িয়ে দেন ।”

অর্জুন কোনও মন্তব্য না করে মোড়কটি নিয়ে বাইক ঘোরাল । হাসপাতালের উলটো রাস্তায় চুকে নির্দিষ্ট একটা বাড়ির ভেতরের বারান্দায় ল্যাংড়া-পাঁচুকে পাওয়া গেল । দু' হাতে ছিলিম ধরে টান দিতে গিয়ে তাকে দেখে থমকে গেল, “আপনি ?”

“যাক, ঠিক আছ এখনও । একটু এসো, কথা আছে ।”

করুণ দৃষ্টিতে হাতে ধরা জিনিসটার দিকে একবার তাকিয়ে সঙ্গীদের একজনের হাতে তুলে দিয়ে ল্যাংড়া-পাঁচু নেমে এল বারান্দা থেকে, “বলুন বাবু ।”

“তোমার মাথা ঠিক আছে ?”

“আজ্জে ? ও, প্রথম টান দিতে যাচ্ছিলাম ! আজ সঙ্গে-সঙ্গে বেশ খদ্দের হয়ে যাওয়ায় এখানে আসতে দেরি হয়ে গেল । একদম ঠিক আছে মাথা ।” ল্যাংড়া-পাঁচ মুখ নিচু করল ।

“তা হলে তোমার বড়য়ের দেওয়া এই জিনিসটার দরকার হচ্ছে না !”

মোড়কটা দেখল ল্যাংড়া-পাঁচ । দেখে হাসল, “তাই বলুন । এই ঠিকানা সে দিয়েছে । এই কাগজে কী দিয়েছে জানেন ? দ্যাখেননি ? তেঁতুল । নেশার পর তেঁতুল খেলেই আমার বমি হয়ে যায় ।”

“বুঝলাম ।” বাইক চালু করে অর্জুন হ্রুম করল, “পেছনে ওঠো ।”

ল্যাংড়া-পাঁচ ইতস্তত করছিল কিন্তু আদেশ অমান্য করল না । বাইক চলতে

আরঙ্গ করলে সে বলল, “আপনি যা ভাবছেন তা নয়। ইচ্ছে করলে আমি দিনের পর দিন নেশা না করে থাকতে পারি। আসলে সময় কাটে না বলেই এই আজডায় চলে আসি।”

অর্জুন কিছু বলল না। সে রামচন্দ্র রায়ের বাড়ির দিকে যেতে লাগল। সেটা লক্ষ করে ল্যাংড়া-পাঁচ বলল, “ও, যা ভেবেছিলাম তা নয়।”

“কী ভেবেছিলে ?” বাইক চালাতে-চালাতে জিজ্ঞেস করল অর্জুন।

“আমি ভেবেছিলাম আবার আমাকে থানায় ঢোকাচ্ছেন আপনি।”

“আজডায় না ছাড়লে সেটা করতে হবে।”

“আপনি আমাকে বাঁচিয়েছেন, যা বলবেন তাই করব।”

অর্জুন আর কথা বাড়াল না। রামচন্দ্র রায়ের বাড়ির সামনে পৌঁছে বাইক থামাল সে। ল্যাংড়া-পাঁচ নেমে দাঁড়ালে সে বলল, “শোনো, এই বাড়িতে একটা সুটকেম আছে। চাবি পাওয়া যাচ্ছে না। তোমাকে খুলে দিতে হবে।”

কথা বলে সে এগিয়ে গিয়ে বাইরের দরজার তালা খুলে ডাকল, “মিস্টার রায়।”

“যাচ্ছি।” ভেতর থেকে গলা ভেসে এল।

বাইরের ঘরের আলো জ্বলে অর্জুন ল্যাংড়া-পাঁচকে বসতে বললে সে সন্তুষ্পণে চেয়ারে বসে জিজ্ঞেস করল, “সুটকেস্টা কার বাবু ?”

“কেন ?” চমকে তাকাল অর্জুন।

“যাঁর সুটকেস তিনি সামনে না থাকলে আমি ওটা খুলব না বাবু।”

“হঠাৎ এমন সিদ্ধান্ত ?”

“আজ্ঞে, হঠাৎ নয়। আপনি ছাড়াবার পর আমি তো এই কারবার ছেড়ে দিয়েছি। কত টাকার লোভ দেখানো হয়েছে কিন্তু আমি বলেছি, মন, তুই নরম হসনি। একটা কেস মানে কয়েক বছর জেল। তাই অন্যের সুটকেসে হাত দিই না।”

ল্যাংড়া-পাঁচুর সিরিয়াস মুখের দিকে তাকিয়ে অর্জুন একটু অপ্রস্তুত হল। জেলের ভাত খাওয়া থেকে বের করে নিয়ে সে নিজে ল্যাংড়া-পাঁচকে বলেছিল, অন্যের তালা মালিকের অজান্তে যেন কোনওদিন না খোলে। সেই কথাই আজ ল্যাংড়া-পাঁচ সুযোগ বুঝে ফিরিয়ে দিল। সে বলল, “দ্যাখো, তুমি যখন অন্যের অজান্তে তালা খুলতে তখন মানুষের সর্বনাশ হত। আজকের কাজটা করলে একজন ভাল মানুষের উপকার হবে। তার চেয়ে বড় কথা, আমি তোমাকে অন্যায় কিছু করতে বলব না।”

অর্জুনের কথা শেষ হওয়ামাত্র রামচন্দ্র রায় হাজির হলেন, “কী ব্যাপার ? কাল সকালে আসার কথা ছিল না ?”

অর্জুন বৃদ্ধকে দেখল, “আপনি ঠিক আছেন তো ?”

“তার মানে ?”

“বাঃ, আপনিই তো বলেছেন কারও সিগন্যাল শুনতে পাচ্ছিলেন।”

রামচন্দ্রবাবু গভীর হয়ে বললেন, “ওসব ব্যাপার হালকাভাবে না বলাই ভাল। এখন বলুন কী জন্যে আবার ফিরে আসতে হল! আমি তো রাত্রের পাওয়া সেরে নিলাম।”

“ভালই করেছেন। ইনি হলেন পাঁচবাবু। এর কথা খানিক আগে আপনাকে বলেছি।” অর্জুন হাসল, “সুটকেসটাকে দেখাতে চাই।”

রামচন্দ্র কথা খরচ না করে ওদের ভেতরের ঘরে নিয়ে এলেন। ল্যাংড়া-পাঁচ সুটকেসটায় হাত দিয়ে কিছুক্ষণ বসে রইল। তারপর নম্বর ঘোরাবার জায়গাটায় আঙুল বোলাতে লাগল। অর্জুন সেটা লক্ষ করে বলল, “ওহো, এই কথাটা বলা হয়নি। চাবি ঢুকিয়ে তালা খোলার সুটকেস এটা নয়। ঠিকঠাক নম্বর এলে এর ডালা খুলে যায়।”

ল্যাংড়া-পাঁচ হাসল, “নম্বরই বলুন আর চাবিই বলুন, ভেতরে তো একটা তালা আছে। ছক্টা আটকে আছে তাতে। একটু অনুভব করতে দিন।”

রামচন্দ্র রায় জিজ্ঞেস করলেন, “অনুভব? শক্ত সুটকেসের বাইরে হাত দিয়ে ভেতরটা অনুভব করা যায়?”

“যে যেমন পারে। তারে আঙুল দিলে কেউ শুধুই টুং টাঁ শব্দ করে, কেউ গান বাজায়। একটু চুপ করুন আপনারা। পারব কি না জানি না, তবু চেষ্টা করতে দিন।” ল্যাংড়া-পাঁচ চোখ বন্ধ করল।

এক, দুই করে বেশ কয়েক মিনিট পাওয়ার পর ল্যাংড়া-পাঁচ বলল, “ওই যাঃ। যন্ত্রপাতি তো সঙ্গে আনিনি। এমনভাবে চলে আসতে হল! একটা সরু অথচ শক্ত তার পাওয়া যাবে?”

রামচন্দ্রবাবু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। সরু তার পাওয়া যাচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত ইলেকট্রিকের তার রবারের ভেতর থেকে বের করে পাকিয়ে কি এক অদ্ভুত কায়দায় সোজা করে চেষ্টা চালাল ল্যাংড়া-পাঁচ। প্রায় আধঘণ্টা ধরে নাছোড়াবান্দা ল্যাংড়া-পাঁচ পড়ে রইল সুটকেস নিয়ে। শেষতক খট করে একটা শব্দ হতেই তার গলায় উল্লাস শোনা গেল, “হঁ। হবে না মানে? আঙুলগুলো মরে গেছে নাকি! নিন বাবু, ডালাটা খুলুন। আপনিই দেখুন ভেতরে কী আছে!”

সুটকেসটাকে টেনে এনে অর্জুন ডালা খুলল। সুটকেসের ভেতরে টাইট করে বসিয়ে রাখা হয়েছে থার্মোকোলের বাক্স। সেটাকে বাইরে বের করতে খানিকটা অসুবিধে হল। ওপরের ঢাকনা খোলার পর আবার একটি থার্মোকোলের বাক্স। খুব ভদ্র অথচ মূল্যবান জিনিসকেই মানুষ এমন যত্নে সতর্কতার সঙ্গে রাখে। দিতীয় বাক্সটা খুলতেই একটা নীল আলোর দপদপানি টের পাওয়া গেল। চকচকে এক ধৰ্তব বস্তু থেকে নীল আলো জ্বলছে-নিভছে।

ল্যাংড়ো-পাঁচ জিজেস করল, “এ কী জিনিস বাবু ?”

অর্জুন তল পাছিল না । সে যন্ত্রের কাছে কান নিয়ে গিয়ে কোনও শব্দ শুনতে পেল না । একটা চকচকে চোকো বাক্স । আলোটা জ্বলছে-নিভছে ওর ভেতরে । ওপরের ছিদ্র থেকে তার একটা অংশ ছিটকে আসছে । সে যন্ত্রটার গায়ে হাত বোলাতে লাগল । হঠাত তার মনে হল রামচন্দ্র বায় যে সিগন্যাল শোনেন তা এখান থেকেই বের হয় না তো !

“ওটা সরিয়ে ফেলুন ।” পেছন থেকে রামচন্দ্রবাবুর চাপা গলা শোনা গেল ।

“এটা কী ? আমি এরকম জিনিস কখনও দেখিনি । কার্ভালো কি কিছু বলেছে আপনাকে ?”

“না, কার্ভালো কিছু বলেনি । কিন্তু ওটা সরিয়ে ফেলুন ।” রামচন্দ্রবাবুর গলা অন্যরকম হয়ে যাচ্ছিল ।

“কেন ?”

“যে-সিগন্যালটা আমি শুনি তা এই ঘরে চুকে ওই বাস্তৱের মধ্যে যেন মিলিয়ে যায় । কাল রাত্রেও আমার মনে হয়েছিল সেটা । আপনাদের বলতে পারিনি ।”

“এই বাস্তৱে মিলিয়ে যায়, না বাক্স থেকে শব্দটা বের হয় ?”

“আঃ, বললাম তো বাস্তৱে চুকে যায় । তখন তো বাক্স জানতাম না, মনে হত সুটকেসেই চুকে যাচ্ছে শব্দটা । পিল্জ, সরিয়ে ফেলুন ওটাকে ।”

“আপনি এমন ভয় পাচ্ছেন কেন ? সারা পৃথিবী ঘুরেছেন আপনি !”

“তাতে কিছু লাভ নেই । ওরা যখন আমাকে মিডিয়াম করে তখন নিজের কোনও ক্ষমতা থাকে না । একদম পুতুল হয়ে যাই তখন । আমার সামনে থাকলে ওরা যদি চায় তো আপনাকেও খুন করতে পারি । কিন্তু শব্দটা ওই সুটকেসের ভেতর চুকে না যাওয়া পর্যন্ত আমি ঠিক থাকি ।” রামচন্দ্রবাবুকে খুব নার্ভাস দেখাচ্ছিল । অর্জুন যন্ত্রটাকে দেখল । অমলদা থাকলে কী করতেন ? এটা কি তা হলে রিসিভার গোছের কিছু ? কী রিসিভ করছে ? কে সিগন্যালিং করে ? হঠাত তার মাথায় অন্য চিন্তা এল । মহাকাশ থেকে ওই সিগন্যাল ভেসে আসছে না তো ?

সে চটপেট যন্ত্রটাকে থার্মোকোলের মধ্যে ঢেকাল । দুটো বাক্সকে সুটকেসে নিয়ে সে রামচন্দ্রবাবুকে বলল, “আমি যদি এটা আজকের রাত্রের জন্যে নিয়ে যাই, আপনার আপত্তি হবে ?”

“আপত্তি ? আপত্তি কিসের । তবে কার্ভালোর জিনিস, আর ওরা যদি এখানে এসে না পায় তা হলে হয়তো আমার ওপরে খেপে যেতে পারে— ।” বিড়বিড় করছিলেন বৃন্দ ।

“যদি কেউ এসেও থাকে এই বস্তুটি না থাকলে আপনার কাছে আসবে

না । ” অর্জুন উঠে দাঁড়াল, “কদমতলার চৌধুরী মেডিক্যাল স্টোর্স চেনেন ১”
রামচন্দ্র মাথা দোলালেন ।

“চৌধুরী মেডিক্যালে গিয়ে আমার নাম বললে ওরা বাড়ি দেখিয়ে দেবে ।
কাল সকালে একবার আসুন । এসো পাঁচ । ” সুটকেস নিয়ে বাড়ির বাইরে পা
বাড়াল অর্জুন ।

“বাইরে থেকে তালা দিয়ে যাবেন না ?” রামচন্দ্র রায় কাতর গলায় জিজ্ঞেস
করলেন ।

“আমার বিশ্বাস, তার প্রয়োজন হবে না । ”

সুটকেস নিয়ে বাইকে ওঠা খুব মুশকিল । সে ল্যাংড়া-পাঁচকে জিজ্ঞেস
করল, “এটাকে ধরে বসে থাকতে পারবে ? ডালা খোলাই আছে । ”

ল্যাংড়া-পাঁচ এককথায় রাজি । পেছনের সিটে বসে সুটকেসটাকে জড়িয়ে
ধরে জিজ্ঞেস করল, “বাবু, এটা খুব দামি জিনিস, না ?”

“হ্রি । ” অর্জুন অন্যমনস্ক ছিল ।

“কী রকম দাম হবে ?”

“জানি না । ” রামচন্দ্র রায়ের কথা যদি ঠিক হয় তা হলে এর কোনও দাম
কেউ দিতে পারবে না । শক্ত করে ধরে রাখো । ” অর্জুন বাইকে গতি দিল ।
পেছনে বসা ল্যাংড়া-পাঁচ সোৎসাহে বলে উঠল, “আঃ । আজ কার মুখ দেখে
উঠেছিলাম !”

অর্জুন সোজা থানায় চলে এল । অবনীবাবু তখনও ফেরেননি । সেকেন্দ
অফিসার শক্তরবাবু অর্জুনকে দেখে মুখ খুলতে গিয়ে থেমে গেলেন পেছনে
ল্যাংড়া-পাঁচকে বসে থাকতে দেখে ।

বাইকে বসেই অবনীবাবুর খবরটা জেনে ইতস্তত করছিল অর্জুন । শক্তরবাবু
ল্যাংড়া-পাঁচকে জিজ্ঞেস করলেন, “আবার ফেঁসেছ ? একদম সুটকেস সমেত
তোমাকে ধরেছেন মনে হচ্ছে ?”

অর্জুন বাইক থেকে নেমে সুটকেসটাকে হাতে নিল, “শক্তরবাবু একটা
উপকার করতে হবে । ”

“নিশ্চয়ই ! বলুন, এ আবার কাজ আরম্ভ করেছে তো ?”

“না । ওকে আমিই নিয়ে এসেছি । আপনাদের এখানে মাটির নীচে একটা
ঘর আছে না ? মানে যেখানে দামি জিনিস রাখা হয় ?”

“হ্যাঁ । ”

“এই সুটকেসটাকে ওখানে আজকের রাত্রের জন্যে রেখে যেতে চাই । ”

“ও । কী আছে ওতে ?”

“মহামূল্যবান একটা জিনিস, কিন্তু কাল সকালের আগে এটা খোলা যাবে
না । ”

“তা হলে তো মুশকিল হল । ”

“কেন ?”

“খাতায় লিখতে হয় কী জিনিস রাখছি । দামি জিনিসের জন্যে এই নিরাপত্তা ।”

“ও । লিখুন সিগন্যালিং মেশিন ।”

“তাই বলুন । স্মাগলড় গুড় । রাখাটা বেআইনি কিন্তু আপনি বলেই রাজি হচ্ছি । দিন ।”

“না । আমি নিজের হাতে রেখে আসব । তুমি এখানেই থাকো পাঁচ ।”

শক্রবাবুর পেছন-পেছন থানার ভেতরে চুকে একটা বিশেষ ঘরের মধ্যে দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেল অর্জুন । লোহার দরজায় দুটো তালা ঝুলছে । পাশের টেবিলে খাতা । সেই খাতায় লেখাপত্র শেষ করে সেপাইকে দিয়ে দুটো চাবি আনিয়ে দরজা খুললেন শক্রবাবু । খুব অন্ধকার । সুইচ টিপে আলো জ্বালতেই কয়েকটা র্যাক দেখা গেল । সবকটা র্যাকই শূন্য । অর্থাৎ, এই মুহূর্তে থানায় কোনও মূল্যবান জিনিস জমা নেই ।

সুটকেসটাকে এমন একটা কোণে ঢুকিয়ে দিল অর্জুন যে, সরাসরি টেনে বের করে আনা যাবে না । আলো নিভিয়ে লোহার ভারী দরজা বন্ধ করে তালা দিয়ে দেওয়া হল । সে শক্রবাবুকে জিজ্ঞেস করল, “ব্যবস্থা মজবুত তো ?”

“মজবুত মনে ? পিংপড়ে ঢোকার পথ নেই ।” এই তালা স্পেশ্যালি বানানো ।”

অর্জুন মনে-মনে হাসল । বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা ল্যাংড়া-পাঁচুর কাছে কোনও তালাই কিছু নয় । তবে ভরসা এই যে, এখন শহরে ওর মতো প্রতিভা দ্বিতীয়টি নেই ।

আগামী কাল সকালে দেখা করবে কথা দিয়ে অর্জুন বাইরে বেরিয়ে এসে ল্যাংড়া-পাঁচুকে পাঁচটা টাকা দিল, “যাও, রিকশা করে চলে যাও ।”

“আপনি জানেন না এই সময়ে জলপাইগুড়িতে রিকশা পাওয়া যায় না ।”

ঠিকই । রাত নটা মানে রিকশাওয়ালাদের কাছে মধ্যরাত । ল্যাংড়া-পাঁচ বলল, “আমি হেঁটেই যাব । আমার কথা ভুলবেন না বাবু ।” পাঁচটা টাকা সে নিয়ে নিল ।

মাথার ভেতরটা যেন লোহা হয়ে গেছে । কিছুই ভাবতে পারছিল না সে । বাইকে স্টার্ট দিতেই হঠাৎ মহাদেববাবুর কথা মনে পড়ল । মহাদেব সেন । অমলদার বন্ধু । বয়সে অবশ্য অনেক বড় । দীর্ঘদিন মহাকাশবিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করেছেন । এখন একটা চোখ প্রায় অন্ধ হয়ে যাওয়ায় বাড়িতে চলে এসেছেন । খুব পশ্চিত মানুষ । অর্জুনের মনে হল মহাদেববাবুর কাছে যাওয়া দরকার ।

জলপাইগুড়ি শহরে সঙ্গে নামতেই সেটা রাত হয়ে যায় । নটা বেজে গেলে

ରାଷ୍ଟ୍ରାଣ୍ତରାମାରେ ଥାଁ-ଥାଁ ହେଁ ଯାଏ । ନିର୍ଜନ ରାଷ୍ଟ୍ରାଯ ଦ୍ରୁତ ବାଇକ ଚାଲାତେ-ଚାଲାତେ ଅର୍ଜୁନର ଏକବାର ମନେ ହଲ ଏଟା ଅସମ୍ଯ, ମହାଦେବବାବୁ ସୁମିଯେ ପଡ଼ତେ ପାରେନ । ଏଥନ ଯାଓଯା ମାନେ ବିରକ୍ତ କରା । କିନ୍ତୁ, ଏକଟୁ ମରିଯା ହଲ ସେ ।

ବାବୁପାଢାୟ କରଲା ନଦୀର ଧାରେ ଏକଟା ଗେଟୋଯାଲା ବାଡ଼ିର ସାମନେ ବାଇକ ଦାଁଡୁ କରିଯେ ସେ ଭେତରେ ଚୁକଲ । ବାଇରେଟା ଅନ୍ଧକାର କିନ୍ତୁ ଭେତରେ ଆଲୋ ଜୁଲଛେ । ବେଳ ଟିପତେଇ ମହିଳା କଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଲ, “କେ ?”

“ଆମି ଅର୍ଜୁନ ।”

ମିନିଟିଖାନେକେର ମଧ୍ୟେଇ ଓପରେର ବାରାନ୍ଦ୍ୟ ଆଲୋ ଜୁଲଲ । ଅର୍ଜୁନ ଦେଖିଲ ଘୋଲୋ-ସତେରୋ ବଚରେର ଏକଟି ଫାର୍ଟ-ପରା ମେଯେ ଓପର ଥେକେ ବୁଁକେ ଦେଖାର ଚେଷ୍ଟା କରଛେ । ସେ ଜିଜ୍ଞେସ କରଲ, “ମହାଦେବବାବୁ କି ଜେଗେ ଆଛେନ ? ଏକଟୁ ଦରକାରେ ଏସେଛିଲାମ ।”

“ଆପନି— !” ମେଯୋଟି ଓପର ଥେକେ ନେମେ ଆସା ଆଲୋଯ ଅର୍ଜୁନକେ ଚିନିତେ ପେରେ ହୟାଇଁ ଉଚ୍ଛ୍ଵସିତ ହଲ, “ଓ ଆପନି ! ନା ନା, ଦାଦୁ ସୁମୋଯାନି ଏଥନେ ! ଦାଁଡାନ, ଏକଟୁ ଦାଁଡାନ ।” ମେଯୋଟି ଅଭିହିତ ହଲ । ଅର୍ଜୁନ ବେଶ ଅବାକ । ମେଯୋଟିକେ ସେ ଆଗେ କୋନାଓଦିନ ଦ୍ୟାଖେନି । ଅମଲଦାର କାଜେ ମହାଦେବବାବୁର କାହେ ତାକେ କଯେକବାର ଆସତେ ହେଁଥେ ଏଥାନେ ।

ମେଯୋଟି ଦରଜା ଖୁଲଲ, “ଆମି ତିଙ୍କା । ଆପନାର କଥା ଖୁବ ଜାନି ।”

“ଓ ।”

“ଆସୁନ ।”

ତିଙ୍କାର ପେଛନେ ସେ ଦୋତଳାଯ ଉଠେ ଏସେ ଯେ-ସରଟିତେ ଚୁକଲ ସେବାନେଇ ମହାଦେବବାବୁ ପଡ଼ାଶୋନା କରେନ । ଚେଥେର ଗୋଲମାଲ ବେଡେ ଯାଓଯାର ପର ଅବଶ୍ୟ ପେଟା ବନ୍ଧ ହେଁଥେ । ତାକେ ଅପେକ୍ଷା କରତେ ବଲେ ତିଙ୍କା ଥବର ଦିତେ ଗେଲ । ମହାଦେବବାବୁ ଏଲେନ ଖାନିକ ବାଦେଇ । ଲୁଙ୍ଗିର ଓପର ଗେଞ୍ଜ ପରା, ଚୋଖେ ମୋଟା ଫ୍ରେମେର ଚଶମା । ଏସେ ଜିଜ୍ଞେସ କରଲେନ, “କୀ ଥବର ଅର୍ଜୁନବାବୁ ?”

ଅର୍ଜୁନ ଉଠେ ଦାଁଡିଯେଛିଲ ଚୟାର ଛେଡେ, “ଏକଟୁ ବିରକ୍ତ କରଲାମ ।”

“ନଟ ଅୟାଟ ଅଳ । ଆଯ ଦିଦୁ, ଏଇ ହଲ ଆମାର ନାତନି । ଖୁବ ଗୋଯେନ୍ଦ୍ରା ଗଲ୍ଲ ଭାଲବାସେ । ଶୁରୁ କରେଛିଲ ଏନିଡ ବ୍ରାଇଟନ, କ୍ୟାରୋଲିନ କିନ ଦିଯେ । ଏଥନ କୋନାନ ଡୱେଲ ଶେଷ କରେ ଆଗାଥା କ୍ରିସ୍ଟି ଧରେଛେ । ଥାକେ କଲକାତାଯ ।” ମହାଦେବବାବୁ ନାତନିର କାଁଧେ ହାତ ରାଖଲେନ ।

ତିଙ୍କା ବଲେ ଉଠିଲ, “ସତି, ଆପନି ଲକ୍ଷନ, ନିଉ ଇୟକେ ଗୋଯେନ୍ଦ୍ରାଗିରି କରେଛେ ?”

ମହାଦେବବାବୁ ବଲଲେନ, “ଯା ପଡ଼େଛ ସବ ସତି । ଏଥନ ଯାଓ ଦିଦୁ, ଆମରା ଏକଟୁ କଥା ବଲି ।” ବେଶ ଅନିଚ୍ଛାର ସଙ୍ଗେ ତିଙ୍କା ଚଲେ ଗେଲେ ମହାଦେବବାବୁ ବସଲେନ, “ତୋମାର ଦାଦା ତୋ ଆବାର ଉଥାଓ ହେଁଥେନ । ବେଶ ଆଛେ ସେ । ହିଂସେ ହୁଁ । ଟିଥର ଆମାର ଚୋଖ ଦୁଟୋ ଏମନ ନା କରଲେ କେ ଥାକତ ଏଥାନେ ପଡ଼େ ? ଯାକଗେ, ଏତ

ରାତ୍ରେ ଏସେହୁ ସଥିନ ତଥନ ନିଶ୍ଚଯାଇ କୋନ୍ତ ପ୍ରୋଜେଣ ଆଛେ ?”

“ହଁ ଆଛେ । କିନ୍ତୁ ତାର ଆଗେ ବଲୁନ ଆପନି ଈଶ୍ଵର ଆଛେନ ବଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରେନ ?”

“ଏକଟୋ କିଛୁର ଓପର ନିର୍ଭର କରଲେ ମନେ ଜୋର ପାଓଯା ଯାଇ । ଏହି ପୃଥିବୀଟାର ସବକିଛୁ ଯେ ନିୟମ ମେନେ ଚଲେ ତାର ପେଛନେ ଯଦି କାରାଓ ପରିକଳନା ନା ଥାକିତ ତା ହଲେ ସବକିଛୁ ଏଲୋମେଲୋ ହୟେ ଯେତ । ଈଶ୍ଵର ଥାକାର ବିପକ୍ଷେ ଯତ ଯୁକ୍ତି, ଥାକାର ପକ୍ଷେ ଅନେକ ବେଶି ଯୁକ୍ତି ଦେଓଯା ଯାଇ । ଆସଲେ ତିନି ଆଛେନ ଭାବତେଇ ଭାଲ ଲାଗେ ।”

ଅର୍ଜୁନ ମହାଦେବବାବୁ ଚୋଥେର ଦିକେ ତାକାଲ । ମୋଟା କାଚେର ଆଡ଼ଲେ ଚୋଥ ଦୁଟୋ ଅନ୍ତୁ ବଡ଼ । ସେ ଜିଜ୍ଞେସ କରଲ, “ଆପନାର ଚୋଥେ କୀ ହୟେଛେ ? ଛାନି ପଡ଼ଲେ... ।”

ମହାଦେବବାବୁ ହାତ ନାଡ଼ିଲେନ, “ନା ଭାଇ । ଏଟା ଛାନି ନଯ । ଶୁକୋମା । ଆମାର ଚୋଥେର ଭେତରେ କିଛୁ ଶିରା ଶୁକିଯେ ଗେଛେ । ଚୋଥେର ଭେତରେ ପ୍ରେଶାରାଓ ଅୟବନମାଲି ବେଶି । ଏ-ଜୀବନେ ସାରବେ ନା, ବରଂ ଦିନ-ଦିନ ଆରା କମ ଦେଖିତେ ପାବ । ଏହି ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀତେ ଅନ୍ଧ ହୟେ ବେଁଚେ ଥାକାର କଥା ଭାବତେ ଖୁବ କଟ ହୟ ।”

ମହାଦେବବାବୁର ମୁଖ୍ୟଟାକେ ଖୁବଇ ବିମର୍ଶ ଦେଖାଇଛି । ଅର୍ଜୁନ ଜିଜ୍ଞେସ କରଲ, “ଅପାରେଶନ କରଲେ ହୟ ନା ?”

“ହତ । କିନ୍ତୁ ଆମାର ଯେ ଆବାର ବେଶିରକମେର ବ୍ଲାଡ ସୁଗାର ଆଛେ । ହତ ବଲଛିଇ ବା କେନ ! ଆମାର ଯେ ସେଟେ ତାତେ ନିଶ୍ଚଯ କରେ କିଛୁଇ ବଲା ଯାଇ ନା । ଥାକଗେ । ଆମାର କଥା ଥାକ । କୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଥନ ଏଲେ ତାଇ ଶୋନା ଯାକ ।” ମହାଦେବବାବୁ ହାସାର ଚେଷ୍ଟା କରଲେନ ।

ଅର୍ଜୁନ ବଲଲ, “ଆମି ଏକୁ ବିପାକେ ପଡ଼େଛି । ଅମଲଦା ଥାକଲେଓ ଉନି ଆମାକେ ଆପନାର କାହେ ପାଠାତେନ । ବ୍ୟାପାରଟା ଖୁବଇ ଅନ୍ତୁ । ଆମି ଅନ୍ତତ ଆଗେ ଶୁଣିନି ।”

ମହାଦେବବାବୁ ବଲଲେନ, “କେ ଯେନ ଲିଖେଛେନ ପୃଥିବୀର ସବ ରହସ୍ୟ କୋଥାଓ-ନା-କୋଥାଓ କେଟ୍-ନା-କେଟ୍ ସମାଧାନ କରେ ଗେଛେନ । ଯେହେତୁ ଆମରା ସେଇ ସମାଧାନେର ସୂତ୍ର ଜାନି ନା ତାଇ ଏଥନ୍ତ ଆମାଦେର କାହେ ରହସ୍ୟମୟ ବଲେ ମନେ ହୟ । ବ୍ୟାପାରଟା ଶୋନା ଯାକ ।”

ଅର୍ଜୁନ ଥାନାଯ ସଙ୍କେବେଲାଯ ରାମଚନ୍ଦ୍ରବାବୁର ସଙ୍ଗେ ଆଲାପ ହୋଯାର ପର ଥେକେ ସମ୍ଭବ ଘଟନା ପର-ପର ବଲେ ଗେଲ । କମ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତିମ୍ପନ୍ଥ ମାନୁଷେରା କୋନ୍ତ କଥା ଶୋନାର ସମୟ ଅନ୍ତୁ ଏକଟୋ ଭଞ୍ଜି କରେନ । ମନେ ହୟ ନିଜେଦେର ଶ୍ରବଣେନ୍ଦ୍ରିୟ ତ୍ରମଶ ଶକ୍ତିଶାଲୀ କରାଇ ତାଁଦେର ଚେଷ୍ଟା ହୟେ ଥାକେ । ଅର୍ଜୁନ ଚୁପ କରଲେ ମହାଦେବବାବୁ ଜିଜ୍ଞେସ କରଲେନ, “କାର୍ବଲୋ ଅସମେ ଯାଓଯାର ସମୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ରବାବୁକେ କି କିଛୁ ବଲେ ଗିଯେଛେନ ?”

“বোধ হয় না । বললে উনি আমাকে বলতেন ।”

“বোধ হয় ব্যাপারটা ঠিক নয় । তোমার জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল । কারণ যদি সুটকেসের বস্তু সম্পর্কে কিছু জানিয়ে গিয়ে থাকে, ধরো, কোথেকে তিনি ওটাকে পেলেন, তাঁর কিছু হয়েছে কি না, তা হলে একটা ধারণা স্পষ্ট হত ।”

“আমি জিজ্ঞেস করিনি । তবে জানা থাকলে রামচন্দ্রবাবু নিশ্চয়ই বলতেন ।”

“কার্ভালো ওঁর বাড়িতে এক রাত ছিল ?”

“হ্যাঁ ।”

“তখন কার্ভালোকে কেউ মিডিয়াম হিসেবে ব্যবহার করেনি ?”

“এই প্রশ্নটাও আমি করিনি ।”

“রামচন্দ্রবাবু সিগন্যাল না কি যেন শুনতে পাচ্ছিলেন, তুমি পাওনি ?”

“না ।”

“তোমার সঙ্গে যে-লোকটা তালা ভাঙতে গিয়েছিল সে পেয়েছে ?”

“না । পেলে বলত ।”

“যন্ত্রটাকে একবার না দেখলে কিছু বলা যাচ্ছে না । এমন হতে পারে, এ-সবই রামচন্দ্রবাবুর কল্পনা । আজ রাত্রে থানায় ওটা রেখে এসেছে । যদি এটা সক্রিয় থাকে তা হলে থানার কোনও চোর অথবা পুলিশের অবস্থা রামচন্দ্রবাবুর মতো হবে । অতএব আগামীকাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা যাক ।”
মহাদেববাবু বললেন ।

“আচ্ছা, যন্ত্র বলেই বলছি, মহাকাশের সঙ্গে জড়িত কিছু নয় তো ?”

“মহাকাশে তো কোনও যন্ত্র এমনি ঘূরে বেড়ায় না যে খসে পড়লে পৃথিবীর কোনও মানুষ কুড়িয়ে পাবে ! আর যদি বা পড়ে তা হলে পৃথিবীতে পড়তে যাবে কোন দুঃখে ! যদি পৃথিবীতে পড়ে তো ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে ।”

অর্জুন উঠে দাঁড়াল, “তা হলে কাল সকালে থানায় গিয়ে খোঁজ নেব ।”

“দাঁড়াও ।” মহাদেববাবু হাত তুললেন, “তুমি বললে রাত হলে রামচন্দ্রবাবু যে সিগন্যালটা শোনেন, তা ওই যন্ত্রের মধ্যে মিলিয়ে যায় । তখন তাঁর আর হিঁশ থাকে না । যা উনি করেন তা তাঁকে দিয়ে অন্য কেউ করায় ?”

“হ্যাঁ । উনি তো তাই বলেছেন ।”

“তোমার সঙ্গে তো বাইক আছে ?”

“হ্যাঁ ।”

“কিন্তু বাইকে বসার সাহস আমার নেই । নইলে তোমার সঙ্গে গিয়ে রামচন্দ্রবাবুকে এই রাত্রে দেখে আসতাম । বেশি রাত তো হয়নি !”

“আপনি যদি আমার পেছনে বসেন তা হলে আমি খুব সাবধানে চালাতে পারি ।”

“না, তুমি রিকশা ডাকো ।”

মহাদেববাবু যে অত রাত্রে অর্জুনের হাত ধরে বের হচ্ছেন, তা ওঁর বাড়িতে লোকদের পছন্দ ছিল না। অনেকেই মুখের ওপরেই আপন্তি জানালেন। তিন্তু বায়না ধরল সে সঙ্গে যাবে, কিন্তু মহাদেববাবু কারও কথা কানে তুললেন না।

তিনি যখন তৈরি হচ্ছিলেন, তখন অর্জুন জলপাইগুড়ির রাস্তায় রিকশা খুঁজছিল। যেহেতু নটা বেজে গেছে, একটাও রিকশা চোখে পড়ছিল না। সে খুব হতাশ হয়ে মহাদেববাবুর গেটের সামনে ফিরে আসতেই শুনল বৃন্দ বলছেন, “কে ?”

“আমি অর্জুন।”

“ও, রিকশা পেলে না ?”

“না।”

“রাজবাড়ি তো বেশি দূর নয়, চলো হেঁটেই যাই।”

“অন্তত দেড় কিলোমিটার পথ।”

“এমন কী বেশি ? তোমার বাইকের চেয়ে হাঁটতে আরাম হবে।”

নির্জন জলপাইগুড়ির রাস্তায় হাঁটতে ভাল লাগছিল অর্জুনের। নিজের বাইকটাকে সে মহাদেববাবুর বাড়ির গেটের ভেতরে ঢুকিয়ে বেথে এসেছিল। মহাদেববাবু হঠাত বললেন, “জানো, আমাদের বাংলা ভাষায় মহাকাশ নিয়েও গল্প-উপন্যাস লেখা হচ্ছে। কিন্তু সোদিন একটা কাহিনী শুনলাম, যা আমাকে খুব চমকে দিয়েছে।”

মহাদেববাবু যে আন্দাজে হাঁটছেন, তা বুঝতে পেরেই অর্জুন তাঁর হাত ধরল। দু'পাশে বাড়ি-ঘর-দোকানের আলো নিভে গেছে। মাঝে-মাঝে দু'-একটা রিকশা দেখা গেলেও তারা যাত্রী নিয়ে পাঁই-পাঁই করে ছুটছে। হাঁটতে-হাঁটতে মহাদেববাবু গঞ্জটা শোনালেন। এক ভদ্রলোকের হাঁট ব্লক হয়েছিল। কিন্তু তাঁর শরীরের যা অবস্থা তাতে অপারেশন করা সম্ভব ছিল না। অনেক ভাবনাচিন্তার পর সার্জেন এবং তাঁর সহকারী নিজেদের শরীরে যে ইনজেকশন নিলেন তাতে তাঁদের শরীর ছেট হয়ে গেল। একটা ছেট ক্যাপসুলের মধ্যে ঢুকে পড়লেন তাঁরা। তারপর সেই ক্যাপসুলটাকে ইঞ্জেকশনের সাহায্যে ভদ্রলোকের ধমনীতে ঢুকিয়ে দেওয়া হল। ধরা যাক, চবিশ ঘণ্টার মধ্যে যা করার করতে হবে সার্জেনকে। তারপরে ওই ক্যাপসুল গলে যাবে।”

এই পর্যন্ত বলে মহাদেববাবু জিজ্ঞেস করলেন, “কী, আজগুবি বলে মনে হচ্ছে ?”

“একটু।”

“লেখক সামান্য লাইসেন্স নিয়েছেন। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে লোকে চাঁদে হেঁটে বেড়ানোটাকে আজগুবি বলে মনে করত।”

“তারপর ?” হাঁটতে-হাঁটতে অর্জুন জিজ্ঞেস করল।

“ধৰ্মনী বেয়ে ক্যাপসুলে চেপে লোক দুটো পথ হারিয়ে ফেলল। ওরা প্রথমে গেল স্ট্যাকে। তারপর লিভারে। নানা জায়গায় ঘৰে ওরা যখন হার্টে পেঁচল তখন অনেক নাটক হয়ে গেছে। কিন্তু হাতে সময় নেই। শিরা বেয়ে ওরা হাদয়েন্ত্রে প্রবেশ কৱল। খুদে-খুদে যন্ত্রপাতির সাহায্যে ওরা অপারেশনের পুরো কাজটা শেষ কৱল। হাতে বেশি সময় নেই কিন্তু বেরিয়ে আসার পথ ওরা খুঁজে পাচ্ছিল না। কী করে ওরা বের হল বলতে পার?” মহাদেববাবু প্রশ্ন কৱলেন।

অর্জুন ভেবে পেল না। ওরা তখন রাজবাড়ির গেট পেরিয়ে যাচ্ছে। মহাদেববাবু বললেন, “পেশেন্টের চোখের জলের সঙ্গে ওদের ক্যাপসুল বেরিয়ে আসামাত্র গলে গেল। বেরোবার ওই একটিমাত্র পথ ছিল। দারুণ গঁজ। পড়তে-পড়তে শিরদাঁড়া সোজা হয়ে যায়।”

অর্জুন বলল, “এই বাড়ি।”

রামচন্দ্র রায়ের বাড়ির সদর দরজা বন্ধ। জানলাগুলোও। কিন্তু ভেতরে আলো জ্বলছে। অর্জুন কড়া নাড়ল। ভেতর থেকে কোনও শব্দ ভেসে এল না। দ্বিতীয়বারের পর গলা পাওয়া গেল। অর্জুন নিজের পরিচয় দেওয়ার পর দরজাটা খুলল। খালি গায়ে লুঙ্গ পরে রামচন্দ্র রায় তাদের দিকে অঙ্গুত চোখে তাকিয়ে আছেন। যেন তাঁর বুকাতে সময় লাগল। শেষমেশ বললেন, “ও, আমি ভাবলাম, আসুন-আসুন। আমি শুয়ে পড়েছিলাম।” কথাগুলো বেশ জড়নো।

অর্জুন বলল, “আমি খুবই দুঃখিত যে আপনার ঘুম ভাঙিয়ে—।”

হাত নাড়লেন রামচন্দ্রবাবু, “ঘুমোইনি। কিছুতেই ঘুম আসছিল না। শুয়ে ছিলাম।”

“প্রতি বাত্রে যা হয় আজ সেসব—।”

“হয়নি। এমনকী সেই সিগন্যালিং সাউন্ডটাও কানের পরদা থেকে উধাও। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছিল কিছু একটা হবে, কিন্তু হচ্ছে না। টেনশন বাড়ছে কিন্তু ঘুম আসছে না।”

“আপনি তো তাই চেয়েছিলেন।”

“মোটেই নয়। ওরা আমাকে দিয়ে কোনও অপরাধ কৱাক এটা চাইনি। কিন্তু আমার কাছ থেকে চলে যাক, এটা কখনও ভাবিনি। সুটকেসটাকে কোথায় রেখেছেন?”

এবার মহাদেববাবু কথা বললেন, “নমস্কার। আমার নাম মহাদেব সেন। চোখে দেখি না বলাই সঙ্গত। অর্জুনবাবুর সঙ্গে তবু এলাম। আপনার মনে হচ্ছে সুটকেসটা এখানে থাকলে সুবিধে হত?”

রামচন্দ্র রায় বললেন, “নিশ্চয়ই। কার্ডলো যে আমার এত বড় উপকার করেছে তা আগে বুঝিনি। ওর ওই সুটকেসটার জন্যেই বোজ রাত্রে ওরা এই

বাড়িতে আসত । ”

“কারা ?” মহাদেব সেন জিজ্ঞেস করলেন ।

“আমি জানি না । কিন্তু ওদের উপস্থিতি টের পেতাম । বেশ ভাল লাগত । ”

এবার অর্জুন বলল, “ভাল লাগত ? আপনি আগে একবারও বলেছেন এ কথা ? থানায় গিয়েছিলেন এর বিরক্তে ডায়েরি করতে, তা হলে কী করে ভাল লাগত ? ”

“আঃ, বোঝাতে পারছি না, ওদের উপস্থিতি আমার ভাল লাগত কিন্তু ওর যদি আমাকে দিয়ে অন্যায় কিছু করিয়ে নেয় তাই ভয় করত । সুটকেস্টা কোথায় ? ” রামচন্দ্র রায় বেশ উদ্বিগ্ন ।

“ওটা ঠিক জায়গায় আছে । আমরা আপনার সঙ্গে ওই ব্যাপারেই কথা বলতে এসেছি । একটু বসতে পারি ? উনি অনেকটা পথ হেঁটে এসেছেন । ” অর্জুন বলল ।

বোঝা গেল অনিচ্ছা প্রবল, তবু বসতে বললেন রামচন্দ্র রায় । বসাটা দরকার ছিল মহাদেববাবুর । তিনি একটু আরামসূচক শব্দ করে জিজ্ঞেস করলেন, “সুটকেস্টা যে এত জরুরি তা আপনি আগে জানতেন ? ”

“না । ওটা পড়ে থাকত ঘরের কোণে । ”

“আপনার বক্ষ আপনাকে দিয়েছিল ? ”

“দেয়নি । রেখে গিয়েছিল । বলেছিল অসম থেকে ফেরার পথে নিয়ে যাবে । ”

“যে-রাত্রে তিনি এ-বাড়িতে ছিলেন সেই রাত্রে কোনও ঘটনা ঘটেছিল ? মানে, ওই সিগন্যালিং সাউভ ? কারও আসার অনুভূতি । ” মহাদেববাবু প্রশ্ন করে যাচ্ছিলেন ।

“না । একদম হয়নি । কার্ভালো চলে যাওয়ার পরের রাত থেকে এটা শুরু হয়েছে । ”

“যাওয়ার দিন উনি কি সুটকেস খুলেছিলেন ? ”

রামচন্দ্রবাবু মনে করার চেষ্টা করলেন । তারপর মাথা দোলালেন, “না । কেউ নিজের সুটকেস খুলছে তা মুখ বাড়িয়ে দেখা অভদ্রতা । আমি দেখিনি । ”

“কার্ভালো আপনাকে যন্ত্রটা সম্পর্কে কিছু বলে গিয়েছেন ? ”

“না । ”

“মিস্টার রায়, এখন কি মনে হচ্ছে আপনি রোজ রাত্রে একটা নেশার মধ্যে ছিলেন, কিন্তু আজ সেই নেশার বন্দুটি পাচ্ছেন না ? ”

“হ্যাঁ, ঠিক তাই । আমার ঘূর্ম আসছে না । ”

“যারা আপনার কাছে আসে বলে মনে হয়, তাদের কোনও কথা আপনার

ଶୁଣେ ଆହେ ?”

“ତାରା କୋନ୍ତା କଥା ବଲେ ନା ।”

ମହାଦେବ ସେନ ଏବାର ଉଠେ ଦାଁଡ଼ାଲେନ, “ଚଲି, ଅନେକଟା ପଥ ଫିରତେ ହବେ ।”

ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ ବଲଲେନ, “କିନ୍ତୁ ସୁଟକେସଟାକେ ଆମାର ଚାଇ, ଏଥନ୍ତି ।”

“ଏଥନ୍ତି ଦେଓୟା ସନ୍ତ୍ବବ ନଯ ।” ଅର୍ଜୁନ ଉଠେ ଦାଁଡ଼ାଲ ।

“କେନ ?”

“ଓଟାକେ ଥାନାର ସିନ୍ଦୁକେ ରେଖେ ଏସେଛି । କାଳ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରତେ ହବେ ।”

ସଙ୍ଗେ-ସଙ୍ଗେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଭେଟେ ପଡ଼ିଲେନ, “ଓଃ, କୀ ଦୁମ୍ଭତି ହେୟାଛିଲ ! ଥାନାଯ ଗିଯେ ଆମାର କାଳ ହଲ । ଓଃ ।”

ମହାଦେବ ସେନେର ହାତ ଧରେ ଅର୍ଜୁନ ବେରିଯେ ଆସତେଇ ଲଟାରିର ମତୋ ଏକଟା ରିକଶା ପେଯେ ଗେଲ । ରୋଡ ସ୍ଟେଶନେ ତାର ରିକଶା ଥାରାପ ହୟେ ଯାଓୟାଯ ଏତ ରାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଟକେ ପଡ଼େ ଛିଲ । ମହାଦେବ ସେନ ଆର ଅର୍ଜୁନ ମେଟ୍ ରିକଶାଯ ବସେ ଶତରେର ଦିକେ ଛ-ଛ କରେ ଚଲେ ଆସଛିଲ । ଅର୍ଜୁନ ଜିଜ୍ଞେସ କରଲ, “କିଛୁ ବୁଝିଲେନ ?”

“ଏକ ବିନ୍ଦୁ ନଯ । ବୁଝିବେ ତୁମି । ଆମାର କାଜ ପ୍ରକାର କରେ ଯାଓୟା । ଆମରା କି ଥାନାର ରାତ୍ତାଯ ଯାଛି ?”

“ଥାନା ? ଆପଣି ଏଥନ ବାଡ଼ିତେ ଫିରବେନ ନା ?”

“ନିଶ୍ଚଯାଇ । ତବେ ତାର ଆଗେ ଏକବାର ଥାନାର ବ୍ୟାପାରଟା ଶୁଣେ ଯେତେ ଚାଇ ।”

“ବୁଝିଲାମ ନା ।”

“ରାତ ଅନେକ ହେୟାଛେ । ଥାନାର ଲୋକଜନ ସିଗନ୍ୟାଲିଂ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁନତେ ପାଛେ କି ନା ଅଥବା ଓଦେର କାରଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାୟର ମତୋ ଅବହ୍ଳା ହଲ କି ନା । ଏଟା ଜାନା ଦରକାର ।”

ଅର୍ଜୁନ ରିକଶାଓୟାଲାକେ ଥାନାର ଦିକେ ଯେତେ ବଲଲ । ଲୋକଟା ଆପନ୍ତି କରଲ । ଓର ବାଡ଼ି ଥାନା ଥେକେ ଅନେକ ଦୂରେ । ସେ ବୈଶିକ୍ଷଣ ଅପେକ୍ଷା କରତେ ପାରବେ ନା ।

ଥାନାଯ ପୌଛେ ମହାଦେବ ସେନ ନାମତେ ଚାଇଲେନ ନା । ତିନି ରିକଶାଯ ବସେ ରହିଲେନ । ଅର୍ଜୁନ ନାମଲ । ପାହାରାଯ ଥାକା ସେପାଇ ଜାନାଲ ଅବନୀବାସୁ ଫିରେଛେନ । ତିନି ଏଥନ ନିଜେର କୋର୍ଟାର୍ଟିର୍ସେ ଆହେନ । ସେକେନ୍ତ ଅଫିସାର ଶକ୍ତରବାସୁ ଏତ ରାତ୍ରେ ଅର୍ଜୁନକେ ଦେଖେ ଆବାକ, “କୀ ହଲ ମଶୀଇ ?”

“କିଛୁଇ ହେୟନି । ଆପନାଦେର ନତୁନ କୋନ୍ତା ଖବର ଆହେ ?”

“ପୁଲିଶେର ଆବାର ନତୁନ ଖବର ! ସବସମୟଇ ଖବର । କୀ ବ୍ୟାପାର ବଲୁନ ତୋ ?”

“ଏକବାର ଭଣ୍ଟେର ସାମନେ ନିଯେ ଯାବେନ ?”

“ନିଶ୍ଚଯାଇ । କିନ୍ତୁ ରହ୍ୟ କିଛୁ ଆହେ ବଲେ ମନେ ହଚ୍ଛେ !”

ଅର୍ଜୁନ ଆର କଥା ନା ବାଡ଼ିଯେ ଶକ୍ତରବାସୁକେ ଅନୁସରଣ କରଲ । ଭଣ୍ଟେର ଦରଜାଯ ତେମନ୍ତି ତାଳା ଝୁଲଛେ । ସେ ଜିଜ୍ଞେସ କରଲ, “ଏଥାନେ ଯାରା ଆହେ ତାଦେର

আচরণে কোনও পরিবর্তন এসেছে ?”

“না । আর পরিবর্তন হবেই বা কেন ?”

“একটা কারণ ছিল । কেউ কোনও শব্দ শুনতে পাচ্ছে ? মেটালিক টোন ?”

“আমি তো শুনিনি । কেউ শুনলে নিশ্চয়ই বলত । আপনি শুনছেন ?”

অর্জুন হেসে ফেলল, “নাঃ । চলুন ।”

“কী ব্যাপার ! এসব প্রশ্ন করছেন কেন ?”

“যে ভদ্রলোকের কাছে সুটকেস্টা ছিল তিনি শুনতে পেতেন ।”

“লোকটা নিশ্চয়ই নেশাভাঙ্গ করত ! জলপাইগুড়িতে এরকম লোকের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে । আরে মশাই এক ভদ্রমহিলা রোজ রাতে ভূত দেখছেন । গিয়ে জানলাম একটা মাটির পাঁচা মেলা থেকে কেনার পর থেকেই নাকি ওই কাণ্ড শুরু হয়েছে । বললাম, তেওঁ ফেলুন কিন্তু তা করবে না । জোর করে সেটাকে করালাম, ফেলে দিতে ভূত দেখা বন্ধ হল । বুরুন । কিসে এলেন, বাইক কোথায় ?”

“রিকশায় এসেছি । সঙ্গে একজন বিশিষ্ট মানুষ আছেন ।”

“কে ?”

“মহাদেব সেন ।”

শঙ্করবাবু সম্ভবত মহাদেব সেন সম্পর্কে বেশ কিছু জানেন না । কিন্তু তিনি অর্জুনের সঙ্গে গেট পর্যন্ত এলেন । দূর থেকেই রাস্তার আলোয় অর্জুনের চোখে পড়ল রিকশার ওপরে মহাদেব সেন দু' হাতে কান চেপে বসে আছেন । মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে নাকি ভদ্রলোকের । নিজেকে অপরাধী বলে মনে হল । এত রাতে ওঁকে বিব্রত করা ঠিক হ্যানি । কাছে পৌঁছে সে জিজ্ঞেস করল, “কী হয়েছে ?”

অদ্ভুত চোখ করলেন মহাদেব সেন, “অর্জুন, আমি বুঝতে পারছি না, কিন্তু আমার কানের পরদায় একটানা একটা সাউন্ড বিপুল করে বেজে যাচ্ছে । কখনও রেডিয়ো খোলার আগের শব্দের মতো টানা । মাই গড । তুমি কিছু শুনতে পাচ্ছ ?”

হতভুব অর্জুন বলল, “না ।”

“এই রিকশাওয়ালাটাও পাচ্ছে না । আপনি পাচ্ছেন ভাই ?”

শঙ্করবাবু হাঁ হয়ে শুনছিলেন । মুখ বন্ধ করে দ্রুত মাথা নেড়ে না বললেন । সেটা ভাল করে দেখতে পেলেন না মহাদেব সেন । বুঝতে পেরে অর্জুন বলল, “উনিও কিছু শুনতে পাচ্ছেন না ।”

মহাদেব সেনকে খুবই উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল । অর্জুন বলল, “ঠিক আছে । চলুন, বাড়িতে গিয়ে রেস্ট নেবেন ।”

মাথা নাড়লেন মহাদেব সেন, “না ভাই । মিস্টার রায় যা বলেছিলেন অবিকল সেই আওয়াজ । খুব দূর থেকে আসছে, যেন ক্ষীণ কিন্তু কানে পৌঁছে

যাচ্ছে । রিকশাটা এখানে দাঁড়ানো মাত্র ওটা কানে পৌঁছেছে । ব্যাপারটা আমার দেখা উচিত ।”

শঙ্করবাবু বললেন, “সার, আপনি বোধ হয় ঠিক সুস্থ নন ।”

“রাবিশ । চোখে দেখতে না পাওয়া ছাড়া আমার কোনও প্রশ্নের নেই ।” মহাদেব সেন রিকশা থেকে নামার চেষ্টা করছেন দেখে অর্জুন এগিয়ে গিয়ে তাঁকে ধরল । মহাদেব সেন মাটিতে দাঁড়িয়ে বললেন, “আমাকে থানার দিকে এগিয়ে নিয়ে চলো ।”

রিকশাওয়ালা এতক্ষণ এসব কাণ্ড দেখছিল । এবার বলল তাকে ছেড়ে দিতে । এমনিতেই প্রচুর রাত হয়ে গিয়েছে, তার ওপর ভুতুড়ে ব্যাপারে সে নেই । অর্জুনের আপত্তি ছিল, কিন্তু শঙ্করবাবু বললেন, “এখানে এসে পড়েছেন যখন, তখন কোনও প্রশ্নের নেই । গাড়ি করে ওঁকে পৌঁছে দিয়ে আসব ।”

ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে মহাদেব সেনের পাশে এসে দাঁড়াতেই তিনি বললেন, “অর্জুনবাবু ।”

“হ্যাঁ, বলুন ।”

“মনে করে দ্যাখো তো, তোমার সঙ্গে কথা বলতে মিস্টার রায় এরকম শব্দ শুনতে পেয়েছেন কি না ?”

“হ্যাঁ । উনি পাছিলেন ।”

“গুড় । এখনও আমার বোধবুদ্ধি ঠিক আছে । মিস্টার রায় তোমাকে বলেছেন একটা সময় তাঁর কোনও হঁশ থাকত না । সেই অবস্থা যদি আমার হয় তা হলে একটু লক্ষ রেখো । আমি চেষ্টা করব আমার হঁশ ঠিক রাখতে । সুটকেসটাকে কোথায় রেখেছি ?” মহাদেব সেনের চোখ এখন একেবারেই বন্ধ । কিন্তু মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল ওঁর ভেতরে কিছু ঘটে যাচ্ছে ।

“মাটির তলার ঘরে ।” অর্জুন জবাব দিল ।

“আমাকে সেখানে নিয়ে চলো ।”

“আমি তো নিয়ে যেতে পারব না । জায়গাটায় বাইরের মানুষের যাওয়া নিষেধ যদি না এঁরা অনুমতি দেন । শঙ্করবাবু, উনি একবার ভণ্টের সামনে যেতে চান । নিয়ে যাবেন ?”

অর্জুন প্রশ্ন করতে শঙ্করবাবু তার দিকে মুখ ফেরালেন । তাঁর চোখে-মুখে বিশ্বয় । মহাদেব সেনের ওই পরিবর্তনের কারণ তিনি বুঝতে পারছেন না । থানায় যারা পাহারা দিচ্ছিল সেই সেপাইরাও কাছাকাছি এসে যেন মজা দেখছে ।

শঙ্করবাবু চাপা গলায় জিজ্ঞেস করবেন, “কী ব্যাপার ? ভূতে ভর করছে নাকি ?”

কথাটা চাপাওয়ে হলেও মহাদেব সেনের কানে গেল । তাঁর গলা শোনা গেল, “অর্জুন, ওর কথাগুলো শুনতে পেয়েছি । তার মানে আই আয়ম ইন ফুল

সেস । ভূতে ভর করলে এসব কথা বলতে পারতাম না মশাই । ঠিক কি না ?”

শক্রবাবু চটপট বলে উঠলেন, “ঠিক কথা । অর্জুনবাবু আমি একবার বড়সাহেবকে জিজ্ঞেস করে আসি । যদি কিছু হয়ে যায়, মানে, আমার একটু রুকি থাকছে তো !”

অর্জুন বলল, “এত বাত্রে ভদ্রলোককে ঘুম থেকে তুলবেন ? আমরা তে কিছুই করছি না । শুধু দরজা পর্যন্ত যাচ্ছি আর ফিরে আসছি ।”

শক্রবাবু আর একটু ইত্তেজ করে বললেন, “ঠিক আছে, তবে অন্য কিছু হলে আপনি কিন্তু আমার কথা বড়সাহেবকে বলবেন । আমি অবশ্য ওঁকে বলেছি যে, আপনি এসে একটা সুটকেস রেখে গেছেন । উনি জিজ্ঞেস করলেন, কীসের সুটকেস ? আমি বললাম সম্ভবত দামি জিনিস আছে ভেতরে ।”

“তা হলে তো ওঁকে জানানোই হয়ে গেছে । চলুন, আপনার কোনও অসুবিধে হবে না ।”

ওরা যত এগোচ্ছিল তত নিচুস্বরে মহাদেব সেন বলছিলেন, “খুব জোরে বাজছে হে । রায় ঠিকই বলেছে । কোনও আজগুবি ভৃতপ্রেত নয় । একেবারে মাথার ভেতরে হ্যামার করছে ।”

বন্ধ দরজার সামনে ওরা যখন এসে দাঁড়াল, তখন মহাদেব সেনের মুখ-চোখ বেশ উন্নেজিত । অর্জুন বলল, “ওই ঘরের ভেতরে সুটকেসটা আছে ।”

মহাদেব সেন সজোরে দরজায় ঘুসি মারলেন ।

শক্রবাবু বললেন উঠলেন, “করছেন কী ? তালা দেওয়া আছে । কাল সকালের আগে খোলা যাবে না । আরে, আপনার হাতে লাগবে ! ও অর্জুনবাবু, সামলান ওঁকে ।”

অর্জুন মহাদেব সেনের হাত ধরল, “আপনি আহত হবেন ।”

“হই হব । আই মাস্ট সি দ্যাট সুটকেস । আঃ কী আরাম !” কথাগুলো জড়িয়ে যাচ্ছিল ওঁর । চোখ-মুখ পালটে যাচ্ছিল । শক্রবাবুর ইঙ্গিতে পাহারাদারী ছুটে এসে মহাদেব সেনকে জড়িয়ে ধরল । একজন একটা দড়ি এনে ভাল করে বাঁধতে যাচ্ছিল, কিন্তু অর্জুন তাকে বাধা দিল । “না । ওটা করবেন না । ধৰাধৰি করে ওঁকে বরং বাইরে নিয়ে চলুন ।”

ওরা যখন মহাদেব সেনকে জোর করে তুলে ওপরে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন শক্রবাবু ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, “সুটকেসটার ভেতরে ভূত আছে নাকি ? আঁ । ভদ্রলোকের ওপর তো ভর করে ফেলেছে ।”

“আপনি তো ওসবে বিশ্বাস করেন না ।”

“করতাম না । কিন্তু এখন চোখের ওপর দেখছি ।”

ওপরে এসেও সেপাইরা মহাদেব সেনকে সামলাতে পারছিল না । তিনি ২০০

যেন প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী এখন। সেপাইরা কী করবে খুবতে পারছে না। অর্জুন ওঁকে বোঝাতে গেল, “আপনি শান্ত হোন, কী করছেন?”

মহাদেব সেন এমন সব শব্দ উচ্চারণ করতে লাগলেন, যা অর্জুন এই জীবনে শোনেনি। এমনিতে দৃষ্টিশক্তি প্রায় নেই, কিন্তু এখন তাঁকে দেখে ওসব মনেই আসছে না। চিৎকার চেঁচামেচিতে অবনীবাবুর ঘুমও ভেঙে গেল। তিনি নেমে এলে অর্জুন তাঁকে সব জানাল। ব্যাপারটা পরীক্ষা করার জন্যে অবনীবাবু নিজে একবার ভণ্টের দরজা থেকে ঘুরে এলেন, তাঁর আচার-আচরণে কোনও পরিবর্তন হল না। ওপরে এসেই অবনীবাবু মহাদেব সেনের বাড়িতে একজন সেপাইকে পাঠালেন খবর দিতে, আর টেলিফোনে ডাক্তার দাসকে থানায় আসতে বললেন।

দুটো হাত পেছন দিকে শক্ত করে ধরে মহাদেব সেনকে একটা চেয়ারে জোর করে বসিয়ে রাখা হয়েছিল। অর্জুনের খুব কষ্ট হচ্ছিল। এই বৃদ্ধ অসুস্থ মানুষটিকে সে কোন সমস্যায় জড়িয়ে দিল!

মিনিট কুড়ির মধ্যে প্রায় একই সঙ্গে মহাদেব সেনের ছেলে এবং বউমা আর ডাক্তার দাস এসে গেলেন। মহাদেব সেনের ছেলে সুব্রত সেন এখনকার কলেজের অধ্যাপক। বাবার ওই অবস্থা দেখে তিনি অবাক!

কী করে এমন হল প্রশ্ন করাতে অর্জুন খুব দুঃখের সঙ্গে ব্যাপারটা জানাল। ভদ্রলোক বললেন, “খুব অন্যায় করেছেন বাবাকে অত রাত্রে নিয়ে গিয়ে। এই বয়সে এ কী হয়ে গেল বলুন তো!”

সুব্রত সেনের স্ত্রী অনেকটা বাস্তব কথা বললেন, “বাবা না চাইলে কেউ কি ওঁকে নিয়ে যেতে পারে? তা ছাড়া উনি কী করে জানবেন যে, এমন হবে!”

ডাক্তার দাসকে মহাদেব সেন পরীক্ষা করতে দিলেনই না। যতবার তিনি কাছে যাচ্ছেন ততবার যেন তাঁর ওপরেই আক্রোশ পড়ছে। শেষপর্যন্ত ডাক্তার দাস বললেন, “মনে হচ্ছে কোনও কারণে ওর নার্ভাস সিস্টেমে গোলমাল হয়েছে। এখনই কড়া ঘুমের ওষুধ দেওয়া উচিত। আপনারা জোর করে ধরুন, আমি একটা ইঞ্জেকশন দিয়ে দিচ্ছি।”

তাই করা হল। মহাদেব সেনের শরীরে প্রচণ্ড শক্তি, এখন তবু সবাই মিলে জোর করে তাঁকে এমনভাবে ধরা হল যাতে ডাক্তার দাস ইনজেকশন দিতে পারেন। কিন্তু আশ্চর্য, তাতেও কাজ হল না। ভদ্রলোক বীতিমতো অবাক। বললেন, “কোনও মানুষ এই ইনজেকশনের পর মিনিট পাঁচেক জেগে থাকতে পারে না। এঁর কী হল?”

রাতটা ওইভাবেই কাটল। ভোর যত এগিয়ে এল, তত নেতৃত্বে পড়তে লাগলেন মহাদেব সেন। সূর্য ওঠার ঠিক আগে তিনি একদম শিশুর মতো ঘুমিয়ে পড়লেন। তাঁর মুখ-চোখ শান্ত হয়ে এল। অবনীবাবু বললেন, “এখন ওঁকে বাড়িতে নিয়ে গেলে ঘুম ভেঙে যেতে পারে। এই ঘরেই আমি বিছানা

করে দেওয়ার ব্যবস্থা করছি। শক্তরবাবু, আপনি দেখবেন কেউ যেন এখানে না ঢোকে। মহাদেব সেনের মতো নামী বিজ্ঞানীর কোনও ক্ষতি হোক আমরা চাই না।”

কয়েক মিনিটের মধ্যে সব ব্যবস্থা হয়ে গেল। মহাদেব সেন এখন আরামে ঘুমোচ্ছেন। ডাক্তার দাস পরীক্ষা করে দেখলেন, ওঁর পাল্স এবং হার্ট নর্মাল। ভয়ের কোনও কারণ নেই। ঘুমের স্তর পরীক্ষা করে ভদ্রলোক শুধু বললেন, “আশ্চর্য! মনে হচ্ছে আমি এইমাত্র ইজেকশন দিয়েছি। কী কাণ্ড!”

মিসেস সেন চলে গেলেন। বললেন, “কাউকে পাঠিয়ে দিলে তুমি যেয়ো।”

সুরুত সেন মাথা নাড়লেন। তাঁকে তখনও অর্জুনের ওপর সদয় মনে হচ্ছিল না।

অবনীবাবু বললেন, “চলুন, দরজা ভেজিয়ে আমরা বাইরে যাই। অর্জুনবাবু অনেক ঝড় গেল, আপনি বাড়িতে গিয়ে বিশ্রাম করুন।”

অর্জুন মাথা নাড়ল, “অসম্ভব। আমার জন্যে ওঁর এই দশা, উনি যতক্ষণ না সুস্থ হয়ে কথা বলছেন ততক্ষণ আমার ঘুম আসবে না।”

“বেশ, তা হলে চলুন, আমরা একটু চা-পান করি।”

ওরা দরজা ভেজিয়ে বাইরে এল। অবনীবাবু একজনকে ডেকে চায়ের কথা বললেন। সবে ভোর হচ্ছে। হঠাৎ অর্জুনের নজরে এল থানার গেট পেরিয়ে রামচন্দ্র রায় বেশ ইতস্তত ভাব নিয়ে চুকচ্ছেন। এই সময়ে ওঁকে এখানে দেখবে ভাবেনি সে। রামচন্দ্র রায় অর্জুনকে দেখতে পেয়ে ইশারায় ডাকলেন। অবনীবাবু বললেন, “আরে, এই ভদ্রলোকই তো গতকাল সঙ্কেবেলায় আমার কাছে এসেছিলেন, তাই না অর্জুনবাবু?”

“হ্যাঁ, উনিই। দাঁড়ান, দেখি কেন ডাকছেন!”

অর্জুন এগিয়ে গেল। রামচন্দ্র রায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। অর্জুন কাছে গিয়ে বলল, “সুপ্রভাত!”

“ও, হ্যাঁ, সুপ্রভাত।” ভদ্রলোককে আজ আরও বয়স্ক দেখাচ্ছিল।

“কী ব্যাপার?”

“আপনার বাড়িতে গিয়েছিলাম। গিয়ে শুনলাম কাল রাত্রে নাকি ফেরেননি।”

এখন মা বাড়িতে নেই। ক’দিনের জন্যে এক পিসির বাড়িতে গিয়েছিলেন। কাজের লোকটি নিশ্চয়ই চিন্তা করবে না। অর্জুন গতরাত্রে বাড়িতে খবর দেয়ানি সেই কারণেই।

“হঠাৎ কোনও প্রয়োজন হয়েছিল?”

“হ্যাঁ। আমার সুটকেসটা ফেরত দিন।”

“আপনি বলেছেন ওটা কার্ডলোর।”

“কার্ভলো আমার বন্ধু। সে ওটা আমার কাছে রেখে গিয়েছিল। অতএব
ওর স্বর্কে যাবতীয় দায়িত্ব আমার। দয়া করে ফেরত দিন।” প্রায় মিনতি
করলেন রামচন্দ্র রায়।

“দেখুন, ওটার অঙ্গ আছে তাই আমরা জানতাম না। আপনি নিজে এসে
থানায় কথা না বললে এসব কিছুই হত না। কিন্তু নিজের অঙ্গতে আপনি
একটা ভাল কাজ করেছেন। আপনার কাছে সুটকেসের ভেতরে যে যন্ত্রটি ছিল
তার রিঅ্যাকশন সব মানুষের ওপর পড়ে না। আমি, ল্যাংড়ো-পাঁচ, থানার
অফিসার অথবা সেপাইরাঁ ওর রিঅ্যাকশন থেকে মুক্ত, অথচ কাল
যে-ভদ্রলোক আমার সঙ্গে আপনার বাড়িতে গিয়েছিলেন, তিনি আক্রান্ত
হয়েছেন। সারারাত ওঁর যে কষ্ট হয়েছে, তা আমি দেখেছি। মনে হয়
আপনারও একই কষ্ট হত। এখন ওই যন্ত্র সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ না হওয়া
পর্যন্ত আমরা আপনাকে ফেরত দিতে পারি না,” অর্জুন বলল।

অবনীবাবু ততক্ষণে কাছে এসে পড়েছিলেন, জিজেস করলেন, “আপনার
বন্ধু ওই যন্ত্র কোথায় পেয়েছেন তা কি আপনাকে বলেছেন?”

নীরবে মাথা নেড়ে না বললেন রামচন্দ্রবাবু।

“একটা অদ্ভুত জিনিস বেজাইনভাবে আপনি রাখতে পারেন না!”

রামচন্দ্রবাবুর কাছে এসব কথা যাচ্ছিল না। তিনি জিজেস করলেন,
“আপনাদের কারও কিছু হ্যানি আর সেই ভদ্রলোকের অবস্থা আমার মতো হয়ে
গেল ! একবার তাঁকে দেখতে পারি ?”

“উনি এখন ঘুমোছেন !” অবনীবাবু বললেন।

“আচ্ছা, আমিও সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত মড়ার মতো ঘুমোতাম।
আপনারা আমার সর্বনাশ করেছেন। এই ক'দিন বাতের ব্যথাটা ছিল না
একটুও, আজ আবার ফিরে এসেছে। ওটা না পেলে আমি আজ আত্মহত্যা
করব !” রামচন্দ্র রায় চাপা গলায় বললেন।

অর্জুন বৃক্ষকে বলল, “ওই সিগন্যাল শোনা, ঘোরের মধ্যে থাকা আপনার
নেশা হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে। একটা রাত না পেয়ে আপনি এসব কথাও
ভাবতে পারছেন। অথচ আপনি নাবিক ছিলেন, কত কষ্ট, পরিশ্রম করেছেন,
জীবন দেখেছেন। একটা সাধারণ নেশাখোরের কথা আপনার মুখে কি
মানায় ?”

“ওঃ, কী করে বোঝাব ওটা কী ধরনের নেশা !”

“আপনি তো ওই নেশায় আক্রান্ত হয়ে কাউকে খুন করতে পারতেন !”

“হ্যাঁ, ঠিক, সব ঠিক !” রামচন্দ্র রায় মাথা নাড়লেন, “তবু—।”

“আর কোনও তবু নয়। আমরা পরীক্ষা করে দেখতে চাই যন্ত্রটাকে।
দরকার হলে সরকারকে জানাতে হবে। এরকম হচ্ছে কেন ! চিংড়িমাছ খেলে
সবার ভাল লাগে, আবার কারও-কারও শরীরে এমন অ্যালার্জি বের হয় যে, সে

দ্বিতীয়বার থায় না । তার শ্রীরের গঠনের সঙ্গে ওই মাছ মেলে না । মনে হচ্ছে আপনার বন্ধুর দেওয়া ওই যন্ত্রটি সব মানুষকে আক্রমণ করে না । কোনও-কোনও মানুষের মস্তিষ্কে এমন কিছু কোষ আছে, যা ওর পছন্দ । বোঝাই যাচ্ছে তাঁদের সংখ্যা খুব অল্প । আপাতত আপনি আর মহাদেববাবু একই গোত্রে । এখন আপনি বাড়ি ফিরে যান । মহাদেববাবুর ঘূর্ম ভাঙলে মনে হয় কিছু জানা যেতে পারে । ” অর্জুন তার লাল বাইকটির কথা ভাবল । সেটা মহাদেব সেনের বাড়ির সামনেই পড়ে আছে গত রাত থেকে । সে অবনীবাবুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হাঁটা শুরু করল । সমস্ত রাত অন্তুত টেনশনে কাটিয়ে এখন বেশ অবসন্ন মনে হচ্ছে নিজেকে ।

ঘূর্ম হয়েছিল কি হ্যানি, ঘণ্টা তিনিক বিছানায় শুয়ে স্নান সেরে কিছু মুখে দিয়ে অর্জুন যখন থানায় ফিরে এল, তখন ঘড়িতে সাড়ে দশটা । শঙ্করবাবু তাঁর বাসস্থানে এখনও ঘুমোচ্ছেন, অবনীবাবু এস. পি’র বাংলোয় গিয়েছেন । অর্জুন জানল মহাদেব সেনের ঘূর্ম এখনও ভাঙেনি । সে বারান্দা দিয়ে এগোতেই তিস্তাকে দেখতে পেল । একজন বয়স্ক মহিলার সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে । ওকে দেখেই তিস্তা হাসল, “গুড মর্নিং ।”

অর্জুন বলল, “সুপ্রভাত । উনি কি এখনও ঘুমোচ্ছেন ?”

“হ্যাঁ । পুলিশটা বলল না জাগলে ভেতরে যাওয়া নিষেধ । কাল কখন আপনি মোটরবাইক নিয়ে গেলেন আমি টেরই পাইনি । ” তিস্তা হাসল ।

“আপনারা এখানে দাঁড়িয়ে না থেকে ভিজিটর্স রুমে গিয়ে বসতে পারেন । ” অর্জুন কথা শেষ করতেই ডাক্তার দাসকে আসতে দেখা গেল । তিনি বললেন, “কী ব্যাপার, উনি কেমন আছেন ? ঘূর্ম ভেঙেছে ?”

অর্জুন বলল, “বোধ হয় না ।”

ডাক্তার দাস ঘড়ি দেখলেন, “প্রায় ছ’ঘণ্টা হয়ে গেছে । চলুন, একবার দেখে আসি ।”

ডাক্তার দাসের পেছন-পেছন ওরা ভেতরে চুকল । মহাদেব সেন সেই একই ভঙ্গিতে ঘুমোচ্ছেন । মুখ খুব প্রশান্ত । ডাক্তার দাস তাঁর হাত তুলে পালস্ দেখতে লাগলেন । এই সময় চোখ খুললেন মহাদেব সেন । তাঁর মাথার পাশে তিস্তারা দাঁড়িয়ে ছিল, পায়ের কাছে অর্জুন । সে দেখল মহাদেব সেনের মুখে বিস্ময় ফুটে উঠেছে । তিনি বললেন, “কী ব্যাপার, তুমি এখানে ?”

ডাক্তার দাস জিজ্ঞেস করলেন, “কেমন বোধ হচ্ছে এখন ?”

এবার মহাদেব সেন বাকিদের দেখলেন । তিস্তা ঝুঁকে পড়ল, “কেমন আছ দাদু ?”

“আরে ! আমি কোথায় শুয়ে আছি ?”

“থানায় । তোমার খুব শরীর থারাপ হয়েছিল । আমরা চিন্তায় ছিলাম

খু-উ-ব ।”

“আমি থানায় শুয়ে আছি !” মহাদেব সেন উঠে বসলেন, “কাল রাত্রে, কাল রাত্রে তো অর্জুন এসেছিল। হ্যাঁ, ওর সঙ্গে বেরিয়ে শেষপর্যন্ত থানায় এসেছিলাম। মনে পড়ছে সব। তারপর আমার কী হয়েছিল অর্জুন ?” স্পষ্ট চেখে তাকালেন মহাদেব সেন।

অর্জুনের কেমন সন্দেহ হল। সে জিজ্ঞেস করল, “আচ্ছা, আপনি কি আমাকে দেখতে পাচ্ছেন ?”

প্রশ্নটি শোনামাত্র মহাদেব সেন হতভস্ব হয়ে পড়লেন, দুটো হাত তুলে চোখ রংগড়ালেন, তারপর চিংকার করে উঠলেন, “আরে, এ কী হল ?”

তিস্তা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, “কী হয়েছে ?”

মুখ ঘুরিয়ে ঘরের সবাইকে দেখলেন মহাদেব সেন, “আমি, আমি দেখতে পাচ্ছি, তোমাদের সবাইকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। কী করে হল ! আমার যে কোনও সন্তানাই ছিল না দেখার। আহঁ। দিস ইঝ এ মিরাকল !” নীচে নেমে দাঁড়ালেন তিনি কথাগুলো বলতে-বলতে।

ডাঙ্কার দাস তাঁকে বাধা দিলেন, “আপনি এত এক্সাইটেড হবেন না। টেক ইট ইঝি !”

“টেক ইট ইঝি ? আরে, আমার মতো প্রায় অন্ধ হঠাতে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেল, এটা কি রোজকার ঘটনা ?” মাথা নাড়লেন মহাদেব সেন। তাঁকে খুব খুশি দেখাচ্ছিল। এই সময় সুব্রত সেন ঘরে ঢুকলেন অবনীবাবুর সঙ্গে। তাঁদের দেখামাত্র তিস্তা চিংকার করে উঠল, “দাদু এখন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন। আমি বাড়িতে যাচ্ছি সবাইকে খবর দিতে।” তিস্তা বেরিয়ে গেল।

সুব্রতবাবু হকচকিয়ে গেলেন, “দেখতে পাচ্ছেন মানে ?”

মহাদেব সেন ছেলের দিকে তাকালেন, “হ্যাঁ সুব্রত, আমি দেখতে পাচ্ছি।”

“কী করে সন্তুষ্ট ?”

এবার ডাঙ্কার দাস বললেন, “অঘটন ঘটে। আমাদের চিকিৎসাশাস্ত্রে যা অসন্তুষ্ট বলা হয়েছে জীবনে তার উলটোটা মাঝে-মাঝে হতে দেখেছি।”

“আপনি ডাঙ্কার ?” মহাদেব সেন বললেন।

অর্জুন বলল, “হ্যাঁ। উনি ডাঙ্কার দাস। গত রাত থেকেই উনি আপনার কাছে আছেন বলা যেতে পারে।”

“গত রাত থেকে ! হ্যাঁ, তাই তো, আমি এ কোথায় শুয়ে আছি ?”

“আপনি থানায় রাত্রিবাস করেছেন সার। আমি এখানকার ওসি।” অবনীবাবু হাসিমুখে এগিয়ে এলেন হাতজোড় করে।

নমস্কার ফিরিয়ে দিয়ে ছেলের দিকে তাকালেন মহাদেব সেন, “আমার কী হয়েছিল ?”

সুব্রত সেন বললেন, “পরে শুনবেন। এখন বাড়ি চলুন, আপনার বিশ্রামের

দরকার।”

মহাদেব সেন মাথা নাড়লেন, “সারারাত ঘুমিয়ে এখন আবার বিশ্রামের দরকার হবে কেন? ডাক্তার, আপনি বলুন তো আমার কী হয়েছিল?”

ডাক্তার দাস বললেন, “আপনি খুবই এক্সাইটেড ছিলেন। সত্যি কথা বলতে গেলে বলতে হয় মস্তিষ্ক কাজ করছিল না। খুব অ্যাগ্রেসিভ হয়ে উঠেছিলেন। সেই অবস্থা থেকে সরিয়ে আনতে আপনাকে আমি ঘুমের ওষুধ দিই। কিন্তু অসুত ব্যাপার, সেই ওষুধ কাজ শুরু করে অনেক পরে, ভোরের একটু আগে। ততক্ষণ আপনার অবস্থা নর্মাল ছিল না। এখন অনুগ্রহ করে একটু শুয়ে পড়ুন, আমি পরীক্ষা করব।”

মহাদেব সেন বাধ্য ছেলের মর্তো আদেশ পালন করলেন। তাঁকে পরীক্ষা করার পর ডাক্তার দাসের মুখে হাসি ফুটল, “নাঃ, একদম ঠিক আছেন। এবার বাড়ি যেতে পারেন।”

শুয়ে-শুয়েই মহাদেব সেন প্রশ্ন করলেন, “ক'টা বাজে এখন?”

অবনীবাবু সময়টা বললেন। মহাদেব সেন বিড়বিড় করলেন, “এত বেলা পর্যন্ত ঘুমোলাম।”

ডাক্তার দাস বললেন, “আপনার ঘুম শুরু হয়েছিল সাড়ে চারটে থেকে। সময়টা বেশি নয়।”

মহাদেব সেন সোজা হলেন, “আমার একটু টয়লেট যাওয়া দরকার।”

সুব্রত সেন বললেন, “বাড়িতে চলুন।”

মহাদেব সেন বললেন, “বেশ। তাই চলো। কিন্তু অর্জুন, তুমি আমার সঙ্গে কখন দেখা করছ?”

“আপনি বিশ্রাম নিন। বিকেলের দিকে।”

“না, না। অত দেরি করা চলবে না। আমি আধুনিক মধ্যেই তৈরি হয়ে নেব। তুমি চলে এসো।” ছেলের সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন মহাদেব সেন। তিন্তার সঙ্গে যে মহিলা এসেছিলেন তিনিও ওঁদের অনুসরণ করলেন। ঘরের জানলা খুলে দিয়ে অবনীবাবু বললেন, “ব্যাপারটা কী হল?”

ডাক্তার দাস বললেন, “আমি বুঝতে পারছি না। গত রাত্রে যখন ওঁকে প্রথম দেখলাম তখন ওঁর দৃষ্টিশক্তি নিয়ে ভাবার প্রশ্নাই ছিল না। বন্ধ উন্মাদ মনে হচ্ছিল ওঁকে। কিন্তু এমন কিছু ঘটে গেছে ওঁর শরীরে, যে-কারণে আমার ইনজেকশন কাজ করতে দেরি করেছিল। ব্যাপারটা কলকাতায় জানাতে হবে।”

অবনীবাবু বললেন, “সেটা জানাবার পরে অনেক সময় পাবেন। কিন্তু সত্যি কি উনি চোখে ভাল দেখতে পেতেন না? আমি বুঝতে পারছি না।”

অর্জুন হতভস্থ হয়ে বসে ছিল। বলল, “এর মধ্যে মিথ্যে কিছু নেই। উনি প্রায় অন্ধ ছিলেন। ওই যন্ত্রটির কাছে পোঁচে যাওয়ার পর ওঁর আচরণে

পরিবর্তন এল । মনে হয় তারই রিভ্যাকশনে উনি এখন দেখতে পাচ্ছেন । ”

ডাক্তার দাস জিজ্ঞেস করলেন, “কী যন্ত্র ?”

অবনীবাবু চট করে ঘুরে দাঁড়ালেন, “একদম ভুলে গিয়েছিলাম । চলুন দেখা যাক । ”

ডাক্তার দাস ব্যাপারটা বুঝতে পারছিলেন না । যেতে-যেতে ওঁকে ওয়াকিবহাল করলেন অবনীবাবু । ভদ্রলোককে বলতে শোনা গেল, “কী আজগুবি গল্প শোনাচ্ছেন !”

নীচের ভেট্টের সামনে পৌঁছে অবনীবাবু ডাক্তার দাসকে জিজ্ঞেস করলেন, “কোনও সাউন্ড শুনতে পাচ্ছেন ?”

ভদ্রলোক জবাব দেওয়ার আগেই অর্জুন বলল, “দিনের বেলায় ওটা শোনা যায় না । অন্তত রামচন্দ্র রায় তাই বলেছেন । ”

“ভদ্রলোক সঠিক কথা নাও বলতে পারেন । ” অবনীবাবুর ইঙ্গিতে সেপাই তালা খুলল ।

ডাক্তার দাস বললেন, “দূর মশাই আমি কিছুই শুনতে পাচ্ছি না । ”

ঘরের যে-কোণে সুটকেসটাকে ঢুকিয়ে রেখেছিল অর্জুন, সেখানেই ওটা পড়ে আছে । অবনীবাবু একটানে সেটাকে র্যাকের আড়াল থেকে বের করতে পারলেন না । অর্জুন সেইভাবেই ঢুকিয়ে রেখেছিল । এখন বলল, “তালা লাগানো নেই । সাবধানে । ”

সুটকেস থেকে থার্মোকলের বাক্সগুলো খুলে যন্ত্রটাকে তুলে আনা হল । ধাতব বস্তুটি শব্দহীন । অর্জুনের খেয়াল হল, রামচন্দ্র রায়ের বাড়িতে যখন এটাকে সে দেখেছিল তখন এর ভেতর থেকে আলো বের হচ্ছিল । এখন কোনও আলোই নেই । ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যন্ত্রটিকে দেখে অবনীবাবু বললেন, “জিনিসটা কী তাই, বোঝা যাচ্ছে না । ”

“সিগন্যাল রিসিভিং মেশিন । যখনই এটা সেই সিগন্যাল পায় তখনই এর ভেতর থেকে আলো বের হয় দপদপ করে । ” অর্জুন গভীর গলায় বলল ।

অবনীবাবু জিজ্ঞেস করলেন, “সিগন্যালটা পায় কার কাছ থেকে ?”

“সেটা জানি না । কাল রাত্রে যখন রামচন্দ্রবাবু সিগন্যালের শব্দ পাচ্ছিলেন তখন ওটা থেকে আলো বের হতে দেখেছি আমি । ” অর্জুন বলল ।

এতক্ষণ ডাক্তার দাস যন্ত্রটির দিকে তাকিয়ে ছিলেন, এবার বললেন, “একটা কথা খুবই বিনীতভাবে জানতে চাইছি । এটা যদি একটা সিগন্যাল রিসিভ করার মেশিন হয় তাহলে এর কাছাকাছি এলাকায় পৌঁছে মহাদেববাবুর নার্ভ বিকল হয়ে গেল কী করে, আর দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন কোন যুক্তিতে ?”

অবনীবাবু বললেন, “তাই তো !”

অর্জুন বলল, “এইটে জানতে আরও কিছু সময় লাগবে । আমরা এর মধ্যে জেনেছি এই যন্ত্রের কাছাকাছি এলে বেশিরভাগ মানুষের কিছুই হয় না । যেমন

আমি, শঙ্করবাবু, ল্যাংড়ো-পাঁচ, থানার সেপাইরা, এমনকী আপনারাও। কারণ আপনারাও কাল রাত্রে কোনও সিগন্যাল শুনতে পাননি। কিন্তু কিছু-কিছু মানুষের পরিবর্তন হয়। আজ সকালে রামচন্দ্র রায় এসেছিলেন, কারণ যন্ত্রটির সঙ্গে রাত কাটানো তাঁর কাছে নেশার মতো হয়ে গেছে। ওঁর শরীরে যে বাতের ব্যথা ছিল তা উধাও হয়ে গিয়েছিল যন্ত্রটির সঙ্গে রাত কাটিয়ে! কিন্তু নির্বাস্ত থাকার ফলে সেটা আবার ফিরে এসেছে।”

“শব্দটা কী বললেন তাই? নির্যন্ত্র?” ডাক্তার দাস জিজ্ঞেস করলেন।

“হ্যাঁ। যদি নির্জন, নির্বাস্ত হতে পারে, তখন নির্যন্ত্র হবে না কেন?” অর্জুন হাসল। তারপর ঘড়ি দেখল।

অবনীবাবু হাত্তাং পুলিশি গাড়ীর্য নিয়ে বললেন, “কার্ভালোর পেট থেকে খবর বের করতে হবে যে, কোথায় সে যন্ত্রটা পেয়েছে?”

“সে যদি আর না ফেরে?”

“এত দামি একটা জিনিস ফেলে রেখে কতদিন বাইরে থাকবে?”

“ভদ্রলোক কিন্তু এক মাস ধরে উধাও।”

“ওই লোকটারও কোন রিজ্যাকশন হয়নি। তাই তো?”

“হ্যাঁ, কার্ভালোও আমাদের দলে।”

“এটাই অন্তুত। হ্যাঁ মশাই এটার সঙ্গে অ্যাটমিক ব্যাপারের কোনও সংযোগ নেই তো? এইয়ে আমি ধরলাম।” অবনীবাবুকে এবার নার্ভাস দেখাল।

“সেটাও জানা দরকার।” অর্জুন গভীরভাবে বলল, “আমি এখন মহাদেববাবুর বাড়িতে যাব। যাওয়ার সময় এটাকে সঙ্গে নেব।”

“এটাকে সঙ্গে নিয়ে বাইরে যাবেন?”

“কেন? দিনের বেলায় অসুবিধে কোথায়?”

“আরে মশাই, এত মূল্যবান জিনিস, ওঁর কাছে যাওয়ার দরকার কী?”

“এই শহরে একমাত্র উনিই এ-বিষয়ে কিছু বলার ক্ষমতা রাখেন। ভদ্রলোক চিরকাল বিজ্ঞানচর্চা করে এসেছেন।”

অবনীবাবু ইতস্তত করছিলেন, “এরকম জিনিস যে-কোনও মানুষের পক্ষে বিপজ্জনক হতে পারে। তা ছাড়া পথে যদি কিছু হয় তা হলে—! বরং উনি তো এখন ভাল আছেন, এখানেই এসে দেখতে বলুন না!”

অনেক তর্কের পর অবনীবাবু রাজি হলেন। কিন্তু পুলিশের জিপে অর্জুন যন্ত্রটিকে নিয়ে যাবে এবং সঙ্গে সেপাই থাকবে। অবনীবাবু উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে এই অন্তুত যন্ত্র পাওয়ার খবর পাঠাতে দেরি করলেন না। এটা নাকি তাঁর কর্তব্যের মধ্যে পড়ে।

জিপে বসে থানার বাইরে আসামাত্র অর্জুন দেখল রাস্তার একপাশে রামচন্দ্র রায় ছাতি মাথায় দাঁড়িয়ে আছেন। ভদ্রলোককে খুব উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল। অর্জুন পুলিশ-ড্রাইভারকে বলল গাড়ি থামাতে। তাকে দেখতে পেয়ে রামচন্দ্র রায়

এগিয়ে এলেন, “আপনার জন্যে দাঁড়িয়ে আছি। আরে, ওটাই তো কার্ভালোর সুটকেস, তাই না ?”

অর্জুন দেখল রামচন্দ্রবাবুর চোখ চকচক করে উঠল। সে সেটাকে গুরুত্ব না দিয়ে বলল, “আপনি এখানে আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন? পাগল হয়ে গিয়েছেন নাকি ?”

“তা বলতে পারেন। বাড়ি গিয়ে শুনলাম থানায় এসেছেন, তাই।” রামচন্দ্রবাবু কাঁচুমাচু হলেন, “আসলে আমার মনে হচ্ছে জীবনের অনেক কিছু হারিয়ে গিয়েছে। ফাঁকা লাগছে।”

“উঠে আসুন জিপে।” অর্জুনের মায়া হল।

চটপট জিপে উঠলেন রামচন্দ্র রায়, “নাইনটিন ফর্টি নাইনে আমি একটানা বাহাত্তর ঘণ্টা জিপ চালিয়েছিলাম। নাওয়া-খাওয়া সব মাথায় উঠেছিল।”

অর্জুন বলল, “থামেননি ?”

“ওই যখন তেলের দরকার হত, তখনই।” রামচন্দ্র হাসলেন, “এখানে, মানে ইতিয়ায় নয়। অস্ট্রেলিয়ায়। জাহাজ থেকে একটা জরুরি খবর নিয়ে ছুটতে হয়েছিল।”

“বাবা, আপনার তো অভিজ্ঞতা অনেক।”

“তা তো বটেই। বই লিখলে ইয়া মোটা হয়ে যেত।”

“লিখুন না।”

“ছাপবে কে? এ-দেশে গুণীর কদর নেই। কার বাড়ি ?”

অর্জুনের ইশারায় ড্রাইভার মহাদেব সেনের বাড়ির সামনে জিপ থামিয়েছিল। সুটকেস নিয়ে নামতে-নামতে অর্জুন বলল, “আপাতত এই শহরে আপনার সঙ্গে মিল আছে যে একমাত্র মানুষটির, তিনি এই বাড়িতে থাকেন। গতরাত্রে তাঁকে আপনার বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলাম।”

“এখানে কেন আনা হল ?”

“উনি একজন বিজ্ঞানী। আপনার, আমার চেয়ে অনেকগুণ বেশি জানেন। ওঁর সাহায্য দরকার এই রহস্য সমাধান করতে। আপনিও আসুন না !” অর্জুনের অনুরোধে রামচন্দ্র রায় যেন বাধ্য হয়েই অনুসরণ করলেন।

বাড়ির সবাই প্রস্তুত ছিলেন। তিঙ্গা ওদের মহাদেব সেনের ঘরে নিয়ে যাওয়ামাত্র তিনি জিজ্ঞেস করলেন, “ওটা কী ?”

“এটাই কার্ভালোর রেখে যাওয়া সুটকেস।” অর্জুন স্বত্ত্বে মেঝের ওপর বাথল সুটকেসটাকে। মহাদেব সেনকে এখন অনেকটা স্বাভাবিক দেখাচ্ছে। চোখের চশমা খুলে তিনি বললেন, “এঁর সঙ্গে কোথায় দেখা হল ?”

“থানার সামনে।” জবাব দিয়ে অর্জুন দেখল রামচন্দ্রবাবু একদৃষ্টিতে মহাদেব সেনের দিকে তাকিয়ে আছেন। যেন ওঁর ভেতরটা পড়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন। তারপর হাসলেন, “রামচন্দ্র মহাদেবের বাড়িতে এল অর্জুনের

সঙ্গে । ”

“ধন্যবাদ । ” মহাদেব সেনের চোখ ঘরের ভেতর দাঁড়ানো আঞ্চীয়ন্দ্রজনের ওপর পড়ল, “এবার আমরা একটু কাজ করব । তোমরা দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে যাও । ”

আদেশ অমান্য করার সাহস কারও হল না, যদিও বেরিয়ে যেতে কারও রাই মন চাইছিল না । রামচন্দ্র রায় বললেন, “কাজের সময় আমার থাকা কি উচিত হবে ?”

“নিশ্চয়ই । এখানে আপনি-আমি গিনিপিগ । প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব । অর্জুন, দরজা দুটো বন্ধ করে সুটকেস খোলো । আগে যন্ত্রটাকে দেখা যাক । ” মহাদেব সেন বললেন ।

• দরজা বন্ধ করে সুটকেস খুলে থার্মোকলের ভেতর থেকে যন্ত্রটাকে বের করা হল । মহাদেব সেন সামনের টেবিলে সেটিকে রাখতে বললেন । জানলা দিয়ে আসা আলো পড়ায় যন্ত্র চকচক করছে । মহাদেব সেন বললেন, “মেটালটা লক্ষ করো । সিল অ্যালুমিনিয়াম মেশানো বলে ভুল হবে । তুমি বলেছিলে আলো বেরোতে দেখেছ, কোনও আলো নেই । ”

“ওটা সিগন্যাল হলে বের হয় বলে মনে হচ্ছে । ”

“হয়তো । মিস্টার রায়, আপনি কি কোনও শব্দ পাচ্ছেন ?”

রামচন্দ্র রায় মাথা নাড়লেন, “নাঃ । দিনের বেলায় তো পেতাম না । ”

“তা হলে তোমার ধারণাই ঠিক অর্জুন । কিন্তু এই মেটাল কভারটায় কোথাও জোড়ের চিহ্ন নেই । ভেতরে যে যন্ত্রপাতি, না না, অর্জুন, এই জায়গাটা লক্ষ করো । ” ঝুঁকে পড়ে দেখতে-দেখতে মহাদেব সেন অর্জুনকে ডাকলেন । অর্জুন দেখল । কিছু একটা খুলে নেওয়া হয়েছে সেখান থেকে । বন্স্ট্রিকে ধরে রাখার হুক এখনও এর গায়ে আছে ।

অর্জুন বলল, “এর গায়ে কিছু লাগানো ছিল । ”

মহাদেব সেন বললেন, “হ্লি । এখন এই যন্ত্রটি ঠিক কী জিনিস তা জানার জন্যে দুটো পথ আছে । এক, আমরা এই মেটাল কভার ভাঙতে পারি । সেক্ষেত্রে যদি যন্ত্রটাই খারাপ হয়ে যায় তা হলে চিরকাল আফশোস থেকে যাবে । দ্বিতীয় পথটা আরও কটা রাত পরীক্ষা করা । ”

রামচন্দ্র রায় বললেন, “দ্বিতীয় পথটাই ঠিক । তা হলে আমার বাতের ব্যুথটা কমে যাবে । ”

“আপনার বাত আছে ?” মহাদেব সেন মুখ তুললেন ।

“আর বলবেন না, নাইনটিন ফিফটি ওয়ানে... । ”

রামচন্দ্রবাবুকে থামিয়ে অর্জুন বলল, “এটা কোথায় ? আফ্রিকায় ?”

“একদম ঠিক । অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল আমার । বাঁচার চাল ছিল না । ”

অর্জুন ভদ্রলোককে থামাবার জন্যে বলল, “উনি বলছেন রোজ রাত্রে এই

অন্ত্রের সঙ্গে থাকার ফলে ওঁর শরীরে বাতের ব্যথা কমে গিয়েছিল । এক রাত হাত্তাছাড়ি হওয়ায় আবার বেড়ে গিয়েছে । আপনার চোখের ব্যাপারটা কীরকম ?”

মহাদেব সেন বললেন, “উনি ঠিকই বলছেন অর্জুন । যখন ঘূম থেকে উঠেছিলাম তখন মনে হয়েছিল সব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি । কিন্তু এরই মধ্যে মনে হচ্ছে দৃষ্টিশক্তি কমতে আরম্ভ করেছে । আগের থেকে অনেক ভাল, কিন্তু ওই পাওয়ার বেড়ে গেলে যা হয় ।”

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “আপনার কি মনে হয় এটা পৃথিবীতে তৈরি হয়েছে ?”

“না হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি । যদি কেউ করে থাকেন তা হলে তাঁর পক্ষে এমন ঝুঁকি নেওয়া খুবই বোকামি হবে ।”

“বোকামি কেন ?”

“তিনি নিশ্চয়ই লুকিয়ে রেখেছিলেন তাঁর আবিক্ষারের কথা । যন্ত্রটা নিশ্চয়ই তাঁর কাছ থেকে চুরি গিয়েছে । প্রতি রাতে তিনি সিগন্যাল পাঠান যন্ত্রটার অস্তিত্বটা জানার । না, তা হতে পারে না । তা হলে তিনি জেনেই যেতেন যন্ত্রটা কোথায় আছে, এসে নিয়ে যেতেন । যে-যন্ত্র একটি মানুষকে প্রভাবিত করে তার শরীরের ক্রটি কমিয়ে দেয়, তাকে তিনি অনেক বড় কাজে ব্যবহার করবেন ।”

“তা হলে ?”

“হ্যাঁ । সেরকমই মনে হয় । এই ধাতব বস্তুটি আমার অচেনা । গড়নও অস্ত্রুত । দিনের আলো নিভে গেলে পৃথিবীতে সিগন্যালটা আসে অথবা দিনের আলোর জন্যেই সিগন্যাল এলেও এটি অচল থাকে । সিগন্যাল পেলেই যন্ত্রটা সক্রিয় হয় । সক্রিয় যন্ত্রটি থেকে যে-তরঙ্গ বের হয় তা সেইসব মানুষের অস্তিক্ষের কোষে প্রতিক্রিয়া আনে, যাদের গঠনের সঙ্গে এই যন্ত্রে রাখা ফর্মুলার মিল আছে । কিন্তু কেন ? কারা এটাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছে । উদ্দেশ্য কী ? তা ছাড়া এই যন্ত্রটি স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় । এর শরীর থেকে কিছু একটা খুলে নেওয়া হয়েছে । কী সেটা ?” যেন বারংবার নিজেকেই প্রশ্ন করে গেলেন মহাদেব সেন । খুব চিন্তামগ্ন দেখাচ্ছিল তাঁকে ।

অর্জুন বলল, “বেশ, এবার আমরা একটা হিসেবে আসি । আমরা জেনেছি এই যন্ত্রটির একটা অংশ উধাও হয়েছে । দুই, এটি দিনের বেলায় নিক্রিয় থাকে । তিনি, সক্রের পরেই দূর থেকে ভেসে আসা সিগন্যালে এ রেসপন্স করে এবং ভোর হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই আবার নিক্রিয় হয় । তা হলে দিনের বেলায় সিগন্যাল আসে না অথবা এলেও এ প্রহণ করতে পারে না ।”

মহাদেববাবু বললেন, “আমাদের পৃথিবী যখন সূর্যের দিকে মুখ করে থাকে তখন ওই সিগন্যাল-প্রেরকের কাজ করার ক্ষমতা কমে যায় । হয়তো সূর্যতাপ

সহ্য করতে পারে না।”

অর্জুন বলল, “বেশ। এবার দেখা যাচ্ছে, সঙ্গে হওয়ার পর থেকেই এই যন্ত্রের কাছাকাছি আসামাত্র কোনও-কোনও মানুষ একটা ক্ষীণ শব্দ শুনতে পাচ্ছেন।”

রামচন্দ্র রায় বললেন, “ক্ষীণ ক্ষিপ্ত ননস্টপ।”

“হ্যাঁ, সেটা একসময় বাড়তে আরম্ভ করে ?”

“মিস্টার রায় বলতে পারবেন। আমি গতকাল রিকশায় বসেই যা শুনতে পেয়েছি তাতে মনে হচ্ছিল কালা হয়ে যাব।”

“ঠিকই। সঙ্গে থেকে শুরু হয়। একটু-একটু করে বাড়তে থাকে। অফিচটপট রাত্রের খাওয়া খেয়ে নিতাম, কানে শব্দ বাজত। তারপর একসময় মনে হত কানের পরদা ফেটে যাবে। তখন আর জ্ঞান থাকত না।” রামচন্দ্র রায় বললেন।

“হ্যাঁ, আমি এই স্টেজটাই জানতে চাইছি। গত রাত্রে আপনার কানে ব্যথা হচ্ছিল শব্দটার জন্যে, রিকশাতে বসেই। আমার সঙ্গে যখন থানার ভেতরে চুকলেন তখনও আপনি স্বাভাবিক কথা বলছিলেন, মনে আছে ?” অর্জুন মহাদেব সেনকে জিজ্ঞেস করল।

“মনে আছে। তখন শব্দটা কানের ভেতর তুমুল হয়ে উঠছিল। যখন নীচের বন্ধ দরজার কাছে পৌঁছলাম তখন ওই আওয়াজের প্রাবল্যে যেন উদ্ধাদ হয়ে গেলাম।”

“হ্যাঁ। আপনি তখন দরজা খোলার চেষ্টা করছিলেন একাই। প্রচণ্ড শক্তি এসে গেল শরীরে। আপনাকে ধরে রাখা একজন সেপাইয়ের পক্ষে সন্তুষ্ট হয়নি। মিস্টার রায়, ওই অবস্থায় পৌঁছে আপনিও কি যন্ত্রটার দিকে যাওয়ার চেষ্টা করতেন ? সেক্ষেত্রে তো আপনি সহজেই যন্ত্রটাকে পেতেন। ওটা আপনার ঘরে সুটকেসের মধ্যেই থাকত।” অর্জুন তাকাল।

“না। আমি বেরিয়ে পড়তাম। খালি হাতে নয়। কিছু একটা ভারী জিনিস বয়ে নিয়ে যেতাম। কোথায় যেতাম, কেন যেতাম তা জানি না। অনেকটা হাঁটতাম মধ্যরাত্রে। দু-একজন প্রতিবেশী পরের দিন সকালে দেখা হলে জিজ্ঞেস করেছে অতরাত্রে তিঙ্গা বিজের দিকে কেন গিয়েছিলাম ? জবাব দিতে পারিনি।” রামচন্দ্র রায় হাসলেন, “সকালে ডান হাতে খুব ব্যথা হত। এখন মনে হচ্ছে এমনও হতে পারে ওই সুটকেস বয়ে নিয়ে যেতাম। শুধু এই কারণেই একসময় ভয় হল, রাত্রে বেরিয়ে আমি কাউকে খুনও করতে পারি। এই ভয় বাড়তেই আমি থানায় গেলাম ডায়েরি করতে। আপনাকে বলেছিলাম আমার বাড়ির বাইরের দরজায় তালা দিয়ে যেতে।”

“ওই সময়ে আপনি কাউকে দেখেছেন বলে মনে পড়ে ?”

“কাউকে বলতে ?” মহাদেব সেন জিজ্ঞেস করলেন।

“এমন কেউ যে আপনাকে পরিচালনা করছে । ”

রামচন্দ্র রায় বললেন, “আমার মনে হত কেউ পাশে আছে অথচ তাকে আমি জ্ঞানে পাছি না । সে যা বলছে আমাকে, তাই করতে হচ্ছে । ”

“আপনি ?”

“ঠিক এক অনুভূতি নয় । আমি বুঝতে পারছিলাম আমাকে তালা দিয়ে কেউ চাবি নিয়ে গিয়েছে । সেই চাবিটা আছে এই যন্ত্রের মধ্যে । ওই যন্ত্র পেলে আমি মুক্ত হয়ে যাব । কিন্তু তোমরা আমাকে আটকে রেখেছিলে । ”
মহাদেব সেন বললেন । এই সময় রামচন্দ্র রায় উঠে এসে পরম স্নেহে যন্ত্রের পায়ে হাত বোলালেন ।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “আপনারা দু’জনেই কি আজ রাত্রে এই যন্ত্রটির সঙ্গে যাকার জন্যে কোনও টান অনুভব করছেন ?”

রামচন্দ্র রায় বলে উঠলেন, “নিশ্চয়ই । ”

মহাদেব সেন বললেন, “আমার শুধু কৌতুহল হচ্ছে । ”

“ওই কৌতুহল থেকেই টান আসবে । এ মশাই নেশার মতন ব্যাপার । ”
রামচন্দ্র রায় দীর্ঘস্থাস ফেললেন ।

“আমাকে একটু ভাবতে দিন । এখনও কয়েক ঘণ্টা হাতে আছে । বিকেলে আমার কাছে এসো অর্জুন । একটা কিছু করতে হবে আজ রাত্রে । ”

“আমি নিশ্চয়ই বাদ যাচ্ছি না ?” রামচন্দ্র রায় জিজ্ঞেস করলেন ।

“অবশ্যই না । ” মহাদেব সেন বললেন ।

“তা হলে এটিকে আবার থানায় রেখে আসি ?” অর্জুন বলল ।

“কেন ?” মহাদেববাবু আপত্তি করলেন ।

“এখন এটা সরকারের সম্পত্তি, যেহেতু এর মালিককে পাওয়া যাচ্ছে না । ”
অর্জুন বলল ।

সমস্ত দুপুর অন্তর্ভুক্ত এক উত্তেজনার মধ্যে কাটল অর্জুনের । শেষপর্যন্ত আড়াইটে নাগাদ সে জগ্নদার বাড়িতে গেল । জগ্নদা এখন শিলিগুড়ির সেট ব্যাকে বদলি হয়ে গিয়েছেন । বউদি তাকে দেখে খুব খুশি । অর্জুন ভি সি আরে স্পিলবার্গের ‘ইঁট’ ছবিটা দেখতে চাইলে তিনি তৎক্ষণাৎ সেটকে চালু করে দিলেন । অর্জুন অনেকবার দেখা ছবিটাকে আর একবার খুঁটিয়ে দেখল । কিন্তু তার মনে হল স্পিলবার্গ যেভাবে দেখিয়েছেন, অন্য গ্রহের মানুষেরা এমন হয় না ।

বউদিকে ভি সি আর বক্ষ করতে বলে সে বেরিয়ে এসে বাইকে স্টার্ট দিল । এখন বিকেল । কদমতলার মোড় জমজমাট । অর্জুন কালীবাড়ির রাস্তাটা ধরল । সে ক্রমশ নিঃসন্দেহ হচ্ছিল ওই যন্ত্রটির সঙ্গে মহাকাশের অন্য গ্রহের জীবদের একটা সম্পর্ক আছে । এ ছাড়া অন্য কোনও ব্যাখ্যা হতে পারে না ।

• ব্যাপারটা নিয়ে যত সে ভাবছিল, তত এক ধরনের রোমাঞ্চে সে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছিল।

থানায় পৌঁছে সে অবাক ! এরই মধ্যে মহাদেব সেন এবং রামচন্দ্র রাজ অবনীবাবুর সামনে বসে আছেন। মহাদেব সেনের ছেলে সুব্রত সেনও সহে আছেন। মহাদেব সেন তাকে দেখে বললেন, “যাক, ঠিক সময়েই এসেছো।”

অর্জুন হেসে আর-একটা চোরারে বসল।

অবনীবাবু বললেন, “ডি আই জি হেড কোয়ার্টার্স একটু আগে টেলিফোন করেছিলেন এস পি সাহেবকে। বলেছেন আমাকে কিছুদিনের জন্যে বিশ্রাম নিতে।”

“কেন ?” অর্জুন অবাক।

“ওঁর ধারণা ওভারস্ট্রেন করে আমার মাথা সুস্থ নেই। আমি ওই যন্ত্রটার ব্যাপারটা রিপোর্ট করেছিলাম।”

“আশ্চর্য !”

“হ্যাঁ, আপনাদের জন্যে আমার এই দশা ! যাকগে, আজকের প্ল্যান কী ?”

“আমরা যন্ত্রটার কাজকর্ম ভালভাবে দেখতে চাই।”

“কীভাবে ?”

এই সময় মহাদেব সেন কথা বললেন, “আমি একটা উপায় ভেবেছি। সুব্রত জিনিসটা বের করো তো।”

মহাদেববাবুর ছেলে একটা ব্যাগ খুলে দুটো হেডফোন জাতীয় জিনিস বের করে তাঁর বাবার হাতে দিলেন। মহাদেব সেন বললেন, “এটা কানে পরলে কোনওরকম বাইরের শব্দ কানে যাবে না। আমি দেখতে চাই শেষপর্যন্ত ঘটনাটা কোনদিকে যায়।”

রামচন্দ্র রায় বললেন, “সরি ! ওটা আমি ব্যবহার করব না।”

“কেন ?” মহাদেব সেন একটু বিরক্ত হলেন।

“আমি শব্দটাকে শুনতে চাই।”

মহাদেব সেন কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু অর্জুন বাধা দিল, “ঠিক আছে, উনি যা চাইছেন তাই হোক। আপনি হেডফোনটাকে ব্যবহার করুন। আজ রাত্রে আপনার স্বাভাবিক থাকা প্রয়োজন।”

অনিষ্টা সত্ত্বেও মহাদেববাবু প্রস্তাবটা মেনে নিলেন। অবনীবাবু বললেন, “আমি আর-একটা ব্যবস্থা করেছি। সেটা এখন বলব না।”

সক্ষে হওয়ার আগে চা খাওয়ালেন অবনীবাবু। তারপর সবাই ঘর থেকে বের হলেন। শক্রবাবু বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। অর্জুনকে দেখে ইশারায় কাছে আসতে বললেন তিনি। অর্জুন এগিয়ে যেতে শক্রবাবু বললেন, “আমার বাবা চোখে দেখতেই পান না। যদি মহাদেববাবু ওই যন্ত্রটির সাহায্যে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পান তা হলে আমার বাবাও পেতে পারেন। স্যারকে বলুন না, আমি

ওঁকে নিয়ে আসতে পারি ?”

“উনি কোথায় আছেন ?”

“আমার কোয়ার্টার্সে ।”

“বেশ, ওঁকে আগে জিজ্ঞেস করুন কোনও সিগন্যালের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছেন কি না । যদি পান, তা হলে নিয়ে আসুন ।” অর্জুন হেসে এগিয়ে গেল ।

আজ বিকেলে মহাদেব সেনের দৃষ্টিশক্তি আরও ক্ষীণ হয়ে এসেছে । সুব্রত সেনের হাত ধরে হাঁটছেন তিনি । সকালবেলায় যে-লোকটা টগবগে ছিল, এখন তাঁকে ছেলের হাত ধরে হাঁটতে হচ্ছে । বাইরে দিন ফুরিয়ে আসছে ।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “আপনি কিছু ভেবেছেন ?”

মহাদেব সেন বললেন, “হ্যাঁ । আমি আগে থানায় এসেছি কারণ অবনীবাবুকে দিয়ে ওই ভল্টের ঘরের মেঝে জুড়ে সাদা চুন ছড়িয়ে দিয়েছি । যে ওই ঘরে চুকবে তার পায়ের ছাপ ওখানে পড়বে । আমি হেডফোন ব্যবহার করব । যদি সিগন্যালের শব্দ না শুনতে পাই তা হলে আশা করি নর্মাল থাকব ।”

ওরা নীচে নেমে ভল্টের দরজার সামনে দাঁড়াল । অবনীবাবু আগে থেকেই সেখানে কয়েকটা চেয়ারের ব্যবস্থা রেখেছিলেন । সেগুলোয় বসে গল্পগুজব হচ্ছিল । হঠাৎ রামচন্দ্র রায় সোজা হয়ে বসলেন, “শুনতে পাচ্ছি ।”

মহাদেব সেন কান খাড়া করলেন, “হ্যাঁ, আমিও পাচ্ছি । সুব্রত ?”

সুব্রত সেন তাঁর হাতে হেডফোন এগিয়ে দিতে তিনি সেটা ভাল করে কানে ঢেকে মাথায় পরে নিলেন ।

রামচন্দ্র রায় বললেন, “বিপ বিপ শব্দ হচ্ছে ।”

অবনীবাবুর নির্দেশে একজন সেপাই ভল্টের আলো নিভিয়ে দিল । যন্ত্রটাকে স্টুকেস থেকে বের করে ভল্টের মাঝখানে একটা টেবিলের ওপর রেখে দেওয়া হয়েছিল । অন্ধকার হতেই তা থেকে মাঝে-মাঝে আলো বের হতে দেখা গেল । মহাদেববাবু পাশে বসা অর্জুনকে বললেন, “তোমার ধারণাটা ঠিক । সিগন্যাল আসামাত্র ব্যন্ত্রটা থেকে আলো বের হয় ।”

করিদোরে আলো আছে, তেতরে নেই । আলোটা ক্রমশ জোরালো হয়ে নিভহে-জ্বলছে । হঠাৎ রামচন্দ্র রায় বললেন, “ডিনারটা করে নিতে পারলে ভাল হত । আজ সারারাত অভুক্ত থাকতে হবে ।”

অর্জুন হাসল । ভদ্রলোক নির্ঘাত খেতে খুব ভালোবাসেন, নইলে এই সময়ে ডিনারের চিঞ্চা করতেন না ।

হঠাৎ মহাদেব সেন বলে উঠলেন, “এ কী ! সর্বনাশ !”

সবাই ওঁর দিকে চমকে তাকাল । মহাদেব সেন বললেন, “আমি শব্দটাকে শুনতে পাচ্ছি । আমার কান ঢেকে রাখা সত্ত্বেও পাচ্ছি । মনে হচ্ছে শরীরের

অন্যসব রক্তপথ দিয়ে শব্দটা চুকে যাচ্ছে । খুবই স্কীণ তাই না মিস্টার রায় ?”
মহাদেব সেন হেডফোন খুলে ফেললেন মাথা থেকে ।

রামচন্দ্র রায় মাথা নাড়লেন, “ঠিক, ঠিক । গোটা রাত সামনে পড়ে আছে, না খেলে খুব দুর্বল হয়ে যাব । শরীর ঠিক না থাকলে কোনও আনন্দকেই আনন্দ বলে মনে হয় না ।”

অর্জুন বলল, “কী খেতে চান ?”

মহাদেব সেন ধমকালেন, “থামো । আপনি এ সময়ে খাওয়ার কথা চিন্তা করছেন ?”

রামচন্দ্র রায় হাসলেন, “একবার জলদস্যুদের পান্নায় পড়েছিলাম । তোর হলেই খুন করবে বলে গেল । সবাই কানাকাটি করছিল । আমি কিন্তু রাতের খাবারটা চেয়ে নিলাম । আমার যুক্তি হল কানাকাটি করে দুর্বল হওয়ার চেয়ে খেয়েদেয়ে শক্তিশালী হওয়া অনেক ভালো । শব্দটা বাড়ছে !”

মহাদেব সেন একমত হলেন, “হ্যাঁ । এখন আর বিপ বিপ নয়, একটানা । বাড়ছে কিন্তু বেশ সহ্য করার মধ্যেই আছে । শরীরে একটা রিমিসিম ভাব এসে গেছে ।”

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “কেউ আপনাকে সম্মোহন করছে বলে মনে হচ্ছে ?”

“আমেজ লাগছে কিন্তু কারও অস্তিত্ব টের পাচ্ছি না । তাই না মিস্টার রায় ?”

“ঠিক, ঠিক ।” চোখ বন্ধ রামচন্দ্র রায় মাথা নাড়লেন ।

অর্জুন লক্ষ করল, টেবিলে রাখা যন্ত্রটা থেকে যে দপ-দপ আলোর ঝলকানি বেরিয়ে আসছিল, তা বদলে গেছে । এখন মদু নীলচে আলো বের হচ্ছে । আলোর রেখাটা মাঝে-মাঝে দিক পরিবর্তন করছে মাত্র । সে মহাদেব সেনের দৃষ্টি আকর্ষণ করল ।

ব্যাপারটা লক্ষ করে মহাদেব সেন বললেন, “সঠিক দিকনির্ণয়ে সাহায্য করছে যন্ত্রটা । কিছু একটা আসছে আর তার আসার পথটা জানিয়ে দিচ্ছে ও ।”

যন্ত্রখানেক ধরে এই ধরনের কথাবার্তা চলল । মহাদেব সেন এবং রামচন্দ্র রায় সিগন্যালিং সার্টিফ শুনেই যাচ্ছেন । শুধু তার পরদা বাড়ছে । ওঁদের কথাবার্তা এখনও স্বাভাবিক । ইতিমধ্যে সুব্রত সেন তাঁর বাবাকে সর্তক করেছিলেন শরীর খারাপ হওয়ার আশঙ্কা জানিয়ে, কিন্তু তিনি কান দেননি । জরুরি কিছু কাজের খবর নিয়ে শক্তরবাবু এসেছিলেন অবনীবাবুর কাছে । অবনীবাবু নির্দেশ দিয়ে বলেছিলেন কেউ যেন তাঁকে বিরক্ত না করে ।

রাত দশটা নাগাদ অর্জুনেরই মনে হতে লাগল, বেশ থিদে পেয়ে গিয়েছে । খেতে হলে এই চেয়ার ছেড়ে উঠতে হয় । কিন্তু ওঠবাবু ঝুঁকি নেওয়া অসম্ভব । কখন কোন মুহূর্তে কী ঘটে যাবে তা কেউ জানে না । রামচন্দ্র রায়

আর খাওয়ার কথা বলছেন না । তাঁকে এখন ঠিক একটি মেশাগ্রাস্ট মানুষের মতো দেখাচ্ছে । শব্দটা বেড়ে গেছে অনেক । মহাদেব সেন গত রাত্রে রিকশায় বসে যেভাবে কান চেপে ধরেছিলেন, এখন সেই ভঙ্গিতে বসে আছেন । যন্ত্র থেকে বের হওয়া আলোটা এখন অতীব উজ্জ্বল । যেন টর্চের আলোর মতো সেটা বাঁ-ডান করে একটা দেওয়ালের ওপর আছড়ে পড়েছে । সেটা দেখে মহাদেব সেন উঠে দাঁড়ালেন, “গতি উন্নত দিকে । শব্দটা আসছে উন্নত থেকে দক্ষিণে । দূরত্ব খুবই কমে এসেছে, খুবই কম, আঃ !” আন্তে-আন্তে ওঁর কথা জড়িয়ে বাছিল । অর্জুন সঙ্গে-সঙ্গে উঠে দাঁড়াল । সুব্রত সেনকে ইশারা করে সে মহাদেব সেনকে ধরতে বলে প্রায় পাঁঁজাকোলা করেই ওপরে নিয়ে এল । সামনে পুলিশ জিপের পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন শক্রবাবু । মহাদেব সেনের শরীর জিপে তুলে দিয়ে অর্জুন বলল, “আপনার ড্রাইভারকে বলুন থানা থেকে সিকি মাইল দূরে গাড়িটাকে নিয়ে যেতে ! ওই যন্ত্রটার প্রভাবের বাইরে এখন ওঁকে রাখতে চাই, নইলে গতকালের অবস্থা হবে ।”

শক্রবাবু ব্যাপারটা বুঝে ড্রাইভারকে হ্রকুম দিলেন । সুব্রত সেন মহাদেব সেনকে ধরে বসে ছিলেন । জিপটা সাত-তাড়াতাড়ি থানার চতুর ছেড়ে বেরিয়ে গেল । অর্জুন আবার ফিরে গেল নীচে । গিয়ে দেখল রামচন্দ্রবাবুকে দুঁজন সেপাই ধরে রেখেছে দুঁপাশ থেকে । অবনীবাবু বললেন, “উনি ওই যন্ত্রটাকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে যেতে চাইছেন । কথা জড়িয়ে গেছে, কিন্তু গায়ে শক্তি এসেছে । মহাদেববাবুকে কোথায় নিয়ে গেলেন ?”

অর্জুন বলল, “থানার বাইরে পাঠিয়ে দিলাম । গত রাত্রে উনি থানার গেটের কাছে এসে শব্দটা শুনতে পেয়েছিলেন । ওই যন্ত্র থেকে কিছুটা দূরে সরে গেলে ওঁর ওপর কোনও বিঅ্যাকশন পড়বে না । গত রাত্রের অবস্থা হওয়ার আগে উনি নমাল হয়ে যেতে পারবেন ।”

রামচন্দ্র রায়ের এখন কোনও হঁশ নেই । তাঁর চোখ ঠিকরে বেরিয়ে এসেছে । অনেক চেষ্টা সংস্ক্রে সেপাই দুঁজনের জন্যে তিনি উঠে দাঁড়াতে পারছেন না । অর্জুন যন্ত্রটির দিকে তাকাল । আলো বেশ চড়া এখন । দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে চারধার বেশ আলোকিত । গত রাত্রে সুটকেসের ভেতর ওটা থাকায় সে আলোর এই চেহারা ঠাওর করতে পারেনি । ঘরের মেঝের দিকে তাকাল সে । কোনও দাগ নেই । কোনও প্রাণী বা বস্তু ওখানে গেলে ছাপ ফুটে উঠত ।

অর্জুন ঘড়ি দেখল । এখন প্রায় এগারোটা বাজে । মহাদেব সেনের কথা মনে পড়ল তার । “গতি উন্নত দিকে, শব্দটা আসছে উন্নত থেকে দক্ষিণে, দূরত্ব বেশি নয় ।” কিন্তু বেশি নয় মানে কতটা ? সে পিছিয়ে এসে অবনীবাবুর কানে নিচু গলায় কিছু বলল । ভদ্রলোক অবাক হলেন, “কিন্তু—”

“একবার দেখাই যাক না।”

“বেশ।” অবনীবাবু নিজেই তালা খুললেন। সাদা মেঝেতে তাঁর জুতোর ছাপ পড়ল। র্যাক থেকে থার্মোকোল বের করে যন্ত্রটাকে ঢুকিয়ে দিতেই আলো ঢেকে গেল। এবার যেমন ছিল তেমনই সুটকেসে সব জিনিস ভরে ওটাকে টেবিলে রেখে তিনি বেরিয়ে এসে সেপাইদের বললেন, “মিস্টার রায়কে ছেড়ে দাও।”

সেপাইরা আদেশ পালন করামাত্র রামচন্দ্রবাবু তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন। একরকম ছুটেই তিনি টেবিলের কাছে পৌঁছে সুটকেসটাকে তুলে ধরলেন। তাঁর মুখের অভিব্যক্তি একদম অন্যরকম এখন। নিজের জিনিস নিজেই নিয়ে যাচ্ছেন, কারও অনুমতি নেওয়ার দরকার নেই এমন ভঙ্গিতে সুটকেসটাকে তুলে তিনি সোজা হেঁটে বেরিয়ে গেলেন। বোঝাই যাচ্ছিল এখন তিনি কাউকে চিনতে পারছেন না।

অর্জুন এবং অবনীবাবু ওঁকে অনুসরণ করে ওপরে উঠে আসতেই দেখা গেল শঙ্করবাবু রামচন্দ্র রায়কে জিজ্ঞেস করছেন, “এ কী! সুটকেস নিয়ে কোথায় যাচ্ছেন?”

রামচন্দ্র রায় জবাব দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করলেন না। ইনহনিয়ে গেটের দিকে হাঁটতে লাগলেন। শঙ্করবাবুকে ইশারায় শান্ত হতে বলে অবনীবাবু বললেন, “আমরা ঘুরে আসছি।”

জলপাইগুড়ির রাস্তা এখন সুন্মান। দোকানপাট বন্ধ। রাস্তায় কোনও রিকশা নেই। রামচন্দ্র রায় সুটকেস নিয়ে সোজা দিনবাজারের দিকে হেঁটে যাচ্ছেন, তার হাত-পনেরো দূরে অর্জুন। অবনীবাবু জিজ্ঞেস করলেন, “কোথায় যাচ্ছেন বলে মনে হয় আপনার?”

“উনি রোজ রাত্রে বের হতেন। ভোরের আগে ফিরে আসতেন সুটকেস নিয়ে। এ গজ নিজেই করেছেন। কোথায় যেতেন, কী করতেন সেটা পরে খেয়াল করতে পারতেন না।” অর্জুন হাঁটতে-হাঁটতে বলল।

“করলা পার হয়ে রায়কতপাড়ার দিকে যাচ্ছেন।”

“হ্যাঁ, এদিকেই ওঁর বাড়ি।”

“বাড়িতে যাচ্ছেন নাকি?”

“মনে হয় না। এটা উত্তর দিক না?”

“হ্যাঁ, থানার উত্তর দিক।”

অর্জুন বেশ উন্নেজিত হল। মহাদেব সেন যদি ভুল না করে থাকেন, যদি ওই সময়েও ওঁর মস্তিষ্ক ঠিক কাজ করে থাকে তা হলে এতক্ষণে একটা সূত্র পাওয়া যাচ্ছে। গতি উত্তর দিকে। দূরত্ব বেশি নয়। রামচন্দ্র রায় উত্তর দিকেই যাচ্ছেন।

রাজবাড়ি ছাড়িয়ে নিজের বাড়ির সামনে পৌঁছে থমকে দাঁড়ালেন রামচন্দ্র

ରାଯ় । ଦେଖେ ମନେ ହଲ, ତିନି କିଛୁ ଭାବରେନ । ଅବନୀବାବୁ ଜିଜ୍ଞେସ କରଲେନ, “ଏଟାଇ ଓର ବାଡ଼ି ?”

ଅର୍ଜୁନ ଜବାବ ଦିଲ, “ହ୍ୟା । କିନ୍ତୁ ବାଡ଼ିତେ ଆଲୋ ଜୁଲାହେ କେନ ?”

“ଆର କେଉଁ ଥାକେନ ନା ?”

“ନା ।”

“ହୟତୋ ଭଦ୍ରଲୋକ କାଳ ରାତ ଥେକେଇ ଆର ଆଲୋ ନେଭାନନ୍ତି । ଉନି ଆବାର ‘ହାଁଟା ଶୁରୁ’ କରରେନ । ଏହି ବସନ୍ତେ ଏତ ଶକ୍ତି, ଭାବା ଯାଯା ନା ।” ଅବନୀବାବୁ ଆବାର ଅନୁମରଣ ଆରନ୍ତ କରଲେନ । ଅର୍ଜୁନେର ଇଚ୍ଛେ ଛିଲ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଯେର ବାଡ଼ିଟାକେ ଏକବାର ଦେଖେ ଯାଓଯା । କିନ୍ତୁ ସୌଂ ସନ୍ତବ ହଲ ନା । ଜଳପାଇଣ୍ଡି ବାଇପାସେର ରାନ୍ତାଯ ଏସେ ବୋବା ଯାଚିଲ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଯ ଆର ଚଲତେ ପାରରେନ ନା । ଏଥାନେ ରାନ୍ତାର ଆଲୋ ନେଇ । ତାରାଦେର ଶରୀର ଥେକେ ନେମେ ଆସା ଆଲୋଯ ଏଥିନ ଚୋଥ ଅଭ୍ୟନ୍ତ ହେଁବେ । ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଯ ଟଲରେନ । ହଠାତ୍ ଧୂପ କରେ ବସେ ପଡ଼ଲେନ ଏକପାଶେ । ବସାର ସମୟେ ସୁଟକେସଟାର ଦଖଲ ଛାଡ଼େନନ୍ତି । ଅନ୍ତତ ଚାର-ପାଁଚ କିଲୋମିଟାର ପଥ ତିନି ହେଟେଛେ ଭାରୀ ସୁଟକେସ ନିଯେ । ଏହି ବସନ୍ତ ଏଟାଇ ଅସ୍ଥାଭାବିକ ।

ଏକଟୁ ଆପେକ୍ଷା କରେ ଅବନୀବାବୁ ବଲଲେନ, “ଚଲୁନ ଦେଖା ଯାକ ।”

ଓରା ପାଶେ ଏସେ ଦାଁଡ଼ାତେଓ ଭଦ୍ରଲୋକେର ସମ୍ବିଧ ଫିରିଲ ନା । ଅର୍ଜୁନ ସୁଟକେସଟା ବେଶ ସନ୍ତର୍ପଣେ ଓର ହାତ ଥେକେ ସାରିଯେ ନିଯେ ଡାଳା ଖୁଲଲ । ଥାର୍ମୋକୋଲେର ଆଡ଼ାଲ ଥେକେ ଯନ୍ତ୍ରଟା ବେର କରତେ ଚାରଧାର ଆଲୋକିତ ହେଁ ଗେଲ । ଯନ୍ତ୍ରେ ଗହର ଥେକେ ବେରିଯେ ଆସା ସେଇ ଆଲୋ ଏଥିନ ଉତ୍ତରମୁଖୀ । ଅବନୀବାବୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଯେର ନାଡ଼ି ପରିକ୍ଷା କରଲେନ, “ଖୁବ ଚଢ଼ଳ, କିନ୍ତୁ ଭୟରେ କିଛୁ ନେଇ ବଲେ ମନେ ହଚ୍ଛେ । ଭଦ୍ରଲୋକକେ ଫିରିଯେ ନେଓଯା ଦରକାର ।”

ଅର୍ଜୁନ ବଲଲ, “ଉନି ଏଥିନ କ୍ଲାନ୍ଟ ଏବଂ ଆଚନ୍ମ । ଆସୁନ ଓରିକେ ଧରେ ଓଇ ଗାଛଟାର ନିଚେ ଶୁଇଯେ ଦିଇ । ଯଦି ଏଟାକେ ସୁମ ବଲେ ତା ହଲେ କିଛକଣ ଘୁମିଯେ ଥାକୁନ । ଫେରାର ସମୟ ନିଯେ ଯାବ ।”

“ଫେରାର ସମୟ ମାନେ ? ଆପନି କୋଥାଯ ଯାବେନ ?”

“ମହାଦେବ ମେନ ବଲେଛେ ଗତି ଉତ୍ତର, ଦୂରତ୍ବ ବେଶ ନଯ । ଏହି ଆଲୋଟାଓ ଦେଖୁନ ଉତ୍ତର ଦିକଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରରେ । ଯନ୍ତ୍ରଟାକେ ଅନ୍ୟ ମୁଖେ ଘୁରିଯେ ଦିଲେଇ ଆଲୋଟା ଉତ୍ତର ଦିକେ ଯାଓଯାର ଚେଷ୍ଟା କରରେ । ମନେ ହ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଯ ଘୋରେ ମଧ୍ୟେ ପ୍ରତି ରାତ୍ରେ ଏହି ଉତ୍ତର ଦିକେଇ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରତେନ । ଶରୀରେ କ୍ଷମତା ଫୁରିଯେ ଯେତେ ଆର ପାରତେନ ନା, ଭୋର ହଲେ ଏହି ଯନ୍ତ୍ର ଅକେଜୋ ହ୍ୟ ଯାଓଯାଯ ସମ୍ବିଧ ଫିରେ ପେଯେ ଆବାର ବାଡ଼ିର ଦିକେ ହାଁଟିଲେନ । ସୁଟକେସଟାକେ ନେବ ନା, ଯନ୍ତ୍ରଟାକେ ହାତେ ନିଯେ ଉତ୍ତର ଦିକେ ନା ହ୍ୟ କିଛୁଟା ହାଁଟା ଯାକ ।” ଅର୍ଜୁନ ଏଥିନ ବେଶ ସିରିଆସ ।

ଅବନୀବାବୁ ରାଜି ହଲେନ । ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଯକେ ଓରା ରାନ୍ତାର ପାଶେ ଏକଟା ଗାଛେର ମୀଚେ ଶୁଇଯେ ଦିଲେନ । ଯନ୍ତ୍ରଟି ନିଯେ ଆବାର ହାଁଟା ଶୁରୁ କରଲେ ଦେଖା ଗେଲ ଦୂରେ

একটা গাড়ি আসছে । যন্ত্রটির আলো টার্চের আলোর মতো ওদের পথ দেখাচ্ছিল । গাড়িটা কাছে আসতেই অবনীবাবু হাত তুললেন কিন্তু ড্রাইভার বড়ের বেগে বেরিয়ে গেল । অর্জুন বলল, “এরকম ফাঁকা জায়গায় এত রাত্রে আপনাকে ডাকাত বলে মনে করা অস্বাভাবিক নয় ।”

“যা বলেছেন । এখন মনে হচ্ছে জিপটাকে নিয়ে এলে হত ।”

“জিপে চেপে রামচন্দ্রবাবুর পেছনে হাঁটাটা স্বাভাবিক ছিল না ।”

“এখন মশাই আমারই পায়ে ব্যথা শুরু হয়েছে । আমরা কোন দিকে যাচ্ছি ?”

“ডান দিকে তিঙ্গা বিজ, বাঁ দিকে জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন, আলো যাচ্ছে এ-দুটোর মাঝামাঝি সোজা । এই এখন আমাদের গাইড ।”

একটু বাদেই রাস্তা শেষ । পথ এখন ডান এবং বাঁ দিকে চলে গিয়েছে । সোজা যেতে হলে মাঠে নামতে হবে । অর্জুন ইতস্তত করছিল । এই মাঠ হাঁটার পক্ষে নিরাপদ নয় । মাটি নরম । কোনও আল চোখে পড়ছে না । কিন্তু হঠাৎ অবনীবাবু উৎসাহী হলেন, “চলুন, এত দূর যখন এসেছি তখন তিঙ্গা পর্যন্ত যাওয়া যাক ।”

অর্জুন দেখল, আলোটা এককানা বেরোচ্ছিল, এখন একটু কমছে-বাড়ছে । অবনীবাবুও সেটা দেখলেন । বললেন, “চলুন না । তিঙ্গা তো পার হতে পারব না । ওই অবধি গিয়ে না হয় কিরে আসা যাবে ।”

অতএব ওরা মাঠে নামল । আলোয় পা ফেলছে সাবধানে । জুতো বসে যাচ্ছে । অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “আপনি স্পিলবার্গের ইটি দেখেছেন ?”

“নাঃ । পুলিশের চাকরি করে সময় হয় না ।”

“আপনার কথা মানতে পারছি না ।”

“কেন ?”

“আমি অনেক পুলিশ অফিসারের কথা শুনেছি যাঁরা প্রচুর বই পড়েন, ভাল ছবি দ্যাখেন । একজন অধ্যাপকের সঙ্গে চট করে তাঁদের তফাত বোঝা যাবে না ।”

“তাঁরা নিশ্চয়ই অনেক ওপরতলার অফিসার, থানা চালাতে হয় না ।”

নিজের জুতোর অবস্থা দেখে মনে হচ্ছিল, ও দুটো খুলে ফেলতে পারলেই ভাল হত । মাঝামাঠ পেরিয়ে একটা উচু বালির ঢিবিতে উঠতে হল । এবং সেখানে উঠেই ওরা দূরে তিঙ্গা দেখতে পেল । আলোটা এখন দপদপ করছে । জায়গাটা বেশ গরম ।

অবনীবাবু চাপা গলায় বললেন, “হঠাৎ যেন চারধার গুমোট হয়ে গেল ।”

অর্জুনের মনে হল এখনই কিছু ঘটতে যাচ্ছে । ওরা ঢিবি থেকে নেমে নদীর দিকে এগিয়ে চলল । তিঙ্গায় এখন জল নেই । একটি মোটা ধারা মাঝখান দিয়ে বয়ে যাচ্ছে । ওরা বালির চরের পাশে এসে দাঁড়াতে মনে হল নদীর চরে

বালির ওপর যেন কিছু নড়ে বেড়াচ্ছে । অবনীবাবু জিজ্ঞেস করলেন, “দেখতে পেয়েছেন ?”

“হ্যাঁ ।”

“জিনিসটা কী বলুন তো ? শেয়াল ছাড়া তো এখানে কোনও প্রাণী নেই ।” অবনীবাবু বেশ হতাশ গলায় বললেন, “বেরোবার সময় তাড়াহুড়োয় রিভলভার নিয়ে আসার কথা খেয়াল করিনি ।”

অর্জুন এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল । অন্ধকার তিণ্টার চরে যে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাকে এত দূর থেকে ঠাওর করা যাচ্ছে না । যন্ত্রটির আলো এমন স্থিমিত হয়ে এসেছে যে, দুঃহাত দূরেও সেটা পৌঁছচ্ছে না । অবনীবাবু জিজ্ঞেস করলেন, “এগোবেন না ?”

“এখন কটা বাজে ?”

“দুটো ।”

“এখনও ঘন্টা দুয়েক সময় আছে ।”

“মানে ?”

“ভোর না হওয়া পর্যন্ত এই যন্ত্রটি সক্রিয় থাকে ।”

“তা থাকে, কিন্তু তার সঙ্গে এগিয়ে ব্যাপারটা দেখার কী সম্পর্ক ?”

অবনীবাবু প্রশ্নটি করা-মাত্র তিণ্টার চরে আলো জলে উঠল । অদ্ভুত নীল আলো । সঙ্গে-সঙ্গে যন্ত্রটির আলো জোরালো হল । নীল আলোটি চর ছেড়ে ধীরে-ধীরে অর্জুনদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল । অবনীবাবু উত্তেজিত হলেন, “আরে ভাই, ওটা এদিকে আসছে, কী করবেন ?”

অর্জুন বলল, “কিছু করার নেই । বালির ওপরে শুয়ে পড়ুন ।”

কথা শেষ হওয়ামাত্রই অবনীবাবু সাঁষাঙ্গে শুয়ে পড়লেন । নীল আলোটা একটা বিশাল বেলুনের চেহারা নিয়ে এগিয়ে আসছিল । অর্জুন যন্ত্রটিকে মাটিতে রেখে খানিকটা তফাতে উপড় হয়ে শুয়ে পড়ল । নীল আলোর বেলুনটা তখন মাত্র কুড়ি গজ দূরে । সামনে তাকানো যাচ্ছে না । সেই নীল জ্যোতিতে চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে ।

নীল আলোর বেলুনটা ধীরে-ধীরে বালির ওপর নামল । অর্জুন দুঁ হাতে চোখ ঢেকে আঙুলের ফাঁক দিয়ে দেখার চেষ্টা করছিল । তার মনে হল বেলুনের ভেতরে শিস্পাজির মতো একটা কিছু বসে আছে । বেলুন স্থির হলে সেটা ওইরকম ভঙ্গি করে । প্রাণীটির মুখ দেখা যাচ্ছে না আলো পেছনে থাকায়, কিন্তু ওর দুটো কান যে অস্বাভাবিক রকমের বড়, তা বোঝা যাচ্ছে । প্রাণীটি খানিকটা স্থির থেকে আবার পর-পর দু'বার ঝুঁকল । একটু অপেক্ষা করল যেন । অর্জুন বুঝতে পারছিল না এমন ক্ষেত্রে কী করা উচিত ! এবার প্রাণীটির হাতে কিছু একটা জলে উঠল যার আলোর রেখা সোজা এগিয়ে এল যন্ত্রটির গায়ে ।

অর্জুন দেখল আলোটা বারংবার যন্ত্রের গায়ে লেগে পেছনে যাচ্ছে। যেন প্রাণীটি মরিয়া হয়ে যন্ত্রটিকে সচল করতে চাইছে অথচ যন্ত্রটি সাড়া দিচ্ছে না। প্রায় মিনিট দশকে ধরে এইরকম চলার পরে প্রাণীটি আবার বেলুনের মধ্যে ফিরে গেল। এবং সেইসময় অর্জুন পরিষ্কার সিগন্যালিং সাউন্ড শুনতে পেল। পাশ থেকে অবনীবাবু বলে উঠলেন, “শুনতে পাচ্ছেন?”

অর্জুন চাপা গলায় বলল, “হ্যাঁ।”

“তা হলে কি আমরাও?”

“না। এটা অনুভূতিতে নয়, পরিষ্কার কানে শুনেছি। ও বেলুনে ফিরে গিয়ে শব্দটা করছে যন্ত্রটিকে সচল করতে।” অর্জুন বলল।

কিন্তু প্রাণীটির সব চেষ্টা বিফলে গেল। যন্ত্রটি আগের মতোই পড়ে রইল।

এইবার সেই প্রাণীটি যেন মরিয়া হয়ে নীল আলোর বেলুন থেকে বেরিয়ে এল। অর্জুন দেখল, ওটা এদিকে এগিয়ে আসছে। যন্ত্রটির সামনে যখন ওটা পৌঁছে গেছে তখন স্পষ্ট দেখতে পেল। প্রাণীটির শরীরে কোনও লোম নেই। স্পিলবার্গের ছবির মতো বেঁটেখাটো চেহারা, কান দুটো অসম্ভব বড়। মুখের আদল চৌকো, নাক, চোখ, ঠোঁট বোঝা যাচ্ছে না। প্রাণীটি যন্ত্রটিকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে যেন খুব হতাশ হল। তারপর সেটিকে শায়িত অর্জুনের সামনে বালিতে রেখে হাত রাখল সেই জায়গায়, যেখান থেকে কিছু খুলে নেওয়া হয়েছে বলে মহাদেব সেন মন্তব্য করেছেন। অর্জুন হতভঙ্গের মতো উঠে বসল। ওর মনে হল প্রাণীটি তাকে জিজেস করছে যন্ত্রের বাকি অংশ কোথায় গেল? তার উভয় দেওয়া দরকার।

সে মাথা নাড়ল। নাড়তেই প্রাণীটিও মাথা নাড়ল। অর্জুন দু'পাশে নেড়েছিল, প্রাণীটি ওপর-নীচে। অর্থাৎ, অর্জুনের কথা সে বিশ্বাস করেনি।

অর্জুন এবার পরিষ্কার বলল, “আমি কিছুই জানি না।”

প্রাণীটি স্থির হয়ে রইল। তারপর দু' হাতে মুখ ঢাকল।

এই সময় অর্জুনের কানে এল অবনীবাবু বলছেন, “ধরে ফেলুন মশাই। জাম্প, জাম্প।”

অর্জুন কিছু বলার আগে প্রাণীটি হাত সরিয়ে প্রসারিত করতেই অবনীবাবু কোঁক করে একটা শব্দ তুলে স্থির হয়ে গেলেন।

প্রাণীটি এবার অর্জুনের মুখোমুখি হল। তার হাত একবার যন্ত্রে আর-একবার নিজের বুকে ঘুরে আকাশটাকে দেখাতে লাগল। করেকবার এমন দেখানোর পর অর্জুন বলল, “এই যন্ত্রটা সম্পূর্ণ হলে তুমি আকাশে যেতে পারবে?”

প্রাণীটি স্থির হয়ে রইল খানিক। তারপর আবার একই ভঙ্গি করতে লাগল।

অর্জুন বলল, “বুঝতে পেরেছি। এই যন্ত্রটাকে সম্পূর্ণভাবে পাওয়া দরকার, তাই তো?” বলার সময় ওর হাতও নড়েছিল।

প্রাণীটি এবার যেন খুশি হল। এই খুশির প্রকাশ বোঝা গেল ওর দুটো হাত পরম্পরকে আঘাত করে করতাটাকে মতো আওয়াজ তোলাতে। যন্ত্রটাকে অর্জুনের দিকে সরিয়ে দিয়ে সে তিস্তার চর হাত তুলে দেখাল।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “বুঝতেই পারছি তুমি গ্রাহন্তরের প্রাণী। কোন গ্রহ?”

প্রাণীটি মাথা গুঁজে রইল।

“তুমি পৃথিবীতে কেন এসেছিলে?”

প্রাণীটি এরও জবাব দিল না। অর্জুনের মনে হল বাংলা ভাষাটাকে ও রপ্ত করতে পারেনি। মজা করার জন্যে সে বাংলা স্বরবর্ণ এবং ব্যঞ্জনবর্ণের সবকটা অক্ষর আবৃত্তির ভঙ্গিতে আওড়ে গেল। সেই সময় প্রাণীটির কান খাড়া হয়ে উঠল। অর্জুন শেষ করতেই প্রাণীটি স্বরবর্ণ এবং ব্যঞ্জনবর্ণগুলো পর-পর উচ্চারণ করে গেল। যেন অর্জুন ওগুলো টেপ রেকর্ড করেছিল, এবার বাজানো হচ্ছে।

অর্জুন বলল, “এগুলো বাংলা অক্ষর। এর ওপরে আমাদের ভাষা দাঁড়িয়ে।”

“অনেক ধন্যবাদ।” অর্জুন স্পষ্ট শুনতে পেয়ে হতভুমি হয়ে গেল, “আপনি আমাদের ভাষা এর মধ্যেই শিখে গেলেন?”

“খুব সহজ ভাষা।”

“আমার শুনতে ভাল লাগল। কিন্তু শুঁকে আপনি কী করলেন?”

“তখন আপনার ভাষা আমি জানতাম না। ওঁর কথা থেকে মনে হয়েছিল মতলব ভাল নয়। কিছুক্ষণ বাদে ঠিক হয়ে যাবেন।”

“আমি বুঝতে পেরেছি এই যন্ত্রটা কাজ করছে না ঠিকভাবে, তাই তো?”

“হ্যাঁ। এর সঙ্গে আর-একটা অংশ ছিল। ওটা না পেলে আমি এই গ্রহের আবর্ত ছেড়ে বেরোতে পারব না। আমার হাতে বেশি সময় নেই।”

“আপনি এখানে এসেছিলেন কেন?”

প্রাণীটি হাত নাড়ল এমনভাবে, যাতে বোঝা গেল সে উত্তর দেবে না। তারপর বলল, “আমি একটা জলের ধারের শহরে নেমেছিলাম। কৌতুহল হয়েছিল। ফিরে যাওয়ার সময় আকাশে উঠে আবিক্ষা করলাম ওটা আমার সঙ্গে নেই। তারপর থেকে আমি খবর পাঠাতাম, ওটা তা গ্রহণ করত। কিন্তু আমাকে ফিরিয়ে দিত না। সেই জলের ধারের শহর থেকে শেষপর্যন্ত ওকে অনুসরণ করে এখানে আমাকেও আসতে হল। তোমাকে খারাপ বলে মনে হচ্ছে না। ওর বাকি অংশটি পেতে তুমি আমাকে সাহায্য করবে?”

“নিশ্চয়ই। আমার সন্দেহ হচ্ছে কার্ভালো নামের একটি লোক সেটা নিয়ে অসমে গিয়েছে। লোকটা না ফেরা পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।”

“কিন্তু আমার সময় নেই। এর মধ্যে আমার সন্ধান শুরু হয়ে গেছে। অসম

কোথায় ?”

“অনেক দূরে । অবশ্য আমাদের হিসেবে ।”

“আমি তোমাকে নিয়ে যেতে পারি ।”

“কিন্তু কার্ভালোকে আমি চিনি না, যে চেনে তাকে নিয়ে আসতে হবে ।”

“আনো । রোজ রাত্রে আমি এই যন্ত্রটাকে চালু করার চেষ্টা করতাম । কিন্তু একই সঙ্গে অন্য যন্ত্র সাড়া দিত । ফলে আমি কিছুই বুৰাতে পারছিলাম না ।”

“ওহে, সেটা অন্য যন্ত্র নয় । আমাদের শহরে দু'জন মানুষ আপনার পাঠানো শব্দ শুনতে পেত । কিন্তু আমরা প্রেতাম না । এটা কী করে সম্ভব ?”

“আমি জানি না । হয়তো ওদের মস্তিক্ষের গঠন এই যন্ত্রটির মতো ।”

“দু'জনের দু'রকম অসুখ ছিল । আপনার এই যন্ত্রের সঙ্গে থেকে সেই অসুখগুলো কমে গিয়েছিল । কিন্তু দিন বাড়তেই আবার সেগুলো ফিরে আসে ।”

“স্বাভাবিক । ওরা শুধু যন্ত্রটার প্রভাবে পড়েছিল । ওদের এখানে নিয়ে এলে ভাল কাজ হত । তুমি ভাল লোক, আমার উপকার করো । কাল রাত্রে এখানে এসো ওই যন্ত্রটাকে সম্পূর্ণ করে । আজ চলি ।”

অর্জুন দেখল অন্তুদর্শন প্রাণীটি সেই নীল বেলুনের মতো জিনিসটায় ফিরে গেল । বেলুন ধীরে-ধীরে আকাশে উঠে গেল । তারপর চোখের বাইরে । অর্জুন হতভম্বের মতো বসে রইল কিছুক্ষণ । এইমাত্র যে ঘটনা ঘটে গেল তা শুনলে যে কোনও মানুষ তাকে পাগল বলবে ।

তোর হয়ে আসছে । সে উঠে অবনীবাবুর পাশে গিয়ে কয়েকবার ডাকলেও তিনি সাড়া দিতে একটু দেরি করলেন । জামার বোতাম খুলে দিয়ে অর্জুন বসিয়ে দিতে চেষ্টা করল । অবনীবাবুর ঘূম ভাঙ্গছিল না । অন্ধকার নদীর চরে নামল সে । পুবের আকাশ ইতিমধ্যেই লালচে ছোপ মাথছে । অর্জুন দেখল, তিঙ্গির চরে কোনও প্রাণীর অস্তিত্ব নেই । একটু আগে যে কিছু আবছা দেখছিল, তা যেন এখন উঁধাও হয়ে গিয়েছে । সুন্মান বালির চরে এখন হাওয়ারা উওল । অনেকটা হাঁটার পরে সে জলের কাছে পৌঁছল । কোনও পাত্র নেই, পকেট থেকে রুমাল বের করে ভাল করে ভিজিয়ে সে দ্রুত ফিরে এল অবনীবাবুর কাছে । এই সময় শেয়াল ডেকে উঠল । এতক্ষণ শিয়ালগুলো কোথায় ছিল ?

অবনীবাবুর সম্বিধি ঠিকমতো ফিরতে আকাশে যেন আলোর জলসা বসে গেছে । কত রং আর রঙের মিশেল । এখন আর অন্ধকার নেই । অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “আপনি হাঁটতে পারবেন ?”

নিজের এই অবস্থার জন্যে বেশ লজ্জিত অবনীবাবু বললেন, “হ্যা, তা পারব ।”

ওঁকে কোনওমতে ধরে-ধরে তিঙ্গি নিয়ে আসতেই অর্জুন

একটা টেম্পো পেয়ে গেল। এই ভোরে টেম্পোটা ময়নাগুড়ি থেকে জলপাইগুড়ির দিকে যাচ্ছে। হাত দেখাতেই সেটা দাঁড়িয়ে গেল। অবনীবাবুকে ড্রাইভারের পাশে বসিয়ে অর্জুন পেছনে উঠল। ড্রাইভার যেই বুঝল তার পাশে দারোগা বসেছে তখনই খুব সিরিয়াস ভঙ্গিতে চালাতে লাগল।

সারাবাত জেগে এ এক অস্তুত অভিজ্ঞতা ! গত রাত্রেও জাগতে হয়েছিল। তখন একটা প্রায়-ভুতুড়ে ব্যাপার ছিল। কিন্তু আজ ? সাইন্স্যান্স ফিল্ড ছবি বা গল্পকে লোকে ফ্যান্টাসি বলে। আজকের এই অভিজ্ঞতার কথা সবাইকে জানালে কী শুনতে হবে ? ওই প্রাণীটি, যদিও প্রাণী বলতে এখন একটু অস্বস্তি হচ্ছে অর্জুনের, মানুষকে আমরা সরাসরি প্রাণী বলে সঙ্গেধন করি না যখন, তখন মানুষের চেয়ে উন্নত শ্রেণীকে কি প্রাণী বলা উচিত ? উন্নত যে, তা হাড়ে-হাড়ে প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু ওর জন্যে এক ধরনের কষ্ট হচ্ছিল। বারংবার বলছিল যে, ওর বেশি সময় নেই। দলছাড়া, দেশছাড়া হয়ে পৃথিবীর আকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওই যন্ত্রটি সম্পূর্ণ না পেলে কোনওদিন ফিরতে পারবে না ও ! অর্জুন হাতে-ধরা যন্ত্রটির দিকে তাকাল। অন্ধকার চলে যাওয়ামাত্র এটি আবার নিশ্চল হয়ে গিয়েছে। কোনও আলো জুলছে না।

রামচন্দ্র রায়কে যেখানে শুইয়ে রেখে এসেছিল সেখানে পৌঁছে টেম্পো থামাতে বলল অর্জুন। নীচে নেহ্নে চারপাশে দেখল। ভদ্রলোক কোথাও নেই। এমনকী ওই সুটকেস্টাকেও চোখে পড়ছে না। অবনীবাবু এখন অনেকটা সুস্থ। তিনিও নামলেন, “গেলেন কোথায় ভদ্রলোক ?”

“বোধ হয় ঘূর্ম ভাঙার পর বাড়ি ফিরে গেছেন !” অর্জুন বলল।

“অর্জুনবাবু !” হঠাতে অবনীবাবুর গলা অন্যরকম শোনাল।

“বলুন !”

“আপনাকে একটা অনুরোধ করতে পারি ?”

“নিশ্চয়ই !”

“গতরাত্রের কথা কাউকে বলবেন না। আমি যে কী করে এমন একটা স্বপ্ন দেখে শরীর খারাপ করে ফেললাম, তা এখন মাথায় চুকছে না। ওপরওয়ালারা জানতে পারলে আমার সার্ভিস বুকে নেট দেবে। মাথাটা এখনও বিমর্শিম করছে।”

“আপনার মনে হচ্ছে আপনি স্বপ্ন দেখেছেন ?”

“তা ছাড়া আর কী ! নীল আলো, অস্তুত জীব, হাত নাড়ল আর আমার জ্ঞান নেই ?”

“ঠিকই। কিন্তু এটাকে আপনার স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে কেন ?”

“তার মানে ? আপনি কি বলতে চান এগুলো সত্য ঘটেছে ?”

“সত্য না হলে আপনি অসুস্থ হলেন কী করে ?”

“ও ! ওই জীবটি আমাকে আহত করেছে ?”

“হঁ।”

“কেন? আমার কথা ও বুঝতে পেরেছিল নাকি?”

“অনুমান করেছিল। আপনার গলার স্বরে ও অনুমান করেছিল আপনি আক্রমণ করতে বলছেন।”

“বিশ্বাস করতে পারছি না। আর হাত নাড়তেই আমি পড়ে গেলাম। শুলি করল না, ছুরি মারল না অথচ আহত হলাম। কিন্তু এখন কোনও চিহ্ন নেই শরীরে।”

“আপনাকে নিঃসাড় করে দিয়েছিল।”

“জীবটি সম্পর্কে আপনার কী ধারণা?”

“আমাদের পৃথিবীর কেউ নয়। আমরা ওর মতো উন্নত নই।”

“আপনার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে।”

অর্জুন কথাটা শুনে হাসল, “আচ্ছা অবনীবাবু, আপনাকে যদি জাপানি ভাষার অ্যালফাবেটগুলো কেউ একবার শোনায় তা হলে তৎক্ষণাৎ আপনি জাপানি বলতে পারবেন?”

“দূর! তা কি সম্ভব?”

“আমার মুখে বাংলা অক্ষরগুলো শুনেই ও পরিষ্কার বাংলা বলতে পেরেছে। উন্নত না হলে পারত না। চলুন, ফেরা যাক।” অর্জুন টেম্পের দিকে এগোল।

“দাঁড়ান ভাই। আপনি বলছেন আমরা গ্রাহাস্তরের জীবের দেখা পেয়েছিলাম? ওই যন্ত্রটির সঙ্গে গ্রাহাস্তরের জীবের সম্পর্ক আছে? ও যে সিগন্যাল পাঠাত তা মহাদেব সেন আর রামচন্দ্র রায় শুনতে পেতেন? সেই সিগন্যাল পাঠিয়ে ও তাঁদের প্রায় উন্মাদ করে দিত? আপনি বলছেন এসব সত্য?” অবনীবাবু উন্তেজিত হলেন।

“এরা কেন উন্মাদের মতো আচরণ করতেন তা আমি জানি না, কিন্তু বাকিগুলি সত্য।”

অর্জুনের কথা শুনে আকাশে হাত ছুড়লেন অবনীবাবু, “মাই গড! এ কথা ঘোষণা করলে পৃথিবীর সব সাংবাদিক আমাদের কাছে পৌঁছে যাবে।”

অর্জুন ফিরে দাঁড়াল, “এখনই এটা আমরা ঘোষণা করব না।”

“কেন?” অবনীবাবু অবাক।

“কারণ, আপনার ওপরওয়ালারা আপনাকে সুস্থ নাও ভাবতে পারেন। আপনি যে-কথা বলবেন তার স্বপক্ষে তো কোনও প্রমাণ দিতে পারবেন না।”

হঠাৎ যেন বুঝতে পারলেন ভদ্রলোক, “ও, হঁ, তাই তো? কোনও প্রমাণ নেই। ইস, কাল যদি রিভলভারটাকে সঙ্গে নিয়ে বের হতাম। জানেন, আমি ভাল করে ওর মুখটাকে দেখিনি।”

“ভাল করেছেন। এখন মুখ বন্ধ রাখুন। চলুন।”

দেড় কিলোমিটার পথ আসার পর অবনীবাবু চিৎকার করলেন ড্রাইভারের পাশে বসে, “অর্জুনবাবু, দেখতে পাচ্ছেন? সুটকেসটা নিয়ে ভদ্রলোক হেঁটে ফিরছেন। দাঁড়াও, দাঁড়াও।”

টেম্পো রামচন্দ্র রায়ের পাশে গিয়ে থামল। অর্জুন দেখল ভদ্রলোক বেশ খতমত হয়ে গেলেন। অন্যায় ধরা পড়ে গেলে মানুষের মুখের অবস্থা যেমন হয়। কিন্তু সেটা কাটিয়ে উঠলেন চটপট, “আপনারা? এই ভোরে কোথেকে আসছেন?”

অবনীবাবু কিছু বলার আগেই অর্জুন বলল, “একটু কাজে গিয়েছিলাম। আপনি?”

রামচন্দ্র রায় হাসলেন, “মর্নিং ওয়াকে বেরিয়েছিলাম। অনেক দিনের অভ্যেস।”

“জাহাজে যখন চাকরি করতেন তখন কী করতেন?”

সঙ্গে-সঙ্গে যেন নিজের জায়গা পেয়ে গেলেন ভদ্রলোক, “আর বলবেন না, ডেকে পায়চারি করতাম। জাহাজের এ-মাথা থেকে ও-মাথা হাঁটাম।”

অবনীবাবু চুপচাপ শুনছিলেন, “আপনার হাতে ওটা কী?”

“হাতে? ও, সুটকেস।”

“সুটকেস হাতে আপনি মর্নিং ওয়াক করেন বুঝি?”

“এটা!” ভদ্রলোক বিচলিত হলেন, “অনেকেই বলেন। কিন্তু নেওয়ার সময় খেয়াল থাকে না।”

অর্জুন বলল, “উঠে আসুন। আপনাকে নামিয়ে দিয়ে যাচ্ছি।”

“না, না, এটুকুই তো পথ, ঠিক চলে যাব।”

“আপনার বাড়ির সামনে দিয়েই তো যেতে হবে আমাদের। আসুন।”
অবনীবাবু ওপরে উঠে এসে রামচন্দ্র রায়কে ড্রাইভারের পাশের আসন ছেড়ে দিলেন।

টেম্পো চললে অবনীবাবু বললেন, “কীরকম মিথ্যে কথা বললেন, অঁয়া?”

“মিথ্যে কথা, কিন্তু না জেনে বলেছেন। কাল রাত্রে কেখায় ছিলেন তা ওঁর খেয়ালই নেই।”

“তাই নাকি?”

“আমার তাই বিশ্বাস। উনি যখন হেঁটে গিয়েছিলেন তখনও জানতেন না কোথায় যাচ্ছেন।”

“নিশির ডাকে লোকে হেঁটে যায় শুনেছি।”

“এ-ও সেরকম।”

রামচন্দ্র রায়ের বাড়ির সামনে টেম্পো থামলে তিনি নামলেন। অর্জুন বলল, ‘আপনি সুটকেসটাকে বাড়িতে নিয়ে নিয়ে রাখুন।’

রামচন্দ্রবাবু বললেন, ‘কিন্তু সুটকেসটাকে খুব হালকা লাগছে।’

“কারণ যন্ত্রটা আমার সঙ্গে আছে। এই দেখুন।”

রামচন্দ্র রায় তাজব হয়ে গেলেন, “কী ব্যাপার বলুন তো ?”

“আপনার কিছুই মনে পড়ছে না ?”

“একদম না।”

“এক কাপ চা খাওয়ালে ভেতরে গিয়ে আপনাকে সব বলতে পারি।”

“নিশ্চয়ই। আসুন, আসুন।”

অবনীবাবু বললেন, “আমাকে বাদ দিতে হবে। কাল রাত থেকে থানার বাইরে আছি। এর মধ্যে কোথাও কিছু হয়ে গেলে শক্রের পক্ষে সামলান্তে মুশকিল হবে। আপনি চা খান, আমি চলি।”

অর্জুন মাথা নেড়ে নেমে পড়ল টেম্পো থেকে। যন্ত্রটাকে দিতে বলল সে।

অবনীবাবু বললেন, “টার তো থানায় থাকা উচিত।”

“মালিক না পাওয়া গেলে থানায় থাকা উচিত। মনে হচ্ছে মালিকের সঙ্কান পাওয়া গেছে। অবশ্য আপনার যদি দিতে আপত্তি থাকে—।” অর্জুন হাসল।

“মানে, আর কিছু নয়, আমি ওপরওয়ালাকে যন্ত্রটার কথা জানিয়েছি তো ! ফট করে কেউ যদি চলে আসে তখন অপ্রস্তুত হব। আপনার যদি তেমন দরকার না থাকে তা হলে আমি ভট্টে রেখে দিতে পারি। আর দরকার হলে না হয় চলে আসবেন।”

অর্জুন মাথা নেড়ে বলল, “ঠিক আছে।”

টেম্পো বেরিয়ে গেল।

রামচন্দ্র রায় বললেন, “পুলিশেরা কাউকে বিশ্বাস করে না, না ?”

অর্জুন বলল, “নিরাপদে রাখাই তো ভাল। যাক গে, আপনার মাথার পেছনে, জামায় প্রচুর ঘাসের টুকরো লেগে আছে। রাত্রে ঘুমিয়েছিলেন কোথায় ?”

নিজের শরীরে হাত বোলাতে-বোলাতে ভদ্রলোক বোকার মতো তাকালেন। অর্জুন হেসে বলল, “চলুন ভেতরে যাই। এক কাপ চা খেয়েই চলে যাব। এখন ঘূর্ম দরকার।”

রামচন্দ্র রায় বাড়ির দরজার কাছে গিয়ে পকেট থেকে চাবি বের করতে গিয়ে থমকে গেলেন, “আরে, তালা দেওয়া নেই ?”

অর্জুন দেখল, তালাটা একটা কড়ায় ঝুলছে বন্ধ অবস্থায়, দুটো কড়াকে আটকায়নি। সে দরজা ঠেলল। দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “আপনি তালা দিয়েছিলেন ?”

“না দিয়ে বের হব কেন ?”

“কখন বেরিয়েছিলেন ?”

“কখন ? মনে পড়ছে না।”

“আপনি বিকেলে বেরিয়েছিলেন। তারপর আর বাড়িতে ফেরেননি। কাল রাত্রে বাইপাসের পাশে একটা গাছের তলায় ঘুমিয়েছিলেন। এসব আমরা জানি। তাই বিকেলে বেরোবার সময় তালা দেননি। তাড়াছড়োয় বেরিয়ে গিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, ঘরের সব আলো জ্বলে রেখে গিয়েছিলেন। দিনের বেলাতেও আলো জ্বলছিল। তাঁর কারণ কাল রাত্রে আপনার মাথায় ওগুলো নেভানোর কথা দেকেনি।”

“তাই যদি হয়, ভেতর থেকে বন্ধ কেন?”

“আর কোনও দরজা আছে?”

“না, একটাই দরজা। ভেতরে উঠোনের পাশে পাঁচিল।”

অর্জুন এবার দরজায় ধাক্কা দিতে লাগল। এই সময় পাশের বাড়ির এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন, “এই যে মিস্টার রায়, সারারাত কোথায় ছিলেন?”

“এই একটু...।” রামচন্দ্রবাবু উত্তর খুঁজে পেলেন না।

“আবার সেই সুটকেস! যাক গে, কাল ঘরদোর খোলা রেখে চলে গিয়েছিলেন? চুরি হয়ে যেতে পারত মশাই। সঙ্গের পর আপনার বন্ধু এসে দেখেন সব খোলা। তখন তিনি বলাতে আমরা জানতে পারি।” ভদ্রলোক বললেন।

“বন্ধু? কোন বন্ধু?” রামচন্দ্র রায় হতভস্ব।

“তা জানি না। একদিন দেখেছিলাম আপনার সঙ্গে এই বাড়িতে। রাত্রে কিছু খেলেন না তিনি। ওঁকেই বলেছিলাম ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়তে। মনে হয় একটু নেশাটেশা করেন, তাই ঘুম ভাঙতে দেরি হচ্ছে। আওয়াজ করুন।” ভদ্রলোক চলে গেলেন। রামচন্দ্র রায় বললেন, “যাচ্ছলে! কে এসে ঘুমোচ্ছে এখানে?”

বিস্তর শব্দ করার পর ভেতরে মানুষের সাড়া পাওয়া গেল।

দরজাটা খুলছে। অর্জুন দেখল খুব রোগাপটকা একটি মানুষ ঘুমচোখে দাঁড়িয়ে। সঙ্গে-সঙ্গে রামচন্দ্র রায় চেঁচিয়ে উঠলেন। উনি যে ভাষায় কথা বললেন তা অর্জুনের বোধগম্য হল না। লোকটাও হাঁ-হাঁ করে উঠল। দুঁজনে নিজেদের উত্তেজনা করতে কিছুক্ষণ সময় নিল। এবার রামচন্দ্রবাবু অর্জুনের দিকে ফিরলেন, “এই ব্যাটাই হল কার্ভালো। কাল সঙ্গেবেলায় অসম থেকে ফিরেছে।”

অর্জুন হাত বাড়াল, “পরিচয় পেয়ে খুশি হলাম।”

ভদ্রলোক হাত মেলালেন, “আমিও।”

রামচন্দ্র রায়ের চেহারাই যেন পালটে গিয়েছে। তিনি বাড়িতে চুকে হইহই করতে লাগলেন। তিনি যে মাঝে-মাঝে কার্ভালোর মাত্তভাষায় কথা বলছেন তাও অর্জুনকে বলে ফেললেন। মুখে জলটল দিয়ে চা পেতে মিনিট কুড়ি লাগল। চায়ে চুমুক দিয়ে চেয়ারে বসে অর্জুন কার্ভালোকে বলল, “আপনার

ফিরতে খুব দেরি হয়ে গেল, তাই না ?”

“হ্যাঁ। দেরি হয়ে গেল।” কার্ভালোর গলার স্বর খুব মিহি।

“আগে তো জাহাজে কাজ করতেন, এখন কী, ব্যবসা ?”

“আঁঁ, হ্যাঁ, ওইরকমই। বয়স হচ্ছে আর কি তেমন পারি !” এবং এতক্ষণে কার্ভালোর খেয়াল হল, “রায়, আমার সুটকেসটা নিয়ে তুমি কোথায় গিয়েছিলে ?”

“সুটকেস ? ওটা একটা শয়তান। শয়তান রেখে গিয়েছিলে তুমি আমার কাছে। জাহাজে চাকরি করার সময় আমাকে যেমন জ্বালাতে, এখনও তাই করছ !” প্রচণ্ড রেগে গেলেন ভদ্রলোক।

কার্ভালো অবাক, “কেন, কী হয়েছে ?”

“কী হয়েছে তুমি জানো না ?”

“কী করে জানব ? আমি কি এখানে ছিলাম ?”

“ওই যন্ত্রটার কথা তুমি জান না ? থার্মোকিলের ভেতর যেটা প্যাক করে রেখেছিলে ?”

“কেন, যন্ত্রটা কী করেছে ?”

“কী করেছে ? আবার প্রশ্ন করছ ?”

“বিশ্বাস করো, আমি কিছু বুঝতে পারছি না।”

“রোজ সঙ্কেবেলায় আমার কানে বিপ্প বিপ্প শব্দ বাজত। রাত যত বাড়ত শব্দটাও বেড়ে যেত। তারপর একসময় কানে তালা লাগার উপক্রম। তখন আর কিছু খেয়াল থাকত না। সারারাত কী করতাম আমি জানি না। তখন মানুষ খুন করে ফেললেও টের পেতাম না। বুঝতে পারছ। রোজ হত, রোজ।”

“শুধু তোমাকেই ওটা এমন করত ?”

“হ্যাঁ। আর কাউকে নয়। অর্জুনকেও নয়। না, পরে আর একজনকে করেছিল।”

“স্ট্রেঞ্জ। যন্ত্রটা কোথায় ?”

“পুলিশের কাছে।”

“পুলিশ ?” চমকে উঠল কার্ভালো, “পুলিশ এর মধ্যে এল কী করে ?”

“আসবে না ? আমিই গিয়ে বলেছি ওই যন্ত্রটার মালিক তুমি। পুলিশ তোমাকে খুঁজছে।” কার্ভালোকে এবার খুবই নার্ভাস দেখাচ্ছিল। সে সুটকেসটার দিকে তাকাচ্ছিল বারংবার।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “আপনি যন্ত্রটা কোথায় পেলেন ?”

“আমি পেলাম, মানে ?”

“যন্ত্রটা আপনার সুটকেসে ছিল।”

“হ্যাঁ ছিল। কিন্তু তার মানে এই নয় আমি পেয়েছি।”

“কিন্তু ওটা এমনি-এমনি আপনার সুটকেসে চুকে পড়তে পারে না । ”

প্রশ্ন শুনে কার্ভালো প্রথমে গোঁজ হয়ে রইল ।

রামচন্দ্র রায় বললেন, “কার্ভালো, তুমি কি কোনও গোলমালে পড়েছ ? ”

কার্ভালো মাথা নাড়ল, “হ্যাঁ ভাই । পড়েছি । কিন্তু সত্যি কথা বললে কি তোমার বিশ্বাস করবে ? ”

“আমরা এতদিন একসঙ্গে কাজ করেছি, তখনও মিথ্যে কথা বলিনি কেউ, আজ কেন তুমি বলতে যাবে ? ” রামচন্দ্র রায় খুবই আন্তরিক গলায় কথাশুলো বললেন ।

কার্ভালো অর্জুনের দিকে তাকাল, “সারাজীবন যা রোজগার করেছি তা হেসেখেলে উড়িয়ে দিয়েছি । সঞ্চয় বলতে তেমন কিছুই ছিল না । ইদানীং বেশ অর্থকষ্টে দিন যাচ্ছিল । এই বয়সে নতুন করে কাজকর্ম শুরু করা খুবই মুশকিল । আপনি হয়তো জানেন না আমি সমুদ্রের ধারের মানুষ । সমুদ্র ও দিকের বেশ কিছু মানুষকে অন্ন দেয় । অবশ্যই সেটা বেআইনি পথে । যা কিছু বিদেশি জিনিস রাতের অঙ্ককারে সমুদ্রপথে আমাদের ওখানে আসত তাই বয়ে নিয়ে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছে দেওয়ার জন্যে গরিব মানুষেরা টাকা পেত । কিছুই না পেয়ে শেষপর্যন্ত আমি ওই বয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ করব বলে স্থির করলাম । ”

কার্ভালো থামতেই রামচন্দ্র রায় চিৎকার করে উঠলেন, “ছি ছি ছি । কার্ভালো, তুমি শেষপর্যন্ত স্মাগলারদের দলে ভিড়েছ ? ”

“ভিড়িনি । চাইলেই যে ওরা আমাকে কাজ দেবে ভাবছ কেন ? ওরা আমাকে প্রথমে যাচাই করবে, আমার সঙ্গে পুলিশের সম্পর্ক আছে কি না জানতে চাইবে । তা ছাড়া ঠিক কাকে বললে কাজটা পাওয়া যায় তাও জানতাম না । রাত্রে সমুদ্রের ধারে কেউ যেত না । আমাদের ওখানে প্রবাদ আছে তোমার যদি সমস্যাহীনতার কষ্ট বেশি হয় তা হলে মাঝরাত্রে সমুদ্রের ধারে গিয়ে দাঁড়াও । একরাত্রে আমি গেলাম । এলোমেলো ঘুরলাম । হঠাৎ শুনি একটা লোক যন্ত্রণায় কাতরাছে বালির দিবির আড়ালে । কৌতুহলী হয়ে কাছে যেতেই সে আমাকে গুলি করতে চাইল । আমি তাকে বললাম, ‘আপনার যন্ত্রণা শুনে এসেছি, আমার অন্য মতলব নেই । দয়া করে আমাকে মারবেন না । ’ নিজের পরিচয় দিতে হল । কাছাকাছি আমার বাড়ি শুনে সে জিজ্ঞেস করল আমি তাকে-সাহায্য করতে পারি কি না ! আমি রাজি হলাম । আমার শরীরের ওপর ভর দিয়ে লোকটা কোনওমতে বাড়িতে এল । দেখলাম ওর পায়ে ক্ষতচিহ্ন । সন্তুষ্ট গুলি লেগেছে । কিছুতেই সে সেটা বলল না । লোকটার নাম হেম বড়ুয়া, বাড়ি শুয়াহাটির কাছে । ” কার্ভালো থামল ।

“আপনি হেম বড়ুয়ার কাছে গিয়েছিলেন ? ” অর্জুন জিজ্ঞেস করল ।

“হ্যাঁ । সেটা পরে বলছি । হেম কিছুতেই ডাঙ্কার ডাকতে দেবে না । তার

ধারণা ডাক্তার ফিরে গিয়ে পুলিশকে খবর দেবেই। অথচ ক্ষতর চেহারা খুব খারাপ দেখাচ্ছিল। আমার বাড়িতে আসার সময় ও একটা বড় থলি এনেছিল। থলিটাকে ও ছুঁতে দিত না। দ্বিতীয় দিনে হেমের জ্বর এল। আমার পরিচিত এক ডাক্তারকে ডেকে আনতে বাধ্য হলাম। তিনি দেখে বললেন, তখনই হাসপাতালে নিয়ে যেতে। নইলে পা বাঁচানো যাবে না। কিন্তু হেম কিছুতেই হাসপাতালে যাবে না। ডাক্তার সাধারণ ওষুধ দিয়ে আমাকে আড়ালে বলে গেল এমন রোগীকে যেন বাড়িতে না রাখি। সেই রাত্রে আমার সামনে হেম ওই যন্ত্রটাকে থলি থেকে বের করল। করে বলল, ‘এটা কী ধাতু দিয়ে তৈরি জানো?’

বললাম, ‘না।’

সে বলল, ‘তুমি মানুষটা খারাপ নয় তাই বলা যায়। পৃথিবীর সবচেয়ে দামি ধাতু এটা। বিক্রি করলে কোটি টাকা’ পাওয়া যাবে।’

জানতে চাইলাম, ‘জিনিসটা কী?’

‘এর জন্যেই তো গুলিটা লাগল। তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার ঘট্টতিমেক আগে আমি একটা জিনিস নিতে সমুদ্রে এসেছিলাম। মাইকেলের নাম শনেছে? এ-তল্লাটের এখন ওই সেরা স্নাগলার। মাইকেলের সঙ্গেই কাজ ছিল। আমি আর মাইকেল যখন কথা বলছি তখন হঠাতে আকাশে নীল আলোর বেলুন দেখতে পেলাম। বেলুনটা নীচে নামল। আমাদের থেকে একশো গজ দূরে। কিছু একটা বেলুন থেকে বেরিয়ে এল। মাইকেল ব্যাপারটা দেখে মিনিটখানেক সময় নিল। আমিও কৌতুহলী হয়ে উঠেছি। আমরা দু'জনেই দৌড়লাম বেলুনের দিকে। আর যেহেতু আমি ভাল দৌড়তাম তাই এগিয়ে গেলাম। মাইকেল মরিয়া হয়ে আমাকে গুলি করল। আমি পড়ে গেলাম। মাইকেল আমাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যেতেই হঠাতে আর্তনাদ করে মাটিতে পড়ে গেল। ওই অবস্থাতেও দেখলাম বেলুন আকাশে উঠে গেল। মাইকেলের কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছিল না। মিনিট পনেরো বাদে আমি কোনওমতে নিজেকে টেনে নিয়ে গেলাম সামনে। মাইকেলের শরীরের পাশ দিয়ে এগিয়ে যেতেই দেখলাম, এই জিনিসটা বালির ওপর পড়ে আছে। পাতলা অঙ্ককারেই এটা এমন চকচক করছিল যে, বুঝলাম এর মূল্য অনেক। এর শরীর থেকে অস্তুত এক আলো বের হচ্ছিল। আমি যন্ত্রটাকে নিয়ে কোনওরকমে ফিরে আসি যেখানে মাইকেলের সঙ্গে দাঁড়িয়ে ছিলাম। মাইকেলের একটা ব্যাগে এটাকে পুরে একটা বালির চিবির পাশে শুয়ে পড়েছিলাম আমি। গতরাত্রে এই ঘরে শুয়ে আবার জিনিসটা দেখলাম। অত্যন্ত মূল্যবান ধাতু। কিন্তু এটা আমি অসমে নিয়ে যেতে চাই। তুমি আমাকে সাহায্য করবে? যা দাম পাব তার টেন পার্সেন্ট তোমাকে দেব। বলো রাজি আছ?’

‘কিন্তু আপনি এই শরীর নিয়ে আসামে যাবেন কী করে?’

‘আমি মরব না । হাসপাতালে গেলেই পুলিশ আমাকে ধরবে । আর যদি মরেই যাই তা হলে আমি ঠিকানা দিচ্ছি, সেই ঠিকানায় এইটে পৌঁছে দেবে । তারা যে টাকা দেবে তার নবুর্ভুতাগ তুমি আমার পরিবারকে দেবে । কথা দাও ।’

আমি রাজি হলাম । সে আমাকে দুটো ঠিকানা লিখে দিল । এইভাবে হঠাতেই টাকা রোজগারের সুযোগ আসায় আমি খুব আনন্দিত হলাম । কিন্তু সেই বাত্রে ওর অবস্থা এত খারাপ হল আমি হাসপাতালে না নিয়ে গিয়ে পারিনি । পরে খবর নিয়ে জেনেছি ওর ডান পা বাদ দিতে হয়েছে । পুলিশ ওকে গ্রেফতার করেছে । আমার ভয় হত আশ্রয় দেওয়ার অপরাধে পুলিশ আমাকেও ধরবে । তাই আমার সুটকেসে ওটাকে ভরে অসমে যাব বলে বেরিয়ে পড়লাম । কলকাতায় এসে মনে পড়ল রায় এখানে আছে । তাই একটা রাত ওর কাছে কাটিয়ে আমি গুয়াহাটী চলে গিয়েছিলাম ।’

“সম্পূর্ণ যন্ত্রটাকে নিয়ে যাননি কেন ?” অর্জুন জিজ্ঞেস করল ।

“তার মানে ?” কার্ভালো চমকে উঠল ।

“আপনি জানেন । যাওয়ার আগে আপনি সুটকেস খুলেছিলেন । যন্ত্রটার আর-একটা অংশ আপনি বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে গিয়েছেন । কিন্তু কেন ?” অর্জুন স্পষ্ট বলল ।

কার্ভালো মুখ নিচ করল । তারপর বলল, “আপনি বুঝতে পেরেছেন দেখছি । হ্যাঁ, ঠিক তাই । বাড়িতে বসেই দেখেছিলাম মূল যন্ত্রটার গায়ে আর-একটা যন্ত্র লাগানো আছে । দুটোই একই ধাতুতে তৈরি । সেই ছেট যন্ত্রটিকে খুলে আমি অসমে নিয়ে যাব বলে ঠিক করলাম । যদি ওখানে ভাল দাম পাই তা হলে বাকিটাকে নিয়ে যাব । রায়ের কাছে রেখে গেলে সেটা কথনওই হাতছাড়া হবে না বলে বিশ্বাস ছিল ।”

“বিশ্বাস ছিল ?” রামচন্দ্র রায় চিংকার করে উঠলেন, “তুমি আমাকে পাগল হওয়ার আয়োজন করে চলে গেলে, আর বলছ বিশ্বাস ছিল ।”

কার্ভালো বলল, “আমি এইটে বিশ্বাস করতে পারছি না । এই যন্ত্র কী করে তোমাকে পাগল করবে ? আর শুধু তোমাকেই করবে কেন ?”

অর্জুন বলল, “এ নিয়ে অনেক ভেবেছি আমরা । পরে শুনবেন । কিন্তু ত্রে বড়ুয়ার যে লোকের কাছে ওটা বিক্রি করবেছেন তার ঠিকানাটা বলুন ।”

“বিক্রি ? কে বলল বিক্রি করেছি ?”

“তার মানে ? কী করেছেন ওটা নিয়ে ?”

“ফিরিয়ে এনেছি ।”

অর্জুন উল্লিঙ্কিত হল, “গুড় । কী ভাল কাজ করেছেন আপনি জানেন না । কোথায় সেটা ?”

“কেন ?”

“আগে দেখান, তারপর বলছি ।”

কার্ভালো একটা ব্যাগ খুলল । তার মধ্যে কাপড়ের পুঁটলি । তার ভেতর থেকে টর্চ লাইটের আকৃতির একটি ধাতব যন্ত্র বের করল সে । অর্জুন কার্ভালোর হাত থেকে জিনিসটা নিয়ে জিজ্ঞেস করল, “এটাকে বিক্রি করেননি কেন ?”

“আমি গুয়াহাটিতে পৌঁছবার দিন-দুই আগে মাইকেলের কাছ থেকে খবর পেয়ে পুলিশ লোকটাকে গ্রেফতার করেছিল । আমি শহরে পৌঁছতেই পুলিশ আমার পেছনে লাগে । অনেক কষ্ট করেছি ওদের চোখে ধূলো দেওয়ার । আমার পকেটের পয়সাও শেষ হয়ে গিয়েছিল ।” কার্ভালো বললুন ।

“এত দেরি করলে কেন এখানে ফিরতে ?” রামচন্দ্র রায় জিজ্ঞেস করলেন ।

“পুলিশের ভয়ে । রাজাভাতখাওয়া নামের একটা জায়গায় ধর্মশালায় অন্য নাম নিয়ে পড়ে ছিলাম কিছুদিন । তারপর আমি কুচবিহারে । আমার দ্বারা স্মাগলিং ব্যবসা হবে না । কিন্তু তুমিও পুলিশকে সব বলে দিয়েছ । এখন আর আমার পরিত্রাণ নেই ।” কার্ভালো খুব দুঃখের সঙ্গে নিঃশ্বাস ফেললুন ।

“কিন্তু তুমি তো কোনও বড় অন্যায় করনি ?” রামচন্দ্র রায় বললেন ।

“পুলিশ সে-কথা বিশ্বাস করবে বলে ভেবেছ ? করবে না ।” মাথা নাড়ল কার্ভালো ।

অর্জুন যন্ত্রটিকে দেখছিল । আগাগোড়াই ধাতব বস্তুতে মোড়া । নীচে একটা আঁটা রয়েছে । ওর মনে পড়ল যে যন্ত্র নিয়ে অবনীবাবু চলে গিয়েছেন, তার গায়ে এমন একটা ব্যবস্থা ছিল । অর্থাৎ, এই বস্তুটি ওই যন্ত্রের গায়ে আটকে যাবে । সে শুনতে পেল, কার্ভালো তার মাত্তভাষায় কিছু বলল রামচন্দ্রকে । রামচন্দ্রবাবু উত্তর দিলেন কিন্তু সেটা কার্ভালোকে খুশি করল না । এবার রামচন্দ্র রায় অর্জুনকে জিজ্ঞেস করলেন, “আপনার কি মনে হয় পুলিশ কার্ভালোকে অ্যারেস্ট করতে পারে ? ও যে অর্থভাবে স্মাগলিং বিজনেসে যেতে চেয়েছিল তা সত্যি, কিন্তু ও সেটা আরভ করেনি । এই যন্ত্রটার মালিক কে তাই বোঝা যাচ্ছে না । ও নীল আলোর বেলুনে চাপা একজনের কথা বলছে । সে কে বলে আপনার মনে হয় ?”

“ভিন্ন প্রহের মানুষ ।”

“অঁ্যা । যাঃ, কী যে বলেন ! পৃথিবীর বাইরের কোনও গ্রহে মানুষ আছে নাকি ? দানিকেনের গঞ্জে নিশ্চয়ই শোনাবেন না । যা বলছিলাম, কার্ভালোকে একটু সাহায্য করুন । আপনার সঙ্গে দারোগাবাবুর বেশ ভাব আছে, দেখুন না ।” রামচন্দ্র রায় বললেন ।

অর্জুনের ঘূঁম পাওছিল না আর । দ্বিতীয় যন্ত্রাংশ হাতে পাওয়ার পর বেশ তাজা লাগছিল নিজেকে । সে কার্ভালোকে জিজ্ঞেস করল, “নীল আলোর বেলুনটাকে আপনার কী মনে হয় ?”

“আমি তো দোখনি । মনে হয় ব্যাপারটা সত্যি নয় ।”

“আপনি কী চান ?”

“বাড়ি যেতে চাই । কোনওদিন অন্যায় কাজ করিনি, এবার করার কথা ভেবেছি । কিন্তু সত্যি বলছি, করিনি । আর কখনও করব না ।”

“তা হলে আপনার চলবে কী করে ?”

“জানি না ।”

“আপনি জানেন আপনার ওই যন্ত্রের কল্যাণে রামচন্দ্রবাবুর পায়ের পুরনো বাতের ব্যথা কমে গিয়েছিল । মাঝেরাত্রে মাইলের পর মাইল ওই শরীরেও তিনি হেঁটে গেছেন রোজ । অজান্তে একটা উপকার করেছেন আপনি ?”

এই সময় রামচন্দ্রবাবু ফোঁস করে দীর্ঘশাস ছাড়লেন, “কোথায় আর সারল ? আজ সকালেই ওটা একটু-একটু করে ফিরে আসছে ।”

অর্জুন উঠল, “মিস্টার কার্ভালো, এখন কয়েকটা দিন আপনি আপনার বন্ধুর কাছে বিশ্রাম নিন । উনি যন্ত্রটির অভাবে রাত্রে ঘুমোতে পারছেন না । আপনার সঙ্গ পেলে সমস্যাটির সমাধান হবে । যেহেতু এই যন্ত্রাংশটি আপনি যে-কোনও কারণেই হোক ফিরিয়ে এনেছেন, তাই মনে হয় পুলিশ আপনার বিরুদ্ধে কোনও স্টেপ নেবে না । আচ্ছা, চলি, নমস্কার ।”

কৃতজ্ঞতার ছাপ ফুটে উঠল কার্ভালোর মুখে । অর্জুন যন্ত্রাংশ নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল । এখন রোদ উঠে গেছে । সে একটা রিকশায় চেপে সোজা কদমতলায় যেতে বলল । আজ বিকেল পর্যন্ত একটানা ঘুমোবার জন্যে ছটফট করছিল সে ।

ঠিক বারোটা নাগাদ ঘুম ভেঙে গেল অর্জুনের । ঘরের সবকটা দরজা-জানলা বন্ধ করে শুয়ে ছিল, যাতে চোখে আলো না ঢোকে । তবু ঘুম ভাঙল এবং আর এল না । খিদে পাছিল বেশ । মা বাড়িতে নেই । কাজের মেয়েটি রামাবানা করে বসে আছে । স্বান সেরে ভরপেট খেয়েও নতুন করে ঘুম এল না । অমলদা বলতেন পৃথিবীর প্রতিভাবান মানুষরা দিনে-রাতে চারঘণ্টার বেশি ঘুমোন না । এই হিসেবে সে প্রতিভাবান মানুষের পর্যায়ে পড়ছে আজ ! এটা এমন সময় যে, যার বাড়িতেই যাবে সে বিরক্ত হবে । অর্জুন বাইক বের করতে গিয়ে হোঁচ্ট খেল । গতকাল সে ওটাকে থানায় রেখেই বেরিয়েছে । অতএব রিকশা নিয়ে থানায় পৌঁছে গেল সে । খবর নিয়ে জানল অবনীবাবু নিজের কোয়ার্টসে ঘুমোচ্ছেন ।

বাইকে চেপে অর্জুন ছুটল জলপাইগুড়ি বাইপাসের দিকে । রিজ থেকে বাঁ দিকের চরে নেমে গেল সে । বালির ওপর বাইক চালাতে অসুবিধে হচ্ছিল । ওটাকে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে সে হেঁটে চরের সেই জায়গায় গেল যেখানে মীল আলোর বেলুনকে সে প্রথম দেখেছিল । বালির ওপর কোনও ভারী

জিনিস চেপে বসেছিল এখানে, অর্জুন স্পষ্ট দেখতে পেল। আর কোথাও কিছু নেই। বালি নিয়ে হাওয়া খেলা করে যাচ্ছে তিনার চরে। সে ফিরে এল বাইকের কাছে।

বেলা তিনটে খুব অসময় নয়। অর্জুন মহাদেব সেনের বাড়ির সামনে বাইকে এসে একটু ভাবল। তারপর এগিয়ে গিয়ে দরজার কড়া ঘাড়ৰ আগেই সেটা খুলে গেল। তিনা দাঁড়িয়ে আছে। অর্জুনকে দেখে হাসল সে, “কাল দাদুকে সাত-তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দেওয়ার জন্যে আমরা সবাই আপনাকে ধন্যবাদ দিয়েছি, শুধু দাদু একটু অপ্রসম হয়েছেন আপনার ওপর।”

“কেন?”

“কাল ওঁকে বাড়িতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, তাই।”

“উনি কি বিশ্রাম করছেন?”

“না। আসুন।”

দোতলায় উঠে মহাদেব সেনের কাছে পৌঁছে অর্জুন দেখল তিনি মগ্ন হয়ে বই পড়ছেন। চোখে চশমা ঠিকই কিন্তু এটাই তো দুদিন আগে অবিশ্বাস্য ছিল। তিনা ডাকতে তিনি মুখ ফেরালেন কিন্তু মাথা পরিষ্কার হল না তৎক্ষণাৎ। অর্জুন বলল, “পড়তে অসুবিধে হচ্ছে না?”

“অ্যা? ও, অর্জুন। খুব সামান্য। আগে তো পড়তেই পারতাম না। তোমরা আমাকে হঠাতে এড়িয়ে চলছ কেন হে? গত রাত থেকে কোনও পাত্র নেই?”

“কোথায় এড়িয়ে চলেছি? আপনার সূত্র অনুসরণ করেছি।”

“তার মানে?”

“গত রাত্রের কথা আপনার মনে আছে?”

“হ্যাঁ, তোমরা আমাকে জোর করে থানার বাইরে নিয়ে এসেছিলে।”

“কারণ, আপনি একটু একটু করে প্রভাবিত হয়ে পড়েছিলেন। বেরবার আগে আপনি শব্দের দূরত্ব এবং দিক অনুমান করেছিলেন। কী করে?”

“খুব সোজা। উত্তর দিকে কান পাতলে আওয়াজটা স্পষ্ট হচ্ছিল।”

এবার অর্জুন মহাদেব সেনকে গতরাত্রের অভিজ্ঞতা খুলে বলল। শুনতে-শুনতে বৃদ্ধ সোজা হয়ে বসলেন। অর্জুন কথা শেষ করলে বললেন, “কী বলব একে? অলৌকিক? এত বছর মহাকাশ নিয়ে কাজ করেছি কখনওই তো এমন অভিজ্ঞতা হয়নি? ফ্লাইং সসার জাতীয় ব্যাপারগুলো উভেজিত করত এবং সেই পর্যন্ত। কিন্তু ওকে তুমি কীভাবে সাহায্য করবে? আমার মনে হয় ওর জ্বালানি শেষ হয়ে আসছে। পৃথিবী থেকে না চলে গেলে ও আর কখনওই যেতে পারবে না। অথচ ওর মহাকাশের জাহাজকে ওড়াবার জন্যে ওই যন্ত্রটাকে সম্পূর্ণ পাওয়া দরকার।”

“হ্যাঁ। কার্ভালো ফিরে এসেছেন। তাঁর কাছে আমি যত্নের আর-একটা

অংশ পেয়েছি।”

“বাঃ। গুড়। তা হলে চলো, ওকে ফিরিয়ে দিয়ে আসি।”

“হ্যাঁ। আমি সঙ্কেবেলায় আপনার কাছে আসব। কিন্তু আমি চাই না বেশি লোক ব্যাপারটা জানুক। আমাদের অতিথি বাজে লোকদের সহ্য করতে পারে না।”

“ঠিক আছে, আর কেউ জানবে না।”

পাশে দাঁড়িয়ে তিস্তা এতক্ষণ সব শুনছিল। এবার আবদারে গলায় বলল, “দাদু, আমি তোমার সঙ্গে যাব। প্রিজ দাদু, কেউ কিছু জানতে পারবে না।”

মহাদেব সেন মাথা নেড়ে যাচ্ছিলেন।

সঙ্কে নাগাদ অর্জুন থানায় এল একটা ব্যাগ নিয়ে। অবনীবাবু নিজের চেয়ারে বসে ছিলেন। দেখামাত্র হাসলেন, “কী ব্যাপার অর্জুনবাবু?”

“যন্ত্রটা চাই।” অর্জুন বলল।

“কেন?”

“যার জিনিস তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে না?”

“জিনিসটা কার?”

“আরে, কাল দেখলেন না?”

“সত্যি বলতে কি, গতরাত্রের ব্যাপারটা আমার কাছে দুঃস্বপ্নের মতো। তা ছাড়া কলকাতা থেকে বড়সাহেবোঁ জানিয়েছেন, ওটাকে অবিলম্বে সেখানে পাঠিয়ে দিতে।”

“অস্বৰ্ব।”

“কেন?”

“ওটা আজই ফিরিয়ে দিতে হবে।”

“না মশাই। ওপরওয়ালারা আমাকে ছাড়বে না ওটা দেখতে না পেলে।”

“অবনীবাবু, আপনি বুঝতে পারছেন না কেন, একটি প্রাণের নিরাপত্তা নষ্ট হয়ে যাবে ওটা আজ ফেরত না পেলে।”

“এটা একা তো কিছু উপকার করবে না। ওর আর-একটা অংশ না পেলে কোনও কাজ দেবে? মাথাটা ঠাণ্ডা করুন।”

হঠাতে অর্জুনের মনে হল, অবনীবাবু আজ স্বাভাবিক নন। এখন এই অবস্থাতে কার্ভালোর ফিরে আসার কথা বলা ঠিক হবে না। সে কার্ভালোকে কথা দিয়ে এসেছে অবনীবাবু তা নাও মানতে চাইতে পারেন। ওপরওয়ালা জেনে যাওয়ার পরে ভদ্রলোক নিজের ওপর আস্তা রাখতে পারছেন না।

অর্জুন বলল, “এক কাজ করি। চলুন, ওটাকে নিয়ে কালকের স্পটে যাই। গতরাত্রে যে এসেছিল তাকে বলি সমস্ত ব্যাপারটা।”

হঠাতে অবনীবাবুর চোখ চকচক করে উঠল। একটু ভাবলেন। তারপর উঠে

দাঁড়ালেন, “চলুন । আপনার কথা রাখছি । তবে আজ আমি সঙ্গে রিভলভার রাখব ।”

“কেন ?”

“গতরাত্রে ও আমাকে আঘাত করেছিল । আজ আমার পালা ।”

অর্জুন বুকল গোলমাল হবে । কিন্তু এ ছাড়া পুলিশের লকার থেকে যন্ত্রটাকে বের করার অন্য কোনও উপায় নেই ।

অবনীবাবু চেয়েছিলেন একটা বিরাট বাহিনী নিয়ে যাবেন যাতে প্রাণীটিকে গ্রেফতার করা সহজ হয় । ওই প্রাণী, যন্ত্রটি একসঙ্গে প্রচারমাধ্যমে হাজির করলে আর দেখতে হবে না । কিন্তু অর্জুন এতে কিছুতেই রাজি হল না । সে বোঝাল, প্রাণীটি বেশি মানুষের উপস্থিতি টের পাবেই এবং সেক্ষেত্রে সে আর নীচে নামবে না ।

যন্ত্রটাকে বের করে কোলে নিয়ে গাড়িতে উঠেছিলেন অবনীবাবু । মহাদেব সেন যেতে চান শুনে খুব একটা খুশি হলেন না । জিপের সামনে ওঁর পাশে অর্জুন বসে ছিল । মহাদেব সেন তৈরি ছিলেন । অর্জুন তাঁকে সামনের আসল ছেড়ে পেছনে চলে গেল । তিন্তা ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, “ঠিক আছে, মনে রাখব, তোমরা আমাকে নিলে না ।”

হেসে ফেলল অর্জুন, “তুমি গিয়ে কী করতে ?”

“অটোগ্রাফ নিতাম ।” তিন্তা বলল ।

তিন্তার চরের কাছে পৌঁছে মহাদেব সেন বললেন, তিনি সেই শব্দটা শুনতে পাচ্ছেন । খুব ক্ষীণ । অর্জুন দেখল, অবনীবাবুর হাতে ধরা যন্ত্র থেকে সবে আলোর ছিটে বের হচ্ছে । সে অবনীবাবুকে বলল, “যন্ত্রটা একবার দেখি । আলোটা অস্তুত লাগছে ।”

নিজে লক্ষ করে বুঝতে না পেরে ভদ্রলোক শেষপর্যন্ত অর্জুনের হাতে ওটা দিলেন । অঙ্ককারে হাঁটতে অসুবিধে হচ্ছিল না, কারণ মহাদেব সেনের হাতে টর্চ ছিল । অর্জুন টর্চ করে কাঁধে বোলানো ব্যাগে হাত ঢুকিয়ে অন্য যন্ত্রাংশটি বের করল । তারপর আন্দাজে চেষ্টা করল আংটা দুটোকে জুড়ে দিতে । পাঁচ-ছ’ পা যাওয়ার পর সে দুটো লেগে যেতেই মহাদেব সেন বলে উঠলেন, “যাঃ ।”

অবনীবাবু জিজ্ঞেস করলেন, “কী হল ?”

“শব্দটা হারিয়ে গেল ।”

“ভাল করে শুনুন ।”

“নাঃ, আর পাচ্ছি না ।”

“চেষ্টা করুন ।”

“দূর ! চেষ্টা করে কি এসব শোনা যায় ! কাল কোথায় এসেছিলে তোমরা ?”

অর্জুনের বুকের ভেতর যেন ড্রাম বাজছে এখন । সে বলল, “এখানে ।”

কিন্তু এটা কী হল ? দুটো যন্ত্র জুড়ে গেলে মহাদেববাবুরাও কিছু শুনতে পান না ? অবশ্যই । প্রথম রাত্রে যন্ত্রটা জোড়া ছিল বলে কার্ভালো থাকা সত্ত্বেও বামচন্দ্র রায় কিছুই শুনতে পাননি । তার মানে এটা এখন শুধু শব্দ গ্রহণ করছে না, পাঠিয়েও যাচ্ছে । বিচ্ছিন্ন অবস্থায় এটা গ্রহণ করত, এরা যেটা পাঠাত তা অতি সূক্ষ্ম বোধসম্পর্ক মন্তিক্ষে গিয়ে আঘাত করত ।

দীর্ঘ সময় অপেক্ষায় কাটিল । শেষপর্যন্ত অবনীবাবু যন্ত্রটি নিয়ে মাটিতে রাখলেন । দপ্দপ করছে আলো । হঠাৎই দেখা গেল তিস্তার চরে কিছু একটা নেমেছে । মহাদেব সেনকে সে জিজ্ঞেস করল, “আপনি কিছু দেখতে পাচ্ছেন ?”

“না ।”

অবনীবাবু বললেন, “আমি পাচ্ছি । আসুক কাছে, রেঞ্জের মধ্যে ।” তিনি রিভলভার বের করে নিলেন । অর্জুন ওঁর হাত ধরল, “কী করছেন আপনি ?”

“আই ওয়ান্ট হিম ।”

“না । কখনওই নয় ।”

“মারব না । এমন আহত করব যাতে পালাতে পারবে না কিন্তু পরে চিকিৎসা করে সারানো যায় । আমি ওকে জীবন্ত চাই ।” অবনীবাবু বললেন ।

“এসব কী কথা । ছি ছি ছি । ইউ ক্যাননট ডু দিস ।” মহাদেব সেন বললেন ।

“আমাকে আমার কর্তব্য করতে দিন । কারও যদি কোনও আইডেন্টিটি না থাকে তা হলে তাকে অ্যারেস্ট করার সম্পূর্ণ অধিকার আমার আছে ।”

এই সময় দেখা গেল তিস্তার চর থেকে একটা নীল আলোর বেলুন ওপরে উঠে এদিকে এগিয়ে আসছে । বেলুনটা যখন কাছে নেমে এল ঠিক তখনই শুলি চালালেন অবনীবাবু । মনে হল জলের মধ্যে একটা পাথর তলিয়ে গেল । সঙ্গে-সঙ্গে প্রচণ্ড চিংকার করে হাত শূন্যে তুললেন ভদ্রলোক । অর্জুন দেখল, ওঁর হাত থেকে মাটিতে কিছু পড়ে গেল । যন্ত্রের শরীর থেকে বেরিয়ে আসা আলোয় মনে হল, একদলা গলিত লোহা । বাঁ হাতে ডাম হাতের কবজি ধরে মাটিতে বসে পড়েছেন ভদ্রলোক । যন্ত্রণায় কাতরে যাচ্ছেন ।

নীল আলোর বেলুন থেকে সেই প্রাণীটি বেরিয়ে এল, “আপনাকে প্রথম দেখছি । কিন্তু মনে হয় কোথাও আমাদের সংযোগ হয়েছিল ।”

অর্জুন বলল, “ইনি আপনার ওই যন্ত্রের পাঠানো সিগন্যাল শুনতে পেতেন । তা ছাড়া পেশায় একজন বিজ্ঞানী ।”

“ধন্যবাদ । আমার যন্ত্র যখন সিগন্যাল ফেরত পাঠাতে শুরু করেছে তখন বোধ যাচ্ছে তুমি আমার উপকার করেছ । কী দিয়ে এই ঝণ শোধ করতে পারি ?”

“ঝণ কেন বলছ ?”

“নিশ্চয়ই । আজ ভোরের আগে আমি যদি মহাকাশে না পৌঁছতে পারি তা হলে শেষ হয়ে যাব । তোমাকে আমার বন্ধুত্ব দিলাম ।”

“ধন্যবাদ । একটা কথা জিজ্ঞেস করছি । ওই যন্ত্রের অর্ধেকটা যে শব্দতরঙ্গ তুলত তা শুনে মহাদেব সেন এবং রামচন্দ্র রায় অস্থাভাবিক হয়ে যেতেন । কিন্তু একজন দৃষ্টিহীনতা আর একজন বাত থেকে মুক্ত হওয়ার পথে পৌঁছেছিলেন । কী করে ?”

“খুব স্বাভাবিক । ওঁদের মস্তিষ্কের যে কোষ শব্দটাকে নিতে পেরেছিল তারাই বলিষ্ঠ হয়ে এই দুটো প্রতিক্রিয়া আনে । কিন্তু পূর্ণমাত্রায় না হওয়ার ব্যাপারটা খুবই সাময়িক হবে । তুমি চাও এটা পূর্ণতা পাক ?”

“হ্যাঁ ।”

“আপনি শুয়ে পড়ুন ।”

মহাদেব সেন নির্দেশ পালন করামাত্র তাঁর গলা থেকে তীব্র চিংকার বের হল । তিনি স্থির হয়ে গেলেন । প্রাণীটি বলল, “কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতে দাও । ওর শরীরের সমস্ত বিকল কোষ এখনই জীবন ফিরে পাবে । এই লোকটিকে কী করা যায় ?”

“কিছু না । উনি বিভ্রমে পড়েছেন । তোমার পূর্ণ যন্ত্র নাও ।” অর্জুন যন্ত্রটিকে তুলে ধরতে মূর্তিটি ইশারা করল থামতে । তারপর আলোর বেলুনে চুকে সে কিছু চালাতেই একটা আলোর রেখা বেরিয়ে এল । তারাই আকর্ষণে যন্ত্রটি সোজা চলে গেল নীল আলোর বেলুনের ভেতরে । প্রাণীটি আবার বেরিয়ে এল, “আমার হাতে আর সময় নেই বন্ধু ।”

“তোমাকে আমি সারাজীবন মনে রাখব ।” অর্জুন বলে উঠল ।

“বিদায় বন্ধু ।” প্রাণীটি আবার নীল বেলুনে চুকে গেল । বেলুনটি উড়ে গেল তিস্তার চরে । তার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে কিছু একটা হস করে উড়ে গেল আকাশে ।

অর্জুনের বুক ভার হয়ে গিয়েছিল । সে মহাদেব সেনকে দেখল । তারপর অবনীবাবুকে । ভদ্রলোক যেন বসে-বসেই ঘুমোচ্ছেন ।

ওঁদের জ্ঞান ফেরার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল অর্জুন, অন্ধকার নিজের নদীতীরে । আকাশে তখন হাজার তারার মালা । শৈঁ-শৈঁ বাতাস বইছে । হঠাতে কানে এল মহাদেব সেনের গলা, “অর্জুন !”

“বলুন ।”

“চলে গিয়েছে ।”

“হ্যাঁ ।”

“আপনি ?”

“হ্যাঁ । আমি দেখতে পাচ্ছি । এই অন্ধকারেও তারাদের দেখতে পাচ্ছি ।”

আনন্দে ভরপুর অর্জুন আকাশের দিকে তাকাল, “ধন্যবাদ, বন্ধু ।”

পাঠ্য ক্লাসিক সিরিজ

সমরেশ মজুমদার

রত্নগভী



রত্নগভী

Pathagar.com

poenagger.net

আজ সকাল থেকেই বিরবিরিয়ে বৃষ্টি এক আকাশ মেঘ থেকে ঝরেই চলেছে। এরকম দিনে বাইরে বেরোতে কারই বা ভাল লাগে! অর্জুন নিজের বিছানায় শুয়ে ছিল চুপচাপ। এখন দুপুর। জানলার বাইরে মরা আলো। কবিরা হয়তো একেই বাদলের দিন বলে সুন্দর লাইন লেখেন, কিন্তু আজ অর্জুনের মাটিতে পা রাখতে একটুও ইচ্ছে করছিল না। দুপুরের খাওয়ার পর ঘুমের অভ্যেস তার কোনওকালে নেই বলেই এখন ঘুমটাই যা আসছিল না। এই সময় টেলিফোনটা বেজে উঠল।

হ্যাঁ, এই বাড়িতে টেলিফোন এসেছে মাসতিনেক। জলপাইগুড়িতে এখন অনেক বাড়িতেই ফোন। দরখাস্ত করতেই কর্তৃপক্ষ খাতির করে বসিয়ে দিয়ে গেছেন যন্ত্রটা। ওটা আসায় লাভ হয়েছে অনেক। আবার বাজে কোনও আসছে বিস্তর।

অর্জুন টেলিফোনটার দিকে তাকাল। এর মধ্যে চার 'র আওয়াজ করেছে যন্ত্রটা। বিছানা ছেড়ে ওঠার আলস্টাকে সরাতে-সরাতে সে মায়ের গলা শুনতে পেল, “কী রে, ঘুমিয়ে পড়লি নাকি ?”

অর্জুন উঠল। রিসিভার তুলে গন্তির গলায় বলল, “হ্যালো !”

তদলোক প্রথমে নম্বর যাচাই করলেন। তারপর বললেন, “আমি শুনেছি তোমার বয়স খুবই কম। আমার বয়স পঁচাশি। তাই তুমি বলছি। তুমি কি এখন খুব ব্যস্ত ?”

“আপনি কে বলছেন ?”

“আমার নাম বিজনবিহারী ঘোষ। শিঙ্গাসমিতি পাড়ায় থাকি। বাড়ির নাম, ‘সারদাময়ী’। যে-কোনও লোককে জিজ্ঞেস করলে দেখিয়ে দেবে। তুমি একবার আসতে পারবে ভাই ?” বুদ্বের গলায় একটা আকুতি ফুটে উঠল। কিন্তু মুশকিল হল বেশিরভাগ মানুষ অপ্রয়োজনকেও প্রয়োজন বলে ভাবতে ভালবাসে।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “এরকম আবহাওয়া। যেতে বলছেন, প্রয়োজনটা কি

খুব জরুরি ?”

“হ্যাঁ ভাই ! আজ এ-বাড়িতে আমার নিজস্ব চাকর ছাড়া কেউ নেই ! সবই গিয়েছে শিলঞ্চড়িতে । এরকম আবহাওয়ায় ফিরে আসবে বলে মনে হয় না । তোমার সঙ্গে কথা বলার এই সুর্বৰ্গ সুযোগ !”

“আপনি আপনার বাড়ির লোকদের এড়িয়ে আমার সঙ্গে কথা বলতে চান ?”

“হ্যাঁ ভাই ! আমি ব্যাপারটা গোপন রাখতে চাই ।”

“বেশ ! আমি আসছি ।”

রিসিভার নামিয়ে রাখামাত্র মায়ের গলা পাওয়া গেল, “এমন দিনে বেরোচ্ছিস ?”

“কী করব ! ভদ্রলোকের জরুরি দরকার । পঁচাশি বছর বয়স ।”

“ও বাবা !” মা পাশ ফিরলেন, “বাড়িতে টেলিফোন এসে এই ঝামেলা করল । আগে কষ্ট করে আসতে হত, এখন নম্বর ঘুরিয়ে কথা বলে নিলেই হল ।” মা চলে গেলেন ।

জলপাইগুড়ি শহরের বেশিরভাগ জায়গায় বৃষ্টিতে জল জমে না কিন্তু কাদা প্যাচপ্যাচ করে । আপাদমস্তক বষাতিতে মুড়ে নিয়ে অর্জুন তার লাল বাইকটা বের করল । পায়ে কাদা লাগাবার বিলুমাত্র বাসনা নেই তার । কদমতলা থেকে শিল্পসমিতি পাড়া আর কত দূর ! ঝাস্তা ফাঁকা । মাঝে-মাঝে দু-একটা রিকশা ঢেকেচুকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে রিকশাওয়ালারা, ভিজে কাক হয়ে । শিল্পসমিতি পাড়ায় পৌঁছে বাড়ি খুঁজে পেতে অসুবিধে হল না ।

বিজনবিহারী ঘোষ অবস্থাপন্ন মানুষ । দোতলা বাড়িটা বিশাল । সামনে পাঁচলঘেরা বাগান । গেটের গায়ে সাদা পাথরের ওপর লেখা, সারদাময়ী । গেট বন্ধ । ঝুপঝুপ বৃষ্টিতে বোঝাই যাচ্ছে না বাড়িতে মানুষ আছে কি না ! অর্জুন দুঁবার বাইকের হন্দ বাজাল । কোনও সাড়া নেই । তৃতীয়বার বাজানোর সময় গেট খুলে একজন প্রৌঢ় ভৃত্যগোছের লোক ছাতা মাথার ওর দিকে তাকাল । অর্জুন তাকে বলল, “আমার নাম অর্জুন । বিজনবিহারীবাবু একটু আগে আমাকে ফোন করেছিলেন ।”

“আসুন । বড়বাবু আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন ।”

নীচের তলায় বষাতি খুলে রেখে সে ভৃত্যটিকে অনুসরণ করে দোতলায় উঠে এল । বেশ সাজানোগোছানো বাড়ি । কোথাও একটুও অপরিষ্কার হয়ে নেই । একটি ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে লোকটি বলল, “বাবু উনি এসেছেন !”

“এসো ভাই ! ঘরে এসো !” উদান্ত কষ্ট কানে আসামাত্র অর্জুন পা বাড়াল ।

গলার স্বর শুনে যে চেহারা কল্পনা করেছিল অর্জুন, বাস্তবে তার কোনও মিল নেই । সাদা ধৰ্মবে বিছানায় যে-মানুষটি বসে আছেন, তাঁর বয়স মুখ-চোখে স্পষ্ট । কিন্তু ওই রোগী মানুষটির বুকের নীচে একটি চাদর আড়াল করা রয়েছে,

হার তলার দিকে খুবই শীর্ণ পায়ের আদল ।

“তোমার বয়স অল্প বলে শুনেছিলাম, কিন্তু এত অল্প, কল্পনা করিনি । তুমি অর্জুন তো ?” ভদ্রলোকের গলার স্বর খুবই জোরালো । ওই শরীর থেকে এরকম গলা কী করে বেরিয়ে আসছে, সেটাও বিশ্ময়ের ! অর্জুন মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল ।

“বোসো । তুমি ওই চেয়ার টেনে নিয়ে বোসো । আসলে কী জানো, আজকাল অঞ্জবয়সীরা কেউ কিছু করে না বলে আমরা তাদের আন্তরিক্ষমেট করতে শুরু করোছি । কী খাবে বলো ?” বিজনবিহারীবাবুকে এখন বেশ আন্তরিক বলে মনে হচ্ছিল অর্জুনের ।

“এই সময় আমি কিছু খাই না ।” অর্জুন চেয়ারে বসল ।

“বেশ । বো নীচে গিয়ে দাঁড়া । এ-সময় কেউ যেন আমার ঘরে না আসে ।” দরজায় দাঁড়ানো ভৃত্যটিকে হ্রকুম করতেই সে দ্রুত সরে গেল । বিজনবিহারী বললেন, “অবশ্য কারও আসার সন্তাননা খুবই কম । বাড়ি এখন খালি ।”

কথাটা টেলিফোনেও বলেছিলেন তিনি । অর্জুন দেখছিল । ঘরের একটা দেওয়ালে পর-পর অনেক অয়েলপেন্টিং টাঙানো । বিজনবিহারী সেটা লক্ষ করে বললেন, “একদম ডান দিকে আমার পিতামহ, নুটুবিহারী, তাঁর পাশে পিতামহী আশালতা, তিনি নন্দর/আমার পিতা পবনবিহারী, পাশে মাতা শ্যামাসুন্দরী, মাঝখানের জায়গাটা আমার জন্যে এখনও ফাঁকা, শেষ ছবি আমার স্ত্রী সরব্দতীর ।”

ফাঁকা জায়গাটার দিকে তাকিয়ে অস্পষ্টি হল অর্জুনের । দাদু, দিদিমা, বাবা, মায়ের ছবি তিনি টাঙাতেই পারেন, মৃতা স্ত্রীর আগে নিজের জন্য জায়গা রেখে দেওয়াটা বেশ অস্পষ্টিকর । সেটা বুঝে বিজনবিহারী বললেন, “আমার ছবি আমি আঁকিয়ে রেখেছি । কাপড়ে মুড়ে খাটের তলায় রাখা আছে । কিন্তু না মরা পর্যন্ত ছেলেরা টাঙাতে পারছে না হে ।” বলে শব্দ করে হাসলেন ।

“আপনি আমাকে কোনও কাজের ভাব দেবেন ?” অর্জুন জিজ্ঞেস করল ।

“হ্যাঁ । তোমার নামডাক হয়েছে শুনেছি । আমাকে যিনি চিকিৎসা করেন, সেই ডক্টর সান্যালও তোমার কথা বলেছেন । তুমি তো বিদেশেও গিয়েছ ?”

“আজ্জে হ্যাঁ ।”

“খুব ভাল । আগে আমার কথা বলি তোমাকে । এই জলপাইগুড়ি শহরে আমার পিতা পবনবিহারী ভাগ্যাব্বেগে এসেছিলেন ১৮৯৯ সালে । তখন তিনি উনিশ বছরের যুবক । আমাদের পৈতৃক বাড়ি ঢাকার কাছে কালীগঞ্জে । ভাগ্যাব্বেগে আসার কারণ অর্থভাব নয় । পিতামহ নুটুবিহারী খুবই বিস্তবান মানুষ ছিলেন । জমিজমা ছাড়াও তাঁর নানা ব্যবসা ছিল । কিন্তু সে-সবই তিনি পেয়েছিলেন উন্ন্যাধিকার সূত্রে । পিতামহো দুই ভাই । ছোটজন একটু

উচ্ছুল প্রকৃতির মানুষ। তিনি কোনও কাজ করতেন না। দাদার কাছে প্রয়োজন হলেই হাত পাততেন। তাঁর দুই ছেলেও একই ধাত পেয়েছিল। ফলে আমার পিতা অনুমান করেছিলেন যে, ভবিষ্যতে গোল বাধবে। তিনি পিতামহের অনুমতি নিয়েই এখানে চলে আসেন। তখন ডুয়ার্সে চা-শিল্পের পদ্ধন হয়েছে। ব্যবসা কেমন হবে তা কেউ সঠিক অনুমান করতে পারছেন না। পিতামহের কাছে ঝণ নিয়ে পিতা একটি চা-বাগানের পদ্ধন করেন। নিজের মায়ের নামে নাম রাখলেন ‘আশালতা’।

“পিতামহ চায়ের ব্যবসা বুবাতেন না, কিন্তু পিতাকে নিরৎসাহ করেননি। প্রথমদিকে তিনি যে নিয়মিত পিতাকে অর্থসাহায্য করেছেন, তার প্রমাণ আমি পেয়েছি। তরণ বয়সে আমিও পিতার ব্যবসায় যুক্ত হই। তখনও পিতামহ জীবিত। যাতায়াতের অসুবিধে থাকা সঙ্গেও আমি ছাত্রাবস্থাতে প্রতি বছরই কালীগঞ্জে যেতাম। পিতামহ শেহ করতেন খুব। পিতার ব্যবসার উন্নতির খবর পেয়ে খুশি হতেন। আমি চাহিতাম তিনি জলপাইগুড়িতে চলে আসুন। তিনি রাজি হতেন না। বলতেন, ‘এই জমিজায়গা, মানুষ ছেড়ে আমি স্বর্গে গিয়েও শাস্তি পাব না ভাই।’

“ক্রমশ আমরা বুবাতে পারছিলাম যে, পিতামহের সঙ্গে তাঁর ভাই এবং ভাইপোদের সম্পর্ক ভাল যাচ্ছে না। তারা অলস জীবন যাপন করবে এবং পিতামহকে সে-ব্যাপারে অর্থ জোগাতে হবে। পিতামহ বিরক্ত বোধ করলেই ঝামেলা বাধত। শেষপর্যন্ত তারা অভিযোগ আনল সরাসরি। পিতামহ পারিবারিক সম্পত্তি সরিয়ে ডুয়ার্সে চা-বাগান কেনার জন্যে আমার পিতাকে উৎসাহিত করেছেন। তাঁরা চা-বাগানের অংশ দাবি করলেন।

“আমার পিতা পবনবিহারী ঝামেলা পছন্দ করতেন না। তিনি অংশ দিলেন না বটে, কিন্তু ওঁদের দাবির কাছাকাছি থোক টাকা ধরে দিলেন। বললেন, ‘আমি যা ঝণ নিয়েছিলাম, তার তিন গুণ ফিরিয়ে দিলাম।’ পিতার ব্যবসা তখন ভাল চলছিল। কয়েক বছরেই তিনি সামলে উঠলেন। এই সময় পিতামহ মারা গেলেন। তাঁর কাজকর্ম করতে আমি এবং পিতা কালীগঞ্জে গেলাম। বাড়িটির অবস্থা তখন বেশ খারাপ। বাড়ির লোকজন বলতে পিতামহের ভাইয়ের বংশধররা। গ্রামের লোকজন অনুযোগ করতে লাগল যে, তারা সামান্য নগদ টাকার লোতে বিষয়সম্পত্তি বিক্রি করে দিচ্ছে। এমনকী আমার পিতামহীর সংগ্রহে নিজস্ব যেসব গহনা ছিল, সেগুলোর হাদিস পাওয়া গেল না। পিতা ঢাকা শহরে এসে একটি মামলা করলেন। যেহেতু বস্তবাড়িটিতে তাঁরও অংশ আছে, তাই তাঁর অনুমতি ছাড়া ওই বাড়ি বিক্রি করতে না পারে। আদালত থেকে সেই মর্মে একটা আদেশ বেরিয়ে যাওয়ায় পিতা নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে এলেন। কিন্তু সেই থেকেই কালীগঞ্জের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ বিছিম হয়ে গেল।” বিজনবিহারী থামলেন একটু। তারপর জিজেস করলেন,

“ভাই, হয়তো এসব গল্প তোমার ভাল লাগছে না। কিন্তু জানা না থাকলে বুঝতে অসুবিধে হবে।”

অর্জুন চুপচাপ মাথা নাড়ল। ভারতবর্ষ বিভক্ত হওয়ার আগেই পূর্ববঙ্গ থেকে বেশ কিছু মানুষ এদেশে এসেছেন। তাঁরা উদ্বাস্ত নন। এদেশে এসে অনেকেই সাফল্য পেয়েছেন। বিজনবিহারীও তাঁদের একজন।

বিজনবিহারী আবার শুরু করলেন, “চায়ের ব্যবসা পিতা ভালই বুঝতেন। ওটা আমিও রপ্ত করলাম। একটার বদলে দুটো বাগানের মালিকানা পেলাম। জলপাইগুড়ি শহরের রায় এবং ঘোষ পরিবারের সঙ্গে আমাদের নামও লোকে বলত। কিন্তু ব্যবসার বুঁকি কী জানো? তোমার ছেলে যদি ব্যবসাবিমুখ হয়, তা হলে তুমি ব্যবসাটাকে যতই বাড়াও, তা এক সময় গোটাতে বাধ্য হবেই। আমার দুই ছেলে। পিতা দেহ রাখার পর আমি তখন প্রচণ্ড ব্যস্ত। বড় ছেলে পড়াশোনায় ভাল। সে চার্টার্ড পাশ করে বিলেতে চলে গেল পড়তে, কিন্তু ছেট্টা কলেজের গাঁট পেরোতে পারল না। অথচ আমি দুজনকে সমান সুযোগ দিয়েছিলাম। বিলেতে থাকার সময়ে বড় জানাল তার পক্ষে আর দেশে ফেরা সম্ভব নয়। ভারতবর্ষের ওই একচিলতে শহরে চায়ের ব্যবসায় জীবন কাটাতে সে নাকি জন্মায়নি। ওখানে কাজের সুযোগ বেশি। আর বিলেতে যখন থাকতেই হবে তখন বাঙালি মেয়েকে বিয়ে না করে ইংরেজ মেয়েকে বিয়ে করাই যুক্তিসংগত।

“এই ব্যাপারটা ওদের মা মানতে পারল না। বিদেশিনীকে বিয়ে করার জন্যে নয়, যে-ছেলে নিজের জন্মভূমিকে হেয় মনে করে, তার মুখদর্শন করতে চাইল না সে। বলল, ‘আমার বড় ছেলে মরে গেছে।’ কথাটা বড়কে জানিয়ে দেওয়া হল। ছেট ছেলে পড়াশোনায় ভাল না হলেও বাস্তববুদ্ধি প্রথর। সে আমার সঙ্গে ব্যবসায় যোগ দিল। এর কিছুদিন পরেই আমার স্ত্রী হাটফেল করে। এই শোক আমাকে বেশ কাবু করে ফেলল। আমি ব্যবসা থেকে সরে এলাম। বয়স হয়েছে, ছেলেও উপযুক্ত। ব্যবসার ব্যাপারে তার সঙ্গে আমার মত সব ব্যাপারে মিলবে এমন কথাও নেই। আমি প্রাচীন ভাবনার মানুষ, সে নবীন। প্রায়ই দিল্লি-কলকাতা করে। পছন্দমতো এক আধুনিকাকে বিয়ে করল। মেয়েটি খারাপ নয়, কিন্তু তার জীবনযাপন এত আধুনিক যে আমার পক্ষে তাল রাখা মুশকিল হয়ে পড়ল।

“আমার ছেলের প্রচণ্ড উগ্র জীবন আমাকে মেনে নিতে হল। এবং সেটা যে মেনে নিতে পারিনি তার প্রয়াণ আমার অসুস্থতা। আমি পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হলাম। একটা দিক অসাড় হয়ে গেল প্রথমে। অনেক চিকিৎসার পরে উর্ধ্বাঙ্গে স্বাভাবিকতা ফিরে এলেও কোমরের নীচ থেকে সব অসাড় হয়ে গেল। কারও সাহায্য ছাড়া আমি বিছানা থেকে নামতে পারি না আর।

“কিন্তু খারাপ খবর বাতাসের আগে ছোটে। ছেট ছেলে অতিরিক্ত লাভের

নেশায় যে ঝুঁকি নিয়েছে তাতে ব্যবসা ঢুবছে। প্রচুর ঝণ করে ফেলেছে কালোয়ারদের কাছে। এবং শেষপর্যন্ত দু-দুটো বাগান বিক্রি করে নিজেকে বাঁচিয়েছে এ-সবই এই বিছানা থেকে শুনলাম। সে আমার ঘরে আসেও ন অথচ এই বাড়িতে থাকে। যা কিছু টাকা পয়সা এখনও আছে তা তার স্ত্রী সরাতে পেরেছিল বলেই আছে। কলকাতার সন্টলেকে ওর স্ত্রী একটি বাড়ি কিনেছে। ব্যাক্সেও রেখেছে কিছু। বছরের বেশিরভাগ সময় সেখানেই থাকে। আমি ভবাকে নিয়ে এখানে পড়ে আছি।”

বিজনবিহারী চুপ করতে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “আপনি টেলিফোনে বললেন বাড়ির সবাই শিলিগুড়িতে গিয়েছে। এই সবাই কারা?”

“আমার পুত্রবধু এবং তার মেয়ে। ছেলেও গেছে। ওরা দিনসাতেক হল এখানে এসেছে।” অনেকক্ষণ কথা বলায় এখন বিজনবিহারীকে বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছিল।

অর্জুন বলল, “আপনাদের পারিবারিক গল্প খুবই দুঃখজনক। আপনার বাবার সব কাজ এভাবে নষ্ট হতে দেখতে আপনার কীরকম লেগেছে তা অনুমান করছি। কিন্তু আপনি আমাকে এখানে কেন আসতে বললেন, বুঝতে পারছি না। এ-ব্যাপারে আমার কী করণীয়?”

মাথা নাড়লেন বিজনবিহারী, “এ-কথা মনে হওয়া খুব স্বাভাবিক। কাহিনী শোনালাম, যাতে সব ব্যাপারটা তুমি বুঝতে পারো। আমাদের এখন অর্থভাব চলছে। তার মানে এই নয় যে, খেতে-পরতে পারছি না। যা কিছু ব্যাকে রাখতে পেরেছি তার সুন্দে বাকি কটা দিন চলে যাবে। কিন্তু... !”

“বলুন!”

“হঠাৎ একটা পুরনো চিঠি খুঁজে পেলাম। আমার শরীরের এই অবস্থায় খোঁজা সম্ভব নয়। ভবাকে দিয়ে বাবার আলমারি পরিষ্কার করছিলাম। যা কিছু কাগজপত্র সে আমাকে এনে দিতে তাতে চিঠিটাকে দেখতে পেলাম। আমার পিতামহের চিঠি।” বিজনবিহারীর মুখ উজ্জ্বল হল।

“চিঠিতে কী লেখা আছে?”

“ব্যাপারটা আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ। তুমি নিশ্চয়ই গোপন রাখবে।”

অর্জুন হেসে ফেলল, “আপনি তো সেই কারণেই আমাকে ডেকেছেন।”

“হ্যাঁ। আমি চাই না আমার ছেলে বা পুত্রবধু এসব জানুক।”

“তাঁদের সঙ্গে আমার এখনও পরিচয় হয়নি। কিন্তু আমি আমার বোধবুদ্ধি দিয়ে যে কাজ করি তার সঙ্গে যদি আপনার পাওয়া চিঠির কোনও সম্পর্ক না থাকে তা হলে বলার দরকার নেই।”

“আছে। চিঠিটা পাওয়ার পর পিতা কেন যে কোনও অ্যাকশন নেননি, তা আমি জানি না। খামের ওপর প্রাণ্তি স্বীকারের তারিখ লিখে রেখেছিলেন এইমাত্র।” বিজনবিহারী তাঁর হাতের কাছে রাখা একটা চামড়ার পোর্টফোলিও

ব্যাগ টেনে নিয়ে সেটা খুললেন ।

অর্জুন দেখল ব্যাগ হাতড়ে ভদ্রলোক একটা খাম বের করলেন । খুব পুরনো আমলের খাম কিন্তু ময়লা হয়নি । খাম থেকে একটি চিঠি বের হল । বিজনবিহারী অঞ্জ কেশে গলা পরিষ্কার করে নিলেন,

কল্যাণীয়েষু পবনবিহারী,

আশা করি তোমার ব্যবসা ভালই চলিতেছে । তুমি গোয়ালন্দ ত্যাগ করিয়া স্বাবলম্বী হইয়াছ, ইহাতে আমি অত্যন্ত আনন্দ পাই । আমি বৃদ্ধ । নিজস্ব জায়গায় শেষ নিষ্পাস ত্যাগ করিলেই শাস্তি পাইব বলিয়া এই স্থানে রাহিয়া গিয়াছি ।

কিন্তু জীবিত অবস্থায় যে অশাস্তি কপালে জুটিয়াছে, তাহার সমাধান কী আমি জানি না । আমার ভাত্তপুত্ররা প্রতিনিয়ত অর্থের জন্য আমাকে বিব্রত করিতেছে । তাহাদের ধারণা আমি সমুদয় অর্থ তোমাকে গোপনে দিয়া দিয়াছি । প্রকৃত সত্য ইহারা বিশ্বাস করে না । অথচ আমার সংগ্রহে সামান্যই নগদ অর্থ আছে । আমি বিশেষভাবে চিন্তিত তোমার জননী এবং পিতামহীর স্বর্গলক্ষারের জন্য । মূল্যবান পাথর ছাড়াই তাহাদের ওজন প্রায় পাঁচশো ভারি হইবে । এইসব অলঙ্কার তাহাদের মূল্যবান স্মৃতি । মূর্খরা ইহাদের দিকে হাত বাঢ়াইতে চায় । আমি আমার স্বঞ্জ ক্ষমতায় ইহাদের রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেছি ।

গতরাত্রে এখানে প্রচুর ঝড়জল হয় । মধ্যরাত্রে আমি সমুদয় অলঙ্কার মাটিতে পুঁতিয়া আসিয়াছি । আমাদের বাড়ির সমুখে যে শিবমন্দির আছে, তাহার দক্ষিণ দিকে যে প্রাচীন বটবৃক্ষ, তাহাকে নিশ্চয়ই স্মরণ করিতে পার । ওই বটবৃক্ষ হইতে দশ কদম পূর্ব দিকে যাইলে এই বাড়ির দোতলার শেষ গবাক্ষ দেখা যায় । গবাক্ষকে নজরে রাখিয়া আর-একটু দক্ষিণে হাঁটিলেই পুকুরিণীর ধাপ শুরু হইবে । সেই ধাপের আগে চার হাত গর্ত খুঁড়িয়া একটি টিনের বাক্সে অলঙ্কারাদি ভরিয়া আমি রাখিয়া দিয়াছি । মাটি সমান করিয়া ফিরিয়া আসিতে কষ্ট হইয়াছিল । আজ সকালে গিয়া দেখিলাম, বৃষ্টি মাটি খোঁড়ার চিহ্ন মুছিয়া দিয়াছে । এই তথ্য তোমাকে ছাড়া কাহাকেও বলিব না । আমার মৃত্যুর পর তোমার যদি প্রয়োজন হয় তাহা হইলেই ওইসব অলঙ্কার তুমি গ্রহণ করিবে । ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করবন ।

—আশীর্বাদক, তোমার পিতা, নুটুবিহারী ঘোষ ।

পড়া শেষ করে বিজনবিহারী মুখ তুললেন ।

অর্জুন বলল, “আপনার বাবা তো আপনাকে নিয়ে গিয়েছিলেন ওখানে ?”

“হ্যাঁ । কিন্তু আমি নিশ্চিত জানি বাবা এসব মাথায় আনেননি । মাটি খুঁড়ে অলঙ্কার বের করলে সবাই দেখতে পেত । আমিও জানতাম । তখন বাবার

অর্থের তেমন প্রয়োজনও ছিল না। পিতামহের শান্ত নিয়েই তিনি ব্যস্ত ছিলেন সে-সময়।”

“পরে যাননি?”

“না। আর না। তা ছাড়া বাবার সব কিছু আমি পেয়েছি। তিনি যদি ওগুলো সংগ্রহ করতেন, তা হলে আমি তা দেখতে পেতাম।”

“একটা কথা। আপনার বাবা মারা গিয়েছেন কবে?”

“স্বাধীনতার পরের বছরে।”

“এতদিনেও আপনি চিঠিটার হাদিস পাননি কেন?”

“পেতে চেষ্টা করিনি বলে। বাবা চলে যাওয়ার পর ওঁর যাবতীয় কাগজপত্র আমি ওই আলমারিতে ভরে রেখেছিলাম। বিশেষ করে যে-খামটার ওপর ব্যক্তিগত লেখা ছিল, সেটা খোলা অশোভন মনে করায় খুলিনি। একসময় কাজের চাপে ভুলেই গিয়েছিলাম এসবের কথা। দ্যাখো ভাই, জীবিত অবস্থায় আমরা এমন অনেক কিছু করি, যা একান্ত আমারই। মরে যাওয়ার পর তার সবকিছু ছেলেমেয়েদের পছন্দ নাও হতে পারে। আমি বাবার ব্যক্তিগত খামে সেই কারণেই হাত দিইনি।”

“চিঠিটা দেখতে পারি?”

বিজনবিহারীবাবু খামসুদুর চিঠি এগিয়ে দিলেন। খামের এক কোণে লেখা আছে, ‘আঠারোই শ্রাবণ, ১৩৩৯ সন’। অর্থাৎ ষাট বছর আগে চিঠিটা এসেছিল। নুটুবিহারীর চিঠিতে কোনও তারিখ নেই। হাতের লেখা স্পষ্ট। সেই সময় শিক্ষিত মানুষেরা চিঠিপত্রে তারিখ অবশ্যই লিখতেন। নুটুবিহারী লেখেননি কেন? কাগজটি বেশ পুরনো। কিন্তু বোঝা যায়, এই কাগজ বেশ ব্যবহৃত হয়নি। হয়তো চিঠি লেখার পর বারপাঁচেক খোলা হয়েছে ভাঁজ। অর্জুন চিঠিটা মন দিয়ে পড়ল। তারপর সেটাকে ফিরিয়ে দিতেই বিজনবিহারীবাবু সয়ত্বে খামে বন্ধ করে ব্যাগের মধ্যে তরে ফেললেন। তারপর গভীরভাবে বললেন, “আমার পিতামহের পাঁচশো ভবি সোনা মাটির নীচে পড়ে আছে ষাট বছরের ওপর। পাথরগুলো বাদ দিলেও সোনার দাম কুড়ি লক্ষ টাকা হবে। একমাত্র আমি ওঁর প্রকৃত উন্নতাধিকারী। তুমি আমাকে গহনাগুলো উদ্ধার করে দেবে?”

অর্জুন বৃদ্ধকে দেখল। তারপর বলল, “আপনার ঠাকুর্দা থাকতেন কালীগঞ্জে। জায়গাটা ভারতবর্ষে নয়। বাংলাদেশের আইনকানুন কী, তা আমি জানি না।”

বিজনবিহারী বললেন, “এতে আবার আইনকানুনের কথা উঠছে কেন? আমাদের জিনিস ওখানে পড়ে আছে। আমি সেটা নিয়ে আসব, এতে অন্যায় কোথায়?”

“আপনি ভুলে যাচ্ছেন বাংলাদেশ একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র। সেখানে যেতে

হলে ভিসার দরকার পড়ে । স্বাধীনতার আগে আপনার জিনিস ওখানে থাকলে এখন সেই জিনিসে আপনার অধিকার আছে কি না সে-প্রশ্ন উঠতে পারে । পাঁচশো ভবি সোনা যদি মাটির তলায় খুঁজে পাওয়া যায় তা হলে অবশ্যই বাংলাদেশ সরকারকে জানানো উচিত । ওই সোনা নিয়ে এদেশে চলে আসা খুব বড় ধরনের অপরাধ । আমার কথা আপনি একটু ভেবে দেখুন ।” অর্জুন বোঝাবার চেষ্টা করল ।

“এসব যে আমি ভাবিনি, তা কী করে জানলে ? কিন্তু সোনা আমার দরকার ।”

অর্জুন উঠে দাঁড়াল, “কিন্তু কাজটা নেব কি না সে-ব্যাপারে আমি একটু ভাবি । আপনাকে আমি দিন তিনিকের মধ্যে জানিয়ে দিতে পারব । নমস্কার ।”

॥ দুই ॥

বৃষ্টি মাথায় নিয়ে এরকম একটা গল্প শুনতে যাওয়ার কোনও মানে হয় না । বাড়ি ফেরার সময় অর্জুনের মনে হচ্ছিল একথা । বৃদ্ধ বিজনবিহারী পঙ্গু হওয়া সত্ত্বেও সোনার গয়নার লোভে লোভী হয়ে উঠেছেন, এটা তার ভাল লাগছিল না । সেই তুলনায় ওঁর বাবা পবনবিহারী অনেক বেশি নির্লাভ মানুষ ছিলেন । তখন ভারতবর্ষ দ্বিষণ্ঠিত হয়নি । তিনি স্বচ্ছন্দে গয়নাগুলো তুলে নিয়ে আসতে পারতেন । অর্জুনের মনে হচ্ছিল এই ব্যাপারটায় কোনও বহস্য নেই । একজন মানুষের লোভ মেটানোর জন্য সে এগিয়ে যেতে পারে না । তিনিদিন পরে একথাই বিজনবিহারীবাবুকে জানিয়ে দেবে ঠিক করল ।

কিন্তু দু'দিন বাদে ভোর চারটের সময় অর্জুনের ঘূম ভেঙে গেল তারস্বরে টেলিফোন বাজার শব্দে । এই সময় খুব বিপদে না পড়লে কেউ কাউকে টেলিফোন করে না । সে বিছানা থেকে উঠে ঘুম-ঘুম অবস্থাতেই রিসিভার তুলল, “হ্যালো ।”

“অর্জুন বলছ ?” খুব চাপা গলায় প্রশ্ন এল ।

“হ্যাঁ ।”

“আমার সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে অর্জুন । আমি নিঃস্ব হয়ে গেছি ।” ভদ্রলোকের গলা কাঁপছিল ।

“আপনি কে কথা বলছেন ?”

“আমি ? ও, আমি বিজনবিহারী ঘোষ ।”

“ও । কী হয়েছে আপনার ?”

“কাল রাত্রে চিঠিটা চুরি হয়ে গিয়েছে ।”

“চুরি হয়ে গিয়েছে ?”

“হ্যাঁ । গতকাল দুপুরেও আৰাম ব্যাগ খুলে ওটাকে দেখেছিলাম । ঠিকই ছিল । আধ ঘণ্টা আগে একটা স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেল । আৱ ঘুম আসছে না দেখে এটা-ওটা হাতড়াছিলাম । হঠাৎ কী খেয়াল হতে ব্যাগটা খুলে দেখি ওৱ মধ্যে চিঠিটা নেই ।” বিজনবিহারীবাবুৱ গলায় প্রচণ্ড হতাশা ।

“আপনি অন্য কোথাও রাখেননি তো ?”

“অন্য কোথাও ? অসম্ভব । কেউ নামিয়ে না নিলে আমি বিছানা থেকে নামতেই পারি না । আমি নিজে কোথায় ওটা রাখব ? তা ছাড়া আমাৰ পৰিকাৰ মনে আছে আমি কাল ব্যাগেৰ ভেতৰ খামটাকে বেৰে দিয়েছিলাম । অৰ্জুন, প্রিজ, তুমি আমাকে বাঁচাও ।” বৃন্দ চাপা গলায় বললেন ।

“আপনি বলছেন নিজে খাট থেকে নামতে পারেন না । তা হলে যে চিঠিটা সৱাবে সে আপনাৰ সামনেই আসবে । তা ছাড়া আপনাৰ কাজেৰ লোক সবসময় থাকে । সে বিশ্বাসী ?”

“তাকে আমি নিজেৰ চেয়ে বেশি বিশ্বাস কৰি ।” বিজনবিহারীবাবু বললেন ।

“বেশ । এখন তো যাওয়াৰ কোনও কথাই ওঠে না । আমি সকালবেলায় একবাৱ যাব ।”

“কিন্তু তুমি কীভাৱে আসবে ?”

“বুঝতে পাৱলাম না ।”

“আমি যে তোমাকে টেলিফোন কৰেছি তা যেন আমাৰ ছেলে জানতে না পাৰে । তুমি অন্য কোনও একটা অছিলা নিয়ে আমাৰ সঙ্গে দেখা কৰতে চেয়ো । প্রিজ ।” লাইন কেটে দিলেন ভদ্ৰলোক ।

এত ভোৱে ঘুম ভেঙে গেলে আবাৰ ঘুমেৰ আশা কৰা যায় না । অৰ্জুন খানিকটা অপেক্ষা কৰে বেৱিয়ে পড়ল । আজ বৃষ্টি নেই । আকাশ পৰিকাৰ । জলপাইগুড়ি শহৰে প্ৰাতঃভ্ৰমণকাৰীৰ সংখ্যা কম নয় । কদম্বতলাৰ মোড়ে হারুদাৰ চায়েৰ দোকানে বসে চা খেতে-খেতে সে এদেৱ দেখতে লাগল ।

হঠাৎ তাৱ মনে হল বিজনবিহারী নিজেই কোনও রহস্য তৈৰি কৰছেন না তো ! হয়তো চিঠি ওঁৰ কাছেই আছে, অৰ্জুনকে জড়াবাৰ জন্য এই গল্প শোনালেন । ওঁৰ মতো মানুষ সাৱাক্ষণ ব্যাগ নিয়ে শুয়ে থাকলে কারও ক্ষমতা নেই চিঠিটাকে চুৱি কৰা । তা ছাড়া চিঠি চুৱি যাবে তখনই, যখন কেউ জানতে পাৱবে ওটাৰ ভেতৰ কী লেখা আছে ! বিজনবিহারীবাবুৰ কথা অনুযায়ী যিনি লিখেছিলেন, বাঁকে লিখেছিলেন, তাৰা দুঃজনেই মৃত । একমাৰি বিজনবিহারীবাবুই ব্যাপারটা জানেন । অতএব অন্য কেউ ওটা চুৱি কৰতে যাবে কেন ?

অৰ্জুন এসব কথা ভাবলৈও যেটা উড়িয়ে দিতে পাৱছিল না সেটা হল বৃন্দেৰ গলার স্বৰ । খুব বড় অভিনেতা না হলে ওই অসহায় অবস্থা গলায় ফোটানো

সন্তুষ্ট হবে না ।

এখন আলো কুটে গিয়েছে, কিন্তু কারও বাড়িতে যাওয়ার সময় এটা নয় । অর্জুন দেখল জগদ্বা হেঁটে চলেছেন দ্রুত পায়ে । সে চায়ের দোকান থেকে বেরিয়ে ওঁর সামনে দাঁড়াতেই জগদ্বা খুব অবাক, “আরে তুমি ! সাতসকালে এখনে কী করছ ? তোমার তো মর্নিং-ওয়াকের অভ্যন্তর নেই !”

“ঘুম আসছিল না, তাই । কেমন আছেন ?”

“আছি । আর তো বেশিদিন চাকরি নেই । তার মানে জীবনটাও বেশিদিন নেই !”

“যাঃ । এসব কী বলছেন ?”

“না হে এটাই সত্যি । কেসটেস কীরকম পাছ ?”

“মোটামুটি । আচ্ছা জগদ্বা, বিজনবিহারী ঘোষ সম্পর্কে আপনি কিছু জানেন ?”

“বিজনবিহারী ? এক্স টি-প্লান্টার ?”

“হ্যাঁ । শিল্পসমিতি পাড়ায় থাকেন ।”

“হয়ে গেল বেড়ানো । হারুদা, দু’ কাপ চা ।” জগদ্বা হাঁক দিলেন ।

“তাহি এইমাত্র খেয়েছি ।”

“আহং, ভোরে দু’ কাপ চা আরামসে খাওয়া যায় । যে-নামটা তুমি করলে, সেই নাম কেউ ভোরবেলায় উচ্চারণ করত না । বলত, দিনটা খারাপ যাবে । প্রচণ্ড কিপটে ছিলেন ।”

“উনি তো এখনও বেঁচে আছেন !”

“আছেন, তবে শুনেছি পক্ষাঘাতগ্রস্ত । ওঁর সম্পর্কে কী জানতে চাও ?”

“ওঁরা তো পূর্ববাংলা থেকে এসে চা বাগান তৈরি করেছেন ?”

“জলপাইগুড়ির বেশিরভাগ মানুষই পূর্ববাংলা থেকে এসেছেন । একসময় রাজশাহী, রংপুর জেলার মতো জলপাইগুড়িকেও পূর্ববাংলার সঙ্গে ধরা হত । ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে বৃহাম নামে এক সাহেব তিস্তা নদীর ধারে গাজোলডোবা বলে একটা জায়গায় প্রথম চা বাগান পত্তন করেন । প্রথম দিকে ইংরেজরা এই জেলার সব ভাল-ভাল জমি দখল করে নিয়ে একটার পর একটা চা বাগান তৈরি করেছেন । বাঙালিরা এল অনেক পরে । তবে রহিম বক্স জলচাকার কাছে প্রথম বাঙালি হিসেবে যে চা বাগান পত্তন করেন, সেটা ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে । ভদ্রলোকের আদি বাড়ি ছিল নোয়াখালি জেলায় । কাছাকাছি সময়ে আর-একটি নাম পাওয়া যায়, তিনি বিহারীলাল গাঙ্গুলি । প্রথম যৌথ কোম্পানি হল মোগলকাটা চা বাগান । তবে রহিম বক্স, গোপাল ঘোষ, জয়চন্দ্র সান্ধ্যালীরা যে কাজ শুরু করেছিলেন তাকে সার্থক করে তোলেন তারিণীপ্রসাদ রায় বেং মৌলবী মোশারফ হোসেন । এই বিজনবিহারীর বাবা গগনবিহারীও সেই সময় চা-শিল্পে যুক্ত হন । ওঁদের একাধিক বাগান ছিল । গগনবিহারী মারা যাওয়ার

পর বিজনবিহারী হাল ধরেন।” হারুদার দেওয়া চায়ে চুমুক দিলেন জগন্মা, “তখন জলপাইগুড়ি শহরের রমরমা অবস্থা। শিল্পপতিরা যেমন ভাল ব্যবসা বুঝতেন তেমনই শহরের মানুষের প্রয়োজনে এগিয়েও আসতেন। খেলাধুলো এবং সংস্কৃতি জগতে এঁদের অবদান ভোলার নয়। বিশেষ করে সত্যেন্দ্রপ্রসাদ রায় এবং বীরেন ঘোষ মশাইয়ের তো তুলনা হয় না। জলপাইগুড়ির প্রাণ ছিলেন এঁরা। কিন্তু বিজনবিহারী শহরের জন্য কিছুই করেননি। নিতান্ত বাধ্য না হলে তিনি কোনও ভাল কাজের জন্য একটি পয়সাও খরচ করতেন না। ঠিক কিপটে বললে কম হবে, তিনি ছিলেন সংকীর্ণমন। আর ওঁর ছেলেরা তো বাগান তুলেই দিল। যা ছিল সব উড়িয়ে এখন কলসি গড়িয়ে থাচ্ছে।” চা শেষ করে জগন্মা যেন খেয়াল করলেন, “তা এত লোক থাকতে তুমি হঠাৎ এই মানুষটির খবর নিছ কেন? কিছু হয়েছে?”

অর্জুন মাথা নাড়ল, “হ্যাঁ। উনি একটা ব্যাপারে সাহায্য চাইছেন।”

“আইনসম্মত হলে করো। তবে নিজের পারিশ্রমিক বুঝে নেবে।”

অর্জুন হাসল। এখনও সে এই ব্যাপারটায় পেশাদার হতে পারেনি। অনেকেই কেস নিয়ে আসে। কাজটা হয়ে গেলে প্রশ্ন করে, কত দিতে হবে? অর্জুন, যা বলা উচিত তার চেয়ে অনেক কম বলে চক্ষুজ্ঞার কারণে। আর প্রচণ্ড খাটুনির পরে যদি কাজটার সুরাহা না হয়, তা হলে পয়সা চাওয়াও যায় না, খাটুনিটাই বৃথা যায়। কিন্তু অন্য বৃত্তির মানুষ তা সত্ত্বেও নিজের দক্ষিণা নেন। মামলায় হেরে গেলেও উকিলকে টাকা দিতে হয়, ডাঙ্কার রোগ সারাতে না পারলেও ফি নিতে ছাড়েন না। তা ছাড়া আর-একটা সমস্যা আছে। তাকে এক-একসময় এক-একবরকম কাজ করতে হয়। সব কাজের গুরুত্ব সমান নয়। তাই সবার কাছে এক দরে দক্ষিণা চাওয়াও যায় না। তবে জগন্মা যখন সতর্ক করলেন, তখন কথাটাকে সে নিশ্চয়ই মনে রাখবে। এবার আর বোকামি নয়।

সকাল নটা নাগাদ লাল বাইক চালিয়ে অর্জুন বিজনবিহারীবাবুর বাড়ির সামনে পৌঁছে গেল। দোতলায় চোখ তুলতেই সে লক্ষ করল, একটি আঠারো-উনিশ বছরের মেয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে তাকে লক্ষ করছে। মেয়েটি বেশ ফরসা এবং ফরসা মেয়েদের দূর থেকে সুন্দরী বলেই মনে হয়। মেয়েটি নিশ্চয়ই বিজনবিহারীবাবুর নাতি। সে গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকতেই ওপর থেকে মেয়েটি সামান্য ঝুঁকে জিজেস করল, “আপনি কাকে চান?”

“বিজনবিহারীবাবু আছেন?”

“উনি এখন বিশ্রাম করছেন।” মেয়েটির মুখ স্পষ্ট দেখতে পেল অর্জুন। মুখে বন্ধ দাগ থাকলেও দেখতে ভালই। অর্জুন বলল, “আমার একটু দরকার ছিল।”

“আপনি ওখানে দাঁড়ান।” মেয়েটি সরে গেল।

অর্জুন সেই ভৃত্যটিকে কোথাও দেখতে পেল না। সকাল নটায় কেউ

বিশ্রাম করছে বলে দেখা করবে না, কেউ শুনেছে কখনও ? বিজনবিহারীবাবু বলেছিলেন যে, ওঁর সঙ্গে পরিচয় আছে অথবা উনি যে আসতে বলেছেন তা যেন কেউ জানতে না পাবে ।

“কাকে চাইছেন ভাই ?”

প্রশ্ন শুনে অর্জুন দেখল মধ্যবয়সী এক ভদ্রলোক নেমে এসেছেন । এই সকালেও ওঁর পরনে পাটভাঙ্গ পাজামা-পাঞ্জাবি । চেহারায় বিজনবিহারীবাবুর আদল আছে ।

“আমার নাম অর্জুন । আমি বিজনবিহারীবাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাই ।”

“প্রয়োজনটা কী জানতে পারি ?”

“আপনি ?”

“আমি ওঁর ছেলে । এই শহরে তো সবাই আমাদের চেনে ? আপনি এখানে থাকেন না ?”

“থাকি । কিন্তু চেনার সৌভাগ্য হয়নি ।”

“আপনি কী করেন ?”

“আমার কাজ সত্য-অনুসন্ধান করা । আমাকেও এই শহরে সবাই জানে ।”

“ওহো । হ্যাঁ । প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর । জলপাইগুড়ির মতো ছেট শহরের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা খুব বড় ধরনের । আসুন এই ঘরে, কথা বলি । আমি গগনবিহারী ঘোষ ।” বলতে-বলতে পাশের একটি ঘরের দরজা খুলে ভদ্রলোক ভেতরে ঢুকে পড়লেন ।

একটা শ্রেতপাথরের গোল টেবিল, চারপাশে চারটে চেয়ার । গগনবিহারী ইঙ্গিত করতেই অর্জুন চেয়ার টেনে বসল । গগনবিহারী বসে জিজ্ঞেস করলেন, “ব্যাপারটা কী ?”

“বাংলাদেশের ঢাকা শহরের একজন বিখ্যাত ব্যারিস্টার আমার ওপর ভরসা করছেন । তিনি কালীগঞ্জের নুটুবিহারী ঘোষমশাই-এর যেসব বৎশথর জলপাইগুড়িতে আছেন তাঁদের সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চান । পুলিশের মাধ্যমে খোঁজখবর নিতে চান না তিনি । নুটুবিহারী ঘোষের ছেলের নাম পবনবিহারী । তাঁর খোঁজ নিতে আমি আপনাদের কথা জানতে পারলাম । আপনার বাবা যখন এখনও জীবিত, তাই তাঁর সঙ্গে কথা বলতে আমি এসেছি ।” অর্জুন বেশ গুছিয়ে কথাগুলো বলল ।

গগনবিহারীর মুখ-চোখ বদলে গেল । কয়েক মুহূর্তের জন্য বিশ্বাস ফুটে উঠলেও নিজেকে ঠিক সামলে নিলেন তিনি, “কী ব্যাপারে খোঁজখবর, বলুন তো ?”

“বিশদ আমিও জানি না । উনি আমাকে লিখেছেন যে, লক্ষ লক্ষ টাকার বিষয়সম্পত্তির সুষ্ঠু ভাগ নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে । এক্ষেত্রে নুটুবিহারীর তরফের বৎশথরদের অবস্থান জানা অত্যন্ত প্রয়োজন । আমার নাম তিনি এক

পরিচিতের মুখে শুনেছেন বলে অনুরোধটা করেছেন।”

“লক্ষ-লক্ষ টাকার বিষয়সম্পত্তি ? বাংলাদেশে। ওসব তো এনিমি’জ প্রপার্টি !”

“বোধহয়, না। আপনাদের আঙ্গীয়রা বাংলাদেশ ছেড়ে চলে আসেনি অথবা সেসব সম্পত্তি জবরদস্তও হয়ে যায়নি। অবশ্য আমার পক্ষেও এখান থেকে কিছু বলা সম্ভব নয়।”

“উনি কি আমাদের যেতে লিখেছেন ?”

“না। এখনও লেখেননি।”

“আপনার কি মনে হয় আমরা ওই সম্পত্তির ভাগ পাব ?”

“সেরকমই তো ইঙ্গিত দেখছি।”

“ক’দিন থেকেই আমার ডান চোখটা নাচছিল। আসুন, আমার সঙ্গে ওপরে আসুন। বাবা তো হাঁটতে পারেন না। ওপরেই আছেন।” গগনবিহারীর ভাবভঙ্গি একদম বদলে গেল। অর্জুনকে নিয়ে তিনি ওপরে উঠতেই মেয়েটিকে দেখা গেল। বারান্দায় একটা চেয়ারে বসে বই পড়ছে। গগনবিহারী হাসিমুখে বললেন, “টুকু, একে চিনিস ? বিদ্যুত গোবেন্দা। অর্জুন !”

মেয়েটি উঠে দাঁড়াল, “ও। আপনার কথা আমার বন্ধুরা খুব বলে। আপনি আমেরিকায় গিয়েছিলেন না ? একটা লাইটারের রহস্য সমাধান করেছিলেন ?”

“ওই আর কি !”

গগনবিহারী বললেন, “বাঃ, স্টেট্স ঘুরে আসা হয়ে গেছে ? বাংলাদেশ তো নস্যি। আসুন, বাবা ওই ঘরে আছেন। বাবা, আপনার সঙ্গে একজন দেখা করতে এসেছে।”

গগনবিহারী এগিয়ে যেতেই অর্জুন মেয়েটির দিকে তাকাল। মেয়েটির মুখ আচমকা পালটে গেল। গভীর হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিল সে।

বিজনবিহারীবু সত্তিকারের অভিনেতা। এমন মুখে তাকালেন, যেন এর আগে তিনি কখনও অর্জুনকে দেখেছেন বলে মনে হল না। বিছানার মাঝখানে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। বললেন, “কী ব্যাপার ?”

গগনবিহারী বললেন, “বাংলাদেশের বিষয়সম্পত্তি নিয়ে কিছু কথা বলতে এসেছেন। ওখানে নাকি লক্ষ-লক্ষ টাকার প্রপার্টি পড়ে আছে, যার একটা অংশ আমাদেরও।”

অর্জুন হাত তুলল, “আমি কিন্তু এ-কথা বলিনি। আমাকে জানানো হয়েছে যে, ওই প্রপার্টি নিয়ে বিতর্ক শুরু হওয়ায় আপনাদের খোঁজ নেওয়া হচ্ছে।”

“ইনি কে ?” বিজনবিহারী প্রশ্নটা করতেই অর্জুনের মনে হল চিটি চুরি যাওয়ার ব্যাপারটা বানানো।

গগনবিহারী বললেন, “ঁর নাম অর্জুন। এই শহরের একমাত্র প্রাইভেট ইনভেন্টিগেটার। খুব নাম করেছেন। স্টেট্সেও গিয়েছেন। সবাই একে

চেনে । ”

“বয়স দেখছি খুবই অল্প । তুমি বলছি, বোসো । ”

অর্জুন চেয়ারে বসল । এই সময় চাকরটি এক গ্লাস শরবত ট্রেতে নিয়ে চুকল । অর্জুনের দিকে তাকাতেই তার মুখে চেনা ছাপ ফুটে উঠল । অর্জুন মুখ ঘূরিয়ে নিতেই সে ট্রে বিজ্ঞানায় বিজ্ঞবিহারীবাবুর সামনে নামিয়ে রেখে ঘর থেকে চলে গেল ।

বিজ্ঞবিহারীবাবু জিজ্ঞেস করলেন, “কী ব্যাপার ?”

“আপনাদের কোনও আত্মীয়স্বজ্ঞন এখনও বাংলাদেশে আছেন ?”

“হ্যাঁ । আমার ঠাকুর্দার ভাইয়েরা আছেন বলে জানি । ”

“শেষ করে আপনি ওখানে গিয়েছেন ?”

“ঠাকুর্দার মৃত্যুর পর যাইনি । তাও ষাট বছর হয়ে গেল । ”

“ওঁদের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ আছে ?”

“না । তবে আমার এক সম্পর্কিত ভাই বছর কুড়ি আগে এসেছিল অর্থসাহায্য নিতে, আমি দিইনি । একরাত ছিল সে । অবস্থা খারাপ না হলে কেউ সাহায্য চাইতে এতদূরে আসে না । ”

“চা ব্যবসা আপনার বাবা শুরু করেছিলেন ?”

“হ্যাঁ । ”

“তিনি টাকা পেলেন কোথায় ?”

“ঠাকুর্দার কাছ থেকে পেয়েছেন । ”

“আপনাদের তো যৌথ পরিবার ছিল । ঠাকুর্দার অর্থে তো তাঁর ভাই দাবি করতে পারেন । কখনও করেননি ?”

“হ্যাঁ । করেছিলেন । বাবা সেসব পাইপয়সায় শোধ করে গিয়েছিলেন । ”

“ও । তা আপনি এখনকার কোনও আত্মীয়ের নাম মনে করতে পারেন না, যাঁরা ওখানে থাকেন ? একটু ভেবে বলুন । ” অর্জুন জিজ্ঞেস করল ।

“ওই তো, যে ছেলেটি এসেছিল সাহায্য চাইতে, তার নাম মনে আছে । বিমানবিহারী । অবশ্য এখন তার বয়স আমার ছেলের সমান হবে । ”

“আপনার বাবার নাম পবনবিহারী । তাঁর কয় ছেলে ?”

“আমিই একমাত্র সন্তান । ”

“আপনার ছেলে-মেয়ে ?”

“দুজন ছিল । এখন একজন বলেই মনে করতে পারেন । ”

“আর-একজন কি মারা গিয়েছেন ?”

“না, তার সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই । ”

“তিনি কোথায় আছেন ?”

“আমি খবর রাখি না । ”

“আপনার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হিসেবে... !”

“আমি একটা উইল করেছিলাম কয়েক বছর আগে, তাতে তার নাম নেই।”

গগনবিহারী মনোযোগ দিয়ে এসব কথা শুনছিলেন, হঠাৎ বললেন, “আবশ্য দাদাকে বাবা এখনও আইনসম্মতভাবে ত্যাগ করেননি। আমি বলছি আদালতে গিয়ে ...।”

বিজনবিহারী মাথা নাড়লেন, “তার কোনও প্রয়োজন হয় না। উইলে আমি যার নাম লিখব, সেই বিষয়সম্পত্তি পাবে। আর বিষয় বলতে রেখেছো বা কী! সবই তো উড়িয়ে দিয়েছ।”

অর্জুনের মনে হল, গগনবিহারী ইশারা করলেন এ-বিষয়ে কথা না বলতে।

তিনি অর্জুনের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন বলে ওঁকে ভাল করে দেখার জন্য মুখ ফেরাতেই তিনি বললেন, “আপনি বসুন, আমি একটু আসছি।”

গগনবিহারীর চলে যাওয়াটাও অস্বাভাবিক। বিশেষ করে চিঠি চুরির সঙ্গে উনি যদি যুক্ত থাকেন তা হলে কখনওই অর্জুনকে একা তাঁর বাবার সঙ্গে রেখে যাবেন না। কথাবার্তা যা হচ্ছে শুনতে চাইবেন। তিনি চলে গেলে অর্জুন বলল, “আমার পক্ষে এই অভিনয় করা সম্ভব নয়।”

“আমার জন্য করো ভাই। এই বাড়িতে শক্রবেষ্টিত হয়ে আছি।”

“শক্র? এই ছেলেকেই তো সব কিছু দিয়ে যাচ্ছেন।”

“আমি এখনও যাচ্ছি না। যাওয়ার দেরি আছে অনেক। হ্যাঁ, একটা উইল করেছিলাম, এবার সেটাকেও পালটাতে চাই। কিন্তু চিঠিটা হাতছাড়া হওয়ার পর আমার মন ভেঙে গেছে। কুড়ি লক্ষ টাকার সম্পত্তি মাটির তলায় পড়ে আছে, আর এই হতভাগা সেগুলো ঠিক তুলে আনবে।” বিজনবিহারী ফোঁস করে নিষ্পাস ফেললেন।

“আশ্র্য! আপনি নিজে যদি ওগুলো পেতেন তা হলে পরে আপনার ছেলেই মালিক হত!”

“সে আমি ভেবে দেখতাম। এখন ও তো সব জেনে গেল ...!”

“আপনি ওঁকে জিজেস করেছেন চিঠির কথা?”

“হ্যাঁ। বলেছিলাম আমার ব্যাগ থেকে একটা কাগজ খোয়া গিয়েছে। সে জানে কি না? বলল, আমার ব্যাগে এই জীবনে হাত দেয়নি।”

“এ-ঘরে আর কে-কে আসে?”

“পুত্রবৃৃ আসেন না। শ্বশুরের প্রতি তাঁর কোনও শ্রদ্ধাভক্তি নেই। টুকু, আমার নাতনি, আসে। সে একটি ছেলেকে পছন্দ করে। ছেলেটিকে আমি দেখিনি। তার মা-বাবা ব্যাপারটা জানেন না। জানলে রেগে যাবেন। সেইজন্যই টুকু আমার সাহায্য চায়। স্বার্থ নিয়েই আসে।”

“ছেলেটি কী করে?”

“কদম্বতলায় একটা সাইকেল রিপেয়ারিংয়ের দোকান আছে। নাম কাজল।” বলতে-বলতে সচাকিত হলেন, “ওঁ, তুমি বড় আজেবাজে কথা

বলছ ! চিঠি চুরির সঙ্গে কাজলের কী সম্পর্ক ?”

“আমার মনে হচ্ছে আপনার চিঠি চুরি যায়নি ।”

“তার মানে ?” এবার যেভাবে চমকালেন, তাতে বোঝা যাচ্ছে বিজনবিহারী অভিনয় করছেন না, “আমি তোমাকে বানিয়ে-বানিয়ে এসব বলছি ?”

“চিঠিটা যদি সত্যি চুরি গিয়ে থাকে, তা হলে আপনার বাড়ির সবাইকে আমার জেরা করা দরকার । অথচ আপনি চাইছেন ব্যাপারটা গোপনে থাকুক । এক্ষেত্রে আমি কী করতে পারি ?”

“তাই বলে আমাকে বদনাম দেবে ?” প্রশ্ন করামাত্র বিজনবিহারী মুখ ফিরিয়ে নিতেই অর্জুন দেখল ওঁর ছেলে ঘরে চুকছেন । অর্জুন বলল, “আপনাকে সন্দেহ করি না, বদনাম দেওয়ার প্রশ্ন নেই । আপনি প্রবীণ মানুষ । কিন্তু আমাকে অস্তত একটা প্রমাণ দেখান ।”

“কী প্রমাণ দেখতে চাইছেন আপনি ?” এবার গগনবিহারী প্রশ্ন করতেই বিজনবিহারীর মুখ ফ্লাকাসে হয়ে গেল । অর্জুন হাসল, “আপনার বাবাকে জিজ্ঞেস করেছি যে, নুটুবিহারী ঘোষের সঙ্গে ওঁর অথবা ওঁর বাবার যে সম্পর্ক ভাল ছিল, তার কোনও প্রমাণ দিতে ।”

“এই প্রমাণ কীভাবে দেওয়া যায় ! ওঁরা তো অনেককাল মারা গিয়েছেন ।”

“কাগজপত্র নেই ? আপনাদের কিছু দান করে যাননি ? আপনাদের মানে আপনার ঠাকুর্দা অথবা ওঁকে ? যা থেকে বোঝা যাবে সম্পর্ক ভাল ছিল !”
অর্জুন বানিয়ে যাচ্ছিল প্রশ্নগুলো ।

গগনবিহারী বললেন, “এটা বাবা বলতে পারেন ।”

বিজনবিহারী ততক্ষণে সামলে নিয়েছেন । অর্জুনকে চাহনি দিয়ে তারিফ করলেন । তারপর বললেন, “হ্যাঁ । চিঠিপত্র দেওয়া-নেওয়া ছিল । বাবা প্রতি সপ্তাহে ঠাকুর্দাকে চিঠি লিখতেন । উনিও সবার খোঁজ-খবর নিতেন । কিন্তু সেসব চিঠি এতই সাধারণ যে, বাবা জমিয়ে রাখার কথা ভাবেননি । আমিও না । বাবার যা কাগজপত্র, তা ওই আলমারিতে ছিল । সেদিন ভবাকে দিয়ে সব নামিয়ে নেড়েচেড়ে দেখছিলাম । ঠাকুর্দার চিঠি পেয়েছি বলে মনে হয় না ।”

“সেটা খুব দরকার হবে । আরও ভাল করে খুঁজে দেখুন । আজ আমি উঠি ।” অর্জুন উঠে দাঁড়াতেই গগনবিহারী হাঁ-হাঁ করে বাধা দিলেন, “এ-বাড়িতে এসে একটু মিষ্টিমুখ না করে যাওয়া চলবে না । আমার মেয়ের ভাল বিয়ে হবে না ভাই ।”

“অনেক ধন্যবাদ । কিন্তু আমি মিষ্টি একদম ভালবাসি না ।”

বিজনবিহারী বললেন, “আমার নাতনিও মিষ্টি খেতে চায় না । তাতে তার ফিগার খারাপ হয়ে যাবে । তোমারও কি সেই এক চিষ্টা ?”

“না ।” অর্জুন দরজার দিকে এগোল, “আবার হয়তো আপনার কাছে আসতে হবে ।”

বিছানায় বসেই বিজনবিহারী বললেন, “ওই বিশ্রামের সময়টুকু বাদ দিয়ে এলে কথা হবে।”

বারান্দায় বেরিয়ে গগনবিহারী ছাড়লেন না। এককাপ চা খেয়ে যেতেই হবে। অতএব পাশের ঘরে চুক্তে হল অর্জুনকে। এটাই এঁদের বসার ঘর। কারণ কোনও খাট দেখা যাচ্ছে না। ঘরের মাঝখানে একটা সোফাসেট রয়েছে। অর্জুনকে বসিয়ে গগনবিহারী বেরিয়ে গেলেন। ঘরে কোনও ছবি নেই। জলপাইগুড়ির বড়লোকদের বাড়িতে এমনটা দেখা যায় না।

“আমার স্ত্রী, আরতি, একটু আগে এর কথা বলছিলাম অর্জুন।”

অর্জুন নমস্কার করল। ভদ্রমহিলা হাতজোড় করলেন। বললেন, “বসুন। কী খাবেন, চা, না কফি? আপনাদের এই শহরে ভাল কোন্ত ড্রিন্কস পাওয়া যায় না।”

“চা।” অর্জুন বলতেই মহিলা বেরিয়ে গেলেন। সন্তুষ্ট হ্রস্ব করতে। কিন্তু অর্জুন বিশ্বিত! জলপাইগুড়ি শহরের কোনও মহিলা এই সাতসকালে এত সেজেগুজে বাড়িতে বসে থাকেন বলে সে জানে না। ভদ্রমহিলা কি একাই কোথাও বের হচ্ছেন? চলিশের ওপর বয়স। কিন্তু মাথা থেকে পা পর্যন্ত তিনি সাধারণ বাংলি মহিলাদের থেকে নিজেকে আলাদা করে রেখেছেন।

গগনবিহারী সোফায় বসে বললেন, “মুশকিল হল বাবার শরীর খারাপ হওয়ার পর থেকে সব কথা মনে থাকে না। বয়সও অনেক হল।”

আরতি দেবী ফিরে এলেন। সোফায় বসে বললেন, “কীরকম টাকা পাওয়া যাবে?”

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “কোন টাকার কথা বলছেন?”

“ওই যে, ও বলল বাংলাদেশে নাকি এখনও সম্পত্তির শেয়ার আছে।” কথাগুলো বলতে-বলতে আরতি দেবী স্বামীর দিকে তাকালেন।

অর্জুন বলল, “আমি সে কথা একবারও বলিনি। সেখানে বিষয়সম্পত্তি নিয়ে বিতর্ক দেখা দেওয়ায় আপনাদের সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়েছে। কী হবে তা আমার জানা নেই।”

আরতী দেবী কাঁধ নাচালেন, “তাই বলুন। আমাকে এমনভাবে বলা হল।”

গগনবিহারী বললেন, “শেয়ার না দিলে কেন খোঁজ-খবর করবে। আপমার কথা শুনে মনে হচ্ছে একবার ঢাকায় গেলে হত।”

আরতি দেবী মাথা নাড়লেন, “কক্ষনো না।”

“না, মানে বেড়াতেও তো যাওয়া যেতে পারে।”

আরতি দেবী বললেন, “আমার বোনেরা ইউরোপ-আমেরিকায় বেড়াতে যায়। আমি কোথাও যেতে পারি না সেটা এক জিনিস, কিন্তু বিদেশ বলতে ঢাকায় যাচ্ছি তা আমি কাউকে বলতে পারব না। বলুন তো, ঢাকা কি একটা বেড়াতে যাওয়ার জায়গা হল?”

অর্জুন বলল, “আমি শুনেছি ঢাকা খুব আধুনিক শহর।”

চা এল। সেটা খেয়ে অর্জুন উঠে পড়ল। ভদ্রমহিলা বারংবার অনুরোধ করলেন ও-বাড়িতে যাওয়ার জন্য। বিয়ের পর জলপাইগুড়িতে এসে ভাল করে কথা বলার মানুষ পাননি তিনি। অর্জুন যখন বিলেত-আমেরিকায় গিয়েছে, তখন সেসব গল্প শোনা যেতে পারে।

গগনবাবু গেট পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেলেন। অর্জুন বাইক চালু করার সময় দোতলার বারান্দার দিকে তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেল না। ব্যাপারটা একটু অস্তুর। বাড়ির সবাই তার সঙ্গে আলাপ করেছে! শুধু টুকু নামের মেয়েটি এড়িয়ে গেল! ওকে দেখে খুব লাজুক বলে মনে হয় না।

ব্যাপারটা নিয়ে অর্জুন মাথা ঘামানো ছেড়ে দিয়েছিল। ওর ক্রমশ বিশ্বাস হচ্ছিল, পুরো ব্যাপারটাই বিজনবিহারীবাবুর বানানো গল্প। সময় কাটাতে এমন একটা কাণ্ড তিনি করেছেন। যদিও তারপরেও ক'দিন হঠাৎ-হঠা�ৎ টেলিফোন করে জিজ্ঞেস করেছেন কোনও হাদিস পাওয়া গেল কি না, কিন্তু অর্জুন উৎসাহিত হয়নি। কিন্তু শেষপর্যন্ত তাকেও ভাবতে হল।

॥ তিন ॥

জলপাইগুড়ির সদর থানার দারোগা অবনীবাবুর সঙ্গে গল্প করা অর্জুনের এখন অভ্যেসের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছে। পুলিশের কিছু লোক এখনও বইপত্র পড়েন। অবনীবাবু তাঁদের একজন। কিন্তু তিনি প্রায়ই অর্জুনকে বলেন, “দুর মশাই, আপনি নিজেকে নষ্ট করছেন। এই শহরে না থেকে কলকাতায় চলে যান। টাকা হবে, নামও হবে।”

অর্জুন কখনওই জবাব দেয় না। মিটিমিটি হাসে।

আজ সঙ্কেবলোয় চায়ের কাপে আড়তা জমেছিল। অবনীবাবু বললেন, “আজ একটা দারুণ দিন। ঘূম থেকে ওঠার পর থেকে এখন পর্যন্ত কোনও ক্রাইম হয়নি এ-শহরে।”

অর্জুন বলল, “এখন ছ'টা বেজে পঁয়তালিশ। রাত বারোটা পর্যন্ত তারিখ বদলাবে না।”

“জানি। কিন্তু আমার মন বলছে তেমন কিছু হবে না আজ।” অবনীবাবু চোখ বন্ধ করলেন। এই সময় একটি ছেলে দরজায় এসে দাঁড়াল, “আসতে পারি?”

চোখ খুললেন অবনীবাবু, “অবশ্যই।”

ছেলেটি ঘরে ঢুকল। জিন্সের ওপর হলুদ টি-শার্ট। মাথার চুল প্রায় কাঁধ পর্যন্ত স্টাইল করে রাখা। ছেলেটি বলল, “আমার নাম কাজল মুখার্জি। কদমতলায় আমাদের একটা দোকান আছে। এর আগে আপনার সঙ্গে

কয়েকবার কথা হয়েছিল।” ছেলেটির মুখভর্তি সাজানো দাঢ়ি।

“আপনি একটা ফুটবল ক্লাবের সঙ্গে জড়িত?” অবনীবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

“হ্যাঁ। আমি কিছুদিন আগে পাশপোর্টের জন্য দরখাস্ত করেছিলাম। ওরা বলছে পুলিশের রিপোর্ট পেলেই পাশপোর্ট ইসু করবে। রিপোর্টটা যদি দয়া করে পাঠান।” ছেলেটি চেষ্টা করছিল ভদ্র গলায় কথা বলতে। বলার সময় দাঢ়িতে হাত বোলাচ্ছিল।

“আমার এখানে কোনও কাজ পেতিং থাকে না কাজলবাবু। তবু আপনি যখন বলছেন তখন একটু অপেক্ষা করুন, আমি খোঁজ নিয়ে দেখছি।” বেল বাজিয়ে সেপাইকে ডেকে অবনীবাবু হৃকুম দিলেন পাশপোর্ট-সংক্রান্ত এনক্যুয়ারিন ফাইল আনতে।

অর্জুন লক্ষ করছিল কাজল মুখার্জিকে। নামটা তার খুব চেনা-চেনা লাগছিল। সে ফট করে জিজ্ঞেস করল, “কদমতলায় আপনাদের কিসের দোকান?”

কাজল জবাব দিল, “সাইকেল রিপেয়ারিংয়ের।”

এবং তখনই মনে পড়ল তার। বিজনবিহারীবাবু তা হলে এরই কথা বলেছিলেন। বিজনবিহারীর নাতনি টুকুকে বিয়ে করতে চায় এই ছেলেটি।

ইতিমধ্যে ফাইল এসে গেল। অবনীবাবু বিশেষ রিপোর্টটি খুঁটিয়ে দেখেছিলেন। মুখ তুলে বললেন, “কিন্তু কাজলবাবু, আপনি দরখাস্তে লিখেছেন স্কুল ফাইনাল পাশ করেছেন, কিন্তু লেখেননি হয়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা দেওয়ার সময় নকল করার অভিযোগে আপনাকে পরীক্ষা দিতে দেওয়া হয়নি। তাই না?”

কাজল দাঁড়িয়ে ছিল। বলল, “ফর্মে লেখা আছে এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন কী? আমার যা, তাই লিখেছি। বাড়তি কিছু লিখিনি।”

“হ্ম।” অবনীবাবু মাথা নাড়লেন, “সাব ইনস্পেক্টর লিখেছেন আপনি এর আগে দুটো মারামারিতে জড়িয়ে ছিলেন। তার একটাতে মার্ডার পর্যন্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু প্রমাণের অভাবে আপনাকে ধরা হয়নি।”

“একদম বাজে কথা। একটা ফুটবল-সংক্রান্ত ব্যাপার এবং আমি তখন শহরে ছিলাম না। দ্বিতীয়টা ইলেকশনের সময়। আমার কোনও ভূমিকা ছিল না।” কাজল বলল।

“আপনি পাশপোর্টের জন্য চেষ্টা করছেন কেন?”

“প্রথম কথা, যে-কোনও নাগরিকের একটা পাশপোর্ট থাকা উচিত। দ্বিতীয়ত, আমি কয়েকদিনের জন্য বাংলাদেশে যেতে চাই।”

“বাংলাদেশে কেন?” অবনীবাবু ফাইলে কিছু লিখেছিলেন, “সেখানে কি আপনার কোনও আঘাত আছেন? বাংলাদেশের কোথায় যাবেন?”

“ঢাকা এবং কালীগঞ্জে। ওখানে যাব বেড়াতে। আমার কোনও আঞ্চলিক ওখানে নেই। আমরা পশ্চিমবঙ্গের লোক।” কাজল বলল।

অবনীবাবু বললেন, “আপনার কপাল খুব ভাল।”

কাজল বলল, “আপনার কথা বুঝতে পারছি না।”

অবনীবাবু হাসলেন, “আজ আমি কারও পেছনে শুধুই সন্দেহের বশে লাগব না। আই ওয়ান্ট টু কিপ দি ডে ক্লিন। তবে দেখবেন এরপর যেন কোনও ঝামেলায় না জড়ান।”

কাজল ধন্যবাদ দিয়ে চলে গেল। চুপচাপ বসে এঁদের কথাবার্তা শুনে যাচ্ছিল অর্জুন। এবার বলল, “অবনীবাবু, আপনার এলাকায় আজ কোনও অপরাধ হবে কিনা জানি না, তবে আমি কাজ পেয়ে গেলাম।”

অবনীবাবু বললেন, “তার মানে ?”

“আমি একটা টেলিফোন করতে পারি ?”

“অবশ্যই।”

এখন জলপাইগড়িতে অপারেটারের মাধ্যমে কানেকশন চাইতে হয় না। একবারেই অর্জুন লাইন পেয়ে গেল। বিজনবিহারীবাবু রিসিভার তুলে বললেন, “কে বলছেন ?”

“আমি অর্জুন।”

“হ্যাঁ। কিছু জানতে পারলে ?”

“শুনুন। আমি আপনার কেসটা নেব বলে এখন ঠিক করলাম।”

“তার মানে ? তুমি আমার ব্যাপারটা এতদিন ভাবনি ?”

“না। কিন্তু এখন থেকে ভাবতে হবে।”

“আমি তোমার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।”

“খুবই সরল ব্যাপার। আমি কেসটা নিছি। আপনি সমস্ত খরচ দেবেন তো ?”

“দ্যাখো ভাই, কে চুরি করেছে তা যদি ধরতে পারো তার জন্য যা পাবে তা নিশ্চয়ই ওসব জিনিস ওখান থেকে তুলে আমার কাছে নিয়ে এলে যা দেওয়া উচিত তার সমান হবে না। তুমি বুঝতেই পারছ।”

“আপনি কালই ভবাকে দিয়ে হাজার চারেক টাকা পাঠিয়ে দিন।”

“হাজার চারেক। সে কী !”

“এই টাকার হিসেব আপনাকে দেব।”

“এত টাকা !” বিজনবিহারীবাবু বিড়বিড় করলেন।

“আপনি নিশ্চয়ই আমাকে পকেটের টাকা খরচ করে তদন্ত করতে বলবেন না।”

“তা তো নয়।” বিজনবিহারীবাবু বললেন, “বেশ। ভবা কাল যাবে।”

রিসিভার নামিয়ে রাখল অর্জুন। অবনীবাবু হতভস্ফ। জিঞ্জেস করলেন,

“কী ব্যাপার বলুন তো ? কাকে ফোন করলেন ?”

“বিজনবিহারী ঘোষ । এক্স টি-প্ল্যান্টার ।”

“আচ্ছা । হঠাতে কী কারণে তাঁর কেস নিলেন ? মনে হচ্ছে আগে রাজি হননি ।” অবনীবাবু কৌতুহলে ফেটে পড়ছিলেন ।

“আগে ভেবেছিলাম কোনও রহস্য নেই । এখন মনে হচ্ছে আছে ।”

“এই কাজল মুখার্জিকে দেখার পর মনে হচ্ছে রহস্য আছে ?”

“এখন পর্যন্ত কোনও ক্রাইম হয়নি । কেন আর প্রশ্ন করছেন ?” অর্জুন উঠে দাঁড়াল ।

অবনীবাবু বললেন, “আপনার রিআকশন ইন্টারেস্টিং ।”

অর্জুন বলল, “আমি যেটা সন্দেহ করছি সেটা যদি সত্যি হয় তা হলে একটা ক্রাইমের সূত্রপাত হচ্ছে । একটু দেখা যাক, তারপর আপনাকে বলব ।”

“

অমল সোম বলতেন, হঠাতে কোনও সূত্র পেয়ে সিদ্ধান্তে ঝাঁপিয়ে পোড়োনা । নানাভাবে সেটাকে বিশ্লেষণ করো, সুযোগ থাকলে অপেক্ষা করো । অর্জুন তাই করবে বলে ঠিক করল ।

কাজলকে থানায় ভাল করে দেখে তার পছন্দ হয়নি । ছেলেটার মধ্যে অঙ্গুত একটা শীতলতা আছে যা অর্জুনকে বিচলিত করছিল । সে সময় পেলেই বাইক নিয়ে কদমতলায় যায় । কাজলের সাইকেল কারখানা খুঁজে পেতে অসুবিধে হয়নি । সকাল-বিকেলে সেখানে যে-ধরনের চেহারার ছেলেরা কাজলের সঙ্গে আড়তা মারে, তাদের কোনও ভবিষ্যৎ ভাবনা নেই তা দেখেই বোঝা যায় । পোশাক দামি এবং যথেষ্ট উদ্বিদ, সিনেমার আর্টিস্টের নকল করা চুল, হাতে বালা । এদের মধ্যে কাজল খুব স্বাভাবিক । অর্জুন ইচ্ছে করেই কাজলের দোকানে যেকেনি । সে ল্যাংড়া-পাঁচকে ধরল । লোকটা এককালে এই শহরের বিখ্যাত তলা-খুলিয়ে ছিল । টাকা নিয়ে চোর-ডাকাতদের এ-ব্যাপারে সাহায্য করত সে । অর্জুন তাকে একটা সময় বাঁচিয়ে দিয়েছিল । ওকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়েছিল আর ওইসব কাজ করবে না । এখন পর্যন্ত কথা রেখে চলেছে ল্যাংড়া-পাঁচ । কদমতলায় লটারির টিকিট বিক্রি করে সে ।

কাজলের নাম শুনে পাঁচ একটু চুপসে গেল, “কাজলদা হেভি মাস্টান ।”

“তাতে কী হল ?”

“যদি জানতে পারে আমি টিকটিকি হয়েছি, তা হলে মেরে হাড় ভেঙে দেবে ।”

“যতক্ষণ তুমি অন্যায় না করছ ততক্ষণ তোমার কোনও ভয় নেই ।”

“অবশ্য আপনার জন্য আমি সব করতে পারি ।”

“সব করতে হবে না । শুধু লক্ষ রাখবে ও রোজ দোকানে আসে কি না ! ব্যবসার বাইরে কারা-কারা ওর দোকানে আসে । ও কোথাও যাচ্ছে কিনা ।”

অর্জুন বুঝিয়ে বলল ।

বিজনবিহারী টাকটা ভবাকে দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন । কিন্তু তারপরেই তাঁর তাগাদা শুরু হয়ে গেছে । দিনে অন্তত একবার টেলিফোন করে প্রোগ্রেস রিপোর্ট চান । অর্জুন শুধু জিজ্ঞেস করেছিল, “আপনি আপনার নাতনিকে কতখানি বিশ্বাস করেন ?”

“নাতনি ? সে এর মধ্যে আসছে কোথেকে ?” বিরক্ত হলেন বিজনবিহারী ।

“ওই বাড়িতে থাকে বলেই বলছি ।”

“পৃথিবীতে যদি কাউকে বিশ্বাস করি, তবে সে টুকু । ওর সব কথা আমাকে বলে । মেয়েটা ওর মা-বাবার ধরন পায়নি বলে রক্ষে ।”

কথা বাড়ায়নি অর্জুন । কাজলের ঢাকায় যাওয়াটা কাকতালীয় হতে পারে, কিন্তু সে থানায় গিয়ে অবনীবাবুকে পাশপোর্টের জন্য তাদ্বিরের সময় কালীগঞ্জের নাম উল্লেখ করেছিল । কোনও আত্মীয়স্বজ্ঞন যে-দেশে নেই, সেখানে বেড়াতে গেলে কালীগঞ্জের কথা আগে মাথায় আসতেই পারে না । যে হেলে দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা আড়া মেরে কাটায়, সে হঠাৎ উদ্যোগী হয়ে একা বাংলাদেশে বেড়াতে যাবে, এমনটা ভাবাও যায় না । কোনও বিশেষ মতলব ছাড়া ও ওদেশে যাচ্ছে না । আর এই মতলবটা ওকে জুগিয়েছে টুকু । অর্জুনের মনে হচ্ছিল টুকুই বিজনবিহারীবাবুর ব্যাগ থেকে খামটা সরিয়েছে । চিঠি পড়ার পর সে বুঝতে পেরেছে ওর গুরুত্ব । তারপর কাজলকে ব্যাপারটা বলেছে । কাজল ধান্দাবাজ ছেলে । সঙ্গে-সঙ্গে কাজে নেমে পড়েছে । গোয়ালন্দে পৌঁছতে গেলে পাশপোর্ট-ভিসার প্রয়োজন হয় বলে অপেক্ষা করছে এখন ।

দিন-পাঁচেক বাদে এক বিকেলে ল্যাংড়া-পাঁচ এসে হাজির, “কাজলদা নেই ।”

“নেই মানে ?” অর্জুন এইটেই আশা করছিল ।

“গতকাল পিওন একটা রেজিস্ট্রি চিঠি নিয়ে এসেছিল । সেটা পেয়ে খুব খেপে গিয়েছিল কাজলদা । পুলিশকে গালাগাল করছিল । অফিস পিওনকে পরে আলাদা পেয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম কী চিঠি এসেছে । পিওন বলল, পাশপোর্ট অফিস থেকে এসেছে ।”

অর্জুন খুব নিরাশ হল, “তার মানে পাশপোর্ট পায়নি ?”

“না ।”

“তা হলে গেল কোথায় ?”

“তা তো বলতে পারব না । আজ বাড়ি থেকেই দোকানে আসেনি । এখানে আসার আগে আমি একবার ওর দোকানের কর্মচারীকে জিজ্ঞেস করেছিলাম । বলল, দাদা বেড়াতে গেছে বাইরে ।”

“হ্ম । আর কোনও খবর আছে ?”

“না । ও হ্যাঁ । আজ দুপুরে একটি অঞ্জবয়সী মেয়ে দোকানে এসেছিল
রিকশায় চেপে ।”

“কীরকম দেখতে ?”

“খুব সুন্দরী । কর্মচারী হয়তো একই কথা বলেছে । শোনার পর দেখলাম
মুখ শুকিয়ে গেল । তাড়াতাড়ি রিকশায় উঠে পড়ল ।”

“এই মেয়েটিকে তুমি আগে দেখেছ ?”

“না । লক্ষ করিনি ।”

“গতকাল কাজল দোকান থেকে কখন বেরিয়েছিল ?”

“সঙ্গের একটু আগে । ওর বন্ধুরা এসে ওকে পায়নি । আমাদের হরির
রিকশায় চলে গিয়েছিল । দোকান বন্ধ করার সময়ও ফেরেনি ।”

“হরিকে কোথায় পাওয়া যাবে ?”

“কদমতলার স্ট্যান্ডে ।”

অর্জুন দশটা টাকা ল্যাংড়া-পাঁচকে দিতে গেল, কিন্তু সে জিভ বের করে সরে
দাঁড়াল, “ছি ছি ছি । এত সামান্য কাজের জন্য পয়সা নেব, তা হয় না ।”

অর্জুন থানায় টেলিফোন করল । অবনীবাবু ছিলেন ।

“কাজল মুখার্জিকে পাশপোর্ট পেতে দিলেন না শেবপর্যন্ত ?”

“ও, খবর পেয়ে গেছেন ? আমি না দেওয়ার কে ? পাশপোর্ট অফিসকে যা
সত্যি তাই জানিয়ে দিয়েছিলাম । ওঁরা যদি না ইসু করেন, তা হলে—”

“আপনি ওকে বলেছিলেন ওর পাশপোর্ট যাতে হয় সেইভাবে রিপোর্ট
দেবেন ।”

“ভেবেছিলাম । কিন্তু ওকে দেখার পর আপনাকে সিদ্ধান্ত নিতে দেখে
বুঝলাম যা সত্যি তাই বিশদে লেখা ভাল ।”

অর্জুন টেলিফোন রেখে দিল । পাশপোর্ট না পেলে কাজল বাংলাদেশে
যেতে পারছে না । তা হলে গেল কোথায় ? সে সঙ্গের পর কদমতলায় এসে
হরিকে ধরল । অঞ্জবয়সী ছেলে । অর্জুনকে চিনতে পারল । বলল, “পাঁচদা
আপনার কথা আমাকে বলেছে বাবু । কিন্তু আমি কখনও কোনও অন্যায়
করিনি ।”

“তুমি অন্যায় করেছ কে বলল ?”

“পাঁচদা বলেছিল আপনার সঙ্গে পুলিশের সম্পর্ক আছে ।”

“তা একটু আছে । তবে তোমার কাছে এসেছি সম্পূর্ণ অন্য কারণে ।
তোমার সাহায্য চাই আমি ।”

“বলুন বাবু ।”

অর্জুন দেখল আশেপাশে দাঁড়ানো রিকশাওয়ালারা কানখাড়া করে তাদের
কথাবার্তা শুনছে নেহাতই কৌতুহলী হয়ে । সে বলল, “চলো, তোমার রিকশায়
ওঠা যাক ।”

অর্জুন সিটে বসতেই হরি কয়েক পা প্যাডেল করে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, “আপনাকে কোথায় নিয়ে যেতে হবে বাবু ?”

“পাঁচ কিলু বলেনি ও-ব্যাপারে ?”

“না ।”

“গতকাল সন্ধের সময় তুমি সাইকেল-কারখানার কাজলকে নিয়ে কোথায় গিয়েছিলে ?”

হরি আবার দাঁড়িয়ে পড়েছিল। পেছনে রিকশাওয়ালা, সাইকেল-বেল বাজাচ্ছে। সে রাস্তার একপাশে সরে এসে বলল, “কাজলবাবু কোনও অন্যায় করেছে, না ?”

অর্জুন হাসল, “আরে, সে অন্যায় করতে যাবে কেন ?”

“কাজলবাবু এমনিতেই ...। তার ওপর যার কাছে গিয়েছিল সেই লোকটা সুবিধের নয়। আপনি তার কাছে একা যাবেন না। ধান্দা ছাড়া কেউ ওর কাছে যায় না।”

“আমি একা নই। তুমি লোকটার কাছে নিয়ে চলো। কোন পাড়ায় থাকে ?”

“সেনপাড়ায়।” বলে হরি রিকশা চালাতে লাগল।

ছেলেটা একটু বেশি কথা বলে কিন্তু অনেক যখন রাখে বলে মনে হল অর্জুনের।

“লোকটার নাম জানো ?” চলন্ত রিকশার বসে জিজ্ঞেস করল অর্জুন।

“কাজলবাবু ওকে দাসবাবু বলে ডেকেছিল।” রিকশাওয়ালা জবাব দিল।

“তুমি কি কাজলকে ওখানে নামিয়ে দিয়েই চলে এসেছিলে ?”

“না। বাইরে থেকে ডাকাডাকি করে সাড়া পাওয়ার পর আমাকে দাঁড়াতে বলে কাজলবাবু ভেতরে ঢুকে গিয়েছিলেন। কী কথা হল জানি না। সেই সময় আরও দু'জন লোক ভট্টাচ্ছি নিয়ে ওই বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। গুগু ধরনের লোক। এখানে কখনও দেখিনি।”

“তারপর ?”

“আধুনিক পরে কাজলবাবু হাসিমুখে বেরিয়ে এলেন দাসবাবুর সঙ্গে। তিনি বললেন, আপনি এই শহরের ছেলে। পুরো ব্যাপারটা আমার ওপর হেঁড়ে দিন। তবে টাকাটা—। সঙ্গে-সঙ্গে কাজলবাবু বললেন, রাত্রে যখন আসব পুরো টাকাটাই পাবেন। আমি কাজলবাবুকে ওঁর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে ভাড়া নিয়ে চলে এসেছিলাম।” রিকশা তখন করলা নদীর রিজে।

“এতে তোমার কি করে মনে হল লোকটা সুবিধের নয় ?”

“বাবু, দেখলেই বোৰা যায়।”

“ঠিক আছে। তুমি আমার জন্য বাইরে অপেক্ষা করবে।”

সেনপাড়ার একেবারে ভেতরে যে বাড়িটার সামনে রিকশা থামাল হরি,

সেটার চেহারা নিতান্তই মধ্যবিত্ত। রাস্তায় আলো জলছে না। অর্জুন বলল, “একটু লক্ষ করা যাক।”

হরি বলল, “আজও ভট্টাচ্ছি ওখানে আছে বাবু।”

মিনিট তিনেকের মধ্যে দৃশ্যের হেরফের না হওয়াতে অর্জুন নামল। বাড়ির সামনে কোনও গেট বা বেড়া নেই। মোটর বাইক রয়েছে দরজার গায়ে। সে ডাকল, “দাসবাবু, দাসবাবু।”

একটু বাদে দরজা খুলে গেল। সিঙ্কের লুঙ্গি আর পাঞ্জাবি পরা এক প্রৌঢ় দরজা খুলে জিজ্ঞেস করলেন, “বলুন।”

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “আপনি কি দাসবাবু?”

“হ্যাঁ।”

“একটু কথা আছে।”

“দাঁড়ান।” ভদ্রলোক ঘুরে দাঁড়ালেন, “তা হলে তুমি চলে যাও। ওদের বলো যা কথা ছিল তাই দেওয়া হচ্ছে। এরপর এরকম হলে আমরা অর্ডার বদলাব।”

ভদ্রলোকের কথা শেষ হওয়ামাত্র একটি চামড়ার জ্যাকেট পরা লোক মাথা নেড়ে বেরিয়ে গিয়ে বাইকে উঠল। সে স্টার্ট নিয়ে চলে যাওয়ার পর দাসবাবু বললেন, “আসুন।”

বাইরের ঘরটি অতি সাধারণ। চারটে বেতের চেয়ার এবং টেবিল, যা জলপাইগুড়ির ফুটপাথে বিক্রি হয় শক্তায়, তাই পাতা। তারই একটাতে বসল অর্জুন। সামনে দাসবাবু।

দাসবাবু জিজ্ঞেস করলেন, “বলুন, কী করতে পারি?”

অর্জুন বুঝতে পারছিল না। সে ভুল করছে কি না! তার হাতে কেনও প্রমাণ নেই। শুধুই অনুমানের ওপর ভিত্তি করে সাহসী হওয়া। সে খুব সিরিয়াস গলায় বলল, “বাংলাদেশে যেতে চাই।”

“যান না। আমি কী করতে পারি?”

“আমার পাশপোর্ট নেই। ডিসা পাব না। এত তাড়াতাড়ি পাশপোর্ট পাব না।”

“আমার কথা আপনাকে কে বলল?”

“আমার এক বন্ধু কাজল।”

“কাজলবাবু আপনার বন্ধু?”

“হ্যাঁ। আমরা একসঙ্গে স্কুলে পড়তাম।” অর্জুন বলল, “ওরও বাংলাদেশে যাওয়ার কথা। আজ সকাল থেকে ব্যাটার দেখা পাচ্ছি না।”

“আপনি কোন পাড়ায় থাকেন?”

“কদমতলায়।”

“কী করেন?”

“একদম বেকার ! সেইজন্য ওখানে যেতে চাই ! যদি কিছু হয় !”

“আজ্ঞায়স্বজন আছে ?”

“তা আছে !”

“কালীগঞ্জে ?”

“কালীগঞ্জ মানে ?”

“বাংলাদেশের একটা গ্রাম ! কাজলবাবুর আজ্ঞায় থাকেন সেখানে ! দেখুন মশাই, আমি আপনাকে চিনি না ! এখনই কোনও কথা বলব না ! আপনি নিশ্চয়ই জানেন এভাবে বর্ডার পেরিয়ে যাওয়া বেআইনি ! জেল হতে পারে ধরা পড়লে ! ওখানেও পুলিশ জেরা করলে বিপদে পড়বেন !”

“আমি খরচ করতে রাজি আছি !”

“দেখুন, আমি এত খুচরো কাজ করি না ! তার জন্য অন্য লোক আছে !”

“কাজল বলেছিল আপনি সব দায়িত্ব নেবেন !”

“কাজলের রেফারেন্স আলাদা ! আপনি কাল আসবেন ! এই সময় ! কী নাম যেন ?”

“অর্জুন !” সে উঠে দাঁড়াল ! নমস্কার করল !

দাসবাবু বললেন, “কদমতলার নিশ্চয়ই অনেকে আপনাকে চিনবে ? আসলে আমি কোনও ঝুঁকি নিতে চাই না ! দিনকাল খারাপ !”

“কত টাকা লাগবে ঢাকায় পৌঁছতে ?”

“বললাম তো, আগামীকাল কথা হবে !”

অর্জুন ঘাথা নেড়ে বেরিয়ে এসে বিকশায় উঠে চাপা গলায় বলল, “থানায় চলো !”

হাসিমুখে অবনীবাবু জিজ্ঞেস করলেন, “যাগ করছে ?”

অর্জুন সেটা এড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, “আপনার কোনও আইডিয়া আছে, মাঝরাত্রে জলপাইগুড়ি থেকে রওনা হয়ে বর্ডার পেরিয়ে গোয়ালন্দে পৌঁছাতে কীরকম সহ্য লাগে ?”

“অ্যাঁ ! না ! কে যাবে ?”

“গিয়েছে ! যাকে আপনি পাশপোর্ট নিতে দেননি, সে চলে গেছে !”

অবনীবাবু বললেন, “সে কী ! উইদ্যাউট পাশপোর্ট ?”

“হ্যাঁ !”

“এটা তো ক্রাইম !”

“ধরতে পারলে !”

“আপনি জানলেন কী করে ?”

“যে লোকটি টাকা নিয়ে বর্ডার পারাপার করায়, তাকে মিট করে এলাম !”

“এই শহরে ?” চোয়াল শক্ত হল অবনীবাবুর ।

“আজ্জে হ্যাঁ । তবে এটা তার খুচরো ব্যাপার, অন্য কিছু আছে, যা মনে হয় সলিড ।”

“নামটা বলুন ।”

“প্রমাণ ছাড়া ধরে কোনও লাভ নেই ।” অর্জুন বলল, “সেনপাড়ায় দাসবাবু নামে এক প্রোট ভদ্রলোক থাকেন । বাড়ির সামনে সঙ্কেবেলায় মোটরবাইক পার্ক করা থাকে । নজর রাখুন । সেইরকম সময়ে বাইকে যারা আসে তাদের সমেত ধরুন ।” অর্জুন উঠল ।

“উঠছেন কোথায় ?”

“হাতে সময় নেই । গোছগাছ করতে হবে । একটা টেলিফোন করতে পারি ?”

“নিশ্চয়ই ।”

অর্জুন ডায়াল করল । বিজনবিহারীবাবু ধরলেন ।

“অর্জুন বলছি । আমি কলকাতায় যাচ্ছি । ওখান থেকে ভিসা নিয়ে বাংলাদেশ । ফিরে এসে দেখা করব ।”

“যাক । এতদিনে ... । কিন্তু চিঠিটা ?”

“আপনার ঠাকুর্দার চিঠি যার কাছে আছে, সে এখন বাংলাদেশের পথে ।”

“তার মানে ? কে সে ?” বিজনবিহারী উত্তেজিত

অর্জুন জবাব না দিয়ে রিসিভার নামিয়ে রাখল ।

॥ চার ॥

ঘটনাগুলো ঘটে গিয়েছিল দ্রুত । জলপাইগুড়ি থেকে কলকাতায় এসে বাংলাদেশ দুতাবাসে গিয়ে ভিসার জন্য আবেদন করা, টাকা দিয়ে বৈধভাবে ডলার কেনা, প্রেনের টিকিটের ব্যবস্থা করা—এসব কাষেলা খুব অঞ্জের ওপর দিয়ে গেল অবনীবাবুর জন্য । তাঁর এক বন্ধু কলকাতার লিন্ডসে স্ট্রিটে ট্র্যাভেল এজেন্সি চালান । সকালবেলায় ট্রেন থেকে নেমেই হোটেলে জিনিসপত্র রেখে পরিষ্কার হয়ে অফিস খোলার সময়েই অর্জুন চলে এসেছিল ভদ্রলোকের কাছে । পরিচয় দিয়ে সব বলতেই তিনি অভয় দিলেন, “কোনও চিন্তা নেই । আজ রাতেই আপনি ঢাকা পৌঁছে যাবেন বাংলাদেশ বিমানের যাত্রী হিসেবে ।”

“রাত্রে ?” অজানা জায়গায় রাত্রে পৌঁছতে পছন্দ করল না অর্জুন ।

“তার আগের ফ্লাইট দুপুরে । তখন সব ফর্মালিটিস শেষ করা সম্ভব হয়ে উঠবে না । অবশ্য সঙ্কেবেলায় ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের একটা ফ্লাইট আছে । আচ্ছা দেখছি, কী করা যায় ?”

পাশপোর্ট, টাকা-পয়সা ভদ্রলোকের হাতে জমা করে দিয়ে অর্জুন বেরিয়ে এসেছিল । একটা গোটা দিন তার হাতে পড়ে আছে এবং কোনও কাজ নেই ।

কলকাতায় অর্জুন অনেকদিন পরে এল। পাতাল রেলে চড়ে মনে হল, এই শহরের মানুষের দুটো চরিত্র। মাটির ওপর যারা হেঁটে বেড়াচ্ছে, মাটির নীচে এসে তারা কীরকম পালটে যায়। কেউ পাতালে নেমে সিগারেট খাচ্ছে না, ময়লা ফেলছে না। সুশৃঙ্খলভাবে যাওয়া-আসা করছে। অথচ ওপরে সম্পূর্ণ ভিন্ন চির। এমন কী করে হয় ?

দুপুরের খাওয়া শেষ করে সে আবার লিঙ্গসে স্ট্রিটের অফিসে ফিরে এল। অবনীবাবুর বক্তু তখন কাজে বেরিয়েছেন। ভিজিটার্স রুমে আরও কয়েকজন অপেক্ষা করছেন। সোফায় বসে একটা পত্রিকা তুলে নিল অর্জুন। ঢাকা এখন একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের রাজধানী। ভারতীয় হিসেবে সে সেখানে বিদেশি বলে গণ্য হবে। অথচ সেখানকার মানুষেরা বাংলাভাষায় কথা বলেন, রবীন্দ্রনাথের গান তাঁদের জাতীয় সঙ্গীত। একজন গুজরাতি অথবা পঞ্জাবির পক্ষে ব্যাপারটা বোঝা সম্ভব নয়।

“দেশলাই আছে ?”

প্রশ্নটা কানে আসামাত্র অর্জুন তাকাল। মোটাসোটা এক ভদ্রলোক তাকেই প্রশ্ন করছেন। উনি বসে আছেন পাশের সোফায়। ভদ্রলোকের বয়স অন্তত পঞ্চাশ হবে। তার ডবল বয়সী একটি মানুষের হাতে দেশলাই তুলে দিতে সঙ্কেত হল অর্জুনের। সে নীরবে মাথা নাড়ল, না।

“ও ! যোক করেন না বুঝি ! গুড ! আমি তো লাস্ট থার্টি ইয়ার্স ধরে ভাবছি ধূমপান করব না, কিন্তু পারছি না। আজকাল ইচ্ছে করেই পকেটে দেশলাই রাখি না, যাতে কম খাওয়া হয়।”

“সিগারেটই বা রাখেন কেন ?”

“না রেখে পারি না। কীরকম খালি-খালি লাগে। এমনকী রোজার সময় হোল ডে যখন পানিও খাই না তখন সিগারেটের কথাও ভুলে যাই। কিন্তু সঙ্গেবেলায় ইফতার করার পরই সিগারেট ধরাই।” ভদ্রলোক স্লান হাসলেন। অর্জুনের মনে হল লোকটা জটিল নয়। জটিল মানুষেরা সাধারণত এত কথা বলেন না। পত্রিকাটা নামিয়ে রেখে সে জিজ্ঞেস করল, “আপনি কি বিদেশে যাচ্ছেন ?”

“বিদেশ ? হ্যাঁ ভাই, খাতায়-কলমে আপনার বিদেশ, কিন্তু আমার স্বদেশ। আমি আজ ঢাকায় যাচ্ছি।”

লোকটির সঙ্গে আলাপ করার আগ্রহ জম্বাল অর্জুনের। সে বাংলাদেশে এর আগে কখনও যায়নি। একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে এবার সে যদিও টুরিস্ট হিসেবে যাচ্ছে, কিন্তু তার লক্ষ অন্য। ভদ্রলোকের নাম মোহসিন ইউসুফ। ব্যবসা করেন। সেইসব কাজেই মাঝে-মাঝে ওঁকে কলকাতায় আসতে হয়। এখানকার পার্ক সার্কাস অঞ্চলে ওঁর আত্মীয়স্বজন আছেন। ঢাকা এবং কলকাতা ওঁর কাছে প্রায় একই। আলাপ করতে-করতে ইউসুফ বললেন,

“কলকাতার এলে একটা ব্যাপার দেখে খুব খারাপ লাগে ভাই। আপনারা তো বাংলি, অথচ বাংলা ভাষার জন্য আপনাদের একটুও মায়া-মতা নেই। আপনারা যেন ঠিক বাংলি হিসেবে নিজেদের চরিত্র ঠিক রাখতে পারছেন না। আমরা বাংলাদেশের বাংলিয়া যত কষ্টেই থাকি না কেন, ভাষার ব্যাপারে সবাই এক, অভিন্ন।”

ইউসুফভাইয়ের সঙ্গে কথা বলে চমৎকার সময় কেটে যাওয়া ছাড়াও অনেকরকম তথ্য জানতে পারল অর্জুন, ঢাকা সম্পর্কে। কলকাতা থেকে জলপাইগুড়ি শহরের যে দূরত্ব, ঢাকা তার অনেক কাছে। কিন্তু ঢাকা কলকাতার থেকেও আধুনিক এবং পূর্ণ বাংলি শহর।

ভিসা, টিকিট এবং ডলার পাওয়া গেল ঠিক সময়ে। ইউসুফ ভাই টিকিট কেটেছিলেন ঢাকা থেকেই, আসার সময়। এই অফিসে অন্য প্রয়োজনে এসেছিলেন। কথা হল, এয়ারপোর্টে তিনি অর্জুনের সঙ্গে দেখা করবেন।

বিদেশে যাওয়ার সময় একটা আলাদা ধরনের উত্তেজনা থাকে। আন্তর্জাতিক বিমানের নিয়ম অনুযায়ী ঠিক দু' ঘণ্টা আগে যখন অর্জুন দমদম এয়ারপোর্টে পৌঁছাল তখন সঙ্গে পোরিয়ে গেছে। ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের টিকিট পাওয়া যায়নি, অনেক চেষ্টায় বাংলাদেশ বিমানে একটা ব্যবস্থা হয়েছে।

ইউসুফভাই দাঁড়িয়ে ছিলেন। নির্দিষ্ট নিয়মগুলো পর-পর করে যেতে তিনিই সাহায্য করলেন। তারপর ইমিগ্রেশন এবং কাস্টম্সের বেড়া ডিঙিয়ে ওরা এসে বসল লাউঞ্জে। সেখানে তখন অনেক যাত্রীই এসে গিয়েছেন। বিদেশে যাওয়ার অন্যান্য ফ্লাইটের ঘোষণা চলছে। অর্জুনের মনে হল পৃথিবীটা খুবই ছেট। মানুষ ইচ্ছে করলেই এবং টিকিট কাটার সামর্থ্য থাকলে যে-কোনও দেশে মুহূর্তেই চলে যেতে পারে।

এই সময় একজন ভদ্রমহিলা লাউঞ্জে এলেন। তিনি যে খুবই সুন্দরী, সে-ব্যাপারে তাঁর সচেতন মনোভাব অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল। সঙ্গে একজন বিশালদেহী পুরুষ, গায়ের রং বেশ কালো। ইউসুফভাই বললেন, ‘ইনি বাংলাদেশের সিনেমার নায়িকা। খুব নাম করেছিলেন এককালে। এখন পড়তির দিকে। এর নাম মঙ্গুশ্রী রায়।’

অর্জুন অবাক হল, “আপনাদের ওখানে হিন্দুরা সিনেমায় নামে ?”

“আশ্চর্য ? কেন নামবে না ? বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে সবার সমান অধিকার আছে।”

অর্জুন মঙ্গুশ্রী দেবীকে দেখছিল। খানিকটা দূরেই বসে আছেন তিনি। শালোয়ার-কামিজ এবং বেগুনি রঙের ওড়নায় ওঁকে অন্যরকম দেখাচ্ছিল। বাংলাদেশি মানুবেরা এই লাউঞ্জে বসে তাঁর দিকে যে সাগ্রহে তাকিয়ে আছেন, সেটা বুঝে বেশ গভীর হয়ে আছেন। অর্জুনের মনে হল প্রযোজক ভদ্রলোক বেশ চিপ্তি। ঘন-ঘন সিগারেট খাচ্ছেন। মানুষটির মুখ খুবই কৃক্ষ, চোখ এবং

ঠেঁটের কোণে একধরনের নিষ্ঠুর অভিযুক্তি আজাপ্তেই ফুটে উঠেছে।

এই সময় টাকমাথা ফরসা বেঁটে মাঝবয়সী এক ভদ্রলোককে তুকতে দেখেই প্রযোজক সোজা হয়ে বসলেন। বোধ হয় এর জন্যই তিনি গেটের দিকে মুখ করে এতক্ষণ বসে ছিলেন। টাকমাথা ভদ্রলোক চেয়ারের পাশে হাতব্যাগ নামিয়ে কোনওদিকে না তাকিয়ে এগিয়ে গেলেন কোনার দিকে, যেখানে দেওয়ালে পর-পর টেলিফোন খোলানো আছে। তাঁকে ডায়াল করতে দেখল অর্জুন। এবং তারপরেই সেই প্রযোজক উঠে গেলেন সেই দিকে। পাশের টেলিফোনটি তুলে নিয়ে তিনিও ডায়াল শুরু করলেন। ব্যাপারটায় খটকা লাগল। অর্জুন ইউসুফভাইকে বলল, “আমি একটু আসছি।” তারপর চলে এল তৃতীয় টেলিফোনটির সামনে। এসে বুঝল যাত্রীদের জন্যে বিনা পয়সায় কথা বলার ব্যবস্থা হয়েছে এই ফোনের মাধ্যমে। সে এলোমেলো নম্বর ঘোরাল, যদিও তার কান খাড়া ছিল। তার বাঁ দিকে প্রযোজক, যাঁর বাঁ দিকে টাকমাথা। প্রযোজক যেন টেলিফোনে কথা বলছেন এমন ভঙ্গি করে কানে রিসিভার লাগিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, “এত দেরি হল? ব্যাগেজ আইডেন্টিফাই করেছেন তো?” অর্জুন শুনতে পেল টাকমাথা বলছেন, “সব ঠিক আছে।”

এই তিনটে শব্দ শোনামাত্র প্রযোজক যেন টেলিফোনে কথা বলা হয়ে গিয়েছে এমন ভঙ্গিতে রিসিভার নামিয়ে আবার সিনেমার নায়িকার কাছে চলে গেলেন। ইতিমধ্যে টাকমাথা আবার ডায়াল করছিলেন। অর্জুন শুনতে পেল লোকটির চাপা হাসি, “একদম ভেতর থেকে বলছি। এইমাত্র সে দেরি কেন হল তা জিজ্ঞেস করে গেল। ক’দিন পরেই বাছাধন টের পাবে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।” রিসিভার নামিয়ে রেখে হেলতে-দুলতে নিজের ব্যাগের কাছে গিয়ে বসল টাকমাথা। প্রযোজকের সঙ্গে তার দূরত্ব এখন অনেকটা। অর্জুন আরও কয়েক সেকেন্ড টেলিফোনের পেছনে খরচ করল, যাতে কেউ তাকে সন্দেহ না করে। স্পষ্টতই একটা চক্রান্তের গন্ধ পাচ্ছে সে। ওই টাকমাথা লোকটা একটি শয়তান। সে প্রযোজককে একরকম বোঝাচ্ছে আবার যাকে টেলিফোন করল তাকে আর-একরকম। কী ব্যাপারে এরা যুক্ত, সেটা অবশ্য বোঝা যাচ্ছে না। অর্জুন নিজেকে বোঝাল, পৃথিবীতে এরকম ঘটনা করই না হচ্ছে, সব ব্যাপারে নাক গলানোর কী দরকার, যতক্ষণ না সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সাহায্যের জন্য তার কাছে আসছে। ইউসুফভাইয়ের পাশে এসে বসতেই তিনি জিজ্ঞেস করলেন, “পেলেন?”

“পেলাম মানে?” অর্জুন বুঝতে পারল না।

“টেলিফোনের লাইন তো বেশিরভাগ সময় পাওয়া যায় না।”

অর্জুন বাস্তবে ফিরে এল, “ও হ্যাঁ, তা ঠিক।”

এই সময় সিঙ্গাপুরগামী একটি প্লেনের যাত্রীদের জন্য কিছু ঘোষণা করা হল। ইউসুফভাই বললেন, “ভারী অন্তর্ভুক্ত জায়গা এই সিঙ্গাপুর আর ব্যাস্কক।

ওসব জায়গা থেকে ঘারা আসে তাদের সম্পর্কে খুব সচেতন থাকে বাংলাদেশ এবং ভারতের কাস্টম্স অফিসাররা । স্মাগলাররা অবশ্য খুব স্মার্ট । ”

“স্মাগলিং হয় ওখান থেকে ?”

“অত্যন্ত । বেকার ভাল যুবকদের সামান্য টাকার লোভ দেখিয়ে ওরা পাপচক্রে লাগিয়ে দিয়েছে । যাকগে, আপনি তো প্রথম ঢাকায় যাচ্ছেন, ওঠার জায়গা কি ঠিক আছে ?”

“না । কোনও হোটেলে উঠব ।”

“হোটেল ?” ইউসুফভাই যেন অঁতকে উঠলেন, “আমি থাকতে আপনি হোটেলে উঠবেন মানে ? এ কীরকম কথা !”

অর্জুন হাসল, “আপনি আমাকে চেনেন না, জানেন না ।”

“ছাড়েন ।” হঠাত নিজস্ব শব্দ বেরিয়ে এল ইউসুফভাইয়ের মুখ থেকে, “আমি মানুষের মুখ দেখলেই বুবতে পাঁরি কে ভাল, কে মন্দ ।”

অর্জুন কথা বাঢ়াল না । অচেনা মানুষকে বাঢ়িতে নিয়ে দিয়ে আতিথ্য দেওয়ার চল পশ্চিমবাংলায় নেই, বাংলাদেশে হয়তো আছে । কিন্তু সে পরে তদনোককে বুঝিয়ে কোনও হোটেলে চলে যাবে । খানিক বাদেই ঢাকাগামী যাত্রীদের বিমানের দিকে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করা হল । সবাই ভড়মুড়িয়ে গেটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে । অর্জুন উঠে দাঁড়ালে ইউসুফভাই বললেন, “ভড় একটু হালকা হোক । আমাদের ফেলে রেখে তো বিমান যাবে না ।”

অর্জুন দেখল টাকমাথা ভিড়ের মধ্যে চুকে গিয়েছেন । প্রযোজক এবং অভিনেত্রী সম্বৃত ইউসুফভাইয়ের মতোই অপেক্ষায় বিশ্বাসী । শেষপর্যন্ত প্রায় সব যাত্রী চলে গেলে অর্জুনরা এগোল । প্যাসেজ দিয়ে নেমে এসে প্লেনের কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য গাড়ির দেখা পেল ওরা । সেখানে আগে আসা কিছু যাত্রী দাঁড়িয়ে আছেন । ইউসুফভাইয়ের সঙ্গে গাড়িতে উঠতেই অর্জুন টাকমাথাকে দেখতে পেল । হঠাত ইউসুফভাই বলে উঠলেন, “আরে মিস্টার ঘোষ, কবে এসেছিলেন কলকাতায় ?”

টাকমাথা তাকালেন । তারপর হাসার চেষ্টা করলেন, “এই তো, ক'দিন আগে ।”

“অনেকদিন পরে আপনাকে দেখলাম ।”

“হ্যাঁ, আমিও ।”

“এখনও কালীগঞ্জে আছেন ?”

“মাৰে-মাৰে যাই ।” টাকমাথা, যাঁর নাম মিস্টার ঘোষ, তাঁর যেন কথা বলতেই ইচ্ছে করছিল না । প্লেনের সামনে পৌঁছে যেতেই সবাই যে যার মতো নেমে প্লেনে উঠল । ছেট প্লেন । অর্জুন আর ইউসুফভাইয়ের আসন পাশাপাশি । মিস্টার ঘোষ অনেক পেছনে । একটু পরে প্রযোজক এবং অভিনেত্রীকে প্লেনে উঠে সামনে বসতে দেখা গেল ।

হঠাতেই অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “বাসে যাব সঙ্গে কথা বললেন তিনি কী করেন ?”

“সঠিক জানি না । বোধ হয় বিজনেস । আমার সঙ্গে আলাপ বিমানে কলকাতায় যাতায়াতের পথে । আগে মাঝে-মাঝেই দেখা হত, এখন হয় না । কালীগঞ্জে বাড়ি ।” ইউসুফ বললেন ।

“কালীগঞ্জটা কোথায় ?”

“চাকা থেকে এখন ঘণ্টা দেড়েক লাগে । আগে ট্রেনে গিয়ে মৌকো করে যেতে হত । এখন সুন্দর রাস্তা হয়ে গিয়েছে । প্রচুর হিন্দু পরিবার সেখানে এখনও বাস করেন ।”

“এই ভদ্রলোকের পুরো নাম কী ?”

“জানি না ভাই । আলাপ হওয়ার সময়, হ্যাঁ মনে পড়েছে, এ. বি. ঘোষ বলেছিলেন । এ-র পরে বি বলেই মনে আছে ।”

বিমান কলকাতা ছাড়ল । অর্জুন তাকিয়ে দেখল, নীচে হিরের মতো কলকাতার আলো জ্বলছে । তারপরেই আকাশের ওপরে আকাশ । এয়ার হোস্টেসদের আনাগোনা, খাবার দেওয়া ইত্যাদিতে মন ছিল না ওর । কালীগঞ্জের এ. বি. ঘোষ তাকে চিন্তায় ফেলে দিয়েছিল । বি কি বিহারীর আদ্যক্ষর ? এই লোকটির কথা জলপাইগুড়ির পরবর্তী জানেন না । কালীগঞ্জের লোক যখন, তখন পরবর্তী দূর সম্পর্কের আঞ্চলিক হতে পারেন । কিন্তু মানুষটি যে সুবিধের নয়, তাতে কোনও সন্দেহ নেই ।

জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ছেট, কিন্তু ছিমছাম । হাতব্যাগ নিয়ে অর্জুন দ্রুত এ. বি. ঘোষের পেছনে চলে এল প্লেন থেকে নামার সময় । ভদ্রলোক কোনওদিকে তাকাচ্ছেন না । বাঁ দিকে ডিউটি-ফ্রি শপের প্রলোভন তাঁকে টানল না । ইমিশ্রণের কাউন্টারে পৌঁছে সোজা নিজের পাশপোর্ট বের করলেন স্ট্যাম্প মারানোর জন্য । ওঁর পেছনে দাঁড়ানোর সুযোগ পেল না অর্জুন । এখানে বিদেশীদের জন্য আলাদা কাউন্টার । এ. বি. ঘোষ বাংলাদেশের মানুষ বলে যে কাউন্টার থেকে পাশপোর্টে ছাপ মারালেন, সেখানে অর্জুনের দাঁড়ানো নিমেধ ।

কিন্তু ভদ্রলোককে পাওয়া গেল লাগেজ নেওয়ার জায়গাটিতে । চুপচাপ একটা ট্রলি নিয়ে দাঁড়িয়েছেন । এরকম লোকের সঙ্গে গায়ে পড়ে কথা বলা ঠিক নয় । নিজের সুটকেসের জন্য অর্জুন অপেক্ষা করছিল এমন সময় ইউসুফভাই পাশে এসে দাঁড়ালেন, “কী ভাই, ওইভাবে দৌড়লেন কেন ?”

অর্জুন হাসল । এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া যায় না ।

“আমার মনে হচ্ছে ওই ভদ্রলোক সম্পর্কে আপনি উৎসুক !”

“কিছুটা ।” অর্জুন স্বীকার করল ।

“আসেন আমার সঙ্গে ।” ইউসুফভাই এগিয়ে গেলেন এ. বি. ঘোষের

দিকে। অতএব অর্জুন নিরীহ মুখে অনুগামী হল। কাছে গিয়ে ইউসুফভাই বললেন, “আজ বাত্রে বিশ্বাই ঢাকায় থাকবেন?”

“আমি তো এখন ঢাকায় থাকি!” ভদ্রলোক জবাব দিলেন।

“ঢাকায় কোথায়?”

“বনানীতে।”

“আমি গুলশনে। কার্ডটা রাখুন।” পকেট থেকে নিজের কার্ড বের করে দিলেন ইউসুফভাই।

“থ্যাক ইউ।” কার্ড নিলেন এ. বি. ঘোষ, “আপনি প্রায়ই ইন্ডিয়ায় যান?”

“ব্যবসার কাজে যাইতেই হয়। এর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। আমার ভাইয়ের মতন। অর্জুন। বাংলাদেশ দেখতে এসেছে। তা আমি বললাম ঢাকা শহর মানে বাংলাদেশ না। যেতে হবে গ্রামে। আমার মৈমনসিংহে বাড়ি। কিন্তু সেখানে কেউ নেই।” ইউসুফভাই কথাগুলো বলছিলেন ঢাকা-কলকাতার ভাষা মিশিয়ে।

অর্জুন নমস্কার করল। এ. বি. ঘোষ অভ্যন্তর ভঙ্গিতে হাত বাড়ালেন, “আমি এ. বি. ঘোষ। ঢাকায় আগে কখনও এসেছেন?”

“না। এই প্রথমবার।”

“হোটেলে উঠবেন?”

অর্জুন জবাব দেওয়ার আগে ইউসুফভাই বললেন, “না, না আমার বাসায়।”

এ. বি. ঘোষ বললেন, “আমাদের কালীগঞ্জ একসময় খুব বর্ধিষ্ঠ গ্রাম ছিল। বরিশাল অথবা নোয়াখালির প্রামের মতো নয়, তবু একটা চরিত্র আছে। ইউসুফভাইয়ের সঙ্গে চলে আসতে পারেন।”

এই সময় সুটকেসগুলো নিয়ে বেশট পাক খেতে লাগল। সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠল নিজের জিনিসপত্র তুলে নিতে। ভিড়টাও বেড়ে গিয়েছিল। ট্রলিতে সুটকেস চাপিয়ে ইউসুফভাইয়ের সঙ্গে কাস্টমসের বেড়া ডিঙিয়ে যখন অর্জুন বেরিয়ে, এল বাইরে তখন এ. বি. ঘোষ অদৃশ্য হয়েছেন। প্রযোজক এবং অভিনেত্রীকে রিসিভ করতে অনেক মানুষ এসেছেন এয়ারপোর্টে।

বাইরে বেরিয়ে আসতেই একটা লোক সামনে দাঁড়াল, “সালাম ছার। গাড়ি আনছি।”

ইউসুফভাই জিজ্ঞেস করলেন, “সব খবর ভাল?”

“জি।”

“চল। আসুন অর্জুনবাবু।”

হাঁটতে-হাঁটতে অর্জুন বলল, “আপনি যদি আমাকে একটা মাঝারি হোটেলে নামিয়ে দেন ...।”

“হোটেল? আমি থাকতে আপনি হোটেলে উঠবেন, একথা বললেন কী করে?”

“ইউসুফভাই, আপনি আমাকে এখনও ভাল করে চেনেন না !”

“আরে রাখেন ভাই ! ব্যবসায়ী লোক, মুখ দেখেই মানুষ চিনতে পারি । চলেন ।”

ঢাকার রাস্তায় যেসব গাড়ি চলে তার প্রায় সবগুলোই জাপানের গাড়ি । তাদের চেহারা সুন্দর, চলেও ভাল । এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে অর্জুনের মনে হচ্ছিল সে বুঝি আমেরিকা অথবা ইউরোপের কোনও শহরে এসেছে । তারপরেই চোখ এবং মন জুড়িয়ে গেল । রাস্তার দু'দিকে যত নির্দেশাবলী, তা বাংলায় লেখা । মাঝে-মাঝে কিছু স্লোগান লেখা রয়েছে, যেমন, ‘সবার জন্য ভাল-ভাত ।’ আরামদায়ক গাড়ির মধ্যে বসে অর্জুনের মনে হল, বাঙালি হিসেবে নিজেদের প্রকাশ করার ব্যাপারে এরা খুবই সচেতন । তার ভাল লাগছিল ।

॥ পাঁচ ॥

গুলশন একটি বর্ধিষ্ঠ অঞ্চল । ‘নতুন ঢাকার পথঘাট, বাড়ি যে-কোনও সুন্দর বিদেশি শহরের সঙ্গে পাঞ্চা দিতে পারে । ইউসুফভাইয়ের বাড়িটিকে জলপাইগুড়িতে অত্যন্ত বড়লোকের বাড়ি বলা হবে, কিন্তু ইউসুফভাই বললেন, “ঢাকায় আমি একটি সাধারণ লোক ।” ওঁর স্ত্রী অত্যন্ত মিশুকে এবং অতিথিপরায়ণ মানুষ । একমাত্র ছেলে আশীর্বত ক্লাস এইটে পড়ে এবং ইতিমধ্যেই কাকাবাবু এবং সন্তুর ফ্যান হয়ে গেছে । রাত্রে সুন্দর বিছানায় শয়ে অর্জুন ভাবল, ইউসুফভাইয়া নিশ্চয়ই ব্যতিক্রম । প্রায়-অচেনা একজনকে এমন যত্ন করে বাড়িতে নিয়ে আসাটা তার চোখে স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছিল না ।

সে এখন বিদেশের মাটিতে । অর্থচ একবারও নিজেকে বিদেশি বলে মনে হচ্ছিল না । এদের বই-এর র্যাকে বক্ষিশচন্দ্র থেকে বুদ্ধদেব শুহর বই সাজানো । আশীর্বত এখানকার দু'জন লেখকের বই দেখিয়ে তাকে বলেছে বাংলাদেশে ওঁরা খুব জনপ্রিয়, অর্থচ সে পশ্চিমবঙ্গে বসে ওঁদের নাম শোনেনি । একজন হলেন, হুমায়ুন আহমেদ, অন্যজন ইমদানুল হক মিলন । রাস্তাঘাটে যেসব সাইনবোর্ড লাগানো, তার একটাতেও ইংরেজি শব্দ নেই । হঠাৎই মনে হয় বাংলা ভাষার রাজত্বে চলে এসেছি ।

কিন্তু তা তো হল । অর্জুন চোখ বন্ধ করল । যে-কাজে এখানে আসা, সেটা কীভাবে শুরু করা যায় ! নুটুবিহারীর কালীগঞ্জের বাড়িতে ইতিমধ্যে কাজলবাবু পৌঁছে গিয়েছেন কি না তা তার জানা নেই । যদি চিঠির কথা সত্য হয় এবং কাজল ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়ে থাকে, তা হলে তার পক্ষে গুপ্তধন উদ্ধার করা কতদুর সম্ভব, তাও সে আন্দাজ করতে পারছে না । কাকতালীয়ভাবে এ. বি. ঘোষের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, যাঁর বাড়ি কালীগঞ্জে । পবনবিহারী বলেছিলেন কালীগঞ্জ থেকে জনেক বিমানবিহারী তাঁর কাছে ঢাকার জন্য অনেকদিন আগে

গিয়েছিলেন । তিনি এখন কালীগঞ্জে আছেন কি না তাও তিনি জানেন না । এই এ. বি.-ই. বি.বি.-র কেউ হতে পারেন । কিন্তু এখনই কালীগঞ্জে যাওয়া দরকার এসব জানার জন্য । কিন্তু কীভাবে যাওয়া যায় ? এখন পর্যন্ত সে ইউসুফভাইকে তার পেশার কথা জানায়নি । জানালে তিনি কতটা সাহায্য করবেন, সে-ব্যাপারে সন্দেহ আছে । সত্যসন্ধানীকে যদি তিনি গোয়েন্দা বলে ভুল করেন, তা হলে দেশের মাটিতে বিদেশি গোয়েন্দাকে সাহায্য করতে নিশ্চয়ই ইতস্তত করবেন । হোটেলে থাকলে এসব ভাবতে হত না । খোঁজখবর নিয়ে সে ঠিক কালীগঞ্জে পৌঁছে যেতে পারত ।

সকালবেলায় নাস্তা খেতে টেবিলে বসে অর্জুনের চক্ষু চড়কগাছ । এই সাড়ে সাতটার সময় সবাই পরোটা, মাংস, তরকারি খাচ্ছেন । অর্জুনের এ-সময় এত খাওয়ার অভ্যেস নেই । অনেক অনুরোধ করার পর সামান্য খেয়ে মুক্তি পাওয়া গেল । টেবিলে দুটো খবরের কাগজ । একটি 'ইন্ডিফাক', অন্যটি 'আজকের কাগজ' । অর্জুন আজকের কাগজে চোখ বোলাচ্ছিল ।

ইউসুফভাই বললেন, “আজ আপনি ঢাকা শহর দেখুন । লাঙ্গের পর আমি ফি । ততক্ষণ আপনাকে আমার ড্রাইভার যুরিয়ে দেখাবে ।”

অর্জুন বলল, “ঢাকা পরে সময় থাকলে দেখব ।”

“তার মানে ? আগে কী কাজ আপনার ?”

প্রশ্নটা কানে যেতে অর্জুন সতর্ক হল । ইউসুফভাই এবং সে ছাড়া ঘরে আর কেউ নেই এখন । মানুষটি ভাল । এঁকে সব কথা খুলে বলা দরকার । অর্জুন বলল, “আপনাকে আমি আমার এখানে আসার কারণটা বলতে চাই । তারপর যদি আপনার মনে হয় আপনি আমাকে কোনও হোটেলে পৌঁছে দিলে খুশি হব । আমি একজন সত্যসন্ধানী ।”

“সে তো জানি । শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যোমবেশ বাস্তি আমার খুব প্রিয় সত্যসন্ধানী । কিরীটি রায়কে আগে ভাল লাগত, এখন লাগে না । তার চেয়ে ফেলুদা দাকুণ ইটারেস্টিং ছিলেন, কাকাবাবুরও তুলনা হয় না । প্রতিবন্ধী মানুষ ।”

“আপনি যাঁদের কথা বলছেন, তাঁরা বইয়ের চরিত্র ।” অর্জুন বাধা দিল ।

“তা অবশ্য ।” ইউসুফভাই হাসলেন, “ট্রাভেল এজেন্টের কাছে আপনার পরিচয় পেয়ে প্রথমে ঠিক বিশ্বাস করতে পারিনি । বয়স তো খুবই কম । ভাল লাগল. সেই কারণেই ।”

অতএব আর কোনও বাধা রইল না । অর্জুন ভদ্রলোককে তার ঢাকায় আসার কারণ বলল । গুপ্তধনের ব্যাপারটা সে বলল এই ভাবে, “ওই বাড়ির কোথাও নুটুবিহারী ঘোষ তাঁর সোনাদানা লুকিয়ে রেখে গিয়েছিলেন । কাজল অত্যন্ত লোভী এবং অসৎ ছেলে । সে লুকিয়ে চলে এসেছে ওগুলো হাতাধার

জন্য । ”

ইউসুফভাই চিন্তিত হলেন, “একজন বাইরের লোকের পক্ষে গ্রামে গিয়ে সন্ধান করা খুবই কঠিন কাজ, যদি না ভেতরের কেউ ওকে সাহায্য করে । সেটা দু-চারদিনে সম্ভব নয় । ”

“নিশ্চয়ই । আপনি আমাকে একটা দিন সময় দিন । দেখি, কোনও যোগাযোগ বের করতে পারি কি না । ” ইউসুফভাই উঠে দাঁড়ালেন । তাঁর কাজে যাওয়ার সময় হয়ে গিয়েছে ।

একটা ঢাউস গাড়ির আরামদায়ক গাদিতে বসে ঢাকা শহরটাকে দেখল অর্জুন, সেই সকালবেলায় । সুন্দর-সুন্দর বাড়ি, তাদের নামকরণও চমৎকার । কিন্তু রাস্তায় এত রিকশার ভিড় যে, সর্বক হয়ে না চালালে অ্যাক্সিডেন্টের সন্তান বেশি । ট্রাম নেই, বাস খুব কম, মানুষকে নির্ভর করতে হচ্ছে রিকশার ওপরেই । তাদের সংখ্যা কত হবে কে জানে ! হাজার-হাজার বিদেশি গাড়ি আর দিশি রিকশা ঢাকার রাজপথ দখল করে রেখেছে ।

শাস্তিবাগ হয়ে পল্টনের মোড়ের কাছে এসে অর্জুন দেখল, ‘হোটেল প্রীতম’ লেখা একটা বাড়ি থেকে কালকের এয়ারপোর্টে দেখা সেই প্রযোজক ভদ্রলোক বেরিয়ে আসছেন একা । ভদ্রলোক যেন একটু অন্যমনস্ক । হোটেলটা কি ওই ভদ্রলোকের ? ফুটপাতের পাশ ফেঁয়ে পার্ক করা বিদেশি গাড়িতে ভদ্রলোক ওঠা-মাত্র সেটা অর্জুনের বিপরীত দিকে চলে গেল । কোনওভাবেই ওঁকে অনুসরণ করা সম্ভব নয় । এই ভদ্রলোকের সঙ্গে এ. বি. ঘোষের কোনও গোপন ব্যাপার আছে । ওঁকে অনুসরণ করলে কোন লাভ হবে, তা অর্জুনের জানা নেই, কিন্তু মন বলছিল হয়তো কেঁচো খুঁড়তে-খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে গেলেও যেতে পারে । ওদের গাড়ি সিগন্যালে দাঁড়িয়ে ছিল । সে ড্রাইভারকে বলল, সামনে থেকে ঘূরিয়ে নিয়ে হোটেলের সামনে যেতে । ভদ্রলোক চলে গেলেও হোটেলের রিসেপশনে খোঁজখবর নেওয়া যেতে পারে ।

গাড়ি থেকে নেমে সিঁড়ি ভেঙে হোটেলে ঢুকেই ডান হাতে আটপৌরে রিসেপশন কাউন্টার নজরে আসতেই বোঝা গেল এটি কোনও অভিজ্ঞাত শ্রেণীতে পড়ে না । রিসেপশনের ছেলেটি তাকে জিজ্ঞেস করল, “বলুন সার । কী সাহায্য করতে পারি ? ”

“আপনাদের এখানে কুম পাওয়া যাবে ? ”

“একটা সিঙ্গল-কুম খালি আছে । তিনশো টাকা । ”

“বাঃ, ভাল হল । আমি একটু অপেক্ষা করতে পারি ? আমার এক বঙ্গ আসবেন কিছুক্ষণের মধ্যে । তাঁর সঙ্গে একজন প্রযোজকের এখানে অ্যাপয়েটমেন্টও আছে । ”

“প্রযোজক ? রাজুভাই ? তিনি তো একটু আগে চলে গেলেন । ”

“সে কী ! কোথায় গেলেন ? ”

“তা তো জানি না । হয়তো বাসায় গেছেন ।”

“কোথায় বাসা ওঁর ?” সরল গলায় জিজ্ঞেস করল অর্জুন ।

“মালিবাগে ।”

হঠাতে ওপরের সিঁড়িতে চোখ পড়তেই অর্জুন অবাক ! এ. বি. ঘোষ নেমে আসছেন, পরনে লম্বা ঝুলের পাঞ্জাবি । অর্জুন হাসল, “আবার দেখা হয়ে গেল ।”

“আপনি এখানে ?”

“জায়গা আছে কি না, খোঁজ করছিলাম ।”

“কোথায় উঠেছেন ?”

“ইউসুফভাইয়ের বাড়িতে ।”

“সেখানে অসুবিধে হচ্ছে ?”

“না, না । আসলে কানও বাড়িতে থাকতে সঙ্কোচ হয় ।”

“ইন্ডিয়ান হ্যাবিট ।” এ. বি. ঘোষ রিসেপশনিস্টকে প্রশ্ন করলেন, “কৰ্ম নাই ?”

“আছে ।” অদ্ভুত উচ্চারণে জবাব দিল ছেলেটি ।

“এই হোটেলের খোঁজ পেলেন কী করে ?”

“রাস্তায় যেতে-যেতে সাইনবোর্ড চোখে পড়ল ।” অর্জুন হাসল, “গ্রামে কবে যাচ্ছেন ?”

“গ্রামে ? ও । আপনার তো গ্রাম দেখার সাধ আছে । চলে যান কালীগঞ্জে । গিয়ে বিমানবিহারী ঘোৰের সঙ্গে দেখা করবেন । সঙ্কোচ না হলে দু-তিনদিন থাকার কোনও অসুবিধে হবে না । দু-তিনদিন বাদে অবশ্য একটা শৃঙ্গটি-পার্টি যাবে সেখানে । সেটাও দেখতে পারেন ।” এ. বি. ঘোষ বেরিয়ে গেলেন ।

অর্জুন কিছুক্ষণ সময় কোনওমতে কাটিয়ে ঘুরে আসছি বলে বেরিয়ে এল হোটেল থেকে । বিমানবিহারীকে চেনেন এ. বি. । এখন আর কোনও সন্দেহ নেই, ইনিও ওই পরিবারের একজন, অথচ নিজের পুরো নামটা বললেন না । প্রীতম হোটেলে এ. বি. রায় কী করছিলেন ? প্রযোজক কি তাঁর সঙ্গে কথা বলতেই হোটেলটাকে বেছে নিয়েছিলেন ? রিসেপশনিস্টের কথাবার্তায় বোঝাই যায় ওখানে ওঁদের যাতায়াত আছে । এ. বি. ঘোৰের বাড়ি বনানীতে, প্রযোজকের মালিবাগে, অথচ দুজনে দেখা করছেন প্রীতম হোটেলে এসে । যাক গে ! কালীগঞ্জে পৌঁছাবার একটা সূত্র তো পাওয়া গেল । এই সময় ড্রাইভার বিড়বিড় করে কিছু বলতেই অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “কী হয়েছে ভাই ?”

“দ্যাখেন না ছার, টয়েটো গাড়িটা তখন থেকে পেছনে লেগেই আছে ।”

অর্জুন মুখ শুরিয়ে গাড়িটাকে দেখল । সাদা গাড়ি, ড্রাইভার একা । ওদের গাড়ি ক্ষেদিকে শুরছে, ওটাও পেছন পেছন আসছে । হঠাতে অর্জুনের ড্রাইভার

গাড়ি থামিয়ে দিল। সঙ্গে-সঙ্গে পেছনেরটাও থেমে গেল। ড্রাইভার দরজা খুলে পেছনের দিকে গেল, “কী মিওগা, মতলবখন কী, কল তো? পিছনে লাইগ্যাআছেন ক্যান?”

অন্য গাড়ির ড্রাইভার বলল, “রাস্তা তো কারও বাপের সম্পত্তি না।”

গজগজ করে ফিরে এল ড্রাইভার, “কে গুড়া, কে ভালমানুষ, আজকাল বোঝাই যায় না? চলেন ছার, বাসায় যাই।”

“চলুন।” অর্জুন বলল। ওই গাড়িটাকে কি কেউ তাকে অনুসরণ করতে পাঠিয়েছে? তা যদি হয়, তা হলে ওর তো নিজেকে আড়ালে রাখার কথা। এমন গায়ে পড়ে কেউ অনুসরণ করে? কিন্তু দেখা গেল ইউসুফভাই-এর বাড়ির দরজা পর্যন্ত দ্বিতীয় গাড়িটা পেছন ছাড়ল না। ওরা ভেতরে ঢেকার পর গাড়িটা বেরিয়ে গেল। অর্জুনের মনে হল, গাড়িটাকে এ. বি. ঘোষ পাঠাননি তো? পাঠানোর অর্থ, ওর মনে অর্জুন সম্পর্কে সন্দেহ এসেছে। সাধারণ জীবনযাপন করেন যে সমস্ত মানুষ, তাঁদের মনে এমন সন্দেহ ছুট করে আসে না।

লাঞ্ছের আগে ইউসুফভাই ফিরে এলেন, “কেমন ঘুরলেন অর্জুনবাবু?”

“আপনি আমাকে তুমি বলবেন, আর বাবুটা ছাড়ুন।”

“ঠিক আছে, ঠিক আছে।”

অর্জুন ওঁকে সকালের অভিজ্ঞতাটা জানাল।

“তোমার ওই হোটেলে যাওয়াটা ঠিক হয়নি। আমার এখানে কি খুব অসুবিধে হচ্ছে?”

“বিন্দুমাত্র নয়। আমি যার খুঁজতে প্রীতম হোটেলে যাইনি।”

“তা হলে তো আরও ভুল হল। এই লোকগুলো অত্যন্ত ডেঞ্জারাস ধরনের। আর এদের জন্য তো বাংলাদেশে আসেনি। আমাকে ভুল বুঝো না। ওই প্রযোজকের নাম রাজউদ্দিন আহমেদ। লোকে রাজুভাই বলে ডাকে। পর-পর দুটো ছবি মার খাওয়ার ফলে লোকটা এখন আকর্ষ ঝগঢ়স্ত। তৃতীয় ছবিটা শুরু করছে ধার করে। এটাও যদি না চলে, তা হলে আত্মহত্যা অথবা বাংলাদেশ ছেড়ে পালানো ছাড়া ওর কোনও পথ নেই। এসব কথা আমার এক চিত্রসাংবাদিক বন্ধুর কাছে শুনতে পেলাম। এ. বি. ঘোষের কথা ভাল করে কেউ জানে না। হ্যাতো লোকটা টাউট, রাজুভাইকে টাকা জোগাড় করে দিচ্ছে। ঢাকার অনেককেই বাইরে থেকে দেখে বোঝা যায় না কার পকেট ভর্তি, কার শূন্য।”

“কিন্তু ওরা যে আমার খবর জানার জন্য প্রকাশ্যে পেছনে আসবে, তা ভাবিনি।”

“তা হলেই বোঝো।”

“কিন্তু একটা ব্যাপারে লাভ হল তো।”

“কী ব্যাপারে ?”

“ওই বিমানবিহারীর কাছে পৌঁছনো যাবে !”

“হয়তো । আবার ওটা বিপদও তো ডেকে আনতে পারে ।”

“মানে ?”

“আমরা জানি না বিমানবিহারীর সঙ্গে এ. বি. ঘোষের সম্পর্ক কী ধরনের ! ওঁর পরিচয় নিয়ে ভদ্রলোকের কাছে গেলে তিনি ভাল চোখে না-ও দেখতে পারেন । আমরা বিমানবিহারীর কাছে যাচ্ছি না । আমি অন্য সূত্র পেয়েছি ।”

“কীরকম ?”

“আমার এক বন্ধুর নাম সাহাবুদ্দিন । তাঁর প্রেস আছে, বই ছাপে । চিত্রসাংবাদিক বস্তুটি আমাকে বলল সাহাবুদ্দিনের বাড়ি ওই কালীগঞ্জে । কর্মচারী ছাড়া কেউ নেই ওখানে । তার দেশের বাড়িতে বেড়াতে যেতে চাই শুনে সে খুব খুশি ।”

“কবে যেতে পারি আমি ?”

“আমি না ভাই, আমরা ।”

“বেশ, তাই হোক ।”

“আগামীকাল সকাল দশটায় সাহাবুদ্দিন তার গাড়ি নিয়ে আমার এখানে আসবে । ও জানে তুমি একজন সাধারণ টুরিস্ট । এর বেশি ওর জানার দরকার নেই ।”

অর্থাৎ আজকের বিকেলটা ঢাকায় থাকতে হচ্ছে । অর্জুন ঠিক করল, বিকেলে বুড়িগঙ্গা দেখতে যাবে । পুরনো ঢাকাকে দেখতে হবে ।

॥ ছয় ॥

সাহাবুদ্দিন গাড়ি চালাচ্ছিলেন । ভদ্র চেহারার মানুষটির মুখে হাসি লেগেই আছে । পরিচয় করার সময় বললেন, “আমাকে মনুভাই বলবেন ।”

অতএব মনুভাইয়ের পাশে অর্জুন বসল । পেছনের আসনে ইউসুফভাই । এখানকার বেশিরভাগ মানুষ, যাঁরা স্বাধীনতার পর জয়েছেন, তারা বাংলা নাম পছন্দ করেছেন । তার আগের মানুষরা ডাকনামটাকেই আসল নামের সঙ্গে ব্যবহার করা শুরু করেছেন । মনুভাই গাড়ি চালাতে-চালাতে বললেন, “নামের ব্যাপারে এখন আমরা আপনাদের থেকে এগিয়ে আছি । আচ্ছা, আপনাদের একটি মেয়ের আধুনিক নাম বলুন তো !”

অর্জুন মনে করার চেষ্টা করে না পেরে বুদ্ধদেব গুহার শরণাপন্ন হয়ে বলল, “যোজনগঙ্গা ।”

মনুভাই বললেন, “ভাল । তবে আমাদের মেয়েদের নাম এখন ‘একা’ রাখা হচ্ছে । একা, মেহা ।”

অর্জুন অবাক হল। কোনও বাঙালি তাঁর মেয়ের নাম 'একা' রেখেছেন, তা সে ভাবতে পারছিল না।

সুন্দর চওড়া রাস্তা দিয়ে গাড়ি ছুটে যাচ্ছিল। এদিকটায় রিকশার ভিড় কমে আসছে। ডান-দিকের পাঁচিলয়েরা বিশাল বাড়িটি যে ঢাকার টেলিভিশন কেন্দ্র, তা ইউনিভার্সাল জানালেন। ক্রমশ নির্জন এলাকার সুন্দর-সুন্দর বাড়ি নজরে এল। এসব বাড়িতে বিদেশি মানুষেরা বিপুল ভাড়া দিয়ে বাস করেন। তারপরেই শিল্প এলাকা। পেট্রুল পাস্পের নামগুলোও চমৎকার। কোনওটা 'পদ্মা', কোনওটা 'মেঘনা'। যমুনাও নাকি আছে। চলিশ মিনিট পরে দু'পাশে গ্রামবাংলা এসে গেল। এবার হাইওয়ে ছেড়ে ডান-দিকের অপেক্ষাকৃত ছোট রাস্তায় বাঁক নিল গাড়ি। ঢাকা-চট্টগ্রাম রেললাইন পার হতেই দু'পাশে আম-কঁচালের গ্রামগুলো। মনুভাই বললেন, "এগুলো এখন আর আগের মতো গ্রাম নেই। লোকে এখান থেকে ঢাকা শহরে ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করে। ঢাকারিটাই প্রামের মানুষদের আসল জীবিকা।"

একসময় গাড়িটা থামতে বাধ্য হল। একটি ছোট নদী সামনে। পাশে ব্রিজ তৈরির চেষ্টা হচ্ছে। নৌকো করে গাড়িটা পার করা হবে। মনুভাই বললেন, "এটি শীতলক্ষ্যার একটা শাখা।"

অর্জুন দেখল খানিকটা দূরে গোটাকুড়ি ছাউনি দেওয়া নৌকো বাঁধা আছে। নৌকোর ওপর যারা বসে, তাদের বেদে-বেদেনি বলে মনে হচ্ছিল। মনুভাই বললেন, "হাঁ, ওরা তাই। এই শাখা নদীটির একটি বিশেষত্ব আছে। এর বালি থেকে বিনুকের বুকে মুক্তো তৈরি হয়। কুড়ি-পঁচিশটা বিনুক তুলতে পারলে একটা মুক্তো আবিষ্কার করা অসম্ভব নয়। বেদেরা ওই মুক্তোর লোভে এই নদীতে আসে। অবশ্য এখন সরকার অনেক কড়াকড়ি করেছেন।"

গাড়িটা যতক্ষণে ওপারে না গেল, ততক্ষণ কাজে লাগাল অর্জুন। বেদেদের নৌকোর গায়ে চলে এল সে পাড় ধরে। বেদেদের চেহারা, পোশাক একই রকম হয়। তারা অর্জুন সম্পর্কে একটুও আগ্রহ দেখাল না। সে গায়ে পড়েই একজনকে জিজ্ঞেস করল, "মুক্তো পেয়েছেন?"

লোকটা বিড়ি খাচ্ছিল নৌকোর গায়ে হেলান দিয়ে। বলল, "কিনবেন নাকি কর্তা?"

"না, মুক্তো কেনার ক্ষমতা আমার নেই।"

"ঢাকায় থাকেন নাকি?"

"না। আমি জলপাইগুড়ি থেকে এসেছি।"

"জলপাইগুড়ি?" লোকটা সোজা হয়ে বসল। তারপর চিংকার করে সঙ্গীদের যা বলল, তা উচ্চারণের জন্য অর্জুনের বোধগম্য হল না। কিন্তু কথাটা শুনে সবাই বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠল। অর্জুন দেখল, সবাই তাকে নিয়ে উত্তেজিত আলোচনা শুরু করল। এবার প্রথম লোকটা বলল, "দুধ-কলা

খাওয়াইলেও সাপে ছোবল মারে । যে আসছিল সে কি আপনার পার্টনার ?”

ইতিমধ্যে মনুভাই এবং ইউসুফভাই এসে পড়েছেন অর্জুনের কাছে । অনেক কষ্টে চিংকার-চেঁচামোচি এবং হাতজোড় করে তাঁরা বেদেদের শাস্ত করে উত্তেজনার কারণটা জানতে পারলেন । বেদেরা জানাল, ক'দিন আগে একটি ছেলে অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে এখানে এসেছিল । বেদেরা তাকে আশ্রয় দেয় । দু'দিন থাকে সে নৌকোয় । তখন বেদেরা জানতে পারে, সে এসেছে ইন্দিয়ার জলপাইগুড়ি থেকে । হঠাৎই গতকাল ছেলেটি উধাও হয়ে গিয়েছে । যাওয়ার সময় একটি বেদের সংগ্রহ করা চারটে মুক্তোও নিয়ে গেছে । ওই মুক্তোগুলোর দাম যাই হোক না কেন, ওর বিশ্বাসযাতকতা ভুলবে না এরা কখনও । অর্জুন যেহেতু জলপাইগুড়ি থেকে এসেছে, তাই ওরা ধরে নিয়েছে দু'জনের মধ্যে 'যোগাযোগ আছে । মুক্তো ফেরত না পাওয়া পর্যন্ত ওরা অর্জুনকে ছাড়বে না ।

শেষপর্যন্ত অনেক কথা খরচ করার পর ইউসুফভাইরা বেদেদের শাস্ত করতে পারলেন । অর্জুন কথা দিল ছেলেটিকে দেখতে পেলে সে পুলিশের হাতে তুলে দেবে । কিন্তু এইসঙ্গে অর্জুনের একটা চিন্তা দূর হল । কাজল তা হলে এই পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে এবং অকুশ্লে পৌঁছলেও এত তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করতে না পারার কথা । বেদেরা বলছে গতকাল সে এখন থেকে চলে গিয়েছে ।

নৌকো ওদের গাড়ি ওপারে পৌঁছে দিলে আবার চলা শুরু হল । মনুভাই 'বললেন, "কী ব্যাপার বলুন" তো ? জলপাইগুড়ি থেকে হঠাৎ এই অঞ্চলে আপনার আগে আর-একজন তক্ষণ উপস্থিত হলেন কেন ?"

"আমার আগে আর-একজন তক্ষণ মানে ?" অর্জুন জিজ্ঞেস করল ।

"সরি ! আমার কথাটা ওইভাবে বলা ঠিক হয়নি ।" মনুভাই লজ্জিত হলেন ।

ইউসুফ বললেন, "জলপাইগুড়ি থেকে কেউ যদি এসে বেদেদের প্রতারণা করে, তা হলে তার আসার কারণ অর্জুন জানবে কী করে মনুভাই ?"

মনুভাই মাথা নাড়লেন, "তা অবশ্য ঠিক । কিন্তু অর্জুনভাই, যে-লোকটি এসেছে, সে সুবিধের নয় । আমার মনে হয় আপনার পরিচয় জলপাইগুড়ির লোক না বলাই ভাল । মানুষ খুব সহজে ভুল বোঝে ।"

কথাগুলো ভাল না লাগলেও অর্জুন কিছু বলল না । হ্যাঁ, কাজল নিশ্চয়ই অন্যায় করেছে । ওই গরিব বেদের মুক্তো চুরি করেছে আশ্রয় পাওয়ার পরেও । এর কোনও ক্ষমা নেই । এই চরিত্র একদিনে তৈরি হয় না । অবনীবাবু ঠিক কাজ করেছেন ভিসার জন্য সুপারিশ না করে । কিন্তু টুকু কী করে এমন খারাপ ছেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব করল !

এখন রাস্তা ছোট, কিন্তু পরিষ্কার । দু'পাশের ছবি যেন বইয়ের পাতা থেকে উঠে এসেছে । যে-গ্রামবাংলার কাহিনী এবং কবিতা একসময় পাঠ্য বইয়ে পড়া

যেত, তাই দু'পাশে দৃশ্যমান । খুব ভাল লাগছিল অর্জুনের । মনুভাই বললেন, “সামনেই খিস্টানপাড়া । এখানকার সবাই খিস্টান । অনেকেই ঢাকার ব্রিটিশ হাইকমিশনে চাকরি করেন । ঢাকার বড় হোটেলগুলোর কর্মচারীরা এখান থেকেই যান । মিশনারিয়া জায়গাটা চালান ।”

পাঁচিলঘেরা একটি বিশাল এলাকার সুন্দর ঘরবাড়ি, গির্জা দেখা গেল । শাস্ত, শব্দহীন । জানা গেল, অনেকেই সুযোগসুবিধে বেশি পাওয়ার আশায় এখানে এসে ধর্মান্তরিত হয়েছেন । কিন্তু এই নিয়ে এলাকায় কোনও বামেলা হয়নি । ভেতরের ব্যবস্থা নাকি অত্যন্ত আধুনিক ।

খানিক বাদেই ক্ষুধিত পাষাণের বাড়িটির মতো একটি বিশাল বাড়িকে দেখা গেল । এটি নাকি জমিদারের পরিত্যক্ত বাসভবন । এখন সরকার এটাকে ভবযুরেদের আশ্রম করেছেন । ঢাকা শহরের রাস্তা থেকে ভবযুরেদের তুলে এনে এখানে রাখা হয় । তাদের অবশ্য এই নিরাপদে বেশিদিন থাকার বাসনা কখনওই হয় না ।

শেষপর্যন্ত কালীগঞ্জ এসে গেল । ঢোকার মুখেই বাজারের গায়ে একটি সুন্দর মসজিদ । এখানে একসময় বিশাল মাটির ঢিবি ছিল । জমিটা মনুভাইদের । তাঁর পূর্বপুরুষ ওই ঢিবি খুঁড়ে এই বাড়ি আবিষ্কার করে তাকে মসজিদে রূপান্তরিত করেছেন ।

মনুভাই গাড়ি চালিয়ে চলে এলেন গ্রামের শেষপ্রান্তে । ওঁদের বাড়ির মধ্যেও একটি ছোট মসজিদ আছে । গাড়ি দেখে ছুটে এল অনেক মানুষ । এরা সবাই এই বাড়ির বিভিন্ন কাজে আছে । মনুভাই কাউকে চাচা, কাউকে খালা বলে ডেকে কাজের কথা বলতে লাগলেন । তারপর ইউনুফাই এবং অর্জুনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, “আজ কী খাওয়াবেন ?”

ওঁদের মধ্যে যিনি বৃদ্ধ তিনি বললেন, “ছার, মেহমান আইছেন, তাঁদের সম্মান তো রাখতেই হইব । গ্রামের মানুষের যা ক্ষমতা তাই দিয়াই মেহমানদের সেবা করব ।”

মনুভাই বললেন, “অর্জুনবাবু, এ হচ্ছে ইন্দ্রিস, আমার ঠাকুর্দার আমলের মানুষ । ছেলেবেলায় ওর কোলে-পিঠে চড়েছি কত । আর এ হল দুর্গাদাস । বাবার সবসময়ের সঙ্গী ছিল ।”

দুর্গাদাস খুবই বৃদ্ধ, কিন্তু এখনও তার শরীর সোজা । নমস্কার করে বলল, “পুরা নাম দুর্গাদাস কৈবর্ত । কর্তা আমারে ভালবাসতেন । যৌবনে ডাকাতি করতাম । এই বাড়ির পেছনে যে বিল, তার সব পানি আমার কথা শুনত । একদিন ধরা পড়লাম, জেল হল । কর্তা আমাকে এই বাড়িতে কাজ দিয়া বললেন, দুর্গা, এবারে আমারে বাঁচ । চারপাশে অনেক শক্র । কে কাকে বাঁচায় ! তিরিশ বছর তাঁর ছায়ার পাশে কোনও দুশমনরে আসতে দিই নাই, কিন্তু ভগবান যেদিন কর্তারে ডাক দিলেন সেদিন আমার মতো মানুষ...” দুর্গাদাস

চোখের জল মুছল ।

এদের ভাল লাগছিল অর্জুনের । প্রচুর গাছগাছালি চারপাশে, বাড়ির ভেতর পুকুর । ওরা বাড়ির পেছনে যেতেই অর্জুন অবাক ! আকাশের শেষ দেখা যাচ্ছে না, শুধু জল আর জল । মনুভাই বললেন, “এই হচ্ছে কালীর বিল । এর কথাই দুর্গাদাস আপনাকে বলছিল । আগে এই বিল পেরিয়েই আমাদের যাতায়াত করতে হত । ওই যে আকাশহোঁয়া বটগাছ দেখছেন, দূর থেকে ওটাকে দেখেই নৌকোর মাঝিরা দিক ঠিক করত ।”

বিলের ধারে গাছের তলায় টেবিল, চেয়ার পেতে দেওয়া হল । অর্জুন, ইউসুফভাই সেখানে বসতেই মনুভাই কাজকর্মের কথা বলতে গেলেন । এখানে তাঁরা নতুন করে মাছচাবের প্রকল্প নিয়েছেন । ইদ্রিস এবং দুর্গাদাস ডাব নিয়ে এল প্রথমে । সেই ডাবের জল গাছের ছায়ায় বসে খোলা জলের দিকে তাকিয়ে খেতে-খেতে অর্জুনের মনে হল এর চেয়ে আরাম সে কখনও পায়নি । ইউসুফভাই জিজ্ঞেস করলেন, “আচ্ছা মিএঁ, এখানে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভাব কীরমকর্ম ?”

ইদ্রিস বলল, “জবাব দাও হে দুর্গাদাস ।”

দুর্গাদাস বলল, “ওই যে দেখতেছেন বাড়িঘর, ওখানে মোছলমানের বাস আর তার এদিকের বাড়িগুলান হিন্দুদের । বাপ-ঠাকুরার মুখেও ধৰ্ম নিয়ে কাউরে কাজিয়া করতে শুনি নাই । ওসব জিনিস শহরে হইলেও হইতে পারে, কালীগঞ্জে হয় নাই, হইব না ।”

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “এখানে হিন্দু কত আছেন ?”

“অনেক । তবে বেশিরভাগই গরিব । থাকার মধ্যে আছেন ঘোষমশাইরা । তবে তাঁদেরও অনেকে শহরে গিয়া আছে । এখন শেষদশা ।” ইদ্রিস জবাবটা দিল ।

“ঘোষমশাইরা কি একসময় বড়লোক ছিলেন ?”

“হাঁ ছার । বাপের মুখে শুনছি সেসব বৃত্তান্ত । এখন কিছু নাই ।”

“শহরে যাঁরা গিয়েছেন তাঁরা আর আসেন না ?”

“না বললেই হয় । আকাশবাবু মাঝে-মধ্যে আসেন ।”

“আকাশ !” .

ইউসুফভাই মাথা নাড়লেন, “সঙ্গবত এ.বি. ।”

অর্জুনের মুখে হাসি ফুটল । তা হলে এ.বি.-র পুরো নাম আকাশবিহারী ।

“গতকাল ইন্ডিয়ার এক মেহমান আসছেন ওই বাড়িতে ।”

“ইন্ডিয়া থেকে প্রায়ই লোক আসে বুঝি ?”

“না ছার । সেই বড় ঘোষবাবুর দেহ রাখার পর আসছিল, তারপর তো কাউরে দেখি নাই ।”

“ওঁদের বাড়িটা কত দূরে ?”

“কাছেই।” দুর্গাদাস ঘুরে দাঁড়াল, “ওই যে শিমুলগাছটা দেখতেছেন, ওইখানে।”

এই সময় মনুভাই ফিরে এলেন, “কীরকম লাগছে আমাদের গ্রাম!”

“দারুণ। বাংলাদেশে এসে যদি ঢাকা থেকেই ফিরে যেতাম, তা হলে কিছুই দেখা হত না। এত সুন্দর জায়গা, ইচ্ছে হচ্ছে কটা দিন থেকে যাই।” অর্জুন বলল।

“থাকুন। কোনও সমস্যা নেই। এরা আপনার দেখাশোনা করবে। যরগুলো তো সব খালি পড়ে আছে।” মনুভাই হাসলেন, “কিন্তু আমাকে আজই ফিরে যেতে হবে। ইউসুফভাই, আপনিও থাকবেন নাকি?”

“আমি তো বাড়িতে বলে আসিনি কিছু।”

“সেটা আমি জানিয়ে দিতে পারি।”

“তা হলে একটা দিন থাকা যায়।”

ভাত এবং মাছের খোল খেয়ে মনুভাই প্রায়-বিকেলে গাড়ি নিয়ে ফিরে গেলেন। যাওয়ার আগে বলে গেলেন যখনই অর্জুনদের ঢাকায় যাওয়ার ইচ্ছে হবে, কালীগঞ্জের পোস্ট অফিস থেকে টেলিফোন করে দিলে দেড় ঘণ্টার মধ্যে ড্রাইভার এখানে গাড়ি নিয়ে আসবে।

ধুলো উড়িয়ে ওঁর গাড়ি মিলিয়ে গেলে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “ইউসুফভাই, আমার জন্য নিশ্চয়ই আপনার কাজকর্মের ক্ষতি হবে?”

“সেটা সামলে নিতে পারব। কিন্তু ভাই, জীবনে কোনও রহস্য সন্ধানে শামিল হইলি। সুযোগ যখন পাওয়া গেল তখন হাতছাড়া করি কেন? একবার যাবেন নাকি ঘোষবাড়িতে?” ইউসুফভাই জিজ্ঞেস করলেন।

অর্জুন মাথা নাড়ল, “এখনই নয়। আপনি নিশ্চয়ই দুর্গাদাসের কথাটা শুনেছেন। ওই বাড়িতে গতকাল একজন অতিথি এসেছেন ইন্ডিয়া থেকে।”

“হ্যাঁ, শুনেছি।”

“আমার ধারণা, এই অতিথিটিই বেদেদের মুক্তো চুরি করেছেন।”

“কাজলবাবু? তা কী করে হবে? উনি তো ঘোষ নন।”

“মুখার্জি। কিন্তু দূর দেশে এসে ঘোষ সাজতে অসুবিধে কোথায়? অবশ্য এ-সবই আমার অনুমান। হয়তো কাজল নয়। অন্য লোক এসেছেন। কিন্তু কাজল যদি হয়, তা হলে বলব সাহস আছে ওর। চলুন, গ্রামটা ঘুরে দেখি। বিকেলে হাঁটতে খারাপ লাগবে না।” অর্জুন বলল।

ইউসুফভাই হাত নেড়ে দূরে দাঁড়ানো ইদ্রিসকে ডাকলেন, “আমরা একটু আপনাদের গ্রাম ঘুরে দেখতে যাচ্ছি।”

ইদ্রিস বলল, “চলেন, আমিও আপনাদের সঙ্গে যাই।”

কালীগঞ্জের রাস্তায় এখনও পিচ পড়েনি। অবশ্য যে প্রধান পথে বাস-চলাচল করে, সেটি পিচের। আজকাল এখানে ঢাকার বাস সরাসরি

আসে । ইদিস সঙ্গে থাকায় সুবিধে হচ্ছিল । বিভিন্ন বাড়ি, গাছ, মাঠ দেখিয়ে সে একটার পর একটা কাহিনী শুনিয়ে যাচ্ছিল । একটা বিরাট ঝাঁকড়া তেঁতুলগাছ দেখিয়ে ইদিস বলল, “এখানে ঘোষবাবুদের এক ছেলে গলায় রশি দিছিল ।”

ইউসুফভাই জিজ্ঞেস করলেন, “কত বছর আগে ?”

“তা ধরেন, যে-বছর পাকিস্তান হল সেই বছর ।”

অর্জুন হেসে ফেলল । ছেলেশ বছর ধরে কোনও ভূত তেঁতুলগাছে বসে থাকবে, এমন হতে পারে না । ভূতেদেরও কাজকর্ম থাকে । সেটা দেখে ইদিস বলল, “হাসবেন না ছার, আমাবস্যার রাইতে এখনও তিনি আসেন । ঘোষবাবুদের পুকুর থেকে মাছ ধরেন ।”

“আপনি দেখছেন ?”

“বিমানবাবু দেখছেন ।”

“উনি কি নেশাভাঙ করেন ?”

প্রশ্নটা ইদিসের পছন্দ হল না । সে গভীর হয়ে গিয়ে বলল, “ইনশা আল্লা !”

দেখা গেল পুলিশের পোশাক পরা দু'জন লোক সামনের পথ ধরে এগিয়ে আসছেন । ওঁদের একজন অবশ্যই অফিসার । ইদিস বলল, ‘সামনেরডা দারোগাবাবু, খুব রাগী ।’

ওরা যখন মুখোমুখি হল তখন দারোগাবাবু দাঁড়িয়ে গেলেন, “নতুন মুখ দেখছি । মহাশয়দের পরিচয় জানতে পারি ?”

ইদিস বলল, “ছার, ইনারা আমাদের বাবুর মেহমান ।”

“কোন বাবু ?”

“মনুভাই ।”

“ও । সাহাবুদ্দিন সাহেব এসেছেন নাকি ?”

এবার ইউসুফভাই জবাব দিলেন, “ওঁর সঙ্গেই আমরা এসেছিলাম । কিন্তু উনি কাজ থাকায় চলে গেছেন, আমরা থেকে গেলাম । আমি মোহসিন ইউসুফ । ঢাকায় থাকি, ব্যবসা করি । আর ইনি অর্জুন, ইন্ডিয়া থেকে বেড়াতে এসেছেন ।”

“ইন্ডিয়া থেকে ? ওয়েস্ট বেঙ্গল ? ওয়েস্ট বেঙ্গলের কোন পার্ট ?”

“জলপাইগুড়ি ।”

“সে কী ! আপনি কবে এসেছেন এদিকে ?”

“আজই ।”

“অসম্ভব । আমার কাছে রিপোর্ট আছে আপনি কয়েকদিন আগে এদিকে এসেছেন অসুস্থ হয়ে । আপনাকে আমার সঙ্গে থানায় যেতে হবে ।”

ইউসুফভাই কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, অর্জুন তাঁকে বাধা দিল, “আমি আপনার

সমস্যাটা বুঝতে পারছি । থানাটা কত দূরে ?”

“কাছেই । চলেন । মেঘ না চাইতেই পানি পেয়ে গেলাম ।”

ওঁরা প্রায় পাহারা দিয়ে অর্জুনকে থানায় নিয়ে এলেন । ঘরে দুকে ইউসুফভাই বেশ রাগত গলায় বললেন, “আপনি খুব ভুল করছেন । এখনই যন্তুভাইকে পাবেন না, ঘটা খানেক বাদে ঢাকায় ফোন করুন, উনি বলবেন অর্জুনবাবু আজই ওঁর সঙ্গে এসেছেন । আচ্ছা, আর-একটা কাজ করা যেতে পারে, আপনি আমার বাসায় ফোন করে জিজ্ঞেস করুন অর্জুন কবে এসেছে ?”

“আপনি কার হয়ে সওয়াল করছেন তা জানেন ?”

“জানি । উনি একজন সত্যসন্ধানী ।”

“কী সন্ধানী ?”

“সত্যসন্ধানী ।” খুব জোরে জবাব দিলেন ইউসুফভাই ।

“ব্যাপারটা কী ভাই ?”

অর্জুন অস্বস্তিতে পড়ল । সে জবাব দিল, “কিছু না । আপনার সমস্যা হল জলপাইগুড়ি শব্দটা । আমরাও আজ বেদেদের মুখে ঘটনাটা শুনেছি । আপনি যাকে খুঁজছেন তিনি আমি নই ।”

অফিসার কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন । তারপর বসতে বললেন, “আপনার কোনও আইডেন্টিটি কার্ড সঙ্গে আছে ?”

“পাশপোর্ট আছে ।”

“দেখি ।”

অর্জুন পাশপোর্ট বের করে দিলে ভদ্রলোক পাতা ওলটাতে লাগলেন, “পরশু রাত্রে এসেছেন । অতএব সন্দেহ দূর হল । এটা বললেই হত । প্রফেশন ট্রুথ ইনভেস্টিগেটর । মানে কী ?”

“সত্যসন্ধানী ।” জবাব দিলেন ইউসুফভাই ।

“কী সত্য খোঁজেন আপনি ?”

“যে-সত্য আগে থেকে বোঝা যায় না ।”

“তার মানে আপনি ডিটেকটিভ ?”

“না । ডিটেকটিভরা অন্য ধরনের মানুষ । আমি সাধারণ ।”

“হ্ম ! এখানে কোন সত্য খুঁজতে এসেছেন ?”

“এখানে এসেছি বাংলাদেশের গ্রাম দেখতে । সত্যিকারের গ্রাম ।”

অফিসার চিংকার করে চায়ের ভুক্ম দিয়ে বললেন, “মশাই, সত্য খোঁজা আমাদের চাকরির মধ্যে পড়ে । সেটা খুঁজতে গিয়ে হিমশিম খাই আমরা । আর আপনারা মোটা টাকা দক্ষিণ নিয়ে সেই কাজটা করেন । গোয়েন্দা-উপন্যাসে পুলিশ যা পারে না, তাই গোয়েন্দারা পারে । আপনারা কি আমাদের চেয়ে বেশি বোঝেন ?”

“মোটেই নয় । আমি গোয়েন্দাও নই ।”

“শুনুন। জলপাইগুড়ি থেকে এক জোচোর এখানে এসেছে। অবশ্য কালীগঞ্জেই যে আছে এমন কোনও প্রমাণ নেই। এখানে আর-এক ভদ্রলোক এসেছেন ঘোষবাড়িতে, কিন্তু তাঁর দাড়ি নেই।”

“দাড়ি নেই মানে ?”

“বেদেরা বলেছে, যাকে ওরা আশ্রয় দিয়েছিল তার দাড়ি ছিল।”

“ও। দেখুন, দাড়ি তো কেটে ফেলা যায়।”

“তা যাই কিন্তু...।” চিন্তায় পড়লেন অফিসার।

“উনি ক’দিন থাকবেন এখানে ?”

“দু-চারদিন।”

“নামটা কী ?”

“সাগরবিহারী ঘোষ।”

অর্জুন হেসে ফেলল। কাজল মুখার্জি নিঃসন্দেহে বুদ্ধিমান। এই পরিবারের সঙ্গে মেলানো নাম খুঁজে পেয়েছে। খাওয়া হয়ে গেলে অর্জুনরা বিদ্যমান চাইল। অফিসার পাশপোর্ট ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, “যদি কোনও প্রয়োজন হয় নির্দিষ্টায় চলে আসবেন।”

“অনেক ধন্যবাদ।”

ইদিস তাদের বাইরে আসতে দেখে খুশি হল। তখন ধূপছায়া নেমে গেছে পৃথিবীতে। অর্জুন ইদিসকে বলল, ‘রাত হওয়ার আগে আমরা একবার ঘোষবাবুদের বাড়িটা দেখতে চাই।’

“চলেন কর্তা।” ইদিস এগিয়ে চলল।

ঘোষবাবুদের অবস্থা যে এককালে ভাল ছিল, তা দূর থেকে বাড়িটাকে দেখেই বোঝা যায়। এখন অযত্ন এবং অর্থভাব একসঙ্গে মিশে যাওয়ায় হতঙ্গী হয়ে আছে। বাড়ির কাছাকাছি আসতেই অর্জুন ছাদে একজন যুবককে দেখতে পেল। কোতুহলী চেখে তাদের দেখছে। তারপর ধীরে-ধীরে সরে গেল। বাড়িটা দোতলা। ঘর অনেক।

অর্জুন জিজেস করতে গিয়ে থমকে গেল। বাড়ির সামনেই একটি শিবমন্দির। মন্দিরের দশা খুবই করুণ। এখন নিয়মিত পুজো হয়তো হয়, কিন্তু অনেককাল সংস্কার হয়নি, শিবমন্দিরের ডান দিকে কোনও বটগাছ নজরে পড়ল না। বস্তুত কোনও বটগাছই ধারেকাছে নেই। সে বলল, ‘বাড়িটার যা চেহারা, তাতে আশেপাশে একটা বটগাছ থাকলে ভাল হত।’

ইদিস সঙ্গে-সঙ্গে মাথা নাড়ল, “ছিল ছার। একটা বটগাছ এখানে ছিল। যে-বছর দেশ স্বাধীন হইল, সেই বছরের বাড়ে গাছ ভাঙ্গে। এনারা তখন গাছ কেটে ফেলেন।”

“বটগাছটা কোথায় ছিল ?” অর্জুন উত্তেজিত।

“হেইডা তো মনে নাই।”

এই সময় একটি কঠোর ভেসে এল, “কী ব্যাপার ইদিস মির্ণা ?”

ওরা দেখল প্রায়-অঙ্ককার বাড়ি থেকে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। মানুষটি ফর্সা কিন্তু রুগ্ণ চেহারা। পরনের ধূতি, গেঁজি পরিচ্ছন্ন।

“সালাম কর্তা। ওই বটগাছটার কথা বলতে ছিলাম।”

“হঠাৎ বটগাছের কথা কেন ?”

“ছার নিজেই—।”

ইদিসকে বাধা দিলেন ইউসুফ ভাই, “আমরা আজই আপনাদের গ্রামে এসেছি। মনুভাই, মানে সাহাবুদ্দিন আমাদের বক্সু। বেড়াতে-বেড়াতে এখানে এসে মনে হল আপনার বাড়ির সঙ্গে বটগাছ থাকলে ভাল হত।”

“তা অবশ্য, আরও প্রাচীন দেখত। আমার নাম বিমানবিহারী ঘোষ।”

“আচ্ছা ! আপনার কথা আমি আকাশবিহারীর কাছে শুনেছি।”

“ও। সে আমার ভাইপো। লোক পাঠিয়ে খবর দিয়েছে দু'দিন বাদে শুটিং করতে আসবে। ওসবের সঙ্গে সে কবে জড়িত হল আপনি জানেন ?”

“খুব সম্প্রতি বলে মনে হয়।”

“হ্ম ! আমাদের অবস্থা খুব ভাল নয়। চাষবাস থেকে কোনওমতে চলে। ক'দিন থাকবেন আপনারা ?” বিমানবিহারী জানতে চাইলেন।

“দু-একদিন।” অর্জুন জবাব দিল; “তা হলে এখানে বটগাছ ছিল ?”

“অবশ্যই ছিল। একাত্তর সালে বাজ পড়ে। সেইরাতে ঝড়ও হয়েছিল। ফলে কেটে ফেলতে হয়। গাছটা ছিল খুব পুরনো। এ-বাড়ির একজন হয়ে গিয়েছিল।” বিমানবিহারী যখন কথা বলছিলেন তখন অর্জুন আশপাশে পুকুর খুঁজছিল। বটবৃক্ষ থেকে দশ পা পূর্ব দিকে গেলে এ-বাড়ির দোতলার শেষ জানলাটাকে দেখা যাবে। সেই জানলাটাকে নজরে রেখে একটু ডান দিকে হাঁটলেই পুকুরের ধাপ শুরু হওয়ার কথা। কিন্তু পুকুরের কোনও চিহ্ন আশপাশে নেই। বটগাছ যখন ছিল, তখন পুকুরটারও তো থাকার কথা।

হঠাৎ বোধ হয় খেয়াল হয়েছে বিমানবিহারী, বললেন, “আপনারা বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন কেন ? আসুন, ভেতরে আসুন।”

অর্জুন বলল, “আজ নয়। আর-একদিন আসা যাবে। এখানে এসে দেখছি বিল থাকা সঙ্গেও সবার বাড়িতে পুকুর আছে। আপনাদের নেই ?”

“আছে। আগে দু-দুটো ছিল, এখন একটা। সেটা পেছনে।”

“আগেরটা ?”

“ওই জমিটা বিক্রি করে দিয়েছি খালেদকে। ওখানে একটা পুকুর ছিল। কেনার পরে খালেদ পুকুরটাকে বুজিয়ে দিয়েছে। আচ্ছা, অবস্থাপন্ন বাড়িতে বটগাছ এবং পুকুর থাকাটা কি খুব স্বাভাবিক ?” বিমানবিহারী হেসে জিজ্ঞেস করলেন।

“কেন বলুন তো ?” অর্জুন জানতে চাইল।

“আমার এক জাতি এসেছেন ইন্ডিয়া থেকে, তিনিও বটগাছ এবং পুরুরের খোঁজ করছিলেন।”

“তাই নাকি ? বটগাছটা ছিল কোথায় ?”

“ওইখানে।” আঙুল দিয়ে জায়গাটা দেখালেন বিমানবিহারী।

অর্জুন ওপরে মুখ তুল। তার মনে হল, অন্ধকার নেমে আসা বাড়ির ছাদে কেউ একজন দাঁড়িয়ে আছে। লোকটা কাজল হতে পারে। ওকে তো সবসময় সতর্ক থাকতেই হবে। কিন্তু ওর কথা বিমানবিহারীকে কীভাবে বলা যায় ? মানুষটাকে জটিল মনে হচ্ছে না, ওঁকে সতর্ক করে দেওয়া উচিত।

“আপনাদের নাম জানতে পারলাম না।” বিমানবিহারী বললেন।

“আমি ইউসুফ, ঢাকায় থাকি, ব্যবসা করি। উনি অর্জুন।”

“এখনও ছাত্র ?”

“না, না। আচ্ছা নমস্কার।” অর্জুন আর কথা বাড়াতে চাইল না। বিদায় নিয়ে ওরা ফিরে যাচ্ছিল মনুভাইয়ের বাড়ির দিকে। ইদিস পিছিয়ে পড়েছে দেখে ইউসুফভাই জিজ্ঞেস করলেন, “ওই বাড়ির মাটির তলায় যে সোনা লুকনো আছে, তা পেলে বিমানবিহারী বাকি জীবনটা আরামে থাকতে পারবেন। কিন্তু ওঁকে সে-কথা বললেন না কেন ?”

অর্জুন বলল, “প্রথম আলাপেই ওসব বলা ঠিক নয়। তা ছাড়া খবরটা যদি মিথ্যে হয় ?”

“তা বটে। আমি একটু বুদ্ধি খরচ করব ?”

অর্জুন হাসল, “অবশ্যই।”

“ওই বটগাছটার সঙ্গে কি সোনাদানার কোনও সম্পর্ক আছে ?”

“বাঃ। আরও বলুন।”

“বিমানবিহারীর বাড়িতে জ্ঞাতি হিসেবে যে এসেছে সে হল কাজল। তাই তো ?”

“অনুমান সেইরকমের। তা হলে কথাটা আমি কাউকে জানাচ্ছি না কেন ?”

“অবশ্যই। বাজে লোককে প্রশ্ন দেওয়া উচিত নয়।”

“আর-একটু দেখাই যাক না।”

মনুভাইয়ের বাড়িতে ইলেক্ট্রিক লাইট আছে। সঁপ্রের পর ঘরে বসে মুড়ি আর চা খাওয়া চলছিল। অর্জুন দুর্গাদাসকে খবর দিয়েছিল দেখা করার জন্য। ইদিস মিএও তখন গল্প শোনাচ্ছিল, “বড়বাবুর ইস্টেকাল হওয়ার পর এই বাড়ির পতন হইছে ছার। তাঁকে সবাই এত ভালবাসত যে, আট হাজার মানুষকে খাওয়াইতে হইছিল। সেসব দিন আর নাই।”

“ডাকছেন ছার ?” দুর্গাদাস দরজায় এসে দাঁড়াল।

“হ্যাঁ। তুমি তো এককালে নৌকো নিয়ে বিলে ঘুরে বেড়াতে। আজ রাত্রে আমাদের নিয়ে বের হবে ?”

“নিশ্চয়ই।”

“নিশ্চয়ই, এর বুদ্ধি আছে কিন্তু মাথায় নাই।” শ্রেকিয়ে উঠল ইদিস মিএগা, “বুড়া হইছিস, কতদিন নৌকা চালাস না, রাতের বেলা মেহমানদের যদি বিপদ হয়, কী জবাব দিবি ?”

“আরে মিএগা, মরা হাতি লাখ টাকা। ভরসা রাখো।” তাকে আশ্বাস দিল দুর্গাদাস।

আজ কৃষ্ণপক্ষের রাত হলেও আকাশে মায়াময় আলো ছিল। রাতের খাওয়া সেরে ওরা দুর্গাদাসের নৌকোয় উঠল। বৃদ্ধ বয়সেও দুর্গাদাসের শরীর দীর্ঘ করার মতো। খালি গা, মালকেঁচা মারা ধূতি, লগি নিয়ে বসেছে নৌকোর একপ্রাণে। পাশে একটা সড়কি। ওই অস্ত্রটির কী প্রয়োজন, জিজ্ঞেস করাতে জানাল, “কখন কী হয় তা কে বলতে পারে ?”

দিগন্তবিস্তৃত বিলে মিনিট পনেরো এলোমেলো ঘুরে বেড়াল অর্জুনরা। চমৎকার বাতাস বইছে। একটু শীত-শীত করছে। ধীরে-ধীরে গ্রামের সব আলো নিভে গেল। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “তুমি কি এখনও এই অন্ধকারে দেখতে পাচ্ছ দুর্গাদাস ?”

“হ্রস্ব করেন।”

“শিমুলগাছটা কোথায় ?”

মুখ ঘুরিয়ে দেখে নিয়ে দুর্গাদাস হাত তুলল, “ওই যে।”

কালচে আকাশের সামনে ঝাপসা কিছু নজরে এল অর্জুনের। সে বলল, “কাউকে জানান না দিয়ে আমরা ওখানে যেতে চাই দুর্গাদাস।”

নৌকো ঘূরল। সামান্য জলের শব্দ ছাড়া কোনও আওয়াজ নেই কোথাও। যদি কেউ এগিয়ে আসা বাড়ির ছাদ থেকে তাদের লক্ষ করে, তা হলে চিনতে পারবে কি না সন্দেহ। গাছটার কাছে পৌঁছে যাওয়ামাত্র চাপা গলায় অর্জুন দুর্গাদাসকে থামতে বলল। মুহূর্তেই যেন অতীতের রক্তের ডাক শুনতে পেল দুর্গাদাস। লগি রেখে সড়কি তুলে নিয়ে যেরকম সতর্ক ভঙ্গিতে বসল, তাতে সেইরকম মনে হল অর্জুনের। ঘোষবাড়ির কারও কোনও সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। এবার হাওয়ায় দুলছে নৌকো। অর্জুনের বিশ্বাস, আজ রাত্রে কাজল একটা চেষ্টা করবে। সে যদি বটগাছটা কোথায় ছিল জেনে গিয়ে থাকে, তা হলে দেরি করার ঝুঁকি নিশ্চয়ই নেবে না।

রাত যখন বারোটা, মশার কামড়ে বসে থাকা কষ্টকর হয়ে উঠছে, সেই সময় দুর্গাদাস চাপা গলায় বলল, “ছার। দ্যাখেন ! একজনার মতলব ভাল নয়।”

ওরা দেখতে পেল। একটি মানুষ বারংবার বিশেষ একটা জায়গায় পায়চারি করছে। শিবমন্দির সামনে থাকায় তাকে মাঝে-মাঝেই দেখা যাচ্ছে না। অর্জুন বুঝতে পারল ওটা পায়চারি নয়, জমি মাপছে কাজল। বটগাছ থেকে দশ পা

পুব দিকে গেলে বাড়িটির দোতলার শেষ জানলা দেখা যাবে। দশ পা মিলিয়ে
নিছিল সে।

॥ সাত ॥

অর্জুন চাপা গলায় দুর্গাদাসকে বলল, “চুপ।”

পাতলা অঙ্ককারে কাজলের মুখ দেখা যাচ্ছিল না। ছেলেটা দুঃসাহসী।
পাশপোর্ট ছাড়া যেভাবে এখানে এসে আঁকীয়ের পরিচয় দিয়ে বাস করছে, তা
অর্জুন নিজেও পারত না। হঠাতে বিলের ওপাশে একটা আওয়াজ হতেই কাজল
সোজা হয়ে দাঁড়াল। তার মুখ, আওয়াজটা যেদিকে হল সেদিকে। অর্জুনও
আওয়াজটা পেয়েছিল। দুর্গাদাসের নজরও সেদিকে। ওরা কাজলকে
ধীরে-ধীরে বাড়ির ওপাশে ঝোপটা দিকে যেতে দেখল। এবং চোখের
পলকেই ঘটে গেল ব্যাপারটা।

তিন-চারটে ছায়ামূর্তি ঝোপঝাড় থেকে লাফিয়ে পড়ল কাজলের ওপর। সে
শব্দ করার আগেই ওরা ওকে চ্যাংডোলা করে তুলে নিয়ে মিলিয়ে গেল ঝোপের
মধ্যে। ততক্ষণে দুর্গাদাস নৌকোর ওপর উঠে দাঁড়িয়ে সড়কি তুলেছে ছুড়বে
বলে। অর্জুন তাড়াতাড়ি তাকে বাধা দিল, “না, চুপ।” দুর্গাদাস যেন অনেক
কষ্টে নিজেকে সামলাল। সামলে বলল, “ছাব।”

ততক্ষণে জলে বৈঠা পড়ার শব্দ হচ্ছে। ওরা দেখতে পেল দুটো সুর
নৌকো পাই-পাই করে বিলের জল চিরে ছুটে যাচ্ছে। এবার দুর্গাদাসের গলা
স্পষ্ট হল, “এরা বেদিয়া। লোকটারে ধীরঝা নিয়া গেল। কন যদি পিছন ধরতে
পারি।”

“কিছু দরকার নেই। তুমি এমন একটা জায়গায় নামিয়ে দাও যেখান থেকে
থানা কাছে হবে।” অর্জুন বলল। অগত্যা আদেশ পালন করছিল দুর্গাদাস।

ইউসুফভাই এতক্ষণ চুপচাপ ছিলেন। এবার বললেন, “ওদের কি বেদে
বলে মনে হল ?”

“আমি স্পষ্ট বুঝতে পারিনি। তবে দুর্গাদাসের দেখতে ভুল হবে না।”

“আপনি কি অনুমান করেছিলেন বেদেরা আজ আসবে ?”

“না। এটা আমার মাথায় ছিল না। আমার মনে হয়েছিল কাজল আজই
গুপ্তধন খুঁড়তে নামবে। তা ছাড়া বেদেরা যে ওর লুকিয়ে থাকার জায়গাটা
জানতে পেরেছে, তাই আমার জানা ছিল না। আচ্ছা, প্রতিশোধ নেওয়ার
ব্যাপারে এরা কীরকম ভয়ঙ্কর হয় ?”

“এরা মাঝে-মাঝেই আইনকানুন মানে না বলে পুলিশের খুব অসুবিধে হয়।”

তীরে নেমে দুর্গাদাসের দেখানো পথে ওরা দ্রুত থানায় চলে এল। থানায়
একজন সেপাই বসে চুলছিল। তাকে পাঠানো হল অফিসারকে বিছানা থেকে
২৯৪

তুলে আনতে। তিনি এলেন খুব বিরক্ত হয়ে। অর্জুনদের দেখে একটু অবাকও!

অর্জুন বলল, “মাফ করবেন, ডিস্টাৰ্ব করতে বাধা হচ্ছ। ওই বেদের দল এইমাত্র ঘোষবাবুদের অতিথিকে তুলে নিয়ে গেছে নৌকোয়।”

“সে কী! কী করে তুলু?”

“ভদ্রলোক পায়চারি করছিলেন মন্দিরের কাছে। ওরা বাধা পায়নি।”

“আপনারা দেখলেন কী করে?”

“আমরা বিলে বেড়াচ্ছিলাম খাওয়াদাওয়ার পরে। নৌকো চড়তে মন্দ লাগছিল না।”

“আপনি শিওর, ওরা বেদে?”

“আমাদের মাঝি তাই বলল। কিন্তু এই লোকটাই যে ওদের মুক্তো চুরি করেছে—!”

হাত তুলে অর্জুনকে থামালেন অফিসার, “আমারই ভুল হয়েছে। বিকেলে আপনারা চলে যাওয়ার পরে বেদেরা এসেছিল, জানতে, আসামিকে পাওয়া গেছে কি না। তাদের ভরসা দিতে পারিনি। তখন ওরা বলেছিল কালীগঞ্জে তিনজন নতুন মানুষ এসেছে। সেই খবর আমি জানি কি না। তাদের আপনাদের কথা বললাম। আর জানালাম ঘোষবাবুর বাড়িতে যিনি এসেছেন তার দাড়ি নেই। ওরা নিশ্চয়ই খোঁজ-খবর নিয়েছে। ঘোষবাবু জানেন ব্যাধীরটা?”

“বোধ হয় না। আপনি কি ছেলেটাকে উদ্ধার করতে পারেন না?”

“নিশ্চয়ই করতে হবে। কেউ আইন নিজের হাতে তুলে নিলে শাস্তি পাবেই। এই বেদেরা খুব ডেঞ্জারাস। এর মধ্যে যদি ওকে কেটে বিলে ফেলে না দেয়, তা হলে...।” অফিসার ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে গেলেন লোক ডাকতে। একটু বাদে ভ্যান রেডি হয়ে গেল। ওদের সামনে দিয়ে সেটা রওনা হতে আর কিছু করার ছিল না। ইউসুফভাই বললেন, “দারোগা নিশ্চয়ই বেদেদের ডেরায় যাচ্ছেন।”

বাড়ি ফিরে শুয়ে পড়েছিল ওরা। অর্জুনের ঘুম আসছিল না। ওপাশের খাটে ইউসুফভাই নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছেন। অর্জুনের মনে হল, সঙ্কেবেলায় কাজলের পরিচয় অফিসারকে জানিয়ে দিলে ওকে বেদেদের হাতে মারা যেতে হত না। কয়েক বছৰ জেল খাটিয়ে বাংলাদেশ সরকার হয়তো ওকে ভারতবর্ষে ফেরত পাঠিয়ে দিতেন। মাঝারাতের পর দরজায় শব্দ হল। কেউ টোকা দিচ্ছে।

অর্জুন উঠে দরজা খুলতেই দুর্গাদাসকে দেখতে পেল। দুর্গাদাসের শরীর থেকে রক্ত ঝরছে। সে চমকে উঠল, “কী হয়েছে?”

“লোকে বলে মানুষের উপকার করতে নাই। বড় কর্তা বলতেন কথাড়া

মিথ্যা । কিন্তু আজ বুঝছি লোকের কথাই সত্যি ।” দুর্গাদাস বলল ।

তাকে ঘরে ঢুকিয়ে যতটা পারে ক্ষত মুছিয়ে দিল অর্জুন । তারপর জিজ্ঞেস করল, “এই গ্রামে ডাক্তার আছেন ?”

“হ ।”

ইউসুফভাইয়ের ঘূম ভেঙে গিয়েছিল । দৃশ্যটি দেখে তিনি উদ্যোগ নিলেন ডাক্তার ডেকে আনার । ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইজিচেয়ারে দুর্গাদাসকে শুইয়ে দিল অর্জুন । বলল, “বিশ্রাম নাও ।” ততক্ষণে বাড়ির অনেকেই জেগে উঠেছে । ইদ্রিস মিএগাও হাজির । অতএব সবার সামনেই ঘটনাটা বলতে হল । অর্জুনদের তীব্রে নামিয়ে দিয়ে দুর্গাদাসের মনে হয়েছিল, চোখের সামনে ওরা অন্যায় করে পার পেয়ে যাবে এমনটা সহ্য করা যায় না । সে নিজে ডাক্তাতি করা ছেড়ে দিয়েছে অনেকদিন, কিন্তু অন্যায় সহ্য করবে কেন ? সঙ্গে-সঙ্গে সে নৌকো নিয়ে ওদের পেছনে ধাওয়া করেছিল । যেহেতু বেশ কিছুটা সময় চলে গেছে, তাই প্রথমে ওদের খুঁজে পায়নি সে । গাজিপুরের কাছে এসে শেষপর্যন্ত ওদের দেখা পায় । বেদেরা অত্যাচার করছিল লোকটার ওপর । তাকে দেখতে পেয়ে বলে সরে যেতে । বলে ওই লোকটা চোর, তাদের মুক্তো চুরি করেছে । মুক্তো বের করলে হাত কেটে ছেড়ে দেবে, না করলে মুগ্ধ কাটবে । দুর্গাদাস প্রতিবাদ করে বলে, চুরি করেছে যখন, তখন থানায় নিয়ে যাও । বিচার যা করার, তা পুলিশ করবে । তখন বেদেরা তাকে শাসাতে থাকে । সেই শাসানি শুনে তার মাথায় রক্ত উঠে যায় । নৌকো কাছে ভিড়িয়ে সড়কি নিয়ে লাফিয়ে পড়ে সে । বেদেদের সঙ্গে মারপিট হয় । শরীরে কাটা-ছেঁড়া হলেও দমে যায় না সে । তারপর লোকটাকে মুক্ত করে বলে ওর সঙ্গে হাত মেলাতে । বেদেদের সে তখন জলে ফেলে দিয়েছিল । চারটে রুগ্ণ বেদে তার সঙ্গে পারবে কেন ? ঠিক তখনই ওই লোকটা তার কাঁধে বৈঠা দিয়ে আঘাত করে । নৌকোর ওপর পড়ে যায় দুর্গাদাস । সেই সময় লোকটা আর-একটা নৌকো পাড়ে ভিড়িয়ে দোড়ে পালিয়ে যায় । বেদেরা নৌকোয় উঠে দুর্গাদাসের অবস্থা দেখে বলে, “সাপকে দুধ খাওয়ালেও যে ছেবল মারে, তা আর কবে বুঝবেন ভাই ।” দুর্গাদাস ওদের কাছে প্রতিজ্ঞা করে, যেভাবেই হোক লোকটাকে ধরে শাস্তি দেবে । ততক্ষণে বেদেরা ওকে চিনতে পেরেছিল । তার ডাক্তাতি-জীবনের কাহিনী একজন জানত । ওরাই দয়া করে তাকে এখানে পৌছে দিয়ে গেছে ।

ডাক্তার এসে পরীক্ষা করে অবাক ! যে-পরিমাণ আহত হয়েছে দুর্গাদাস, তাতে এই বয়সে এতদূরে আসতে পারাটাই বিশ্বাসকর । তখনই তাকে গাজিপুরের হাসপাতালে ভর্তির জন্য নিয়ে যাওয়া হল । ভোর হল । ঘুমের কোনও অবকাশই ছিল না । আলো ফুটতেই অর্জুন ইউসুফভাইকে নিয়ে হাঁটতে বের হল । ইউসুফভাই বললেন, “মনে হয় কাজল এবার এই তল্লাট ছেড়ে

পালিয়ে যাবে । ”

“অসম্ভব । লোভ এমন জিনিস, একবার কামড়ালে আর ছাড়তে চায় না । গাজিপুর এখান থেকে কতদুরে জানেন ?” অর্জুন জিজ্ঞেস করল ।

“আসবার সময় মনুভাই দেখিয়েছিলেন । হেঁটেই আসা যায় । ”

“তা হলে ও গাজিপুরে আস্তানা গাড়বে আর রাত্রে ঘোষবাড়িতে হানা দেবে । ”

“পুলিশকে ব্যাপারটা জানিয়ে দিতে হয় !” ইউসুফভাই বললেন, “ডেঞ্জারাস লোক, যার জন্য বাঁচলি, তাকেই তুই মারলি ?”

কথা বলতে-বলতে ওরা ঘোষবাড়ির সামনে পৌঁছে গিয়েছিল । সেখানে তখন পুলিশ অফিসারের ভ্যান দাঁড়িয়ে । ওরা এগোতেই অফিসার আর বিমানবিহারীকে দেখা গেল কথা বলতে-বলতে বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে ।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “খবর আছে কিছু ?”

“কী করে থাকবে ? গোয়েন্দা স্পটে থাকলে পুলিশ বোকা হয়ে যায় । ”

“আপনি কিন্তু আমাকে অনর্থক ঠুকেছেন । আমি গোয়েন্দা নই । ”

“তা ছাড়া বাংলাদেশ সরকারের অনুমতি ছাড়া আপনি গোয়েন্দাগিরি করতেও পারেন না । ”

“নিশ্চয়ই । তবে সত্যসঞ্চান করে আপনাকে জানাতে পারি । ”

“গুড় । আপনার আসামি পালিয়ে গেছে । বেদেগুলো মিথ্যে বলবে না । ”

“আমার সন্দেহ, গাজিপুরেই আছে । ”

“থাকলে ঘণ্টাদুয়োকের মধ্যে ধরা পড়বে । বাপধনের বিরুদ্ধে এখন দুটো চার্জ । মুক্তো চুরি এবং দুর্গাদাসকে আঘাত করা, যা থেকে মৃত্যু হতে পারত । ”

“আরও আছে । ” অর্জুন হাসল ।

“তাই নাকি ? কীরকম ?”

“লোকটার আসল নাম কাজল মুখার্জি । তার সঙ্গে ঘোষ-পরিবারের কোনও সম্পর্ক নেই । বিমানবিহারী বাবুর ভালমানুষির সুযোগ নিয়ে এ বাড়িতে জাঁকিয়ে বসেছিল ভুয়ো পরিচয় দিয়ে । ”

বিমানবিহারী চমকে উঠলেন, “সে কী ! ও বিজনকাকা আর ওর ছেলে গগনবিহারীর নাম করল ! ওদের কথা বলল ! ”

“স্বাভাবিক । যাতায়াত আছে । ওখানে সে আর একটা ক্রাইম করেছে, যা অবশ্য আপনাদের কাজে লাগবে না । যে অপরাধ শুনলে আপনি অবাক হবেন তা হল, কাজলবাবুর সঙ্গে এ-দেশে আসার কোনও বৈধ কাগজপত্র নেই । ”

“তার মানে ও উইদাউট পাশপোর্ট এসেছে ?” অফিসার চেঁচিয়ে উঠলেন ।

“ঠিক তাই । ”

“তা হলে ইশাই এ-কথাটা আমাকে কাল থানায় গিয়ে বলেননি কেন ?”

“আমার নিশ্চিত হওয়া দরকার ছিল যে, ওই লোকটাই কাজল। কাজলের দাঢ়ি ছিল। আর আপনি বলেছেন এর দাঢ়ি নেই। তা হলে কী করে বলি?”

“হ্ম। আমি গাজিপুরে যাচ্ছি।” অফিসার ভ্যানে চেপে চলে গেলেন।

এবার বিমানবিহারী বললেন, “আচ্ছা, এই ধান্ধাবাজ লোকটি আমার বাসায় উঠতে গেল কেন বলুন তো? আমার আঙ্গীয়দের খবরই বা নিয়ে এল কেন?”

“এর কারণ একটা চিঠি।”

“কী চিঠি? কার লেখা?”

“নুটুবিহারী বলে কেউ আপনাদের বংশে ছিলেন?”

“হ্যাঁ। তিনি আমার বাবার পিতামহের বড় ভাই। ওঁর ছেলে ইত্তিয়ায় চলে গেলেও তিনি আজীবন আমাদের সঙ্গে ছিলেন।” বিমানবিহারী বললেন।

“আপনাদের ধারণা ছিল একান্নবর্তী পরিবারের শরিক হওয়া সঙ্গেও মুটুবিহারী তাঁর ছেলেকে সাহায্য করতে প্রচুর টাকা ইত্তিয়ায় পাঠিয়েছেন।”

“হ্যাঁ। আমার ঠাকুর্দা বলতেন তিনি সোনাদানাও ছেলেকে দিয়ে দিয়েছেন।”

“আর তাই আপনি বিজনবিহারীর কাছে অর্থসাহায্যের জন্য গিয়েছিলেন?”

“আপনি জানলেন কী করে?”

“কথাটা কি মিথ্যে?”

“না। সত্যি। পাকিস্তান আমলে আমি গিয়েছিলাম।”

“বিজনবিহারী বলেন তিনি এবং তাঁর পিতা সমস্ত টাকা শোধ করে দিয়েছেন।” অর্জুন বলল, “আর সোনাদানা কিছুই নেননি।”

“তা হলে সেগুলো গেল কোথায়?”

“হ্যাঁ। সেটাই রহস্য! আর সেই কারণে কাজল মুখার্জির মতো একজন লোভী মানুষ বিনা পাশপোর্টে এখানে উপস্থিত হয়েছে। সে জানতে পেরেছে ওই সোনাদানা এই বাড়ির কোথাও লুকোনো আছে। সেই কারণেই তাকে ছদ্মপরিচয়ে আপনার এখানে উঠতে হয়েছিল।” অর্জুন শাস্ত গলায় বুবিয়ে বলল।

“এ-বাড়িতেই সোনাদানা লুকোনো আছে?” বিড়বিড় করলেন বিমানবিহারী।

“কাজল সেই খবরই পেয়েছে।”

“আচ্ছা অর্জুনবাবু, আপনি কি সত্যি গোয়েন্দা?”

“গোয়েন্দা নই, সত্যসন্ধানী।”

“ও। কিন্তু আপনাকে এইসব খবর কে দিল?”

“আমার মক্কলের নাম আপনাকে বলতে বাধ্য নই।”

“আপনি বাংলাদেশে এসেছেন কেন? বেড়াতে, না সত্যসন্ধান করতে?”

“দুটোই। বাংলাদেশের হৃদয় দেখার খুব সাধ ছিল। পদ্মা, গঙ্গা, মেঘনা,

যমুনা, শীতলক্ষ্যা অথবা আড়িয়াল খাঁ না দেখলে নিজেকে বাঙালি বলা যাবে না। সত্যসন্ধানের কাজটা যখন পাওয়া গেল তখন রথও দেখব কলাও বেচেব।”

“আপনি জানেন সেইসব সোনাদানা কোথায় লুকোনো আছে?”

অর্জুন হাসল, “জানি। কিন্তু আরও অনেক কিছু না জানা পর্যন্ত বলব না।”

কাজল মুখার্জি এখনও ধরা পড়েনি। গত দু'দিনে গাজিপুরের মানুষ হঠাৎ-হঠাৎই একজন অচেনা মানুষকে দেখেছে, কিন্তু কিছু বলার আগেই সে উধাও হয়ে গিয়েছে। পুলিশের কল্যাণে তারা সবাই জানে একজন অপরাধী সেখানে লুকিয়ে আছে। গ্রামের মানুষ সজাগ থাকা সত্ত্বেও কাজল গ্রেফতার এড়িয়ে যাচ্ছে।

গাজিপুরের হাসপাতালে বৃদ্ধ দুর্গাদাস শুয়ে আছে সমস্ত শরীর ব্যাসেজে মুড়ে। অর্জুন এবং ইউসুফভাই তাকে দেখে এসেছে। দিনদশেক থাকতে হবে তাকে হাসপাতালে।

বিমানবিহারী গত দু' রাত বাড়ি পাহারা দিয়ে কারও দেখা পাননি। অবস্থা এখন এমন, কাজলের পক্ষে যে-পথে এ-দেশে এসেছিল সেই পথে ভারতে ফিরে যাওয়াটাই স্বাভাবিক।

ইউসুফভাই ব্যবসায়ী মানুষ। তাঁর অনেক কাজ। অর্জুন ওঁকে ঢাকায় ফিরে যেতে অনুরোধ করেছিল, কিন্তু তিনি যেতে রাজি নন। মাঝে-মাঝেই পোস্ট অফিসে গিয়ে বাড়িতে ও অফিসে ফোন করছিলেন। কালীগঞ্জের রহস্য তাঁকে আটকে রেখেছিল। অর্জুন এই দুটো দিন মাছ ধরে কাটাল। ইদিস মির্শার হাতছিপ দিয়ে সে অনেক ছোট-মাছ ধরল।

তৃতীয় দিনে শুটিং পার্টি এল কালীগঞ্জে। নায়ক-নায়িকাকে দেখতে যেন মেলা বসে গেল। বিমানবিহারীর বাড়িতে তাদের রাখা হল, বাকিরা বিলের পাশে তাঁবু ফেলল। ইউসুফভাই শুটিং দেখতে গিয়েছিলেন, সন্ধের মুখে ফিরে এলেন আকাশবিহারীকে সঙ্গে নিয়ে। আকাশবিহারীর পেছনে সেই প্রযোজক।

আকাশবিহারী বললেন, “কী মশাই, আমি আপনাকে আমন্ত্রণ জানালাম ঘোষবাড়িতে থাকার ব্যাপারে, আর আপনি মনুর বাড়িতে এসে উঠেছেন?”

অর্জুন ইউসুফভাইকে জিজেস করল, “আপনি ওঁকে সব কথা বলেননি?”

“বলেছি, কিন্তু ওর কানে চুকছে না।” ইউসুফভাই বললেন।

“চলুন আপনি আমাদের ওখানে। জমিয়ে আড়ডা মারা যাবে।” আকাশবিহারী বললেন।

“অনেক ধন্যবাদ। এখানে আমি খুব ভাল আছি। আড়ডা মারার দরকার

হলে পাওয়া যাবে, বেশিদুর নয় তো । কাজ ভাল হচ্ছে ?”

“তা হচ্ছে ! ও হ্যাঁ, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ একজন প্রতারককে বাড়ি থেকে তাড়াতে পেরেছেন বলে । আরে, আমাদের বাড়িতে গুপ্তধন লুকোনো আছে, অথচ সেটা আমিই জানতাম না । শোনাঘাত্র আমি মাসুদকে বললাম, আর তোমার ভয় নেই, ছবি শেষ হবেই ।”

“মাসুদ কে ?”

“ওই যে । বিখ্যাত প্রযোজক ।”

সেই বিশাল কালো মানুষটি মাথা নোয়ালেন সামান্য ।

কিছুক্ষণ এলোমেলো কথা বলার পর কাজের কথায় এলেন আকাশবিহারী, “এবার বলুন, গুপ্তধন কোথায় লুকোনো আছে ? আপনি ইতিয়া থেকে খবর নিয়েই এসেছেন । আমি যদি কালীগঞ্জের কথা নাও বলতাম তবু আপনাকে ওই কারণে এখানে আসতে হত !”

“শুনেছি সেটা আপনাদের বাড়ির মধ্যেই আছে ।”

“সত্যি বলছেন না । মাটির তলায় থাকলে দুঁবিঘে জমি চষতে হবে । কতটা নীচে আছে তাও জানি না । কিন্তু আপনি জানেন ।” আকাশবিহারী এবার সিরিয়াস ।

অর্জুন হাসল, “আপনাদের বাড়ির মাটির নীচে যদি সোনাদানা পাওয়া যায় তা হলে এখন তার মালিক হবে কে ?”

“কে আবার ? আমি । আপনাদের ওই বিমানবিহারীর ক্ষমতা আছে আমার বিরুদ্ধে কথা বলার ?” ফোঁস করে উঠল আকাশবিহারী ।

“তা হলে আপনার উচিত এখনই কাজলকে খুঁজে বের করা ।”

“কাজলকে ?”

“হ্যাঁ । ওর কাছেই গুপ্তধনের নকশা আছে ।”

“আপনি যে সত্যি বলছেন তার প্রমাণ কী ?”

“সত্যি বলতে পারছি বলেই আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছি ।”

“কিন্তু আপনিও তো একজন প্রতারক হতে পারেন । ওই কাজলের সঙ্গে বড়বড় করে এখানে আসতে পারেন । কী প্রমাণ আছে আপনার স্পষ্টকে ?”

“এ-প্রশ্নের জবাব আপনাকে দেব না আকাশবিহারীবাবু । নিজেকে দিয়ে আপনি আমাকে বিচারের চেষ্টা করবেন না । দমদম এয়ারপোর্টে কিসের ভয়ে ওই মানুষদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে সাহস হয়নি, টেলিফোনের অভিনয় করতে হয়েছিল সেটা আমি জানি !” অর্জুন কথাটা বলামাত্র আকাশবিহারী চমকে উঠলেন । পরমুহূর্তেই তাঁর চোখ জুলে উঠল । দাঁতে দাঁত চেপে তিনি বললেন, “তার মানে আপনি আমাকে অনুসরণ করছিলেন ?”

“না । মজার ব্যাপার হল কাঁচা ক্রিমিনালরা সহজেই নিজেকে ধরিয়ে দেয় ।”

“আপনি সাপের গর্তে হাত ঢুকিয়ে খোঁচা মারছেন। এর ফল আপনাকে ভোগ করতে হবে।” আকাশবিহারী আর দাঁড়ালেন না। দলবল নিয়ে চলে গেলেন। ইউসুফভাই বললেন, “আপনি কাজটা ভাল করলেন না।”

অর্জুন হাসল, “মাঝে-মাঝে এরকম খারাপ কাজ করতে হয় ইউসুফভাই।”

সেই রাতটাও ভালভাবে কাটল। শেষরাতে কেউ বা কারা বিল পেরিয়ে ঘোষাড়িতে উঠেছিল নৌকো নিয়ে। আকাশবিহারী শুটিং পার্টি নিয়ে আসার পরে বিমানবিহারী আর বাড়ির বাইরে আসেননি। আকাশবিহারীর লোকজন আগস্তককে তাড়া করতে একটা নৌকোকে বিলে ছুটে যেতে দেখা যায়। ইউসুফভাইয়ের শুটিং দেখতে মজা লাগছে। তিনি সেখানে গেলেন। অর্জুন সাত-স্কালে থানায় এল। অর্জুন বলল, “অফিসার, আমার দৃঢ় বিশ্বাস কাজল গাজিপুরেই আছে। গত রাত্রে সেই এসেছিল।”

“ইম্পিসিব্ল। আমি যেভাবে খুঁজেছি তাতে তার থাকার কোনও চান্স নেই।”

“বেশ। যে-লোকটা নৌকো নিয়ে এসেছিল তাকে গাজিপুরের দিকেই যেতে দেখা গেছে।”

“হ্ম। চলুন, যাবেন গাজিপুরে?”

এরকম প্রস্তাব পাবে আশা করেনি অর্জুন। অফিসার তাকে এড়িয়েই চলছিলেন।

গাজিপুরে পৌঁছে অর্জুনের অনুরোধে বিলের দিকটায় গেলেন অফিসার। সেখানে গিয়ে জানা গেল ভোরবেলায় একটা নৌকোকে তীরে দেখা গেছে। ভাসতে, যেটার ওখানে থাকার কথা নয়। নৌকোর মালিক বলল, কেউ রাত্রে নির্ঘাত ওটা চুরি করেছিল।

কাজল যদি সেই চোর হয়, তা হলে সে এই জায়গা দিয়েই গাজিপুরে ঢুকেছে। বিলের পাশে সবক'টি ঝোপঝাড়, গাছ গ্রামের মানুষদের আবার খুঁজে দেখতে বলা হল। অর্জুন চারপাশে নজর রেখে গ্রামের দিকে এগোল। সামনেই একটা কবরখানা। বেশ পুরনো হলেও নিয়মিত পরিষ্কার করা হয়। আগাছা নেই বললেই চলে। এখানে কাজলের পক্ষে লুকিয়ে থাকা সন্তুষ্য নয়। অর্জুনের দৃঢ় বিশ্বাস, সে লুকিয়ে আছে কোনও মানুষের কাছেই। তিনিদিন না খেয়ে কেউ থাকতে পারে না। বনে-জঙ্গলে থাকতে হলে কাজলকে অভুক্ত থাকতে হবে।

অফিসার ওর পাশে এসে দাঁড়ালে অর্জুন বলল, “আপনার পরামর্শ চাই।”

“বলুন।”

“আকাশবিহারী ঘোষকে আপনার কীরকম মনে হয়?”

“একটু বেপরোয়া। রাগী।”

এই সময় দুটো দিশি কুকুর কবরখানার মুখটায় দাঁড়িয়ে চিৎকার শুরু করল।

অফিসার একটা চিল ছুড়লেন তাদের তাড়াবার জন্য। কুকুরদুটো একটু সরে গিয়েও ফিরে এল।

“কাজলের ধারণা, ঘোষবাড়ির মাটির তলায় গুপ্তধন আছে। আকাশবিহুরী সেইটে কজ্জা করতে চান। অথচ তিনি জানেন না কোথায় সেটা লুকোনো আছে। আপনি একটু খোঁজ নিন, এর মধ্যে আইনসঙ্গত কোনও ব্যাপার আছে কি না !”

“তার মানে ?”

“বাংলাদেশ সরকারের কোনও আইন আছে কি না !”

“নিশ্চয়ই। যার কোনও দাবিদ্বার নেই তা সরকারি কোষাগারে জমা পড়বে।”

“দাবিদ্বার আছেন, কিন্তু তাঁরা জানেন না সম্পত্তির পরিমাণ কী অথবা কে রেখেছিল !”

“বাঃ, তা হলে দাবি টিকবে কেন ?”

“কাজলের কাছে গুপ্তধনের বিশদ বিবরণ আছে। আকাশবিহুরী যদি তাকে ধরতে পারেন, তা হলে ওঁর পক্ষে আগাম দাবি জানানো সুবিধে হবে।”

“বুঝতে পেরেছি। আমি আজই বড়কর্তাদের ব্যাপারটা জানাচ্ছি। কিন্তু আপনি যখন এত কথা জানেন, তখন গুপ্তধনের হুদিসটা আপনারও জানা স্বাভাবিক।”

“আমি জানি। কিন্তু অফিসার, যিনি ওই সম্পত্তি মাটির তলায় পুঁতে গিয়েছিলেন, তিনি চাননি আকাশবিহুরীরা ওগুলোর অধিকারী হোক।”

“এর কোনও প্রমাণ আছে ?”

“হ্যাঁ। উনি একটি চিঠি লিখেছিলেন। চিঠিটা কাজলের কাছে আছে।”

কুকুরদুটো চিৎকার করছিল। ওরা এখন ভেতরে চুকে পড়েছে। একটা পুরনো কবরের সামনে গিয়ে ওরা গলা তুলছিল। অফিসার চিল মারতেই ওরা পালিয়ে গেল। অর্জুন কবরটার দিকে তাকাল। বেশ পুরনো কবর। পাশে মাটি উঠেছে। আর একটা মোটা পাটকাঠি ওর ভেতর থেকে বেরিয়ে আছে। অফিসার ফিরে যাচ্ছিলেন। অর্জুন ওঁকে অনুসরণ করতে করতে আর-একবার কবরের দিকে তাকাতেই মনে হল পাটকাঠিটা স্থান পরিবর্তন করেছে। যেদিকে ছিল তার উলটোদিকে ঢলেছে এখন, অথচ বাতাস বইছে না।

অর্জুন দাঁড়িয়ে পড়তেই অফিসার জিজ্ঞেস করলেন, “কী হল ?”

“এসব কবরের নীচে কফিন আছে ?”

“থাকার কথাই। তবে বেশি পুরনো হয়ে গেলে শরীরের সঙ্গে সেগুলোও পচে যায়।”

“সেখানে মানুষ চেষ্টা করলে লুকিয়ে থাকতে পারে ?”

“খুব কষ্ট হবে। নিষ্কাশের অসুবিধে হবেই।”

“যদি নাকের সামনে কোনও মনজাতীয় কাঠি লঃগানো থাকে ?”

অফিসার হেসে ফেললেন, “এমন অভিনব বুদ্ধি কার মাথায় আসবে ?”

“আমার মাথায় যখন এল, তখন কাজলের মাথাতেও আসতে পারে ।”

“তা হলে সবকটা কবর খুঁড়ে দেখতে হয় । ব্যাপারটার সঙ্গে এলাকার মানুষের সেন্টিমেট ও ধর্মবিশ্বাস জড়িয়ে আছে । প্রতিক্রিয়ার কথা তাবতে পারবেন না ।”

“সবকটা কবর খুঁড়ব কেন ? আমরা বেরিয়ে গেলে কুকুরদুটোকে কবরখানায় ঢুকতে দিন । যে-কবরটার সামনে দাঁড়িয়ে ওরা চেঁচাবে, সেটাই পরীক্ষা করুন ।”

“কোনও ক্লু পেয়েছেন নাকি ?”

“আপনি আমার কথামতো পরীক্ষা করে দেখুন না ! এটা তৃতীয় ব্যক্তি জানবে না ।”

ওরা বাইরে বেরিয়ে এলে কুকুরদুটোকে দেখা গেল না । তারা তাদের ধান্দায় চলে গেছে । অফিসার খুব নিরাশ হলেন, “এখন কুকুর পাই কোথায় ?”

দূর থেকে কবরটাকে দেখার চেষ্টা করল অর্জুন । কাঠিটা আবার জায়গা বদলেছে । সে হাত বাড়িয়ে কবরটা দেখিয়ে দিল অফিসারকে । অফিসার সেদিকে এগিয়ে গেলেন । প্রথমে জায়গাটাকে ঘুরে দেখলেন ভদ্রলোক । তারপর হাত বাড়িয়ে কাঠিটাকে হ্যাঁচকা টানে ওপরে তুলে নিলেন । চোখের সামনে সেটা ধরে মাথা নাড়লেন ।

তাঁর ইঙ্গিতে সবাই কবরটার কাছে পৌঁছে গেল । দেখা গেল, কবরের নীচের দিকে একটা গর্ত আছে, যার ভেতর দিয়ে নীচে ঢেকা অসম্ভব নয় । অফিসারের হস্তিত্বিতে কাজ হল । ধীরে-ধীরে কাজলের মুণ্ড এবং দেহ বাইরে বেরিয়ে আসতেই তাকে বেঁধে ফেলা হল । এখন তার চেহারা খুবই খারাপ দেখাচ্ছে । তিনিদিনে পেটে তেমন কিছু পড়েনি বোঝা যাচ্ছিল ।

অর্জুন বলল, “কাজলবাবু, আমাকে মনে পড়ছে ?”

ফ্যালফ্যাল করে তাকাল ছেলেটা । কথা বলল না ।

“আমি অর্জুন । আপনি যখন পাশপোর্টের চেষ্টায় জলপাইগুড়ির থানায় গিয়েছিলেন, আমি তখন সেখানে বসে ছিলাম । জলপাইগুড়ির বদনাম করে ফেললেন আপনি !”

“ও ! তোর জন্যই আমার এই অবস্থা ?” হিসহিস করে উঠল ছেলেটা ।

আসামি ধরা পড়েছে শুনে পিলপিল করে লোকজন ছুটে আসছিল । অফিসার আবার দাঁড়ালেন না । কাজলকে ভ্যানে তুলে সোজা থানায় ফিরে এলেন ।

থানায় জিজ্ঞাসাবাদের সময় কাজল প্রথমে কিছুই বলছিল না । অল্পসম্পর্কে অত্যাচারের পর সে মুখ খুলল, “আমি কোনও অন্যায় করিনি ।”

“পাশপোর্ট ছাড়া বাংলাদেশে দোকোনি ?”

“না । পাশপোর্ট চুরি গিয়েছে ।”

“বেদেদের মুস্তো চুরি করোনি ?”

“না ।”

“নিজেকে ঘোষবাবুদের আস্থায় বলে মিথ্যে পরিচয় দাওনি ?”

“না । আমি সত্যিই আস্থায় হতে যাচ্ছি । জলপাইগুড়ির গগনবিহারী ঘোষের মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ের কথা পাকা ।”

“দুর্গাদাসকে তুমি মারোনি ?”

“না । সে নিজেই পড়ে গিয়েছিল ।”

“তা হলে কবরের মধ্যে লুকিয়ে ছিলে কেন ?”

“বেদেদের ভয়ে । ভেবেছিলাম সব ঠাণ্ডা হয়ে গেলে থানায় গিয়ে নিজেই সাহায্য চাইব ।”

অফিসার বললেন, “এ যে ঘোর মিথ্যেবাদী !”

অর্জুন বলল, “এই ঘটনার পরে টুকু বেঁচে যাবে, ওটুকুই লাভ ।”

“টুকুকে তুই চিনিস ?” লাল চোখে তাকাল কাজল ।

“চিনব না কেন ? ওর সরলতার সুযোগ নিয়ে আপনি চিঠিটা চুরি করে গুপ্তধনের লোভে এতবড় ঝুঁকি নিয়েছিলেন ।” অর্জুন বলল ।

অফিসার বললেন, “চিঠিটা দেখি ?”

“কেন ?”

“আমার দরকার, তাই । প্রশ্ন করা হচ্ছে । দাও চিঠিটা ।”

“আমার কাছে নেই ।”

তৎক্ষণাৎ ওকে সার্চ করা হল । দেখা গেল চিঠিটা কাজলের সঙ্গে নেই । এই সময় থানার বাইরে হাঁচাই শোনা গেল । আকাশবিহারী দলবল নিয়ে থানায় চুকলেন, “আপনি কি ওঁকে অ্যারেন্ট করেছেন ?”

“হ্যাঁ ।”

“অভিযোগ ?”

“অনেক ।”

“উনি আমাদের অতিথি । আমি ওর জন্য জামিন হিসেবে এসেছি ।”

“কোর্টে গিয়ে বলবেন ।”

“অফিসার ! আমার সঙ্গে বামেলা করবেন না । আমি সই করে ওকে নিয়ে যাচ্ছি । যখনই বলবেন কোর্টে পোঁছে দিয়ে যাব কিন্তু ঘোষবাড়ির বদনাম হতে দেব না ।”

“আপনি তো মশাই একে আগে চিনতেন না ?”

“ঘোষবাড়ির রক্ত আমার শরীরে বইছে যে !” টেলিফোনের কাছে এগিয়ে গেলেন তিনি, “একটা ফোন করছি ।”

ফোনে যার সঙ্গে কথা বললেন ভদ্রলোক, তিনি কোনও বড়কর্তা হবেন। নিজে কথা শেষ করে অফিসারকে দিলেন রিসিভার। অফিসার আপনি জানছিলেন। অফিসার রিসিভার নামিয়ে রেখে বললেন, “কাজ হল না আকাশবাবু। বস আমাকে আইনমাফিক চলতে নির্দেশ দিয়েছেন। তবে আপনি ইচ্ছে করলে ওর সঙ্গে আলাদা কথা বলতে পাবেন।”

“বেশ। তাই হোক।”

পাশের ঘরে ওদের পাঠানো হলে অর্জুন অফিসারকে বলল, “আপনার গাড়িটাকে কিছুক্ষণের জন্য পেতে পারি?”

“কেন?”

“খুব জরুরি ব্যাপার। এসে বলব।”

ভদ্রলোকের অনুমতি এবং একজন সেপাই সঙ্গে নিয়ে পুলিশের গাড়িতে অর্জুন ছুটল গাজিপুরে। কবরখানায় পৌঁছে ও দৌড়ে গেল সেই কবরের কাছে, যেখান থেকে কাজলকে ধরা হয়েছিল। অনেক কষ্টে নীচে নামল সে। জায়গাটা প্রায় অন্ধকার। হাতড়ে-হাতড়ে কিছুই পাওয়া গেল না প্রথমে। তারপর উঠে এসে সে সেপাইকে একটা টর্চের ব্যবস্থা করতে বলল। মাটির নীচে শ্বাস নিতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল তার। টর্চ পুলিশের গাড়িতেই ছিল। সেটা নিয়ে আসার পর অর্জুন আবার নীচে নামল। এবং তখনই সে কঙ্কালটাকে দেখতে পেল। একপাশে কাত করে রাখা হয়েছে। তেতরে কাজলের কোনও জিনিসপত্র নেই। কঙ্কালটাকে টর্চের আলোয় পরীক্ষা করতে-করতে হঠাৎ নজরে এল। করোটির গর্তে সেলোফেনে মোড়া কিছু ঢোকানো আছে। জিনিসটা বের করতেই সে খামটাকে পেয়ে গেল। পবনবিহারীকে লেখা ন্টুবিহারীর চিঠি। যে-চিঠি চুরি করে টুকু দিয়েছিল কাজলকে।

ওপরে উঠে আসামাত্রই অর্জুন চিংকারটা শুনতে পেল, “হ্যান্ডস আপ।”

সে দেখল আকাশবিহারী এবং মাসুদ কয়েক হাত দূরে দাঁড়িয়ে আছে। আকাশবিহারীর হাতে রিভলভার। আকাশবিহারী বললেন, “চিঠিটা দে।”

“গুলি করুন। কিন্তু চিঠিটা পাবেন না।”

“ইয়ার্কি হচ্ছে? ওই চিঠি আমার দরকার। আর দরকার মেটাতে আমি কথনও আপস করি না। তিন গুণব, তার মধ্যে না পেলে ...।”

অর্জুন খামটাকে মুঠোর মধ্যে করে সেপাইটার দিকে তাকাল। সে তালপাতার মতো থরথর করে কাঁপছে। খামটাকে মাটিতে ফেলে দিল অর্জুন।

“মাসুদ, ওটাকে তোল। আমাদের আর স্মাগলিং-এর ব্যবসা করতে হবে না।”

মাসুদ এগিয়ে আসছিল। হঠাৎ আর্তনাদ করে মাথা দুঃহাতে চেপে ধরে বসে পড়লেন আকাশবিহারী। অর্জুন দেখল রিভলভার তাঁর হাত থেকে মাটিতে পড়ে গেল। সে দ্রুত ছুটে গিয়ে রিভলভার তুলে নিতেই ইদ্রিস মিশ্রকে দেখা

গেল এগিয়ে আসতে । বৃক্ষের হাতে লম্বা গুলতি ।

অর্জুন অবাক হয়ে বলল, “আপনি ?”

“কেন ছার ? একা দুর্গাদাসই পারে, আমি পারি না ? আপনি আমাদের মেহমান, সেই মেহমানের ওপর এ-ব্যাটি বন্দুক ওঠায় ?”

“আপনি এখানে এলেন কী করে ?”

“দুর্গাদাসরে দেখতে আইছিলাম । নাতি কইছিল গুলতি আনতে । এইটা কাজে লাগল ।” ইদ্বিং গলা তুলল, “এই মিঞ্জা, পালাইবেন না, এই বুড়ার হাতে এখনও তাগদ আছে ।”

আকাশবিহারী, মাসুদ এবং কাজলকে সদরে চালান করে দিয়ে অফিসার বললেন, “বড়কর্তা আপনাকে ধন্যবাদ দিতে বলেছেন ।”

“দুর ! আমি কী করলাম ! সবই তো আপনি করলেন ।”

“আপনি কাল থাকবেন না ?”

“না । আজই চলে যাচ্ছি ।”

“কিন্তু কাল বড়কর্তার সামনে মাটি খোঁড়া হবে ।”

“সেইজন্যই থাকব না । চিঠিটা নিয়ে যাচ্ছি । ক্লায়েন্টের চিঠি চুরি গিয়েছিল, সেটা তাঁকে ফেরত দেব । আপনি এর জেরক্স রেখে দিন । গুপ্তধন পাওয়া গেলে তা ওই চিঠি অনুযায়ী এখানকার ঘোষ-পরিবারের প্রাপ্য নয় । জলপাইগুড়ির ঘোষ-পরিবার যেহেতু এ দেশের নাগরিক নন, তাই তাঁরাও দাবি করতে পারেন না । কালীগঞ্জকে ভালবাসতেন বলে নুটুবিহারী এখানেই থেকে গিয়েছিলেন । অতএব ওঁর সম্পত্তি বাংলাদেশ সরকারের পাওয়া উচিত, যাতে তা দেশের মানুষের উপকারে লাগে ।”

“দৃশ্যটা দেখবেন না ?”

“না ।”

“কেন ?”

“যদি কিছুই না থাকে ? যদি নুটুবিহারী মিথ্যে কথা লেখেন ? যদি এই চিঠিটাই জাল হয় ? অথবা ইতিমধ্যে কেউ গুপ্তধন তুলে নিয়ে গিয়ে থাকে ? কী দরকার মশাই আর সমস্যা বাঢ়িয়ে !” অর্জুন হাসল ।

এই সময় একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল থানার সামনে । ইউসুফভাই বললেন, “মনুভাই এসেছেন । আমাদের এবার ফিরতে হবে ।”

অফিসার বললেন, “একটু চা খেয়ে যান । ততক্ষণে আমি চিঠিটার জেরক্স করানোর জন্য গাজিপুরে লোক পাঠাই ।”

অর্জুন সম্মতি জানাল ।

ফুলে বিঘেৰ গন্ধ

সমুৰেশ মজুমদাৰ



ফুলে বিঘেৰ গন্ধ

সাতসকালে হাবু এল ।

‘অর্জুন তখন সবে চায়ের কাপে চুমুক দিয়েছে, দরজায় দাঁড়িয়ে একগাল হাসল হাবু । কোনও কোনও মানুষ, দেখতে যত খারাপই হোক, হাসলে এক ধরনের সুন্দর হয়ে ওঠে, হাবুও সেইরকম ! পাজামার ওপর হাওয়াই শার্ট সোয়েটারে ঢেকে এই সময় ওর এখানে আসাটা অনর্থক হতে পারে না । নিতান্ত প্রয়োজন না হলে হাবু অমল সোমের বাড়ির চৌহদিন বাইরে পা বাঢ়ায় না । অমলদা যে দীর্ঘকাল জলপাইগুড়ির বাড়ি ছেড়ে বাইরে আছেন, তা শুধু হাবুর ভরসায় । অথচ মানুষটি কথা বলতে পারে না, বলতে চেষ্টা করলে মুখে আঙুত যন্ত্রণার সঙ্গে অস্পষ্ট শব্দ বের হয় । কিন্তু ওর বুদ্ধি খুব । অমলদার সঙ্গে চমৎকার বোঝাপড়া আছে ।

“কী ব্যাপার হাবু ?” অর্জুন সোজা হয়ে বসল ।

দুটো হাত শূন্যে কোনও ছবি আঁকল, পর পর দুঁবার । অর্জুন অর্থটা বোঝার চেষ্টা করল । সে কিছুই বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করল, “কোনও খবর আছে ?”

হাবু মাথা নাড়ল । “হ্যাঁ ।”

“অমলদার ?”

হাবু এবার দাঁত বের করে সশ্বত্তি জানাল ।

“অমলদার চিঠি এসেছে ?”

দ্রুত মাথা নেড়ে না বলে একটা হাত শূন্যে ঘুরিয়ে মেঝের দিকে নামাল ।

অর্জুন চমকে উঠল, “অমলদা ফিরে এসেছেন ?”

হাবু আবার দাঁত বের করে হেসে হাত নেড়ে অর্জুনকে ডাকল ।

অর্জুন সঙ্গে সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে পড়ল । অমলদা ফিরে এসেছেন এটা একটা দারুণ খবর । এই মানুষটির কল্যাণেই সে আজ পরিচিতি লাভ করেছে । তার সত্যানুসন্ধান অভিযান শুরুই হত না যদি অমল সোম তাকে উৎসাহিত না করতেন । জলপাইগুড়ি শহরের হাকিমপাড়ায় চুপচাপ বসে থাকা ওই বিপুলীক

মানুষটির উপস্থিত বুদ্ধি এবং ক্ষমতা বড় শহরে গেলে শোরগোল ফেলে দিত অন্যায়েই। সমস্যায় পড়ে অনেকেই ওঁর কাছে আসত এবং সেগুলো অমলদা সমাধান করতেন অন্যায়ে। কিন্তু হঠাতে সংসার এবং স্থির জীবন সম্পর্কে বিত্রঞ্চ এসে যায় ওঁর। অর্জুন তখন ওঁর কাছে শিক্ষানবিশি করছিল। অমলদাকে পাশে না পেলে সে অথবা জলে পড়বে বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু অমলদা তাকে যে সাহস জুগিয়েছিলেন, তারই ওপর নির্ভর করে ও সত্যানুসন্ধানের কাজ একাই করে যাচ্ছে।

মাকে অমলদার ফিরে আসার খবরটা দিয়ে অর্জুন তার লাল বাহিকে উঠে বসল। হাবু পেছনে উঠে অর্জুনের কোমর এমন করে জড়িয়ে ধরল যে বসতে অসুবিধে হচ্ছিল। অর্জুন যত তাকে আলগা করে ধরতে বলে তত তার বাঁধন শক্ত হয়। অর্জুন বাহিক থামিয়ে মাটিতে নেমে হাবুকে দেখাল, কোথায় ওকে ধরতে হবে। হঠাৎ একটা নীল মারুতি প্রচণ্ড জোরে ছুটে এসে ওদের প্রায় গা ঘেঁষে বেরিয়ে গেল। তারপরই উঠে দাঁড়িয়ে দোড় লাগাল গাড়িটাকে ধরতে। রাগে অস্ফ হয়ে দু' হাত মাথার ওপর তুলে চিন্কার করতে করতে ছুটে যাওয়া মানুষটিকে দেখে কষ্ট হল অর্জুনের। জলপাইগুড়ি শহরে এত বেপরোয়াভাবে কেউ গাড়ি চালায় না। চৌধুরী মেডিক্যালের রামদা সামনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। বললেন, “উৎপাত।”

অর্জুন তাঁকে জিজ্ঞেস করল, “চেনেন?”

রামদা বললেন, “আলাপ নেই। যা শুনছি তাতে আলাপ করার আগ্রহও নেই। শিল্পসমিতি পাড়ার বরেন ঘোষালের ছোট ভাই। বোম্বে না কোথায় থাকে। এখানে এসে নিজেকে খুব তালেবর ভাবছে। হবে একদিন অ্যাকসিডেন্ট।”

হাবু দাঁড়িয়ে ছিল দূরে। অর্জুন বাহিক নিয়ে কাছে এসে ওকে পেছনে তুলল।

গেট খুলে হাবুই চুকল প্রথম। দুটো শালিক লতিয়ে ওঠা মটরশুটি গাছে ঠোকর দিচ্ছে। হাকু শব্দ করে তেড়ে যেতে তারা উড়ল। মাটি থেকে একটা ঢেলা তুলে শূন্যে ছুঁড়ল হাবু। রাগে তার চোখমুখ বিকৃত হয়ে গেছে। অর্জুনের মনে হল নীল মারুতির ওপর রাগটা হাবু এভাবেই মিটিয়ে নিল।

দরজা খোলাই ছিল। অমলদা ইঞ্জি-চেয়ারে বসে বাংলা কাগজ পড়ছিলেন। মুখ তুলে অর্জুনকে দেখে বললেন, “এসো।”

অমলদার চুলগুলো এখন একদম সাদা। ফরসা রোগা মানুষটিকে অন্যরকম দেখাচ্ছে। অর্জুন খুব খুশি হয়ে জিজ্ঞেসা করল, “কখন এলেন?”

“এই তো ! বসো। তারপর কাজকর্ম কীরকম চলছে ?”

“মোটামুটি। ওঁ, কী ভাল লাগল আপনাকে দেখে ! আপনি যে আবর ফিরে আসবেন, তা আমি ভাবতেও পারিনি।” কথাগুলো না বলে পারল ন

অর্জুন ।

“কেন ? তুমি কি ভেবেছিলে আমি সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছি ?” অমলদা হাসলেন ।

অমলদার সঙ্গে কথা বলতে লাগল অর্জুন । ওর মনে হচ্ছিল, মানুষটি আবার আগের মতো সহজ হয়ে গেছেন । উধাও হওয়ার আগে ওর সঙ্গে কথা বলা আনন্দদায়ক ছিল না । পাঁচটা প্রশ্ন করলে হয়তো একটার জবাব পাওয়া যেত । কথা বলতে বলতে অর্জুন একটা আওয়াজ পাচ্ছিল । খুব গভীর এবং রাগী আওয়াজ । একটানা, থামছে না । অর্জুনকে বারংবার মুখ ফেরাতে দেখে অমলদা বললেন, “ওটা নাক ডাকার শব্দ ।”

“নাক ডাকা ? এত জোরে ?”

“রাত্রে বাড়ির গেট থেকেও শুনতে পাবে । যাও, দেখে এসো ।”

এ বাড়িতে এতদিন হাবু একা ছিল । তা হলে অমলদার সঙ্গে কেউ এসেছে । ওরকম আওয়াজ হলে কারও চোখে ঘুম আসা খুব মুশকিল । অর্জুন উঠল । ভেতরের বারান্দায় পা দিতেই বুবল আওয়াজ বের হচ্ছে পাশের ঘর থেকে, যার দরজা বন্ধ, কিন্তু বাগানের দিকের জানালা খোলা । আচেনা লোকের যতই নাক ডাকুক, ঘুম ভাঙিয়ে দরজা খোলানোর কোনও যুক্তি নেই । অর্জুন বাগানে নেমে পড়ল । দেওয়ালের খাঁজে-পা রেখে শরীর সামান্য তুলে জানালার শিক ধরে ভেতরে তাকাতেই হতভুব হয়ে গেল সে । তার গলা থেকে চিংকার ছিটকে এল, “আরে ! কী আশ্চর্য !”

আওয়াজটা দীর্ঘ কম হল । দাড়িগোঁফ ভর্তি বিশাল মুখখানা সামান্য নড়ল । তারপর আবার যা ছিল তাই হয়ে গেল । মনে হচ্ছিল জঙ্গলের মধ্যে টাইফুন বয়ে যাচ্ছে । অর্জুন চিংকার করে উঠল আবার “মেজর ! মেজর ?”

আচমকা শব্দাবলী থেমে গেল । চোখ দুটো পিটিপিট করে উঠল । মুখ্টা এবার জানালার দিকে ফিরল, কিন্তু বোঝা গেল স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন না বিশাল চেহারার মানুষটি । ডান হাত হাতড়ে আবিষ্কার করলেন বালিশের পাশে রাখা চশমা । সেটি নাকে গলিয়েই অত বড় শরীরটা লাফিয়ে উঠল, “হের অর্জুন ।”

সঙ্গে-সঙ্গে চওড়া হাতটা বেরিয়ে এল গরাদের ফাঁক দিয়ে । অর্জুন হাসতে হাসতে হাত মিলিয়ে বলে উঠল, “উঃ ।”

সেটা গ্রাহ্য না করে মেজর বললেন, “উঃ । কতদিন পর তোমার দেখা পেলাম ইয়ংম্যান । উমি, একটু বড় দেখাচ্ছে, অ্যাডাল্ট হয়ে গেলে এর মধ্যে ?”

“এর মধ্যে মানে ? কতদিন পর দেখা হল হিসেব করুন ।”

“তা ঠিক । আমাকে কেমন দেখাচ্ছে ? বৃদ্ধ ?”

“নো । নট অ্যাট অল ।”

“ঠিক । এই কথাটা আমি সবাইকে বলি । সুস্থ যদি থাকতে চাও তা হলে নিজেকে তরংণ তাবো । আচ্ছা, ডুয়ার্সে কি জঙ্গজানোয়ার খুব কমে গেছে ?”

একেবারে প্রসঙ্গের বাইরে প্রশ্ন শুনে অর্জুন বুঝল মেজর একই রকম রয়ে গেছেন। সে মাথা নাড়ল, “তেমন রিপোর্ট পড়িনি।”

“খোঁজ নাও। গতরাত্রে আমি মশারি টাঙ্গাইনি অথচ কোনও মশা আমাকে কামড়ায়নি। মশারা কখনওই ভেজিটেরিয়ান হতে পারে না। তার মানে ওরা এখানে দুর্ভাব।”

“মশাদের আপনি জঙ্গু-জানোয়ারের মধ্যে ফেলেছেন?”

“হোয়াই নট? মশা রক্ষপায়ী জীব এবং শুধু পান করেই থেমে থাকে না, ম্যালেরিয়ার জার্মস চুকিয়ে দিয়ে যায়। একটা বাঘ তোমার রক্ত খাবে চেটে, চেটে কিন্তু তোমার শরীরে রোগ দেকাবে না। কাবেষ্ট?” সিরিয়াস মুখে বললেন মেজর।

শিক ধরে আধবোলা হয়ে কথা বলতে অসুবিধে হচ্ছিল কিন্তু মেজরের কোনও ভুক্ষেপ নেই সেদিকে। বিছানায় বসে এমন ভঙ্গিতে কথা বলছেন যেন অর্জুনও সেই একই আরামে রয়েছে। সে বলল, “এবার আমি নামছি।”

“নামছ মানে?”

“আমি আধবোলা হয়ে কথা বলছি।”

“অঁঁ? তাই নাকি! দ্যাটস ব্যাড। জানালা দিয়ে কেউ কারও সঙ্গে কথা বলে? তোমার উচিত ছিল দরজায় নক করে আমাকে ডাকা। না, অর্জুন, এটা তোমার কাছে আমি এক্সপেন্ট করিনি।”

অর্জুন মেনে নিল, “আমি দুঃখিত কিন্তু।”

“না। কোনও অজুহাত নয়। এখানকার বাঙালিদের অনেক গুণগোল। তোমার খুব প্রিয় বন্ধুর বাড়িতেও তুমি হট করে যেতে পারো না। টেলিফোনে বা অন্য কোনওভাবে তাকে জানাবে যাওয়ার কথা। তার তো অসুবিধে থাকতে পারে। হয়তো সে ওই সময় একা থাকতে চাইছে, তুমি গায়ে পড়ে ডিস্টর্ব করছ। নিজের প্রয়োজনটাই ভাবো অন্যের কথা চিন্তা করো না।” মেজর দাঢ়িতে হাত বোলালেন।

“আমি দুঃখিত মেজর।” অর্জুন নীচে নেমে পড়ল।

মেজরের এসব কথায় একটুও রেগে গেল না অর্জুন। উনি তো ভুল বলেননি। আমাদের আচার-আচরণে এমন অনেক গোলমাল আছে, যা নিজে আমরা ভাবিই না।

মেজরের সঙ্গে ওর আলাপ কালিম্পং-এ বিষ্ট সাহেবের বাড়িতে যাওয়ার সময়। বিষ্ট সাহেবের বোনের দেওর উনি। লোকটি প্রকৃতিপাগল। প্রকৃতিক মধ্যে বিরল কিছু খুঁজে বেড়ান। পৃথিবীর সব অস্তুত জায়গায় দিনের পর দিন অভিযান করেছেন। সাহারায় এক দিশি কুকুরের মধ্যে মেঝিকান রক্ত দেবৰুক পেয়েছিলেন। কালিম্পং-এর একটা পপি দেখিয়ে ওর আমেরিকান বন্ধুক চমকে দিয়েছিলেন। মেজর এখন থাকেন আমেরিকায়। নিউ ইয়র্ক শহরে।

ম্যানহাটানে ওঁর ফ্ল্যাটে অর্জুন থেকে এসেছে। অমল সোমের সঙ্গে নিশ্চয়ই
বিটু সাহেবে ওঁর যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছেন।

হাবু চা নিয়ে এল। অর্জুন একটু আগে বাড়িতে চা খেয়ে এলেও আবার
কাপ তুলে জিজ্ঞেস করল, “এখন আপনি এখানে থাকবেন তো ?”

“হাবুটার জন্যে এই বাড়িটা যখন বিক্রি করতে পারছি না, তখন মাঝে মাঝে
এসে থাকতে হবে হে। ক'দিন থেকে মনে হচ্ছিল জলপাইগুড়ি জেলাটা ভাল
করে দেখা হয়নি। মেজের আমেরিকায় বসে খবর পেয়েছেন জয়স্তী অঞ্চলে
এক ধরনের ফুল ফোটে, যার গন্ধে মানুষ কেন বড় প্রাণীও অজ্ঞান হয়ে যায়,
উনি সেই ফুল দেখতে চান। আমি এখানে এতকাল থাকলাম অথচ জানতে
পারিনি একথা। তাই নিজের জেলাটা ঘুরে-টুরে দেখতে চাই। তোমার এখন
কাজের চাপ কীরকম ?”

“কোনও চাপ নেই।” অর্জুন মাথা নাড়ল।

“বাঃ ! তা হলে এই জেলায় কোনও ক্রাইম হচ্ছে না ?”

বলতে বলতে বাড়ির সামনে গাড়ির আওয়াজ এসে থেমে গেল। অমলদা
বললেন, “জিপে করে কেউ এল বলে মনে হচ্ছে !”

অর্জুন চায়ের কাপ হাতে নিয়ে বাইরের বারান্দায় এসে দেখল জিপ থেকে
জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার ভট্টাচার্যসাহেবের নামছেন। অর্জুনকে দেখে হাত
নাড়লেন তিনি। এই মানুষটিকে একজন আই. পি. এস. বলে চট করে মনেই
হয় না। বারান্দায় উঠে ভট্টাচার্যসাহেবের বললেন, “গুড মর্নিং। মিস্টার সোমের
সঙ্গে দেখা করা যাবে ?”

“নিশ্চয়ই। কিন্তু আপনি জানলেন কী করে উনি এসেছেন ?”

“কলকাতা থেকে খবর এসেছে।”

কথার মধ্যেই অমলদা বেরিয়ে এলেন। অর্জুন ওঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে
দিল ভট্টাচার্যসাহেবের। ওকে ভেতরে নিয়ে গিয়ে বসানো হল। বোঝা যাচ্ছিল
এস. পি. অমল সোম সম্পর্কে তেমন কিছুই জানেননা। কলকাতা থেকে হ্রকুম
এসেছে ওঁর সঙ্গে সহযোগিতা করতে। তিনি ধরে নিয়েছেন অমল সোম
একজন কেউকেটা এবং সেই কারণেই সকাল সকাল চলে এসেছেন।

অমলদা হাসলেন, “সত্যি, সরকারি কর্মচারীদের ব্যাপারই আলাদা। হয়
ছাবিশ মাসে বছর, নয় ধরে আনতে বললে বেঁধে আনা। না মিস্টার ভট্টাচার্য,
আপাতত কোনও সাহায্য চাই না। তেমন দরকার হলে নিশ্চয়ই জানাব।
আপনি যদি অনুগ্রহ করে এখানকার ডি. এফ. ও-কে আমার কথা জানিয়ে দেন,
তা হলে খুশি হব।”

ভট্টাচার্যসাহেব বললেন, “অবশ্যই। কিন্তু আমার একটু কৌতুহল হচ্ছে।
আপনার মিশনটা কী ?”

অমলদা বললেন, “একটা বিষাক্ত ফুল খুঁজতে চাই। যার গন্ধে মানুষ তিরিশ

সেকেন্দ্রের বেশি বাঁচতে পারে না । আপনি কি এরকম ফুলের কথা শনেছেন ?”

ভট্টাচার্যসাহেব অবাক হয়ে বললেন, “না । এরকম ফুল জলপাইগুড়ি জেলায় আছে ? অস্তুত ব্যাপার ! যদি থাকে তা হলে তো মানুষ মারা যেত এবং আমি খবর পেতাম ।”

“হয়তো মারা যাওয়ার পর লোকে কারণটা বুঝতে পারেনি ।”

“ওই ফুলের খবর আপনি কী করে পেলেন ?”

“আমি পেয়েছি মেজরের কাছে । পৃথিবীর যাবতীয় রহস্যময় জিনিসের সম্বান্ধ করাই ওঁর কাজ । হয়তো উনি যে খবরটা পেয়েছেন সেটা সত্যি নয়, কিন্তু অনুসন্ধান না করে তো সেটা জানা যাবে না ।”

এই সময় চিংকার শোনা গেল । চিংকার না বলে গর্জন বলাই ভাল । অর্জুন দ্রুত উঠেনের বারান্দায় ছুটে গেল । সে দেখল মেজর উর্ধ্বমুখী হয়ে সমানে হাত নেড়ে অস্তুত সব শব্দ উচ্চারণ করছেন । উচ্চারণের ধরনে সেগুলো যে গালাগাল, তা অনুমান করা যায় । অর্জুন জিজ্ঞেস করতে আঙুল তুলে আমগাছের ডাল দেখালেন । সেখানে বসে একটা কাক মুখে টুথৰাশ নিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে মেজরকে দেখছে ।

অর্জুন হেসে ফেলল, “ও কী করে টুথৰাশ পেল ?”

“কাকটার গলার আওয়াজ শুনে মনে হয়েছিল ওটার গায়ে মঙ্গেলিয়ান রক্ত আছে । দেখতে এলাম । ছেঁ মেরে আমার হাত থেকে ত্রাশটা নিয়ে গেল !”

“ছেঁ মেরে ? কাকের তো এত সাহস হয় না ?”

“মঙ্গেলিয়ান কাক দেখেছ । পাজির পাখাড়া ।”

“আপনি এতক্ষণ কি ওই ভাষায় গালাগাল দিছিলেন ?”

“গালাগাল কে বলল ? আমি আদুর করে ডাকছিলাম ।”

“আদুর ? ওইভাবে ধমকানো কি আদুর হতে পারে ?”

মেজর মাথা নাড়লেন হতাশায়, “তোমাকে নিয়ে পারা গেল না । যে যা, তার বাইরে কিছু ভাবতে পারো না ? তুমি যদি বোলপুরের টেশন মাস্টার হতে আর রবীন্দ্রনাথ যদি সেখানে দাঢ়ি কামিয়ে ট্রেন থেকে নামতেন, তা হলে তো তাঁকে চিনতেও পারতে না !”

॥ দুই ॥

কথাটা বেশ নাড়া দিল অর্জুনকে । সত্যি তো, বেশি বয়সের রবীন্দ্রনাথকে দাঢ়ি-কামানো অবস্থায় দেখলে কি চেনা যেত ? বিদ্যাসাগর মশাইয়ের মাথার হঠাৎ চুল গজিয়ে গেলে অথবা মাইকেল মধুসূন্দন দণ্ডের মাথায় ইয়া বড় টক গজালে এবং মুখে দাঁড়ি না থাকলে কী কাণ্ডই না হত ! অনেক দিন ধরে

কোনও মানুষকে যেভাবে আমরা দেখে এসেছি, তার সামান্য ব্যক্তিগত ঘটলে হিসেব পাণ্টে যায়। গোয়েন্দুরা যে ছদ্মবেশ ধরেন তা অপরাধীকে ভুল ভাবানোর জন্য, কিন্তু সেটা শুধুই ছদ্মবেশ। কিন্তু কারও চেহারা একটু হেরফেরে আপনা-আপনি যে আমূল পালটে যেতে পারে, তা তো মাথায় আসেনি। এই যেমন মেজের। মোটাসোটা, ভুঁড়িওয়ালা চেহারায় সবসময় মুখভর্তি দাঢ়ি আর হাতে পাইপ, ওঁকে যদি ধূতি-পাঞ্জাবি পরিয়ে দাঢ়ি কেটে দেওয়া যায়, তাহলে উনি সম্ভবত নিজেকেই চিনতে পারবেন না।

অমলদার বাড়ি থেকে বেরিয়ে অর্জুন তার লাল মোটর বাইক চালিয়ে বাবুপাড়ার দিকে যেতে যেতে এইসব কথা ভেবে নিজের মনেই হেসে ফেলল। কোনও কুখ্যাত অপরাধী ছদ্মবেশের সাহায্য না নিয়ে দাঢ়ি কামিয়ে টাক গজিয়েও নিজেকে নিশ্চিন্ত আড়ালে রাখতে পারে। টাকে চুল গজাবার ওষুধ এখনও পর্যন্ত আবিস্কৃত হয়নি, কিন্তু মাথা ভর্তি চুল খসিয়ে টাক ফেলতে তো কোনও অসুবিধে নেই।

করলা ব্রিজ পার হওয়ার সময় সে লোকটাকে দেখতে পেল। দুটো খাঁচায় পাখি ভর্তি করে বাঁশে ঝুলিয়ে কাঁধে নিয়ে চলেছে। এখন বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী পাখি-শিকার এবং তা নিয়ে ব্যবসা করা সম্পূর্ণ বেআইনি। লোকটা হাঁটছে হনহনিয়ে। অর্জুন একেবারে সামনে নিয়ে বাইকটাকে দাঁড় করাতেই লোকটা রেগে গেল, “কী ব্যাপার ?”

“পাখি বিক্রি করবে ?”

“তা তো নিশ্চয়ই। নইলে এত কষ্ট করে আসতে যাব কেন ?”

“কী কী পাখি আছে ?”

“আপনি পাখি চেনেন ? ময়না টিয়া আমি বিক্রি করি না।”

অর্জুন সেটা লক্ষ করেছে। লোকটার খাঁচায় কোনও চেনা পাখি নেই। সে জিজেস করল, “তোমার খাঁচার পাখিগুলো বেশ নতুন। আগে কখনও দেখিনি। কোথেকে ধরেছ ?”

লোকটা অসহিষ্ণু গলায় বলল, “বাবু, আমাকে ছেড়ে দিন। গঞ্জ করার সময় আমার নেই। এমনিতেই খুব দেরি হয়ে গিয়েছে।”

“কিন্তু তাই, তোমাকে যে আমার সঙ্গে থানায় যেতে হবে !” অর্জুন গঞ্জির গলায় বলল।

“কেন বামেলা করছেন ? থানায় নিয়ে গেলে আমি দুঁদিন পরে ছাড়া পেয়ে যাব কিন্তু এই পাখিগুলো বাঁচবে না। এরা কী খায় তা পুলিশ জানে না, জানলেও যাত্র করে খাওয়ানোর সময় কেখায় তাদের ? আপনি যদি এদের মেরে ফেলতে চান, তা হলে থানায় নিয়ে চলুন।”

লোকটার কথা বলার মুনশিয়ানা চমকপ্রদ। অর্জুন বুঝল কথাগুলোয় যুক্তির অভাব নেই। সে বলল, “তুমি অন্যায় করছ, ফের ভয়ও দেখাচ্ছ ?”

“না বাবু, আমি তো কোনও ভয় দেখাইনি।”

“তুমি কোথায় বিক্রি করবে এদের?”

“একজন স্টেশনের সামনে আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে। তাকে জিম্মা করে দিলেই সে আমাকে দাম মিটিয়ে দেবে। এর বেশি কিনু জানিনা আমি।”

“সেই লোকটি পাইকার হলে কাকে বিক্রি করছে সে?”

“সে-খবর আমাকে বলবে কেন?”

“পাখিগুলো ধরেছ কোথায়?”

“নীলগিরি জঙ্গলে। বাবু এবার চলি।”

“নীলগিরির জঙ্গল তো অনেকদূর। ওখানে পাখি ধরে তুমি এতটা পথ হেঁটে আসছ?”

“পাগল। এতটা পথ কি হাঁটা যায়। লরির মাথায় চেপে এসেছি। বাইপাসের কাছে নেমে গিয়ে শহরে চুকেছি। জলপাই মোড়ে নামলে হাঁটতে কম হত কিন্তু ওখানে পুলিশ থাকে। আচ্ছা, নমস্কার।” লোকটি পাশ কাটিয়ে হনহন করে চলতে লাগল পাখির খাঁচা লটকানো বাঁশ কাঁধে নিয়ে।

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন চালু হবার পরও ডুয়ার্সের মানুষ পাখিকে বন্যপ্রাণী বলে মনে করে না। বাধ গণ্ডার হরিণ শিকার বন্ধ হয়ে গিয়েছে। চোরাশিকারিদের সঙ্গে বনবিভাগের সংঘাত হয় অবশ্য কিন্তু ইদানীঁ কালেভদ্রে তেমন ঘটনা ঘটে। কিন্তু পাখি অথবা ক্ষুদ্র প্রাণীদের যেমন খরগোশ অথবা সাপকে বন্যপ্রাণী হিসেবে ডুয়ার্সের মানুষ এখনও ভাবে না। জানতে পারলে বনবিভাগ বাধা দেয়, কিন্তু সেটা তেমন জোরালো নয়।

অর্জুনের মনে হল লোকটাকে অনুসরণ করলে ওর পাইকারকে ধরা যেত। ওই লোকটা ওইরকম অচেনা পাখি কাকে বিক্রি করে তা জানলে বনবিভাগ উপকৃত হত। কিন্তু সে বাবুপাড়ায় এসেছে যে কাজের জন্য, তা অনেক জরুরি।

জলপাইগুড়ি শহরের যে কোনও মানুষ এস.পি.রায়ের বাড়ি চেনে। এই মানুষটি দীর্ঘকাল ধরে শহরের মানুষের নানা উপকারে সময় এবং অর্থ দিয়েছেন। বাল্যকালে অর্জুন তাঁকে দেখেছিল। রায় সাহেব মারা যাওয়ার পর ওঁর ছেলে এপি একই রকম জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন। চা-শিল্পের সঙ্গে জড়িত রায়-পরিবার প্রভৃতি বিত্তশালী কিন্তু তাঁদের বাড়িগুলোর চেহারায় যে আটপোরে ভাব তা শহরের মানুষকে বিস্মিত করে। বাইক থেকে নেমে অর্জুন দেখল এপিদা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে সন্তুদের সঙ্গে গল্ল করছেন। ওকে দেখতে পেতে এপিদা হাত তুললেন, “এসো অর্জুন।”

এপিদার বয়স মধ্য পঞ্চাশ। স্বাস্থ্য ভাল। সকালবেলায় সুট টাই পঞ্জে দাঁড়িয়ে আছেন। অর্জুন তাঁকে বলল, “অমলদা গতকাল ফিরে এসেছেন। উনি আমাকে আপনার কাছে পাঠালেন।”

“ও তাই নাকি ? অমলবাবু ফিরে এলেন শেষ পর্যন্ত । ভাল খবর । তা কী ব্যাপার ?”

“উনি কয়েকদিনের জন্য হাসিমারা অঞ্চলে থাকতে চান । আপনাদের তো চা বাগান আছে ওদিকে । যদি অসুবিধে না হয় ।”

“কিসের অসুবিধে ? উনি যাবেন, এটা তো আমাদের গর্বের বিষয় । কিন্তু তাই, আমার নিয়ন্ত্রণে যে বাগানগুলো, তা এদিকে । ঠিক আছে, সন্তু কথা বলে রাখবে । ওপারে মধু-বাগান আছে, আমার ভাইয়ের, অসুবিধে হবে না কোনও । হ্যামিলটনেও ব্যবস্থা করা যেতে পারে । আমি এখনই বাগড়োগরায় যাচ্ছি কলকাতার প্লেন ধরব বলে, না গেলে সঙ্গে যেতাম । সন্তু, তুমি সব ব্যবস্থা করে দিয়ো ।” এ পি রায় ঘড়ি দেখলেন ।

সন্তুদা মাথা নাড়লেন, “কোনও চিন্তা নেই, ব্যবস্থা হয়ে যাবে ।”

কথাবার্তা পাকা করে অর্জুন বাড়ি ফিরছিল, হঠাৎ সেই পাখিওয়ালার কথা মনে এল । সে বাইক ঘুরিয়ে দু'মিনিটের মধ্যে স্টেশনে চলে এল । ইদানীঁ তিস্তা-তোর্সা ট্রেনের দৌলতে জলপাইগুড়ি স্টেশনের চেহারা সামান্য ফিরেছে । রোড স্টেশন হয়ে যাওয়ার পর অবহেলার ছাপ প্রকট হচ্ছিল । ঝুপড়ি দোকান, রিকশার ভিড় সত্ত্বেও দেখতে অসুবিধে হচ্ছিল না অর্জুনের । কিন্তু পাখিওয়ালা বা তার খাঁচা-দুটোকে দেখতে পেল না । লোকটা এত তাড়াতাড়ি হাওয়া হয়ে গেল ? সে বাইক নিয়ে দুবার পাক দিতেই একটা চায়ের দোকানের বেঞ্চিতে লোকটাকে বসে থাকতে দেখল । বাইক থেকে নেমে দোকানে ঢোকার সময় সে লক্ষ করল খাঁচা দুটো নেই ।

গেলাসের চায়ে বিস্কুট ভিজিয়ে আরাম করে খাচ্ছিল লোকটা, অর্জুন গিয়ে পাশে বসতেই চমকে উঠল । অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “বিক্রি হয়ে গিয়েছে ?”

বাধ্য হয়ে স্বীকার করল লোকটা, “হ্যাঁ ।”

“কে কিম্বল ?”

“আমি কি সব খদ্দেরের নাম জেনে বসে আছি !”

“যে খদ্দের তোমাকে এখানে পাখি নিয়ে আসতে বলেছে, তার নাম জানবে না !”

হঠাৎ লোকটা সোজা হয়ে বলল, “আপনার মতলব কী বলুন তো বাবু ?”

অর্জুন হাসল, “তুমি যে পাখি ধরে এনেছ, তা কেউ বাড়িতে পোষে না । যে কিনেছে তার উদ্দেশ্য কী, সেটা আমি জানতে চাইছি ।”

“জেনে কী করবেন ? আপনি কি পুলিশ ?”

“না । তবে পুলিশের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ভাল । তুমি জানো পাখি ধরে নিয়ে এসে বিক্রি করা বেআইনি । আর ওই সব বিরল জাতের পাখি যদি তুমি ধরে শেষ করে দাও, তার জন্য কী শাস্তি হতে পারে তা নিশ্চয়ই জানো ।”

অর্জুন গভীর হল ।

লোকটা চা শেষ করে বিড়ি ধরাল, “এর মধ্যে চার বার থানায় রাত কাটিয়েছি আমি । কোনও বার অবশ্য জেল হয়নি । পাখি ধরার কেস তৈরি করতে পুলিশ সময় পায়নি ।”

“বাঃ, চমৎকার !” অর্জুন না বলে পারল না ।

লোকটি মাথা নাড়ল, “আপনারা শহরের বাবুরা আমাদের পেটের জ্বালা বুঝবেন না । আমি জঙ্গলের ধারে থাকি । সেখানে কোনও কাজকর্ম নেই । আমার বউ-বাচ্চাকে দু’ বেলা ভাত দিতে পারি না । জঙ্গলের গাছ কাটা নিষেধ, তো কাটা হয় না । একমাত্র পাখি ধরার কায়দাটাই ভাল জানি । তাই ধরে আনলে যদি ওদের দু’ বেলা ভাতের ব্যবস্থা হয়, তাহলে জেলে গেলেও সেটা আমাকে করতে হবে বাবু ।”

অর্জুন বলল, “তুমি অন্যায় করে সাফাই গাইছ । অন্য কাজকর্ম করো না কেন ? ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট তো ক্যাজুয়াল লোক নেয় । শ্রমিকের কাজও তো করতে পারো ।”

“ঠিক আছে, আপনি আমাকে ফরেস্ট ডিপার্টের কাজ পাইঘে দিন, আমি এসব করব না ।”

অর্জুন ভাবল । এই চেষ্টাই করা যেতে পারে । এই জেলার ফরেস্ট অফিসারের সঙ্গে তার পরিচয় আছে । ভদ্রলোককে অনুরোধ করলে উনি নিচ্ছয়ই রেঞ্জারকে বলে দেবেন একে একটা কাজ দিতে । সে জিজ্ঞাসা করল, “তোমার নাম কী ?”

“সুন্দর রায় ।”

“সুন্দর ! বাঃ, চমৎকার নাম । এত সুন্দর নামের মানুষ কখনও পাখি ধরে ?”

কথাটা শোনামাত্র লোকটার মুখ কীরকম হয়ে গেল । চোখ বন্ধ করে গাঢ় গলায় বলল, “বিশ্বাস করুন বাবু, একটুও ইচ্ছে হয় না । পাখিগুলো ধরা পড়ার পর যখন ডানা ঝাপটায়, তখন বুকের ভেতরটা কীরকম করে ।”

“তবু তোমাকে ধরতে হচ্ছে ?”

“হ্যাঁ বাবু । টাকার লোভ বড় মারাত্মক । একটা টিয়া কিংবা ময়নার বাচ্চা ধরলে দশ পাওয়া যায় । কিন্তু এই পাখিগুলোর জন্য তিরিশ পাই । আজ প্রাত কুড়িটা এনেছি । ছয়শো পেয়েছি নগদ । মাসে দুবার । পেটে ভাত পড়লে বুকের কষ্ট মনে থাকে না ।”

“কিন্তু এই পাখিগুলোর দাম বেশি কেন ?”

“জানি না বাবু । দিব্যি দিয়ে বলছি । তবে শুনেছি, এদের মাংস সেদ্ধ করে খেলে কলজের জোর বাড়ে, বাতের ব্যথা কমে যায় ।”

“তার মানে ওই পাখিগুলোর প্রত্যেকটাকে মেরে ফেলা হবে ।”

লোকটা ঠোঁট কামড়াল । মাথা নিচু করল ।

“সুন্দর, তোমার বাড়ি কোথায় ?”

“জলদাপাড়া ফরেস্ট ছাড়িয়ে সুহাসিনী বাগানের দিকে যেতে যে জঙ্গলটা, তার গায়ে । ওখানে পার্বতী দিদিমণি আছেন—যিনি হাতি পোষ মানান । তিনি আমাকে চেনেন ।”

“তোমাকে আবার কবে এখানে পাখি নিয়ে আসতে বলা হয়েছে ?”

“সামনের অমাবস্যা । পুর্ণিমা আর অমাবস্যায় আসতে হয় ।”

“তুমি চাকরি পেলে এসব ছেড়ে দেবে তো ?”

“জলেশ্বরের দিব্যি, কক্ষনো করব না ।”

“তুমি আমার সঙ্গে চলো ।”

জলপাইগুড়ির ডি এফ ও অফিসে গিয়ে বড়কর্তার দেখা পেল অর্জুন । ভদ্রলোক প্রবীণ এবং সহজ মানুষ । অর্জুন সুন্দরের পরিচয় দিল, “এই লোকটা পাখি চুরি করে বিক্রি করে পেটের তাগিদে, আপনি যদি ওকে মাঝে মাঝে আপনার ডিপার্টমেন্টের ঠিকে কাজ দেন, তাহলে চুরিটা বন্ধ হয়—ওর পরিবারও বাঁচে ।”

“পাখি চুরি করে বিক্রি করে ? এ তো কালপ্রিট ।”

“ঠিকই । কিন্তু এখনও শাস্তি হয়নি বলে ওকে যদি সুযোগ দেন ।”

“কী বলছেন ? জেনেগুনে একজন চোরকে কেউ আর ঢোকায় ?”

“ওকে একটা সুযোগ দিন, দেখবেন ও পালটে যাবে ।”

ডি এফ ও যেন বাধ্য হয়ে বললেন, “ঠিক আছে, ওকে রেঞ্জারের সঙ্গে দেখা করতে বলবেন । তিনি যদি উপযুক্ত মনে করেন, তা হলে আমার আপন্তি নেই ।”

বাইরে বেরিয়ে এসে সুন্দর বলল, “আপনাকে অনেক ধন্যবাদ বাবু, কিন্তু আমাকে ওরা কাজ দেবে না । এ পৃথিবীতে একবার খারাপ হলে আর ভাল হবার সুযোগ পাওয়া যায় না । আমার কপালে যা লেখা আছে—তা কে খণ্ডবে ।”

“তবু তুমি রেঞ্জার সাহেবের কাছে যাও । আচ্ছা, দাঁড়াও, আমরা কাল বাদে পরশু তোমার ওদিকেই যাচ্ছি । তখন আমি তোমাকে নিয়ে রেঞ্জারের কাছে যাব । কিন্তু তুমি কথা দাও, তার আগে আর পাখি ধরবে না ।” অর্জুন বলল ।

সুন্দর বলল, “জলেশ্বরের দিব্যি দিয়েছি, কথার খেলাপ হবে না । আমি যদি সৎ পথে বেঁচে থাকতে পারি, তা হলে চুরিচামারি করতে যাব কেন ?”

সন্তুষ্টা বলেছিলেন, দরকার হলে গাড়ি দিতে পারেন চা-বাগানে যাওয়ার জন্য । ডুয়ার্সে এখন প্রচুর মিনিবাস এবং বাস চালু হলেও নিজস্ব গাড়ি থাকলে সময় কম লাগে । অমল সোম বললেন, “আমরা বাসে যাব ।”

“বাস !” মেজর আঁতকে উঠলেন, “গাড়ি যখন পাওয়া যাচ্ছে, তখন বাসে কেন ? এখানকার বাসে তো দাঁড়ালেও সোজা হয়ে থাকা যায় না ।”

অমলদা হাসলেন, “ওই অভিজ্ঞতাটুকু আপনার হোক । পৃথিবীর অনেক বিবর জিনিস আপনি দেখেছেন, কিন্তু পশ্চিমবাংলার মানুষ কী কসরত করে বাসে যাতায়াত করেন তা নিশ্চয়ই জানেন না । অবশ্য ইচ্ছে হলে আপনি অর্জুনের বাইকে চেপে যেতে পারেন, আমি বাসে যাব ।”

অর্জুন শুনছিল, “আমি বাইক নেব ?”

“অবশ্যই । কখন ওটা কী প্রয়োজনে লাগবে, কে জানে ?”

মেজর ঠিক করলেন তিনি বাইকেই যাবেন । চা-বাগানগুলোর গেস্ট হাউসে সবই পাওয়া যায় অতএব লাগেজ বেশি নিতে হবে না । কিন্তু অমলদা বাসে যাবেন শোনার পর অস্বস্তি হচ্ছিল অর্জুনের । অমলদা সেটা পরিষ্কার করলেন, “গাড়ি করে যেতে চাই না কারণ ওখানকার মানুষ ভাববে আমরা বেশ দরের লোক । সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ওপর নজর পড়বে । এটা আমি চাই না ।”

মেজরের বিপুল শরীর নিয়ে তার বাইক কতদূর ঠিকঠাক যেতে পারবে, তাই ভেবে দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল অর্জুন ।

॥ তিন ॥

ঠিক হয়েছিল হাসিমারার তেমাথায় অমলদা সকাল এগারোটায় ওদের জন্যে অপেক্ষা করবেন । সকালের বাস ধরে গেলে ওঁর পক্ষে ওই সময়ে পৌঁছতে অসুবিধে হবে না । অর্জুন আটটা নাগাদ অমলদার বাড়িতে গিয়ে দেখল, মেজর তৈরি হয়ে বসে আছেন । দেখা হওয়ামাত্র দাঁড়িয়ে উঠলেন, “লেটস স্টার্ট !” যাওয়ার আগে হাবুর হাতের চা খেয়ে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল অর্জুনের, কিন্তু মেজরের ভাস্তি দেখে সেটা বলতে পারল না । মেজরের হাত খালি, দুই কংক্ষে স্ট্রাপ খোলানো ব্যাগ পিঠে ঝুলছে ।

বাইকের ইঞ্জিন চালু করার পর মেজর বসতেই মনে হল চাকা কিছুটা ছেঁটে হয়ে গেল । সোদিকে ঝুক্ষেপ নেই । মেজর বললেন, “অল রাইট ?”

বাইক চালু করে অর্জুন বলল, “ঠিক আছে, আপনি চেষ্টা করুন সহজ হবে বসতে ।”

“সহজ ? আমার মতো সহজ পৃথিবীতে আর কে আছে জানি না । একবার আল্লাসে ক্ষি করছিলাম । বাধ্য হয়ে নয়, নটোরিয়াস একটা গ্যাং পেছনে তাকে করছিল, হঠাৎ বাঁ হাঁচুতে অসম্ভব যন্ত্রণা । নিজেকে বললাম, সহজ হবে সঙ্গে-সঙ্গে সহজ হয়ে গেলাম । বরফের ওপর আমার স্পিড দেখে ব্যালুকে তো হতভম্ব । পাঁচ মিনিট কথা বলতে পারেনি ।” ছোট হাসি কেবল মেজরের দাড়ির জঙ্গলে চাকা ঠোঁট থেকে ।

অর্জুন জানতে চাইল, “ব্র্যালবার্ন কে ?”

“জুরিখে থাকে ছোকরা । তিন-তিনবার ক্ষিতে ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ান ।”

অর্জুন আর কথা বাড়াল না । মেজরের ভারী শরীর ব্যাক সিটে মাঝে-মাঝে নড়ছে । অর্জুন সতর্ক হয়ে চালাচ্ছিল । মেজর যা বলেন তা শুনলে শ্রেফ গুল বলে মনে হয় । কিন্তু আমেরিকা ইংল্যান্ডে গিয়ে মেজরের পরিচিতি সে নিজের চোখে দেখে এসেছে এবং তারপর তো অবিশ্বাস করার উপায় নেই ।

তিস্তা ব্রিজ ছাড়িয়ে ময়নাগুড়ি বাইপাস দিয়ে যেতে-যেতে অর্জুনের মনে হল মেজরকে বলা দরকার । এদিকে উনি আগে আসেননি । অর্জুন মুখ ঘুরিয়ে বলল, “ওই যে রাস্তাটা দেখছেন, ওটা জল্লেশ্বর মন্দির পর্যন্ত গিয়েছে । ডুয়ার্সের সবচেয়ে নামকরা শিবমন্দির ।”

“বিশেষত্ব কী ?”

“খুব প্রাচীন মন্দির । কোচবিহারের রাজা স্বপ্নে আদেশ পেয়ে ওখানে এমন একটা শিবলিঙ্গ পেয়েছিলেন, যার কোনও শেষ নেই ।” অর্জুন বলতে-বলতে বাইক মোড়টা পেরিয়ে গেল ।

“হ্যাঁ ।” মেজর চিন্কার করে উঠতেই অর্জুন ব্রেক কষল ।

মেজর বললেন, “শেষ নেই । তার মানে পাথরটা মাটির তলায় পোঁতা । তাই তো ?”

“হ্যাঁ ।”

“কিন্তু তার শেষ নেই মানে ? মাটি খুঁড়ে দেখা হয়নি ?”

“হয়েছিল । বলা হয়েছে অখণ্ড শিব ।”

“ইন্টারেস্টিং । লেট্স গো, নিজের চোখে দেখে আসি । এরকম পাথর গ্র্যান্ড ক্যানিয়নে প্রচুর পাওয়া যায় । তুমি জানো কি, ওখানে যেসব পাহাড়ের ছড়া রয়েছে, তাদের নাম সব ভারতীয় দেবতাদের নামে । শিব, বিশ্ব, ইত্যাদি । দুটোর মধ্যে মনে হচ্ছে যোগসূত্র আছে ।”

অর্জুন খবরটা শুনে অবাক হল । কিন্তু এখন যদি বাইক ঘুরিয়ে জল্লেশ্বরের রাস্তা ধরা হয়, তা হলে হাসিমারায় পৌঁছতে অনেক দেরি হয়ে যাবে । যদিও অল্লদা বাসে যাচ্ছেন এবং পৌঁছতে দেরি হবে, তবু ফেরার সময় নাহয় মন্দিরটা দেখা যেতে পারে । মেজর রাজি হলেন ।

অর্জুন বাইকের গতি বাড়াল । খানিকক্ষণ পরে মেজর কিছু সময় গুনগুন করে গলা তুলে জিজ্ঞেস করলেন, “হিন্দিতে র্যাপ গাইতে শুনেছি, বাংলায় কেউ গাইছে ?”

“র্যাপ ?” অর্জুন হাওয়ার জন্যে চেঁচাল ।

“হ্যাঁ ।”

“জানি না । তবে এখন জীবনমুখী গান খুব হচ্ছে ।”

“কী মুখী ?”

“জীবনমুখী ।”

“ও, সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতাগুলোয় সুর দেওয়া হচ্ছে বুঝি? ওটা তো হেমস্তকুমার অনেক দিন আগেই গেয়েছেন। নতুন কী হল! র্যাপ ব্যাপারটা একদম আলাদা। আফ্রিকাতে এক ধরনের পাখি আছে, যাদের ডানা তিন ফুট লম্বা। রেগে গেলে তারা হাততালি দেওয়ার মতো করে ডানাতালি দেয়। তাতে যে আওয়াজ ওঠে তার সঙ্গে র্যাপের রিদ্মের মিল আছে। বুঝলে?”

মেজরের সঙ্গে থাকলে অনেক তথ্য জানতে পারা যায়। কিন্তু এই র্যাপ গান বেশিরভাগ শুনতে অর্জুনের একটুও ভাল লাগে না। মেজর যদি উৎসাহিত হয়ে হেঁড়ে গলায় র্যাপ গাইতে আরম্ভ করেন, তা হলে বিপদ। সে প্রসঙ্গ ঘোরাবার জন্যে বলল, “ওই দেখুন, জলঢাকা নদী।”

দু’পাশে ধানের মাঠ, বড় পিচের রাস্তাটা উচুতে উঠছে ব্রিজে পৌঁছতে এবং তারপরেই বেশ চওড়া নদী। যদিও এসময় নদীতে জল নেই তেমন, তবু দৃশ্যটি দেখতে ভালই লাগে। মেজর বললেন, “পাঁচ মিনিটের জন্যে বিশ্রাম নেওয়া যাক।”

“বিশ্রাম?” অর্জুন গতি কমাল বিজের ওপর।

“আমার পা অসাড় হয়ে আসছে হে। একটু স্বাভাবিকভাবে রক্ত সঞ্চালন করুক, তারপর আবার পেছনের সিটে বসব।”

অতএব অর্জুন বিজের একধারে বাইকটাকে রাখল। নীচে পা দিয়ে কয়েক সেকেন্ড মেজর নড়বড় করলেন। বোৰা যাচ্ছিল ওঁর পায়ে জোর নেই। সেটা ফিরে এলে চারপাশে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, “জলপাইগুড়ি, ময়নাগুড়ি তারপরে কী?”

“ধূপগুড়ি।”

“আচ্ছা! এরকম নাম আরও আছে?”

“হাঁ, লাটাগুড়ি, বিনাগুড়ি। ডুয়ার্সে গুড়ি ছাড়া আর একটা শব্দ পাওয়া যায়, কাটা। যেমন নাগরাকাটা, গম্ভেরকাটা, ফালাকাটা।”

“এই গুড়ি আর কাটার মানে জানো?”

অর্জুন একটু ভাবল। একসময় কার কাছে যেন ঐতিহাসিক কিছু তথ্য শুনেছিল। ভূটান এবং তিব্বতের মানুষেরা এই অঞ্চলে নিয়মিত আসতেন এবং তাঁদের ব্যবহৃত শব্দ থেকে এদিকের অনেক জায়গার নাম হয়েছে। সে বলল, “আলাদা করে বলা মুশকিল। যেমন জলপাইগুড়ি। লোকে ভাবে এখনকালে অনেক জলপাই গাছ ছিল। গুড়ি মানে জায়গা। কিন্তু এ তথ্য ঐতিহাসিকের মানেননি। আসল শব্দ হল জিলেপিগোড়ি। জিলে মানে বাজার বা বিনিয়ন কেন্দ্র, পে মানে উল বা কস্তুর, গো মানে দরজা আর রিএর অর্থ পাহাড়। ভোট-তিব্বতিতে এই জিলেপিগোড়ি-র নামে পাহাড়ের দরজায় কস্তুর উল বিক্রি করার জায়গা বা বাজার।”

মেজর বললেন, “মাথা শুলিয়ে যাচ্ছে। আমি ভাই শুড়ি মানে জায়গা আর কাটা মানে টুকরো করা ভেবে নিছি। ওসব জায়গায় গাছটাছ টুকরো হত।”

“ভাবুন, কিন্তু কাউকে বলবেন না। জলপাইগুড়িতে ফিরে গিয়ে একজনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব, যাঁর কাছে সমস্ত তথ্য পাবেন।” অর্জুন বলল।

মেজর নদীর দিকে তাকালেন, “জলচাঁকা। তার মানে জলে ঢেকে যায় চারদিক।”

“মোটেই নয়।” অর্জুন হেসে ফেলল, “শব্দটা হল জলচাঁকা। ভোট-তিব্বতিতে একে বলা হত দিচু। ‘দি’ মানে এই, this, আর ‘চু’-এর অর্থ নদী। এই নদীর ধার দিয়েই শুনেছি ভোট-তিব্বতে যাওয়ার রাস্তা ছিল।”

“ইন্টারেস্টিং। এই নদীকে ফলো করলে তিব্বতে যাওয়া যায়? ইদানীং কেউ কি গিয়েছে?”

“জানি না। সম্ভবত না।”

“তা হলে এটা নিয়ে পরে ভাবতে হবে।”

ওরা যখন কথা বলছিল, তখন জলপাইগুড়ির দিক থেকে একটা নীল মারুতি জিপসিকে ছুটে আসতে দেখা গেল। জিপসি যে চালাচ্ছে হয় তার হাত পাকা নয়, অথবা নেশা করে স্টিয়ারিং-এ বসেছে। জিপসিটা প্রচণ্ড গতিতে রাস্তার এপাশ-ওপাশ করতে-করতে ছুটে আসছে। বিজের ওপর উঠেও সেটা র ধরন যখন পালটাল না, তখন অর্জুন তার বাইকটাকে ফুটপাতের ওপর তুলে আমার চেষ্টা করল।

একচুলের জন্যে বেঁচে গেল অর্জুনের বাইক। হাওয়ার ধাক্কায় টলে গিয়েছিল অর্জুন, মেজর চিংকার করে গালাগালি করছিলেন। জিপসিটা কিন্তু কোনও রকম ভুক্ষেপ না করে তেমনই এলোমেলো হয়ে দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছিল। মেজর চিংকার করলেন, “ফলো হিম। ওকে ধরে থানায় নিয়ে যেতে হবে।”

মেজরকে পেছনে বসিয়ে বাইক চালাল অর্জুন। গতি বাড়াতেই ওরা তীরের মতো ছুটল! যেহেতু রাস্তার এপাশ ওপাশ মাড়িয়ে জিপসিটা এগোচ্ছে তাই কাছাকাছি পৌছতে বেশি দেরি হল না। কিন্তু ওই রাস্তা জুড়ে চলার জন্যেই টপকে যাওয়া যাচ্ছে না। মেজর চিংকার করলেন থামার জন্যে, অর্জুন হুন বাজাল। কিন্তু গাড়ির ড্রাইভারের কোনও ভুক্ষেপ নেই। এবার উলটো দিক থেকে একটা বাস আসছে দেখা যেতেই জিপসিটা আচমকা রাস্তার ডান দিকে ব্রেক করে দাঁড়িয়ে পড়ল। বাসটা চলে যেতে অর্জুন বাইক নিয়ে এল পাশে। জিপসির একমাত্র আরোহী তখন কালো চশমার আড়াল থেকে তাদের দেখেছে।

মেজর সদর্পে এগিয়ে গেলেন, “এ কী রকম গাড়ি চালানো হচ্ছে, আঁ? ড্রিঙ্ক করেছ নাকি?”

লোকটি কোনও উত্তর দিল না। অর্জুন লক্ষ করল লোকটি আদৌ নেশাগ্রস্ত নয়। গায়ের রং টকটকে ফর্সা, রোগা, ঠেঁটের ওপর ধনুকের মতো কুচকুচে কালো গোঁফ।

“তোমার ঠার্কুর্দার নাম কী?” অস্ত্রুত শীতল গলায় প্রশ্নটা এল।

“অ্যাঁ? মানে? হোয়াট ইজ দিস?” মেজরের শরীর এক পা পিছিয়ে গেল।

“আমার সঙ্গে ওই ভাষায় কথা বললে সেই নামটি তোমাকে ভুলে যেতে হবে। এটা অবশ্য দ্বিতীয়বারে। তৃতীয়বারে ঠার্কুর্দার ছেলের নাম তোমাকে ভুলতে হবে। চতুর্থবারে ...।” গিয়ার চেঞ্জ করল লোকটি, “ডুয়ার্সে এসেছ, জেনে রেখো আমি নিজেকে ছাড়া অন্য কাউকে কৈফিয়ত দিই না।” আচমকা গতি বাড়িয়ে এগিয়ে গেল জিপসি। এবার আর এঁকেবেঁকে নয়, সোজা, মুহূর্তেই চোখের আড়ালে চলে গেল বাঁক নিয়ে।

“বদমাশ, ভিলেন।” মেজর আকাশে মুঠো করা দু’ হাত ছুঁড়লেন, “আমাকে ডয় দেখাচ্ছে? অন্যায় করেও আমার সঙ্গে এই ব্যবহার! দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা, তোমার মতো পুঁটি মাছকে এই শর্মা তোয়াকা করে না। যদি আবার দেখা পাই—।” শূন্যে শব্দগুলো ছুড়ে দিচ্ছিলেন মেজর সশব্দে।

এইসময় একটা অ্যাম্বাসাড়ার গাড়ি জলপাইগুড়ির দিক থেকে ধীর গতিতে এগিয়ে আসছিল। মেজরের উত্তেজিত চেহারা দেখে উলটো দিকে দাঁড়িয়ে গেল সেটা। গাড়িতে ড্রাইভারের পাশে এক বৃন্দ বসে আছেন। বৃন্দের আদেশে ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল, “কী হয়েছে?”

মেজর আড়চোখে তাকালেন। তারপর বৃন্দ বুবোই গলা চড়ালেন, “এই ডুয়ার্সে কি জঙ্গলের আইন চলে? মগের মুল্লুক? আমার বাপ-ঠার্কুর্দার নাম ভুলিয়ে দেবে বলল?”

এবার ওপাশের দুরজা খুলে বৃন্দ নেমে এলেন, “যিনি বলেছেন, তিনি কি নীল জিপসিতে ছিলেন?”

“ইয়েস। নীল জিপসি।”

বৃন্দ সঙ্গে-সঙ্গে হাতজোড় করলেন, “যদি কোনও তিক্ততা হয়ে থাকে, তা হলে আমি তার জন্যে দুঃখপ্রকাশ করছি। আপনাকে অনুরোধ করব ভুলে যেতে।”

অর্জুন এতক্ষণ নাটকের দর্শকের মতো দেখে যাচ্ছিল। এখন ওই বৃন্দের বক্তব্য শোনার পর তার আগ্রহ বাড়ল। সে বৃন্দের সামনে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, “আপনার পরিচয়?”

“আমার নাম হুরপ্রসাদ সেন। আপনারা যাঁকে দেখেছেন, তিনি আমাদের ছেটসাহেব। ব্যানার্জি টি গার্ডেনসের পরবর্তী মালিক। আমাদের বড় সাহেব স্বর্গত অশ্বিনী ব্যানার্জি ডুয়ার্সে গোটা চারেক চা বাগানের মালিক ছিলেন। উনি

চলে যাওয়ার পর মিসেস ব্যানার্জিই সব দেখাশোনা করেন। ওঁদের কোমও সস্তান নেই। ছোট সাহেব মিসেস ব্যানার্জির ভাই। মানুষটি খুব খামখেয়ালি। আজ আমাদের একসঙ্গে ফেরার কথা ছিল। কিন্তু উনি আগে চলে এলেন।”
বৃন্দ বললেন।

“আপনি কী করে আন্দাজ করলেন যে উনি এখানে গোলমাল করেছেন।”

“এর আগে পথে দুটো গোলমাল থামিয়ে এসেছি। আশংকা হল এখানেও করতে পারেন।”

অর্জুন মাথা নাড়ল, “এরকম লোককে তো জেলে পোরা উচিত।”

“তা সম্ভব নয়। ওঁর প্রতাপ-প্রতিপত্তি প্রচুর। তবে আমাদের মালকিন অন্য ধরনের মানুষ। তিনি ভাই-এর ব্যবহার সমর্থন করেন না, আবার তাকে শাসনও করতে পারেন না।”

“আপনারা কোন চা বাগানে যাচ্ছেন ?”

‘নিম টি এস্টেট।”

এবার মেজর এগিয়ে এলেন, “শুনুন মশাই, আপনাদের ছোট সাহেব যে অন্তর্দু ব্যবহার করেছেন তার ফল ওঁকে ভোগ করতে হবে। ওঁকে সামনে এসে ক্ষমা চাইতে হবে।”

“প্রিজ, এ নিয়ে আর জোরাজুরি করব না। এই যে আমি আপনাদের সঙ্গে কথা বলেছি, তা জানতে পারলে উনি চিবিয়ে থাবেন। অবশ্য আমি স্বেচ্ছায় এটা করিনি, মিসেস ব্যানার্জির নির্দেশ আছে বলেই করেছি। তবে ছোট সাহেবকে না ঘাটানোই ভাল।”

“ভড়লোকের পুরো নাম কী ?”

“নীল চ্যাটার্জি। ডুয়ার্সে সবাই ওকে নীল বলেই জানে। আচ্ছা নমস্কার।” বৃন্দ ফিরে গেলেন গাড়িতে। অ্যাওসাড়ারটা বেরিয়ে গেল।

মেজর বললেন, “ভড়লোকের অপদার্থ ছেলে। চাবকে সোজা করে দিতে হয়।”

অর্জুন আর কথা বাড়াল না। মেজরকে পেছনে বসিয়ে সে স্পিড তুলল। বেশ দেরি হয়ে গেছে। অঞ্চল হাসিমারা বাজারে অপেক্ষা করবে। তবে যাই হোক, নীল চ্যাটার্জি বেশ ইন্টারেস্টিং চরিত্র। মনে হচ্ছে লোকটার সঙ্গে এ যাত্রায় আবার দেখা হবে।

অপমানিত হয়েছেন বলেই মেজর আর একটাও কথা বলেননি। মন খারাপ হলে মানুষ চুপ করে যায়। ধূপগুড়ি গয়েরকাটা পেরিয়ে বীরপাড়া ছাড়ানোর পর অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “আপনার কী হল ?”

“তোমার ব্যবহার দেখলাম।” পেছনে বসা মেজর জবাব দিলেন।

“কী বকম ?”

“লোকটা, আমার পূর্বপুরুষের কথা বলে অপমান করল, আর তুমি সেটা

কান পেতে শুনলে ? আমি তোমার বয়সে হলে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিতাম । ”

“তাতে জেলে যেতে হত । তা ছাড়া আমি দেখলাম, আপনি বেশ দক্ষ হাতে সিচ্যায়েশন ট্যাক্ল করছিলেন । তাই মাথা গলালাম না । ”

“বলছ ? দক্ষ হাতে ! বাংলা ভাষার কোন মাথামুণ্ড নেই । ”

“তার মানে ?” হঠাৎ এমন মন্তব্যে হকচকিয়ে গেল অর্জুন ।

“দক্ষ মানে এফিসিয়েন্ট । তাই তো ? আবার শিবের শশুরের নাম দক্ষ । সেই পাজি লোকটার যজ্ঞ নষ্ট করতে শিবকে কী কাও করতে হয়েছিল । ওই লোকের নাম দক্ষ হয় কী করে ? ”

অর্জুন হাসল, “দক্ষ ব্রহ্মার মানসপুত্র । ব্রহ্মার বুড়ো আঙুল থেকে জন্ম বলে ওঁর নাম দক্ষ । ”

“তুমি দেখছি পুরানের গল্পগুলো ভাল জানো । ”

“না । শুধু ‘পৌরাণিক অভিধান’ বলে একটা বই পড়েছি । দারুণ ইন্টারেস্টিং । একবার ধরলে আর ছাঢ়তে পারবেন না । ডান দিকে জলদাপাড়া ফরেস্ট । ”

ওরা বাঁক নিছিল । মেজর তাকালেন, এমন কিছু জঙ্গল নয় । বাঘ সিংহ তো থাকবে না, হাতি, গণ্ডার আছে বলছে । আসলে বাঘ, সিংহ ছাড়া জঙ্গল একেবারেই আলুনি ।

ওরা হাসিমারার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল । সুন্দর পিচের নির্জন বাস্তা । পাখি ডাকছে । দু’ পাশে জঙ্গল । একটা নদী পড়ল । অর্জুনের মনে পড়ল সেই পাখি শিকারী সুন্দরের কথা । লোকটার চাকরির জন্যে ফরেস্ট অফিসে নিয়ে যেতে হবে । কাছাকাছি যেখানে প্রকৃতীশ বড়ুয়ার মেয়ে পার্বতী বড়ুয়া থাকেন, সেখানে গেলে সুন্দরের ঠিকানা পাওয়া যাবে ।

সে বলল, “এই সামনের জঙ্গলের কোথাও এমন একজন ভদ্রমহিলা থাকেন, যাঁর ছবি ছাপা হয়েছে ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক-এর মলাটে । ”

“তাই নাকি ? কেন ?” মেজর জানতে চাইলেন ।

“ডুয়ার্সের হাতিরা তাঁর কথায় ওঠে-বসে । হাতিকে ওঁর মতো আর কেউ চেনে না । ”

“দারুণ ব্যাপার ! আলাপ করা যাবে ?” মেজর নড়ে-চড়ে বসলেন ।

॥ চার ॥

অর্জুন ঘাড়ি দেখল । দেরি হয়ে গিয়েছে যথেষ্ট । অপেক্ষা করতে-করতে অমলদাঁ অবশ্যই বিরক্ত হয়ে যাবেন । সে মাথা নেড়ে বলল, “ফেরার সময় যাব । এখানে থাকলে যে-কোনও দিনই আসতে পারি । ”

‘যাব’ এবং ‘আসতে পারি’ পাশাপাশি দুটো বাক্য ব্যবহার করে নিজেই হেনে

ফেলল অর্জুন । সে একই গতিতে বাইক চালাচ্ছিল । গত বর্ষায় এদিকের যে সমস্ত ব্রিজ ভেঙেছে, তা এখনও সারানো হয়নি । নদীর ওপর বাঁধ তৈরি করে পথ ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে । সামনের বর্ষায় সব ধূয়ে যাবে, তখন এই এলাকার অবস্থা হবে করুণ । ডান দিকে সুহাসিনী চা-বাগান । বাগানের নামটা পড়া মাত্র বেশ ভাল লাগল । নিপাট বাঙালি নাম ভুটানের গায়ে ।

সে মেজরকে বলল, “ওই যে পাহাড় দেখছেন, ওটা ভুটান । ফুটশিলিং নামে একটা শহর আছে ওখানে । পারো কিংবা যিন্পু যাওয়ার রাস্তা ।”

“তুমি কি পাসপোর্ট নিয়ে এসেছ ?”

“ওসব লাগে না । দুই দেশের চুক্তি অনুযায়ী মানুষ এমনিই যাওয়া-আসা করতে পারে ।”

“গুড় । যাওয়া যাবে তা হলে ।”

মন্দিরটাকে বাঁ দিকে রেখে এগোল অর্জুন । মেজর বেশ মজার মানুষ । যে-কোনও নতুন কিছু শোনেন, তাতেই আগ্রহী হয়ে যান । বন্ধনহীন জীবন যাপন করলে বোধ হয় মানুষ এইরকম হয় !

হাসিমারার বাজার এলাকা ছোট । তিন মাথার মোড়ে বাইক থামাতেই মেজর বললেন, “আমাকে ধরতে হবে । বাইকটা হেলিয়ো না ।”

“কেন ?” অর্জুন অবাক হল ।

“কোমর থেকে পা অবশ হয়ে আছে । মনে হচ্ছে ওগুলো আমার নয় ।”

অর্জুন বাঁ হাতে বাইকটাকে সামলে ডান হাতে মেজরের হাত ধরল । মাটিতে পা দিয়েই মেজর এমন লটপট করতে লাগলেন যে, দু'পাশের দোকানের মানুষজন শব্দ করে হাসতে লাগল । মেজর ওই অবস্থায় খেপে গেলেন, “হাসির কী আছে, অ্যাঁ ? মানুষের দুরবস্থা দেখে কী করে হাসি বের হয় ?”

অর্জুন বলল, “ইগনোর করুন । কলার খোসায় পা পিছলে পড়ে গেলেও লোকে হাসে । তবে আপনি ইতিমধ্যেই এখানে পরিচিত হয়ে গেছেন, আর রাগ করলে সেটা পাকা হয়ে যাবে ।”

“ও হ্যাঁ, মিস্টার সোম তো বলেছিলেন সাধারণ মানুষ হয়ে থাকতে ।” মেজর ততক্ষণে সামান্য বল পেয়েছেন পায়ে, “আসলে কী জানো, আমার শরীরটা এমন, যেখানে যাই সেখানকার মানুষ এক নজর দেখেই মনে রেখে দেয় । নাইনটিন সিঙ্গাটি সেভনে প্রথম নর্থ পোলে যাই । একটা এক্সিমোর গামে কিছুক্ষণ ছিলাম । নাইনটিন এইটি ফাইভ সেখানে যেতেই দেখলাম, অনেকেই আমাকে চিনতে পেরেছে । বুঝতেই পারছ, আমার পক্ষে ছদ্মবেশ ধারণ করা অসম্ভব !”

অর্জুন বলল, “অমলদা ছদ্মবেশের কথা বলেননি, বলেছেন আমরা যে সাধারণ মানুষ—এই ইস্প্রেশন রাখতে । আপনার খিদে পায়নি ?”

“খুব । কিন্তু এখানকার দোকানের যা চেহারা তাতে খেতে ভরসা হচ্ছে না ভাই ।”

“কেন ?”

“ভারতে এলে বাইরের ভাজাভুজি আমি একদম খাই না । তবে রসগোল্লা খাওয়া যেতে পারে ।”

অর্জুন কথা বাড়াল না । বিদেশে যাঁরা দীর্ঘকাল আছেন, তাঁদের পক্ষে চট্ট করে ভারতীয় খাবারের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া কঠিন । কোনও উন্নাসিকতা নয়, ওঁদের শরীরের সিস্টেম ভেজাল অথবা পোড়া তেল বরদাস্ত করতে পারে না । বিটুসাহেব এ-ব্যাপারে একটা নিষ্ঠুর উপমা দিয়েছিলেন অনেক কাল আগে । ফুটপাতে যেসব শিশু বড় হয়, তাদের সহ্যশক্তি অনেক বেশি । মোংরা, বাসি খাবার খেলেও কিছু ক্ষতি হয় না তাদের । কারণ সেটাকে অতিক্রম করার শক্তি একটু-একটু করে অর্জন করেছে তারা । কিন্তু যত্ন এবং নিরাপত্তার মধ্যে সমস্ত সুবিধের সঙ্গে যারা বড় হচ্ছে, তারা একদিনও ফুটপাতের শিশুর সঙ্গী হতে পারবে না । আমেরিকান খাবারদাবারের সঙ্গে আমাদের সাধারণ দোকানের খাবারের এতটাই প্রভেদ ।

মেজের গোটাচারেক রসগোল্লা খেয়ে বললেন, “অমৃত ।”

অর্জুন জিলিপি খেল । ভাজা মিষ্টি খেতে ওর খুব ভাল লাগে । যদিও এখন ভর-দুপুর, এসব খাওয়ার সময় নয়, তবু অমলদাকে ফেলে ভাতের হোটেলের সন্ধানে যাওয়া যায় না ।

দাম মিটিয়ে ওরা দেখতে পেল, একটা জিপ তাদের বাইকের পাশে দাঁড়িয়েছে । ড্রাইভার গোছের একজন নীচে নেমে এপাশ-ওপাশ তাকাচ্ছে । পাশের দোকানদার লোকটাকে কিছু বলতে সে এগিয়ে এসে নমস্কার করল, “আপনারা জলপাইগুড়ি থেকে আসছেন ?”

“হ্যাঁ ।” অর্জুন বোঝার চেষ্টা করল ।

“আপনাদের মধ্যে একজনের নাম অর্জুন ?”

“হ্যাঁ, ঠিকই ।”

“তা হলে আমার সঙ্গে চলুন । সাহেবরা অপেক্ষা করছেন । আমি এক ঘণ্টা আগেও এসেছি ।”

“কোথায় যাব ? কোন সাহেব ?”

“সুহাসিনী বাগানের সাহেব । আপনাদের একজন বোধ হয় আগেই এসে গেছেন ।” লোকটা জিপের দিকে এগোল । মেজের বললেন, “এটা কীরকম হল ! মিস্টার সোম প্রচারিত হতে নিয়েধ করেছিলেন, কিন্তু এখন তো সবাই দেখল । যাক গে, যাবে নাকি ?”

“মনে হচ্ছে অমলদাই পাঠিয়েছেন । কাছেই তো বাগানটা । আপনি কি জিপে বসবেন ?”

“অবশ্যই ।” গটগট করে মেজৰ জিপের দিকে এগিয়ে গেলেন ।

জিপটাকে অনুসরণ করে অর্জুন চা-বাগানের ভেতর একটা সুন্দর বাংলোর সামনে পৌছে গেল । খানিক দূরে ফ্যাট্টিরির আওয়াজে বোৰা যাচ্ছে এখন কাজের সময় । বাংলোয় ঢোকার সময় যে দরোয়ান গেট খুলেছিল, তাকে দেখতে অনেকটা হিন্দি সিনেমার অনুপম খেরের মতো ।

গাড়ির শব্দ পেয়েই সিঁড়ি বেয়ে যে মানুষটি নেমে এলেন তাঁকে অর্জুন চেনে । ইদানীং জলপাইগুড়ির বেশ কিছু অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে ইনি উপস্থিত হন । ছিপছিপে পেটো শরীরের পঞ্চশোর্ধ্ব ব্যক্তিটি একসময় পাহাড়ে উঠতেন । ভদ্রলোক হাত তুলে হাসতে-হাসতে বললেন, “ওয়েলকাম, ওয়েলকাম, এই চা-বাগানে আপনাদের পেয়ে আমি খুব গর্বিত । কি অর্জুনবাবু, ভাল আছেন ?”

“হ্যাঁ, আপনি ?”

“চলে যাচ্ছে ভাই । পাঞ্চববর্জিত হয়ে থাকি, তবু তৃতীয় পাঞ্চবের সারিধ্য পাব বলে এখন পুলাকিত । আসুন সার, আমি ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ।” মেজৰের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন ভদ্রলোক ।

“আমি বোধ হয় আপনার নাম শুনেছি । আপনি অভিনেতা ?” মেজৰ বেশ হাসি-হাসি মুখে হাত ঝাঁকালেন ।

“না সার ! তিনি আমার শ্রদ্ধার মানুষ এবং অনেক বয়স্ক । সেই ভানুবাবু থাকতেন কলকাতায় । তাঁর সঙ্গে আমার নামের মিলের জন্যে প্রথমে সক্ষেত্র বোধ করতাম, এখন করি না । আপনার পরিচয় আমি একটু আগে অমলবাবুর কাছে শুনেছি, আসুন, লাঞ্চ রেডি ।”

কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে এসে অর্জুন বুঝল, চা-বাগানের ম্যানেজারৰা বেশ আরামেই থাকেন । সুন্দর সাজানো ড্রাইংরুমের সোফায় বসে ছিলেন অমল সোম, সামনের ফ্লাসে পানীয়, জিভেস্‌ করলেন, “পথে কোথায় কোথায় নেমেছিলে ?”

“আমি বেশি স্পিড নিতে পারিনি ; অবশ্য এক জায়গায় একটু সময় নষ্ট হয়েছে ।” অর্জুন বলল ।

“আপনার শরীরের অবস্থা কেমন মেজৰ ?”

“নামার সময় মনে হচ্ছিল কোমরের নীচটা নেই । হরিবল রাস্তা ।”

“আমি এমনটা হবে আন্দাজ করেছিলাম । হাসিমারায় কিছুক্ষণ আপেক্ষা করতেই ভানুবাবুর কথা মনে এল । কোনও-কোনও মানুষের সহ্যশক্তি সাধারণের চেয়েও বেশি । ভানুবাবুও তেমনই । তারপর এসে যখন জানতে পারলাম ওর স্তৰী চন্দ্রমা এখন কল্পণাতে, তখন মনে হল আজকের দিনটায় এখানে জেঁকে বসা যেতে পারে ।” অমল সোম হাসলেন ।

“একথা চল্দিমা শুনলে দুঃখ পাবে । ও থাকলে আরও বেশি যত্ন করত ।”
ভানুবাবু প্রতিবাদ করলেন ।

“আমি ওঁকে দুঃখ দিতে চাইনি । কিন্তু তিনটে উটকো লোককে উনি কেনই
বা যত্ন করতে যাবেন !”

ভানুবাবু মাথা নাড়লেন, তারপর জিজ্ঞেস করলেন, “লাঞ্ছের আগে কোনও
ড্রিস ?”

মেজর মাথার ওপর হাত তুললেন, “নো । আমি, যাকে বলে প্রচণ্ড ক্ষুধার্ত,
ঠিক তাই ।”

টেবিলে বসে খাবারের ব্যবস্থা দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল । খানসামা খাবার
পরিবেশন করছিল । মেজর খেতে-খেতে ‘দারুণ’, ‘ডিলিসিয়াস’, ইত্যাদি শব্দ
উচ্চারণ করছিলেন । অমল সোম বললেন, “মেজর, ভানুবাবু এডমন্ড হিলারির
সঙ্গে এভারেস্ট ইয়েতির সঙ্কানে গিয়েছিলেন ।”

খাওয়া থামিয়ে মেজর কিছুক্ষণ তাকালেন, “বঙ্গ সম্ভান হয়ে সাতেবকে
বোঝাতে পারলেন, যা-যা দেখতে পাওয়া গেল না—তা নেই বলে ঘোষণা করা
ঠিক নয় ?”

“আমরা কোনও প্রমাণ পাইনি ।”

“আপনারা না পেতে পারেন, আমি পেয়েছি । আমি একবার তেইশ হাজার
ফুট উচুতে তিনি বাস্তির ছিলাম । প্রচণ্ড তুষার-ঝড়ের জন্যে না পারছিলাম
এগোতে, না পিছোতে । আমার সঙ্গী ছিল অস্ট্রেলিয়ার ব্রায়ান নিকলসন ।
নাম-করা মাউন্টেনিয়ার । তৃতীয় দিনে ব্রায়ানকে টেন্টে রেখে আমি একটু
বেরিয়েছিলাম বরফের কস্তিশন বুঝতে । মিনিট তিনেক গিয়েছি, এমন সময়
চিৎকার কানে আসতেই কোনও রকমে ফিরে এলাম টেন্টে । দেখলাম ব্রায়ান
অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে । ওর জ্ঞান ফিরতেই ভয়ার্ট গলায় বলল, সেখানে
থাকবে না । আমি বেরিয়ে যেতে সে টেন্টের বাইরে পা বাড়িয়ে চারপাশ
দেখছিল, এমন সময় কেউ তার মাথায় আঘাত করে । ওকে যে টেন্টে টেন্টের
ভেতর নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তার দাগ তখনও স্পষ্ট । অবশ্য তিনফুড়ের
কয়েকটা কোটো ছাড়া কিছু খোয়া যায়নি । তবে বরফের ওপর আমি সেই
পায়ের ছাপ দেখেছিলাম, হিলারি যাকে পাহাড়ি মানুষের পদচিহ্ন বলেছেন ।
বাট মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড, পাহাড়ি মানুষ ওই উচ্চতায় এবং অমন ওয়েদারে কাউকে
আঘাত করার জন্যে নিশ্চয়ই ঘুরে বেড়াবে না ।” মেজর একটানা বলে
গেলেন ।

ভানুবাবু চুপচাপ শুনছিলেন । বললেন, “এই ঘটনায় প্রমাণ হচ্ছে না, যে
আঘাত করেছিল সে একজন ইয়েতি ! হিংস্র প্রাণী নিজের অজান্তেই অস্তিত্ব
গোপন করতে পারে না । ব্রায়ানকে সে আঘাত করতে যাবে কেন ? আর
তিনফুড়ের ব্যবহার কোনও ইয়েতি জানে, এটাও— ।” ভানুবাবু হাসলেন ।

“তা হলে ওখানে কে গিয়েছিল ?”

“হ্যাঁ, সেটা রহস্য ! কিন্তু রহস্যের সমাধান হওয়ার আগেই সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না ।”

অমল সোম এবার কথা বললেন, “এবার আমার সিদ্ধান্তে আসি । ইয়েতি নেই শুনতে ভাল লাগছে না । আবার একজন ইয়েতিকে বাঞ্ছিবান্দি করে চিড়িয়াখানায় নিয়ে আসা হয়েছে ভাবলেও খারাপ লাগে । অতএব ওই রহস্যের সমাধান হওয়ার আগে ইয়েতি যেমন আছে তেমন থাকুক ।”

মেজর মাথা নাড়লেন ! তারপর বললেন, “মিস্টার ব্যানার্জি, আপনার এখান থেকে নীলগিরির জঙ্গল কতটা দূরে ? গিয়েছেন কখনও ?”

ভানুবাবু মাথা নাড়লেন, “বড়জোর আধুঘণ্টা লাগে । কাজেকর্মে যেতে তো হয়ই ।”

“ওখানকার কোনও রহস্যের খবর রাখেন ?”

“যেমন ?”

“একটি ফুল আছে । তার গাঁকে যে বিষক্রিয়া হয়, তাতে একজন মানুষ মারা যেতে পারে ।”

“হ্যাঁ, এরকম একটা গুজব কানে এসেছে বটে কিন্তু প্রমাণ পাইনি ।”

“ফুলটাকে খোঁজার চেষ্টা করেছেন ?”

“না । তার জন্যে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট রয়েছে ।”

অমল সোম বললেন, “মেজর ওই ফুলের সন্ধানে এসেছেন ।”

“ইটারেস্টিং ! আমি এ-ব্যাপারে আপনাকে সাহায্য করতে পারি । নীলগিরির রেঞ্জারসাহেবে আমার বিশেষ পরিচিতি । আগামীকালই আমরা তাঁর কাছে যেতে পারি । কিন্তু আপনি তো আমেরিকায় থাকেন । নীলগিরির খবরটা কী করে পেলেন ?”

মেজর জবাব না দিয়ে হাসতে লাগলেন এমন ভঙ্গিতে যে, গোপন তথ্য প্রকাশ করবেন না ।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “এদিকের জঙ্গলে জীবজন্তু কীরকম আছে ?”

“আটক্রিশ রকমের প্রাণীর সন্ধান পাওয়া গিয়েছে ।”

“মাই গড ! আটক্রিশ ?” মেজর বললেন ।

“হ্যাঁ, ভালুকই তিন রকমের, শ্রেণি ভালুক, কালো ভালুক আর হগ বিহার । এরা খুদি-খুদি ভালুক । আর্কটিনিঙ্গ কোলারিস । বায় সাত রকমের । সাধারণ বাঘ, চিতাবাঘ, ক্লাউডেড লেপোর্ট, এদের বেঁচা পাহাড়ে পাওয়া যায়, নিওফেলিস নেবুলোসা, লেপোর্ট ক্যাট, জঙ্গল ক্যাট, নেসার ক্যাট, সিভেট ক্যাট । কেউ-কেউ অবশ্য বিরল হয়ে আসছে । আমার বাগানে মাঝে-মাঝেই চিতার উৎপাত হয় । পাতা তোলার সময় শ্রমিকরা আক্রান্ত হলে ব্যবস্থা নিতে হয় । বাগানের মধ্যে আমাকে ফাঁদ পাততে হয়েছে । গত রাতেই সেই ফাঁদে একটা

প্রমাণ সাইজের চিতাবাঘ ধরা পড়েছে। ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টকে খবর দিয়েছি, তারা এসে সাহেবকে নিয়ে যাবেন।”

খাওয়াদাওয়া হয়ে গেলে বাইরের ঘরে এসে অর্জুনের মনে পড়ল। সে জিজ্ঞেস করল, “আচ্ছা, ব্যানার্জি টি গার্ডেন্টা কোথায়?”

“নীলগিরির ওপাশে।” ভানুবাবু জবাব দিলেন।

সঙ্গে-সঙ্গে মেজের উত্তেজিত গলায় বললেন, “আপনি কি নীল চ্যাটার্জিকে চেনেন?”

ভানুবাবু অবাক হয়ে তাকালেন, “সর্বনাশ! নীলকে আপনারা চিনলেন কী করে? বিশেষ করে আপনার তো ওকে চেনার কথাই নয়!”

অমল সোম জিজ্ঞেস করলেন, “লোকটা কে?”

“ওই ব্যানার্জি টি কোম্পানির ভবিষ্যৎ মালিক। মিসেস ব্যানার্জির ভাই। কিন্তু এটাই ওর একমাত্র পরিচয় নয়। ডুয়ার্সের এই তল্লাটে এমন কেউ নেই, যে ওকে ভয় না পায়। ওর মন বলে কোনও বন্ধ নেই।”

॥ পাঁচ ॥

সাধারণত একজন টি প্ল্যান্টার আর একজন সমক্ষেণীর মানুষ সম্পর্কে কটু কথা বলেন না। ডুয়ার্স দার্জিলিং এবং আসামে যে কুটি চা বাগান আছে, তার মালিক ম্যানেজারের খবর প্রত্যেকের কম-বেশি জানা। একজন ভাল ম্যানেজার টানা একই বাগানে দীর্ঘকাল চাকরি করেছেন এমনটা অবশ্য খুব বেশি দেখা যায় না। যিনি ভাল কাজ জানেন, তাঁকে অন্য কোম্পানি বেশি মাইনে দিয়ে নিয়ে যায়। তাই কেউ চট করে অন্য বাগান সম্পর্কে মন্তব্য করে জনপ্রিয়তা হারাতে চায় না। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ম্যানেজার হিসেবে সুনাম প্রচুর এবং সেইসঙ্গে ভদ্রলোক বলেও স্বীকৃত। তাই ব্যানার্জি টি এন্টে সম্পর্কে তিনি আর মুখ খুললেন না। বললেন, “এবার আপনাদের বিশ্রাম নেওয়া উচিত। আমার পাশের বাংলোয় সব ব্যবস্থা রয়েছে, চলুন ওখানে।”

অর্জুনের নীল-সম্পর্কিত কথাবার্তা চালিয়ে যেতে আগ্রহ ছিল। তার মনে পড়ল শিল্পসমিতি পাড়ার বরেন ঘোষালের ছোট ভাই ওই একই রংকম বেপরোয়া গতিতে মার্কিত চালায়। নীলের সঙ্গে ওর এত মিল কী করে হয়? চা-বাগান এলাকায় মালিক এবং সেইসঙ্গে ম্যানেজারই সব ছিল এতকাল। দিন বদলালেও যা কর্তৃত থেকে গেছে, তাতে নীলের পক্ষে নিজের এলাকায় যা করে সম্ভব, তা বরেন ঘোষালের ভাইয়ের পক্ষে জলপাইগুড়ি শহরে কী করে সম্ভব হচ্ছে?

ওরা যে বাংলোয় গেল, সেটি কাঠের এবং বিশাল। সমস্ত আধুনিক ব্যবস্থা আছে। দোতলার বিরাট বারান্দায় চা-বাগানের দিকে মুখ করে চেয়ার টেবিল

পাতা। তার সামনে সিলিং-এ একটা প্রমাণ সাইজের মৌচাক ঝুলছে। মৌমাছিদের ভিত্তে সেটা টিস্টস করছে। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “ওরা কার্মড়ায় না?”

তানু ব্যানার্জি হাসলেন, “না। আমাদের খুব বন্ধু ওরা। তবে বিরক্ত করলে একটু-আধটু হল ফুটিয়ে দিলেও দিতে পারে। প্রত্যেক বছর ওরা এখানে চাক বাঁধে।”

“আপনারা মধু পান?”

“ইচ্ছে করলেই পেতে পারি, কিন্তু এই চাক ভাঙা হয় না। মধু শেষ হলে ওরা নিজেরাই উড়ে যায়, তখন চাক শূন্য। ওরা বোধ হয় সেটা জানে আর তাই আমাদের বন্ধু ভাবে।”

মেজর বললেন, “ইন্ডিয়ান মৌমাছিদের হলে তেমন বিষ থাকে না হে।”

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “কোন মৌমাছি বেশি বিষাক্ত?”

অমল সোম হেসে ফেললেন, “তুমি কী হে! কবিরা মৌমাছি নিয়ে কত সুন্দর কবিতা, গান লেখেন, আর তুমি তাদের বিষাক্ত বলছ? হল ওদের আঘুরক্ষার একটা অস্ত্র মাত্র, কিন্তু ওরা বিষাক্ত হবে কেন? নিজেদের মধ্যে কী সুন্দর ভাব দ্যাখো তো, শত-শত মৌমাছি কী চমৎকার একসঙ্গে আছে। আমরা সেটা ভাবতে পারি না। চলুন, ঘরে যাই।”

মৌমাছিদের সম্মিলিত আওয়াজ অদ্ভুত ভারী সুর তুলছিল। অর্জুন দেখল, বেশ কিছু মরা মৌমাছি নীচে পড়ে আছে। ওরা নিশ্চয়ই অসুস্থ অথবা বন্ধ হয়ে মারা গিয়েছে, নিজেরা তো মারামারি করে না।

তানু ব্যানার্জি অমল সোমকে একটি ঘরে নিয়ে গিয়েছিলেন। মেজর মৌমাছির চাকের নীচে চলে গেলেন। তাঁর মাথার ঠিক দু' হাত উচুতে চাকের শেষ। ওপর দিকে তাকাতেই কিছু একটা তাঁর নাকের ডগায় পড়ল। সেটা আঙুলে তুলে দেখে নিয়ে জিভে ঘষলেন মেজর। তাঁর চোখ বন্ধ হয়ে গেল, “ডিলিসিয়াস! ভারী মধুর মধু!” তারপরেই সচেতন হয়ে বললেন, “সুহাসিনী বাগান থেকে নীলগিরির জঙ্গল খুব বেশি দূরে নয়, উনি তাই বললেন তো?”

“হ্যাঁ।” অর্জুন মাথা নাড়ল।

“তা হলেও এই মৌমাছিগুলো কাছাকাছি থেকেই মধু সংগ্রহ করছে। যদি সেই বিষাক্ত ফুলের মধু ওরা আনত, তা হলে এতক্ষণে আমার মৃতদেহ দেখতে পেতে তোমরা।”

অর্জুন মাথা নাড়ল, “মৌমাছিরা সেই ফুলের কাছে গেলে গঞ্জেই মারা যাবে, মধু নিয়ে আসবে কী করে? তা ছাড়া সেই সব ফুলে মধু নাও থাকতে পারে।”

“কারেক্ট। তবে প্রকৃতির ব্যাপার তো, মৌমাছিরা নিষ্পাস বন্ধ করেও ফুলের বুকে চুকে পড়তে পারে। তবে ওই মধু সেই সব ফুলের নয়।” বলতে বলতে চাকের নীচ থেকে সরে এলেন মেজর। কয়েকটা মৌমাছি ওই সময়ে তাঁর

কাঁধ-মাথায় এসে বসেছিল, চলে আসামাত্র তারা উড়ে গেল।

দুটো ঘর। একটায় অমলদা, অন্যটিতে মেজরের সঙ্গে অর্জুন। অমলদা বললেন, “দেখছি, ওদের ভাব বেশি, একসঙ্গে থাকলে অনেক গল্প করতে পারবেন।” আসলে অমলদা একা থাকতে বেশি পছন্দ করেন, তা চমৎকার ঘুরিয়ে বললেন।

দ্বিতীয় ঘরে চুকে মেজের প্রথমেই বললেন, “হ্ম, ব্রিটিশ কালচার।”

“তার যানে?” অর্জুন ব্যাগ রাখছিল।

“ফুটবল খেলার মাঠের মতো বেডরুম, বাথরুমটায় না গিয়েও বলতে পারি হাড়ডু খেলা যাবে। সঙ্গে নিশ্চয়ই সাজগোজ করার ঘর আছে। দ্যাখো গিয়ে।”

অর্জুন দেখল এবং মিলে গেল মেজরের অনুমান। ভানু ব্যানার্জি এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন দরজায়, “এদেশে চা-বাগানের চর্চা ব্রিটিশেই শুরু করেছিল, তাই ওদের প্রভাব সর্বত্র থাকবেই। আচ্ছা, আমাকে এখন কাজে যেতে হচ্ছে, কোনও দরকার নেই তো?”

মেজর বললেন, “নাথিং। পেট ভর্তি খাওয়ার পর ভাল বিছানা পাওছি, আর কিসের দরকার?”

অর্জুন বলল, “বাঘটাকে দেখা যাবে?”

ভানু ব্যানার্জি মাথা নাড়লেন, “নিশ্চয়ই। ঠিক আছে, আমি আধঘণ্টা বাদে একটা জিপসি পাঠিয়ে দিছি ওটা নিয়ে যেখানে ইচ্ছে সেখানে যেতে পারেন। ড্রাইভার ছেলেটি বেশ ওস্তাদ।”

ভানু ব্যানার্জির পায়ের শব্দ কাঠের সিঁড়ি থেকে মিলিয়ে যাওয়ার আগেই মেজের বিছানায় শরীর এলিয়ে দিয়ে বললেন, “আজকাল টের পাই বুরলে, বয়স হচ্ছে একটু-একটু করে। এখন শুতে পেলে আর কিছুর দরকার হয় না, আবার বেশিক্ষণ শোওয়াও যায় না। যন্ত্রণা। আব ঘন্টা পর ডেকে দিয়ো, সঙ্গে যাব, তাই চেঞ্জ করলাম না।”

কথা শেষ হওয়ামাত্র নাক ডাকতে লাগল মেজরে। একটা মানুষ কতটা ভাগ্যবান হলে এমন সহজে ঘুমাতে পারে এবং অন্যের ঘুম নষ্ট করে অন্যাসে, তা মেজরকে না দেখলে বোঝা যাবে না। অর্জুন বাইরে বেরিয়ে চেয়ারে বসে মৌচাকের দিকে তাকাল। মোটা-মোটা মৌমাছিরা জানালা দিয়ে উড়ে এসে চাকের গায়ে সেঁটে যাচ্ছে। পাশের গাছগাছালিতে পাখি ডাকছে। পৃথিবীটা কী সুন্দর এখানে!

অমলদা কিছু বললে সে আজ পর্যন্ত অবাধ্য হয়নি। সেই কারণে বলামাত্র এখানে চলে এসেছে। এখানে আসার কারণ হিসেবে সেই ফুলটার হাদিস জানার কথা বলা হয়েছে, যার বুকের গল্পে বিষ আছে। কিন্তু এ-ধরনের ফুল থাকলে এত দিন নাম শোনা যায়নি কেন? জঙ্গল যতই বড় হোক, ফরেন্ট

ডিপার্টমেন্ট থেকে তো সঙ্গে-সঙ্গে এলাকাটা ঘিরে ফেলে ফুলের গাছগুলো নষ্ট করে দেবে। তা দিচ্ছে না কেন? যদি ধরে নেওয়া যায় ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট ব্যাপারটা জানে না, তা হলে তো আরও অবিষ্কাশ্য হবে। যেখানে বিষ ছড়াচ্ছে সেখানে কেউ জানে না, আর বিদেশের কাগজে সে-সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য ছাপা হচ্ছে? অবশ্য অমলদা যেখানে আছেন, সেখানে তার মাথা ঘামানোর কোনও দরকার নেই! অর্জুন ঠিক করল সে নিজেকে একজন টুরিস্ট ছাড়া কিছু ভাববে না। এ যাত্রায় নিছকই বেড়াতে আসা, এইভাবেই উপভোগ করবে। হঠাৎ ওর নজর গেল মৌমাছির চাকটার ওপর। চাকের নীচের দিকের একটা অংশ আচমকা ঝুলে পড়েছে। এমনভাবে ঝুলছে যে, নীচে পড়ে যাওয়া অনিবার্য। সঙ্গে-সঙ্গে একদঙ্গল মৌমাছি ওপরের অংশ থেকে উড়ে এসে ঘিরে ফেলল জায়গাটাকে। তারপর ধীরে-ধীরে আবার আগের আকারে নিয়ে গেল ওরা। অর্জুন মুঝ হয়ে দৃশ্যটি দেখল। দুর্ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে এ খবর ওরা কী করে পেল এবং সবাই একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ার অভ্যেস কেমন করে তৈরি হল, তা নিয়ে ভাবতে গেলে কোনও থই পাওয়া যাবে না। শুধু এই শিক্ষা যদি মানুষেরা পেত!

অমলদা শুয়ে-শুয়ে বই পড়ছিলেন। সি এইচ স্টকলির লেখা 'স্টকিং ইন দ্য হিমালয়াজ অ্যান্ড নর্দার্ন ইন্ডিয়া।' খাঁচায় আটকানো চিতা বাঘ দেখার চেয়ে সেই বই পড়া নাকি বেশি সুখের, তাই তিনি গেলেন না। প্রায় নতুন জিপসিতে অর্জুন আর মেজর বসে পড়ল।

ড্রাইভারের নাম বৃন্দাবন। বয়স তিরিশের নীচে। কথা বলার জন্যে মুখিয়ে ছিল। ফ্যাক্টরি এলাকা ছাড়িয়ে চা-বাগানের মধ্যে চুকেই বলল, “সার, এর আগে চিতাবাঘের গায়ে হাত দিয়েছেন?”

মেজর মাথা নাড়লেন, “চিতাবাঘ কি বাড়ির কুকুর যে, গায়ে হাত বোলাব?”

“আমি বুলিয়েছি সার। আসলে খাঁচাটা ছোট তো, পেছন থেকে গায়ে হাত দিলে বাঘটা কিছু বলতে পারে না। এটা একদম খাঁটি চিতা।”

দূর থেকেই জায়গাটা বোঝা গেল। বেশ কিছু আদিবাসী মানুষ ভিড় করে আছে। জিপসি দেখে তারা একটু সরে দাঁড়াল। বৃন্দাবন তাঁদের নিয়ে এল খাঁচার সামনে। ফুট দশকের লম্বা, পাঁচ ফুট চওড়া একটা মজবুত খাঁচা জঙ্গলের মধ্যে এমনভাবে লুকিয়ে রাখা আছে যে, চট করে বোঝা যায় না। চিতাবাঘটি প্রমাণ সাইজের। দুটো থাবা সামনে রেখে চুপচাপ বসে মানুষ দেখছে। পাশে একটা ছাগলের অবশিষ্ট অংশ পড়ে আছে। ওই ছাগলটাকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল।

মেজর একটু ঝুঁকে এগোতেই চিতাবাঘটা চট করে সোজা হওয়ার চেষ্টা করল এবং সেইসঙ্গে চাপা গর্জন করে উঠল। মেজর হকচকিয়ে গিয়ে দু' পা পিছিয়ে এসে বললেন, “কী ব্যাপার!”

চিতা থাবা তুলে সামনের বক্স দরজায় আঘাত করল। চারপাশের দর্শকরাই এতে খুব মজা পেল। এতক্ষণ জন্মটা চুপচাপ বসে থাকায় তাদের আনন্দ হচ্ছিল না। বাঘটাকে খাঁচানো নিষেধ, তাই তারা ধৈর্য ধরে বসে ছিল। মেজরকে দেখে বাঘের প্রতিক্রিয়া হওয়ায় তারা উৎসাহিত হয়ে মেজরকে অনুরোধ করতে লাগল আবার খাঁচার সামনে এগিয়ে যেতে।

মেজর গভীর মুখে দেখলেন লোকগুলোকে। তারপর অর্জুনকে জিজ্ঞেস করলেন, “ওরা আমাকে কী মনে করছে? ক্লাউন? দেব নাকি তিম্পেনির ধর্মক?”

“সে জিনিসটা কী?”

“তিম্পেনির ঢাকের নাম শোনোনি? আফ্রিকায় খুব জনপ্রিয়। সেই ঢাক বাজলে জঙ্গলে-জঙ্গলে খবর ছড়িয়ে যায়। ওই ঢাক থেকেই আমার ধর্মক।”

“কিন্তু বাঘটা আপনাকে দেখে খেপে যাচ্ছে কেন বলুন তো?”

“খেপে যাচ্ছে? কোথায়? আবার সেই একই ভুল। গর্জন শুনেই মনে করলে খেপে যাচ্ছে? জন্ম-জানোয়ারের ল্যাঙ্গুয়েজ বোঝার চেষ্টা করো। ও আমার সাহায্য চাইছে।” মেজর বৃন্দাবনের দিকে তাকালেন, “ওকে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে কখন নিয়ে যাবে?”

“আজই নিয়ে যাওয়ার কথা।”

“এই এলাকায় আর কোনও বাঘ আছে?”

“আরও দুটো আছে।”

“তারা নিশ্চয়ই এর ধরা পড়ার কথা জেনে গেছে। এই খাঁচায় আর নতুন বাঘ ধরা পড়বে না। বড়সাহেবকে বলো এটাকে ছেড়ে দিতে।”

“ওকে ছেড়ে দিলে কুলিরা খেপে যাবে। গত সপ্তাহেই একটা বাঘ দু-দুটো গোরু মেরেছে। এখন বাগানের সবাই বাঘের ওপর খুব রেগে আছে। ওকে ছাড়া চলবে না।” বৃন্দাবন মাথা নাড়ল।

“তা হলে এখান থেকে বেরিয়ে চলো। বাঘটার অসহায় অবস্থা দেখতে আমার ভাল লাগছে না।”

ওরা জিপসিতে বসতেই চিতা ডেকে উঠল। মেজরের চলে যাওয়া যেন বেচারা পছন্দ করছে না, এরকম মনে হচ্ছিল। বৃন্দাবন হেসে বলল, “আপনাকে ওর মনে হয় পছন্দ হয়েছে।”

মেজর অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

খানিকটা যাওয়ার পর অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “আমরা একটু আশেপাশে ঘুরে আসতে চাই।”

“বলুন সার, কোথায় যাবেন?”

“সুহাসিনী বাগানের কাছেই কোনও জঙ্গলে পার্বতী বড়ো নামে একজন বিখ্যাত মহিলা থাকেন।”

কথা শেষ করতে দিল না বৃন্দাবন, “বুঝেছি। পার্বতীদি কি এখন এদিকে আছেন? চলুন, ঘুরে আসি। বেশি দূরে তো নয়।”

মেজের জিজ্ঞেস করলেন, “সেই লেডি উইদ অ্যান এলিফ্যান্ট?”

“আমি যা শুনেছি, তা ঠিক হলে কম বলা হল। উনি গৌরীপুরের রাজ পরিবারের মেয়ে। ওঁর বাবার নাম ছিল প্রকৃতীশ বড়ুয়া।” অর্জুনকে কথা শেষ করতে দিল না বৃন্দাবন, “লালজি, ওঁকে লালজি বললে সবাই চিনত। একদম বুড়ো বয়সেও হাতি নিয়ে ঘুরতেন।”

“বড়ুয়া টাইটেল তো অসমের মানুষের হয়?”

“গৌরীপুর অসমেরই। তবে প্রকৃতীশ বড়ুয়ার দাদা ছিলেন বাঙালির গর্ব। আমাদের বাংলা সিনেমার প্রথম দিকে যাঁর অবদান চিরস্মরণীয়, সেই প্রমথেশ বড়ুয়ার ছবি নিশ্চয়ই আপনি দেখেছেন। আমি একটা ছবি দেখেছি, ‘মুক্তি’।” অর্জুন বলল।

“মাই গড। আমার ফেভারিট হিরো ছিল হে। ওঁকে নকল করে একসময় আমি শার্ট বানাতাম, বড়ুয়া। কলার। রাজকুমার ছিলেন। আচ্ছা! ইন্টারেস্টিং। ওঁর ভাইয়ি পার্বতী বড়ুয়া?” মেজেরকে এতক্ষণে বেশ উৎকুল্পনা দেখাল। পিচের রাস্তায় গাড়ি ওঠামাত্র পক্ষজ মল্লিককে নকল করে গাওয়ার চেষ্টা করলেন, “দিনের শেষে ঘুমের দেশে...।”

একটা ভাঙা বিজের পাশ দিয়ে জিপসি নেমে গেল, বোরাতে এখন জল নেই। তারপর কঁচা পথ ধরে এগোতে লাগল দুলতে-দুলতে। গাড়ির পেছনে ধূলোর ঝড় উঠেছে। এখন বিকেল, তবে সক্ষে নামতে কিছুটা সময় বাকি। মিনিট পাঁচেক যাওয়ার পর ওরা নীচের মাঠে একটা কাঠের বাড়ি দেখতে পেল। বৃন্দাবন বলল, “যাক, পার্বতীদিদি আছে।”

“কী করে বুঝলে?” মেজের জানতে চাইলেন।

“ওপাশে দেখুন, দুটো হাতি দাঁড়িয়ে আছে।”

জিপসির আওয়াজ পেয়ে গাছের তলায় দাঁড়ানো হাতি দুটো কান খাড়া করল। একজন কয়েক পা এগিয়ে এসে থমকে দাঁড়াল। বাড়িটার কাছে এসে নিরাপদ দূরত্বে থেকে হৰ্ন বাজাতে লাগল বৃন্দাবন। খুব সাধারণ হালকা কাঠের বাড়ি। কোনও রকম জাঁকজমক নেই। তার দোতলার বারান্দায় একটি শীর্ণ শরীর দেখা গেল। বৃন্দাবন গাড়ি থেকে নেমে চিন্কার করল, “সাহেবের বন্ধুরা এসেছেন আপনার সঙ্গে দেখা করতে। নিয়ে আসব?”

মহিলা হাত নেড়ে আসতে বললেন। মেজের ফিসফিস করলেন, “এই সেই লেডি, আই মিন রাজকুমারী?” অর্জুন জবাব দিল না।

ততক্ষণে মহিলা নীচে নেমে এসেছেন। ওরা নেমে এগিয়ে গেল। ফরসা, ছিপছিপে, রোগা বলাই ভাল, আটপৌরে চেহারার তিরিশের কাছাকাছি মহিলা তখন হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে আছেন। কাছাকাছি হতেই বললেন, “আশুন।

আপনারা ভানুদার বক্তু যখন, তখন আমারও দাদা।”

কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের সংঘাত প্রায়ই হয়, কিন্তু তাই বলে এইরকম ? অর্জুন ভেবেছিল এই পার্বতী বড়ো হান্টারওয়ালী টাইপের কেউ হবেন, কিন্তু আটপোরে শাড়ি পরা মহিলাকে দেখে দিদি ছাড়া কিছু ভাবা যায় না ! এরই ছবি ‘ন্যাশনাল জিওগ্রাফি’-র মলাটে ছাপা হয়েছে ?

খুব যত্ন করে পার্বতী ওদের দোতলার বারান্দায় নিয়ে এলেন। কয়েকটা বেতের চেয়ার আছে সেখানে। বৃন্দাবন নীচে রইল। পার্বতী জিজ্ঞেস করল, “চা খাবেন ? লেবু দিয়ে দেব, দুধ-চা দিতে পারব না। না কি কফি ?”

মেজর চারপাশে তাকাচ্ছিলেন। এই জঙ্গলের মধ্যে একজন মহিলা এভাবে একা থাকতে পারেন, তা যেন বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “চা কি আপনি করবেন ?”

“না, না। লেবু চা বলি, অ্যাঁ ?” তারপর বারান্দার এক কোণে গিয়ে নীচের দিকে মুখ করে কাউকে চা তৈরির নির্দেশ দিলেন। মেজর বললেন, “অস্তুত !”

ফিরে এসে পার্বতী জিজ্ঞেস করলেন, “কে অস্তুত ?”

“আপনি এখানে একা থাকেন, ভাবতেই পারছি না !”

“অসুবিধে কোথায় ?” পার্বতী হাসলেন।

“আপনার ভয় লাগে না ?”

পার্বতী মাথা নেড়ে আঙুল তুলে দেখালেন, “ওরা আছে। জঙ্গলের দেবতা। ওরা সঙ্গে থাকলে আমি যমকেও ভয় পাই না।”

॥ ছয় ॥

দুটো হাতিকে সঙ্গী করে একজন মহিলা এমন নির্জন জঙ্গলে আছেন এবং তিনি নিজেকে বাঙালি ভাবেন। যদিও ওঁর কাজের মহিলা এখানে আছেন, কিন্তু সেই বৃক্ষার থাকা আর না-থাকা একই। মেজর খুব নরম গলায় জিজ্ঞেস করলেন, “আপনার অসুবিধে হয় না ?”

“না। কিসের অসুবিধে ? সবই তো আছে এখানে। নিজের নলকূপ, ইলেকট্রিক আনিয়েছি খুব লড়াই করে। খাই-দাই, বৃক্ষী বাজাই। অবশ্য প্রায়ই বেরিয়ে যেতে হয় এ-জঙ্গল সে-জঙ্গল। এখানে আর থাকি কতদিন ! এই মাসি থাকে। এদিকের মানুষ, সাহস খুব।”

পার্বতী বললেন, “আসুন, কাজের কথা বলি। এত কষ্ট করে এখানে এলেন কেন ?”

মেজর বললেন, “বিদেশের একটা কাগজে পড়েছি, এদিকের জঙ্গলে নাকি এখন এক ধরনের ফুল ফোটে, যার গন্ধ নাকে গেলে বড় জন্মও মারা যায়। ভাস্তুলে আমি একজন অভিযানী। পৃথিবীর নানা প্রাণ ঘূরেছি। অভিযান

করেছি মেরুতেও । খবরটা পেয়ে স্থির থাকতে পারলাম না ।”

“ফুলটাকে পেয়েছেন ?”

“আমরা আজই জলপাইগুড়ি থেকে এখানে এসেছি ।”

“কী জানি বাবা । এতকাল এখানে পড়ে আছি, কোনও দিন তো শুনলাম না এমন ফুলের কথা !”

“আপনিও শোনেননি ?” মেজর যেন অবিশ্বাস করলেন ।

“না । কাগজে ওরকম উলটোপালটা কথা খুব লেখে । এই যেমন আমাকে নিয়ে বিদেশের কাগজ লিখল আমি নাকি ম্যাজিক জানি, তাই হাতিরা আমার কথা শোনে । একটা কাগজ লিখল আমি নাকি কুইন অব ফরেস্ট । ভাবুন ! কিন্তু আমার কাছে কেন ?”

একটু আগে, যখন পরিচয় হয়েছিল, তখন পার্বতী অর্জুনের দিকে কিছুটা অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলেন । সে সত্যসন্ধান করে, জানার পরেও কিছু বলেননি । অর্জুন এতক্ষণ চুপচাপ শুনছিল । এবার বলল, ‘আমি আপনার কথা খুব শুনেছি । আপনাকে দেখার আগ্রহ ছিল । বুদ্ধদেব গুহার লেখায় আপনার বাবার কথাও পড়েছি । এত কাছাকাছি যখন এলাম, তখন ঠিক করলাম আলাপ করতে হবে ।’

এই সময় দুটো প্লেটে গরম-গরম হালুয়া এসে গেল । পার্বতী একটা বেতের টুলে ডিশদুটো রেখে বললেন, “নিন, খেয়ে নিন ।”

মেজর তাকালেন, “সুজি ? মিষ্টি দেওয়া ?”

“আপনার মিষ্টি খাওয়া বারণ ?”

“হ্যাঁ, মানে, রক্তে চিনির পরিমাণ বাড়ছে ।”

“বাড়ুক । আপনাকে একটা টোটকা দিচ্ছি । সপ্তাহে দু’ দিন বাজার থেকে একটা ছোট চারাপোনা কিনে আনবেন । মাছটা যেন জ্যাণ্ট হয় । ওর পিটিটা ঠিকঠাক বের করে পাকা কলাৰ ভেতৰ চুকিয়ে খেয়ে নেবেন । সুগাৰ বেশি থাকলে একদিন অস্তুর খেতে হবে । দেখবেন অসুখটা আৰ শৱীৰে নেই । খান ।”

মেজর অর্জুনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস কুরলেন, “চারাপোনা মানে ?”

অর্জুন বলল, “কুই-মৃগেলের বাচ্চা । আপনাকে বাজারে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে দেব ।”

ওরা সুজির প্লেটে হাত দিল । এক চামচ মুখে পুৱে মেজর বললেন, “ডিলিসিয়াস ।”

অর্জুন জিজ্ঞেস কৰল, “হাতিৰ সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কত দিনেৰ ?”

“ছ’ মাস বয়স থেকে । বাবার কোলে চেপে জস্বলে-জস্বলে ঘুৰতাম । আমি যা জেনেছি, তা বাবার কাছ থেকেই পাওয়া । ওঁকে সৱকার খুব সম্মান কৰত, উপদেষ্টা কৰে রেখেছিল । তখন আবহাওয়া অন্যরকম ছিল । এখন

বেশির ভাগ মানুষ দায়িত্ব হীন। জগলকে না ভালবেসে ফরেস্টের চাকরি করে। এই কিছু দিন আগে রাতিরবেলায় জিপ এল আমার কাছে। শুনলাম মাদারিহাট জঙ্গলে একটা হাতি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে। গেলাম। সারা রাত থেকে হাতিটাকে সুস্থ করে তুললাম। এর পরে কী-কী করতে হবে, বলে এলাম। কিন্তু নিশ্চয়ই তা করেনি। পরে খবর পেলাম বেচারা মরে গেছে। এসব দেখলে মন খারাপ হয়ে যায়।”

“আমি শুনেছি ভুটান থেকে একদল মানুষ আসে হাতি ধরার জন্যে।”

“হ্যাঁ। ওরা আমার বাবার আমল থেকে আসে। বছরে দুঁ-তিন মাস। অন্তুত ধৈর্য। সরকার যে-কটা বাচ্চা হাতি চান, তা আমি ওদের নিয়ে ধরে দিই। যে টাকা পাওয়া যায়, তার অনেকটাই ওদের দিয়ে দিই। জীবন বিপন্ন করে রোজগার করতে হয়।”

“বিপন্ন বলছেন কেন?”

“যে-কোনও মুহূর্তেই, একটু অস্তর্ক হলে প্রাণ যাবে বনের হাতির পায়ে।”

“আপনার কথা সেই হাতি শনবে না?”

“শোনে কখনও? যে মা জানছে তার বাচ্চাকে আমি নিতে এসেছি, সে কখনও আমাকে পছন্দ করবে? কক্ষনো না। সে অনেক গঁজ। নিন, চাখান।”

চা এসেছিল। কাপে চুমুক দিয়ে অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “আপনি সুন্দরকে চেনেন?”

“কোন সুন্দর?”

“কাছাকাছি কোনও গ্রামে থাকে। জগলে ঘুরে ঘুরে পাখি ধরে।”

পার্বতীর মুখ আচমকা কঠিন হয়ে গেল, “ওকে আপনি চিনলেন কী করে?”

“দু’ দিন আগে ওকে দেখেছি জলপাইগুড়িতে। অন্তুত ধরনের পাখি খাঁচায় করে নিয়ে নিয়েছিল বিক্রি করতে। আমি ওকে পুলিশে দিতে চেয়েছিলাম। শেষ পর্যন্ত ও কথা দিয়েছে, চাকরি পেলে আর পাখি চুরি করবে না। আমার সঙ্গে ডি এফ ও-র কথা হয়েছে। তাই ওর খোঁজ করছি।” অর্জুন বলল।

“আপনি কি মনে করেন চাকরি পেলে সুন্দর পালটে যাবে?”

“ও শপথ করে তাই বলেছে।”

“কী জানি! তবে আজকাল বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। লোকটা একটা ক্রিমিন্যাল। প্রথম-প্রথম টিয়া, ময়না ধরত। সংসারী মানুষের শখ মেটাতে ওই সব পাখিদের খাঁচায় চুকতে হত। তারপর কানে এল সুন্দর আর টিয়া, ময়না ধরে না। ও ধরছে হিল প্যার্টিজ, লেসার ফ্লেরিকান অথবা রিটার্ন। আমি অনেক বলেছি, কিন্তু কানে তোলেনি। শুনেছি, মাঝে-মাঝেই ওর কাছে গাড়ি চালিয়ে লোকজন আসে। কী বলে তা জানি না, কিন্তু অবস্থা ফিরে যাচ্ছে সুন্দরের। ওই সব পাখি ধরার জন্যে ওর যেমন শাস্তি হওয়া উচিত, তেমনই

যারা ওর কাছে পাখিগুলো কেনে, তাদেরও জেলে পাঠানো দরকার। ”

“সুন্দর রায় কোথায় থাকে ?”

“বেশি দূরে নয়। আমার বাড়িতে আসতে যে ভাঙা বিজটা দেখলেন, তার থেকে সিকি মাইল মাদারিহাটের দিকে গেলে ডান হাতে ছেট গ্রাম পাবেন। এদিকে পায়ে ইঁট পথ আছে, আরও কম দূরত্বের। আমি তো আজকাল ওর মুখ দেখতে চাই না। ”

“কিন্তু ও আপনার নাম করেছে। এমনভাবে বলেছে যাতে মনে হয় সম্পর্ক ভাল। ”

“বদমাশ ! আসলে ও জানে, আমি ওর বট-ছেলেকে ভালবাসি। যখন ওর রোজগার ছিল না তখন ওদের ডেকে এনে খাওয়াতাম। সুন্দরের ছেলেটা হাতির সঙ্গে থাকতে খুব ভালবাসে। হাতির কাজ শিখতে চায়। মাত্র সাত বছর বয়স কিন্তু স্বচ্ছন্দে হাতির পিঠে উঠে উঠে যায়। দেখুন, ওর বাপকে যদি চাকরি করাতে পারেন, তা হলে পরিবারটা বৃক্ষ পায়। ”

কথা বলায় ব্যস্ত থাকলেও পার্বতীর কান যে পরিক্ষার, তা বোঝা গেল। তিনি আপন মনে বললেন, “এই সময়ে আবার কে আসছে !”

খুব ক্ষীণ একটা আওয়াজ এগিয়ে আসছিল। আওয়াজটা গাড়ির ইঞ্জিনের। তারপরেই ওরা গাড়িটাকে দেখতে পেল। নীল মারুতি। বাঁক নিয়ে যেই দেখল আর-একটি জিপসি দাঁড়িয়ে আছে, অমনি মারুতিটা থেমে গেল। মারুতিতে দুঁজন আরোহী। তারপরই হৰ্ণ বাজাল।

অর্জুন দেখল আওয়াজ হওয়ামাত্র হাতিদুটো ধীরে-ধীরে এদিকে এগিয়ে আসছে। তাই দেখে তাদের ড্রাইভার চটপট গাড়িতে উঠে বসল। একেবারে বাড়ির সামনে পৌঁছে হাতিদুটো স্থির হয়ে দাঁড়াল। যেন তাদের অতিক্রম করে কেউ যেন পার্বতীর কাছে পৌঁছতে না পারে এমন ভঙ্গ। মারুতির লোকদুটো কী করবে বুঝতে পারছিল না। হাতিদুটোর ভঙ্গ ওদের সাহস কেড়ে নিয়েছে। একজন চিৎকার করল, “ওখানে কেউ আছেন ?”

পার্বতী উঠে ব্যালকনির একধারে এগিয়ে গেলেন, “কী চাই ভাই ?”

“আপনি পার্বতী বড়ুয়া ?”

“আজ্জে হ্যাঁ। ”

“সুন্দর কি এখানে এসেছে ?”

প্রশ্নটা শুনে অর্জুন চমকে তাকাল। এবং তারপরেই সে চিনতে পারল। অমলদার খবর নিয়ে হাবু যে-সকালে তাকে ডাকতে গিয়েছিল, সেই সকালেই ওই নীল মারুতিটাকে সে জলপাইগুড়ির রাস্তায় বেপেরোয়া চালাতে দেখেছে। এক বলক যে-মুখটাকে সেদিন দেখেছিল, তার সঙ্গে আজকের ড্রাইভারের কোনও পার্থক্য নেই। রামদা বলেছিলেন বরেন ঘোষালের ছেট ভাই।

পার্বতী চেঁচিয়ে জবাব দিলেন, “এখানে সে আসবে কেন ?”

“সেটা আপনি জানেন। আমরা খবর পেলাম ও এখানে আসতে পারে, তাই জিজ্ঞেস করছি।”

“আপনারা কারা?”

এবাব জবাব দেওয়ার প্রয়োজন মনে করল না ওরা। ওই ছোট রাস্তাতেই গাড়ি ঘুরিয়ে ফিরে গেল দ্রুতগতিতে। গাড়ির আওয়াজ মিলিয়ে যাওয়ামাত্র কচি গলায় অঙ্গুত শব্দ বাজল। অর্জুন দেখল হাতিদুটো বেশ সহজ হয়ে শুঁড়ে নেড়ে ফিরে যাচ্ছে নিজের জায়গায়। আর পাশের জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসছে একটি বাচ্চার সঙ্গে ঘোমটা টানা মহিলা।

পার্বতী বললেন, “নিশ্চয়ই কোনও গোলমাল হয়েছে। সুন্দরের বউ-ছেলে আসছে।”

বাচ্চাটা এদিকে না এসে হাতিদের কাছে চলে গেল। নিজের মনে কথা বলে চলেছে সে। একটা হাতি বসে পড়তেই সে চট করে পিঠে উঠে একেবারে আকাশের দিকে মুখ করে টিৎ হয়ে শুয়ে পড়ল। মহিলাটি সিঁড়ির মীচে এসে দাঁড়াতেই পার্বতী জিজ্ঞেস করলেন, “কী ব্যাপার? সুন্দরের কী হয়েছে?”

মহিলা দিশি ভাষায় জড়ানো গলায় যা বলল, তার সারার্থ হল: এবাব শহর থেকে ফিরে এসে সুন্দরের হাবভাব পালটে গিয়েছিল। কেবলই বলত, অনেক অন্যায় করেছি, আর নয়। এবাব পাপের প্রায়শিকভ করতে হবে। ঘর থেকে বের হত না। গস্তির মুখ দেখে মহিলা কিছু বলতে সাহস পায়নি। গতকাল হাসিমারা থেকে একটা লোক এসেছিল ডাকতে, সে দেখা করেনি। স্ত্রীকে বলেছিল বলতে, বাড়ি নেই। লোকটা বলে গিয়েছিল সুন্দর যেন নীলুবাবুর সঙ্গে দেখা করে। শোনার পর বেশ ভয় পেয়ে যায় সুন্দর। স্ত্রীকে বলে, কিছু দিনের জন্য সে এই জঙ্গল ছেড়ে চলে যাবে। দরকার হলে আরও ভেতরে ভুটানের জঙ্গলে চুকে যাবে। যা টাকা আছে, তাতেই বউ যেন কোনও মতে চালিয়ে যায়। জলপাইগুড়ি থেকে কেউ যদি তাকে চাকরি করার জন্য খোঁজ করে, তা হলে বলতে হবে পরে দেখা করবে। মহিলা অনেক জিজ্ঞেস করা সঙ্গেও সুন্দর কারণ বলেনি। আজ একটু আগে ওই নীল গাড়িটা সুন্দরের খোঁজে এসেছিল। ও সঙ্গে-সঙ্গে পেছনের দরজা দিয়ে জঙ্গলে চুকে যায়। এখন দুশ্চিন্তায় মাথা ঠিক রাখতে পারছে না মহিলা। তাই ছেলেকে নিয়ে ছুটে এসেছে পার্বতীর কাছে।

সব শোনার পর পার্বতী জিজ্ঞেস করলেন, “আমার কথা ওদের কে বলেছে? তুমি?”

মহিলা মাথা নাড়ল, হ্যাঁ। কারণ, একটা লোক এমন শাসাচ্ছিল যে, মহিলা মনে করেছিল দিদির কাছে পাঠিয়ে দিলে ওরা শায়েস্তা হয়ে যাবে।

পার্বতী ঘুরে দাঁড়ালেন, “কী করি বলুন তো! এই মেয়েটার স্বামী হল সুন্দর রায়। নিশ্চয়ই কোথাও কোনও অন্যায় করে এসেছে, তাই লোকজন ওকে

খুঁজছে। এখন উপায় না দেখে বউ-ছেলেকে ফেলে জঙ্গলে পালিয়ে গেছে। এইরকম সোককে কখনও বিশ্বাস করা যায়?”

অর্জুন বলল, “আপনি যা ভাবছেন, তা নাও হতে পারে। শুনলেন তো, শহর থেকে ফিরে আসার পর ওর মধ্যে পরিবর্তন এসেছিল। লোকটার মধ্যে অন্যায়বেংধ ছিল, হয়তো আমার সঙ্গে কথা বলার পর সেটা বেড়ে যাওয়ায় ও লিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিল। এই লোকগুলো হয়তো কোনও অন্যায় কাজে লাগতে চায় বলেই ও জঙ্গলে লুকিয়ে থাকতে চাইছে। সুন্দরকে না পেলে এর কারণ জানা যাবে না। তা ছাড়া ওই নীলগাঢ়ির ড্রাইভার লোক ভাল নয়। ওর সম্পর্কে শহরের লোকদের ধারণা ভাল নয়।”

মেজর জিজ্ঞেস করলেন, “কে ও ?”

“জলপাইগুড়ির শিল্পসমিতি পাড়ায় বরেন ঘোষালের ছেট ভাই। উনি থাকেন বোম্বাইয়ে, সম্পত্তি উদয় হয়েছেন। কিন্তু—” অর্জুন হঠাৎ চুপ করে গেল। সে দুটো মানুষের মধ্যে সম্পর্ক কী হতে পারে ভেবে পাছিল না। মেজর বললেন, “সেন্টেন্স শেষ করোনি।”

“ওই মহিলা বললেন একটা লোক এসে হৃকুম করে দিয়েছিল, নীলুবাবুর সঙ্গে দেখা করতে। এই নীলুবাবুর পরিচয় আপনি জানেন ?” অর্জুন পার্বতীকে জিজ্ঞেস করল।

পার্বতী মাথা নাড়লেন, “ব্যানার্জি টি এস্টেটের ওনারের ভাই। শুনেছি খুব বাজে লোক, কিন্তু আমার সঙ্গে কখনও পরিচয় হয়নি।”

“বাঃ। নীলুবাবুর সঙ্গে বরেন ঘোষালের ছেটভাইয়ের একটা যোগসূত্র থাকা অসম্ভব নয়। গাড়ি চালানোর ব্যাপারে দু'জনের তো চমৎকার মিল। কিন্তু এই জঙ্গলে কোনও মানুষের পক্ষে বেশি দিন লুকিয়ে থাকা কি সম্ভব ? যত দূর জানি, এদিকের জঙ্গলে ফলটল তেমন নেই।” অর্জুন বলল।

“ঠিকই শুনেছেন। মানুষ যেসব ফল খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে, তা পাওয়া যাবে না। তবে মাটির নীচে যেসব হয়, যেমনঃ শাঁকালু খুঁজে পাওয়া অসম্ভব নয়। তাই সুন্দরকে খাবারের জন্য বেরিয়ে আসতেই হবে। তবে এদিকে সে নাও আসতে পারে। জঙ্গলের বুকেই ছেট-ছেট পাহাড়ি গ্রাম আছে। সেখানেই যাওয়া ওর পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু এদের এখন কী বলি !” পার্বতীকে চিহ্নিত দেখাল। তিনি ব্যালকনি থেকেই গলা তুললেন, “ঠিক আছে। তুমি ছেলেকে নিয়ে বাড়ি ফিরে যাও। মনে হয়, রাত নামলে সুন্দর বাড়িতে ফিরে যাবে। আর যদি না যায়, তা হলে কাল সকালে এসো। বাচ্চাটাকে কিছু খাইয়েছ ?”

“হ্যাঁ। কিন্তু যে-টাকা ও শহর থেকে পাখি বিক্রি করে এনেছে, তাতে হাত দেইনি। ও বলেছে, পাপের টাকা।”

“সেই টাকা কোথায় ?”

“ইঁড়িতে রেখে দিয়েছে ।”

পার্বতী একটু চিন্তা করলেন, “তা হলো ও এখানে থাক । তুমি জামা-কাপড় নিয়ে চলে এসো ।”

মহিলা দ্রুত জঙ্গলের মধ্যে চুকে গেল । ওপাশে ছেলেটা তখনও হাতির পিঠে শুয়ে আছে । মেজের সেটা লক্ষ করে মন্তব্য করলেন, “জুনিয়ার টারজান ।”

পার্বতী চিৎকার করলেন, “মধু, নেমে আয় । সঙ্গে হয়ে আসছে ।”

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “ন্যশনাল জিওগ্রাফিক-এর যে সংখ্যায় আপনার ছবি ছাপা হয়েছিল, সেটা কি এখানে আছে ? থাকলে দেখতাম ।”

পার্বতী ভেতরে চলে গেলেন । এই সময় দূরে রেলের কয়লার ইঞ্জিনের হাঁস্ল শোনা গেল । আর তারপরই চোচের কাঁপিয়ে একটা রেলগাড়ি দূরের জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চলে গেল আসামের দিকে । শেষ আলোয় মাখামাখি আকাশ এবং জঙ্গলের পটভূমিকায় রেলগাড়ির চলন্ত দৃশ্য কী মনোরম ! ছেলেটা চট করে হাতির ওপর উঠে দাঁড়িয়ে সেই রেলগাড়ির ছুটে যাওয়া দেখছিল । হ্যাঁই অর্জুনের মনে পড়ে গেল পথের পাঁচালির অপূর রেলগাড়ি দেখার দৃশ্য । ওই ছেলেটার সঙ্গে অপূর এই মুহূর্তে কোনও পার্থক্য নেই । দুঃজনের চেখের অভিব্যক্তি একই ।

পার্বতী একটা ঝুকঝুকে রঙিন পত্রিকা নিয়ে এলেন । পৃথিবীর অন্যতম মূল্যবান পত্রিকা, যার মলাটে হাতির পিঠে বসে থাকা পার্বতীকে দেখা যাচ্ছে । পার্বতী সম্পর্কে একটা সুন্দর ক্যাপশন রয়েছে মলাটে । ভেতরেও তাঁকে নিয়ে অনেকটা লেখা ।

“এটা বের হওয়ার পর কেউ যোগাযোগ করেনি আপনার সঙ্গে ?”

“হ্যাঁ, বিদেশিরা করেছেন । তাঁরা ক্যামেরা নিয়ে আসেন টিভির জন্যে । এই তো, বিখ্যাত এক ইংরেজ সাহেব আসছেন দিল্লিতে । তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চান । তাঁর অফিসের লোকজন আমাকে দিল্লিতে যেতে লিখেছেন । কে যাবে ? আমার কাজ নেই নাকি ? যাদের দরকার, তাঁরা আসুন আমার কাছে । আমি কেন যাব ? তাই জানিয়ে দিয়েছি ।”

অর্জুনের খুব শ্রদ্ধা বাড়ল । সে বলল, “দিদি, আপনার কাছে আবার আসব ।”

“আসুন ভাই । এসেই জিজ্ঞেস করেছিলেন, এখানে একা থাকতে ভয় লাগে কি না । বনের জন্তকে আমি মোটেই ভয় করি না । ভয় মানুষকে । মানুষের মতো লোভী জানোয়ার ভগবান আর সৃষ্টি করেননি ।”

সঙ্গের পরেই চা-বাগানের শ্রমিক-পল্লীতে মাদল বাজে। আজ হালকা জ্যোৎস্না উঠেছে। বাংলোর বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে অমল সোম বললেন, “পার্বতীকে কখনও দেখিনি, কিন্তু ওর বাবা লালজিকে আমি ভাল চিনতাম। ভানুবাবু, আপনার সঙ্গে নিশ্চয়ই পরিচয় ছিল ?”

ভানু ব্যানার্জি এখন পাজামা-পাঞ্জাবি পরে দিব্যি বাঙালি হয়েছেন, বললেন, “হ্যাঁ। ভালই আলাপ ছিল। সারা জীবন জঙ্গলে ঘুরেছেন রাজবাড়ির ছেলে হয়েও, প্রচুর ইন্টারেস্টিং গল্প শোনা যেত। ওঁর মেয়ে এই পার্বতীটা অনেকখানি বাবার স্বত্বাব পেয়েছে।”

অর্জুন চারপাশে তাকিয়ে দেখছিল। হালকা সরের মতো জ্যোৎস্নায় গাছপালায় ঘেরা বাংলোর চৌহানিকে কী মনোরম মনে হচ্ছে। হঠাৎ অমল সোম জিজ্ঞেস করলেন, “অর্জুন, তুমি ওই সুন্দর নামের পার্বি-চোরটার জন্য চাকরির চেষ্টা করেছ, তুমি কি মনে করেছ ও শুধরে যাবে ?”

অর্জুন মুখ ফেরাল, “যেতে তো পারে। শুনলাম, জলপাইগুড়ি থেকে ফিরে এসে লোকটার প্রচণ্ড পরিবর্তন হয়েছে। ঘর থেকেই বের হয়নি। তারপর পুরনো লোকজন দেখা করতে চায় বলে সে বাড়ি ছেড়ে জঙ্গলে গিয়ে লুকিয়েছে। আমার তো মনে হয়, ওকে সাহায্য করা উচিত।”

“বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করতে চায় না বলে সে জঙ্গলে গিয়ে লুকোবে কেন ?”

“হয়তো ওর সেই সব বন্ধু অন্যায় কাজকর্ম করে থাকে।”

“সেই কাজে যাদের ওকে প্রয়োজন, তাদের ছায়া এড়িয়ে সে কতদিন লুকোতে পারবে ? হ্যাঁ, ওই যে নীলবাবুর সঙ্গে দেখা করতে বলেছে লোকগুলো, তিনিই কি ব্যানার্জি টি গার্ডেসের পরবর্তী মালিক নীল চ্যাটোর্জি ? ওঁর যে আচরণ রাস্তায় তোমরা দেখেছ, তার সঙ্গে অবশ্য এই সুন্দরের মতো লোককে দেখা করতে বলা চমৎকার মানিয়ে যায়।” অমলবাবু বললেন।

ভানু ব্যানার্জি বললেন, “কিন্তু মিস্টার সোম, নীলের দিদি মিসেস ব্যানার্জি কিন্তু খুব ভালমানুষ। বরং ওঁর স্বামী অশ্বিনী ব্যানার্জি খুব কড়া ধাতের লোক ছিলেন। তাঁর জীবদ্ধশায় নীল দু-একবার দিদির কাছে এসেছে মাত্র, পাকাপাকিভাবে থাকতে পারেনি। অশ্বিনী ব্যানার্জির মৃত্যুর পর দিদিকে সাহায্য করতে এদিকে চলে আসে সে।”

অর্জুন বলল, “আমাদের সঙ্গে যে বৃক্ষলোকটি কথা বলেছেন, তাঁর নাম হুরপ্রসাদ সেন।”

ভানু ব্যানার্জি মাথা নাড়েন, “হ্যাঁ, মিস্টার সেন অনেক প্রবীণ মানুষ। একসময় চা-বাগানের ম্যানেজারি করতেন। নীল তাঁকে পছন্দ না করলেও মিসেস ব্যানার্জির অনুরোধে উনি অফিসের কাজকর্ম দেখাশোনা করেন। আমি

বলি কী, এদের সংস্পর্শ এড়িয়ে যাওয়াই ভাল । ”

মেজর চুপচাপ শুনছিলেন । এবার মুখ খুললেন, “কিন্তু মিস্টার ব্যানার্জি, চা-বাগানের মালিকদের তো প্রচুর পয়সা । নীল চ্যাটার্জি মালিক হতে যাচ্ছেন, নীল মারগতিতে চড়েন । তিনি কেন সুন্দরের মতো একটা পাখিচোরের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন ? ”

ভানু ব্যানার্জি বললেন, “নীল কখন কী করবে তা প্রেতিক্রিয়া করা মুশকিল । আমি ওকে হাইওয়ের ধারে পাঞ্জাবি ধারায় বসে আড়ডা ঘারতে দেখেছি । ব্যানার্জি টি গার্ডেলে এখন কোনও শ্রমিক বিক্ষেভ নেই । গত বছরে বিক্ষেভ করতে পারে এমন তিনজন শ্রমিক নেতার মৃতদেহ তোর্সা নদীর চরে পাওয়া গিয়েছে । পুলিশ খুনিকে ধরতে পারেনি, কিন্তু শ্রমিকরা বুঝে গিয়েছে বিক্ষেভ জানালে তাদেরও একই অবস্থা হবে । ”

মেজর চেঁচিয়ে উঠলেন, “এ যে দেখছি ডিস্ট্রিক্টরশিপের চেয়েও খারাপ অবস্থা । পুলিশ কী জন্য আছে ? আপনারা ওর এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করছেন না কেন ? ”

ভানু ব্যানার্জি উঠে দাঁড়ালেন, “দেখুন, শহর, গ্রাম-গঞ্জের সঙ্গে চা-বাগানের পার্থক্য হচ্ছে এখানে গাছপালা বেশি, মানুষ কম । যে মানুষেরা থাকেন তাঁরা এক-একটা ছেট গোষ্ঠীতে, চা-বাগানকে কেন্দ্র করে । কিছু দিন আগেও পুরো ডুয়ার্স, ম্যানেজারের শাসনে শাসিত হত । এখনও আমরা অন্য বাগানের সমস্যায় নাক গলাই না । তার জন্যে অ্যাসোসিয়েশন আছে । নীল চ্যাটার্জি যতক্ষণ আমাকে বিরুত না করছে, ততক্ষণ আমি আমার বাগান নিয়েই ব্যস্ত থাকব । যাকগে, আপনারা কি কালই নীলপাড়া ফরেস্টে যেতে চান ? ”

অমল সোম বললেন, “সেই রকমই তো ইচ্ছে আছে । ”

“আপনারা আমার এখানে থেকেও যাতায়াত করতে পারেন । একটু সময় লাগবে হয়তো... । ”

“মধু চা-বাগান কীরকম ? এ পি রায় ওখানে বোধ হয় আমাদের জন্যে ব্যবস্থা করেছেন । ”

“মধু থেকেও বেশ কিছুক্ষণ লাগবে । আপনারা ফরেস্টের ভেতরে থাকতে চান ? একটা বাংলো আছে, কোচবিহার থেকে বুক করতে হয় । আমি সেই চেষ্টা করতে পারি । ”

মেজর বললেন, “দ্যাট্স গুড । জঙ্গলের ভেতর থাকার খ্রিলই আলাদা । তারপর এদিকে এসে যখন শুনলাম চিতা-চিতা আছে, তখন আমি ওই বাংলোয় থাকতে চাই । ”

কোচবিহার থেকে অনুমতি আনতে দুপুর হয়ে যাবে । ঠিক হল, লাঞ্ছ সেবে ওরা এখান থেকেই জঙ্গলে চলে যাবে । ডিনার শেষ করে শুতে যাওয়ার সময় ভানু ব্যানার্জি তাঁর বাংলোর বেয়ারার হাত দিয়ে চিরকুট পাঠালেন । তাতে

ଲେଖା, ତିନି କୋଚବିହାରେର ଡି ଏଫ ଓ-ର ସଙ୍ଗେ ଟେଲିଫୋନେ କଥା ବଲେଛେନ । ଅମଲ ସୋମେର କଥା ବଲାତେଇ ଭଦ୍ରଲୋକ ଜାନିଯେଛେନ, ଆଗାମିକାଳ ସକାଳେ ତିନି ନିଜେଇ ଚଲେ ଏସେ ବାଂଲୋର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରେ ଦେବେନ ।

ଚିରକୁଟା ପଡ଼ା ହଲେ ମେଜର ସପ୍ରଶଂସ ଗଲାଯା ବଲଲେନ, “ବାଃ, ଏଦିକେର କର୍ତ୍ତରୀ ଦେଖଛି ଆପନାକେ ଖୁବ ଥାତିର କରେ । ଆପନାର ଜନ୍ୟେ ଗର୍ବ ହଛେ ମଶାଇ ।”

ଅମଲ ସୋମ କୋନେ କଥା ବଲଲେନ ନା ।

ସକାଳ ସା�େ ଦଶଟାଯା କୋଚବିହାରେର ଡି ଏଫ ଓ ଅନୁପମ ତ୍ରିବେଦୀ ଜିପ ନିଯେ ଏଲେନ । ଅମଲ ସୋମେର ସଙ୍ଗେ ପରିଚୟ କରିଯେ ଦେଓଯାର ପର ତିନି ଯେ ସେଇ ସବେ ଚୁକେଛେନ, ଆର ବେରନୋର ନାମ ନେଇ । ଭଦ୍ରଲୋକେର ଏତ କୀ କଥା ଥାକତେ ପାରେ, ବାରାନ୍ଦାଯ ବସେ ମେଜର ଭେବେ ପାଞ୍ଚିଲେନ ନା । ଅର୍ଜୁନକେ ତିନି ବଲଲେନ, “ବ୍ୟାପାରଟା କୀ, ଜାନୋ ?”

“କୋନ ବ୍ୟାପାର ?”

“ଜଲପାଇଣ୍ଡିର ପୁଲିଶ ସୁପାର ତୋମାର ଦାଦାର ସଙ୍ଗେ ଦେଖା କରତେ ଏସେଇଲେନ । ଏଥାନେ ଜେଲାର ଫରେସ୍ଟେର ବଡ଼କର୍ତ୍ତା ସ୍ବର୍ଗ ଏସେ ଆଲୋଚନାୟ ବସେଛେନ, ରହସ୍ୟମୟ ।”

ଅର୍ଜୁନ ବଲଲ, “ଅମଲଦା ନିଜେ ଥେକେ ନା ବଲଲେ ଆପନାକେ ଚୁପ୍ଚାପ ଅପେକ୍ଷା କରତେ ହବେ, କଥନ ରହସ୍ୟର ସମାଧାନ ହୁଏ । ତବେ ଡି ଏଫ ଓ ସାହେବ ଏସେହେନ ଯଥନ, ତଥନ ଫରେସ୍ଟ ବାଂଲୋଯ ଆରାମେ ଥାକା ଯାବେ । ଏଦିକେର ବାଂଲୋର ବାରୁଚିରା ଦାରଳ ମୁରଗିର ମାଂସ ରାନ୍ନା କରେ ।”

“ମୁରଗି ?” ମେଜର ସୋଜା ହେଁ ବସଲେନ । ତାଁର ଦାଢ଼ିଗୋଁଫେର ଆଡ଼ାଲ ଭେଦ କରେଓ ଆତ୍ମତ ହସି ଫୁଟେ ଉଠିଲ, “ମୁରଗି ଖାଓଯା ଆମି ହେବେ ଦିଯେଛି ହେ ।”

“କିନ୍ତୁ ଆପନି ତୋ ପାଠୀର ମାଂସ ଖାନ !”

“ଖାଇ । କେନନା ଇନ୍ଡିଆନ ପାଠୀର ମତୋ ନିର୍ବେଦ୍ଧ ପ୍ରାଣୀ ପୃଥିବୀ ଥେକେ ଚଲେ ଗେଲେ କୋନେ କ୍ଷତି ହସ ନା । ତୁମି କତ ବଡ଼ ମୁରଗି ଦେଖେ ?”

“ବେଶ ବଡ଼, ଦୁ’-ଆଡ଼ାଇ କେଜି ହବେ ।”

“ଦୁର ! ଆମି ଅବଶ୍ୟ ଓଜନ ନିତେ ପାରିନି, ଦାଢ଼ିପାଣ୍ଠା ଛିଲ ନା । ତବେ ଚାରଜନ ପୋର୍ଟର ବେଶ କରନ୍ତ କରେ ଓକେ ତୁଳେଛିଲ । ସ୍ଟଟନାଟା ବଲି ଶୋନୋ : ସେବାର ଆଫିକାଯ ଗିଯେଛି ବିଶ୍ରାମ ନେବ ବଲେ । ଆମାର ବସୁ ଲୋପେଜ ଥାକତ ଜାଇରେ ନଦୀର କାହେ । ସାରା ବହର ବୃଷ୍ଟି ହସ ସେଖାନେ । ଲୋପେଜର ସଙ୍ଗେ ଆମି କିନ୍ମାମା ଶହର ଥେକେ ଆଶି ମାଇଲ ଦୂରେ ଏକ ଜଙ୍ଗଲେ ତାଁରୁ ଫେଲେ ତୋଫା ଛିଲାମ । ଲୋପେଜ ବଲେଛିଲ, ବୃଷ୍ଟି ବେଶ ହଲେଓ ସାପଖୋପ ଛାଡ଼ା ହିଂସ୍ର ପ୍ରାଣୀ ଓଦିକେ ବଡ଼ ଏକଟା ନେଇ । ଏକଦିନ ବୃଷ୍ଟି ନେଇ ଦେଖେ ଜାଇରେ ନଦୀର ଧାରେ ଗିଯେଛିଲାମ । ଚାରପାଶେ ମାଥାସମାନ ବୋପ । ହଠାତ୍ ଶବ୍ଦ ଶୁଣେ ଦେଖି ଏକଟା ଉଟପାଖିର ମତୋ ପ୍ରାଣୀ ଆମାଦେର ଦିକେ ତାକିଯେ ଆଛେ । ଲୋପେଜ ବଲଲ, “ପାଲାଓ । ଏରା ମାବେ-ମାବେଇ ହିଂସ୍ର ହସ । ଆମରା ଦୌଡ଼ିତେ ଲାଗଲାମ । ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରାଣୀଟା

পেছনে ধাওয়া করল কঁক-কঁক করতে করতে । এমন বীভৎস গলা আর ডানার আওয়াজ আমি জীবনে কখনও শুনিনি ! প্রাণ বাঁচাবার তাগিদে লোপেজ গুলি চালাল । দুটো গুলিতেই ওটা পড়ে গেল ধূপ করে । তখন কাছে গিয়ে দেখলাম উটপাখি নয়, মুরগি । ” মেজর চোখ বন্ধ করে বলে গেলেন ।

“মুরগি আপনাদের তেড়ে এসেছিল ?”

“ইয়েস মাই বয় । পুঁচকে মুরগিগুলোকে দ্যাখোনি শত্রু দেখলে তেড়ে যেতে ? তা লোপেজের লোকেরা কোনওমতে ওটাকে বয়ে নিয়ে এল তাঁবুতে । ধূমধাম করে মাংস রান্না করল । কিন্তু মুখে দিয়েই মন খারাপ হয়ে গেল । ওই বিশাল পাখির তেজস্বী ভঙ্গি মনে পড়ে যেতে আর খেতে পারলাম না । সেই থেকে আমার জীবনে মুরগি বন্ধ । ”

“ওটা সত্যই মুরগি, না অন্য কিছু ?”

মেজর পিটপিট করলেন, “তুমি কখনও আফ্রিকায় গিয়েছ ?”

“না ।”

“বিবর্তনের নিয়ম মেনে পৃথিবীর সব প্রাণী ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে । এই যে হাতি দেখতে পাও, এদের হাজার পুরুষ আগের চেহারাটা কল্পনা করো । পাহাড়ের মতো । সেইজন্যে হাতির সঙ্গে পাহাড়ের উপরা এখনও দেওয়া হয় । কিন্তু সময় ওদের ছোট করে দিয়েছে । একটা টিকটিকি কুমিরের চেয়ে বড় ছিল আকৃতিতে । মুরগির ক্ষেত্রে তাই হওয়া স্বাভাবিক । তা আফ্রিকায় এখনও কিছু প্রাণী অতীতের ছায়া ধরে রেখেছে । ওটা মুরগিই । ”

“তা হলে তো আপনার ওখানে খাওয়ার কষ্ট হবে । ডালভাতের ওপর থাকতে হতে পারে । ”

মেজর হাসলেন, “কুছ পরোয়া নেই । আমার স্টকে কিছু সার্ডিন আছে । তাই দিয়ে চমৎকার ভাত খাওয়া যায়—সার্ডিনের বাটিচচড়ি আর ভাত । ”

“সার্ডিন মাছ ?”

“ইয়েস মাই বয় । টিনে প্যাক করা । সবসময় সঙ্গে রাখি । তবে ওরা যেভাবে খায়, সেভাবে নয় । মাছটাকে টিন থেকে বের করে দিশি প্রথায় বাটিচচড়ি বানিয়ে নিয়ে ভাতের ওপর ঢালো । আহা !” মেজর যেন এখনই তার স্বাদ পেয়ে গেলেন ।

এই সময় অমল সোমের ঘর থেকে দু'জনে বেরিয়ে এলেন ।

অমল সোম অনুপম ত্রিবেদীর সঙ্গে ওদের আলাপ করিয়ে দিলেন । ‘হ্যান্ডসাম’ শব্দটা চট করে মনে এল অর্জুনের । মিস্টার ত্রিবেদী বললেন, “আপনার কথা আমি শুনেছি অর্জুনবাবু । পরিচয় হওয়ায় খুশি হলাম । আপনারা যে আমাদের জঙ্গলে থাকবেন, সেইজন্য গৌরবার্হিত বোধ করছি । শুনলাম এখানে আসার সময় নীল চ্যাটার্জির সঙ্গে আপনাদের আলাপ হয়েছে । ”

“আলাপ ?” মেজর খেপে গেলেন, “লোকটা আমাকে অপমান করেছে। একবার হাতের কাছে পেলে এমন শিক্ষা দিতাম যে, বাছাধন টাইট হয়ে যেত !”

“আপনারা বেড়াতে এসেছেন, ওসব না করাই ভাল। নীল আমাদের কাছেও সমস্যা। জঙ্গলের নিয়মকানুন মানছে না। অথচ ওর বিরুদ্ধে এমন কোনও সাক্ষী জোগাড় করতে পারিনি যে, আমরা ব্যবস্থা নেব। ওহো, আপনি যে ফুলের সন্ধানে এসেছেন, তার নাম কী ?”

মেজর বললেন, “বুনো ফুল। বাংলা নাম জানি না। তবে আমি নাম রেখেছি বিষগুৰা।”

ত্রিবেদী বললেন, “কয়েকটা মৃত্যুর খবর আমাদের কাছে অবশ্য এসেছে এবং সেই সব মৃতদেহে আঘাতের চিহ্ন নেই। আমরা এখনও পর্যন্ত কোনও কারণ খুঁজে পাইনি। জঙ্গলে মাঝে-মাঝেই সংক্রামক রোগ ছড়ায়, প্রাণীরা মারা যায়। তখন যে এলাকায় এটা ঘটে, সেই এলাকা থেকে বন্যপশুদের সরিয়ে দেওয়া হয়। যাদের সরানো সম্ভব হয় না, তাদের প্রতিবেদক দেওয়ার চেষ্টা করি। কিন্তু এই মৃত্যুগুলো ঠিক এক জায়গায় হয়নি আর ঘন-ঘন হয় না। আপনি যদি কারণ আবিষ্কার করতে পারেন, তা হলে বিশাল উপকার হবে।”

মেজর মাথা ঝুঁকিয়ে বললেন, “আমি প্রাণপণে চেষ্টা করব। কী অর্জুন ?”

“নিশ্চয়ই।” অর্জুন সমর্থন করল।

সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহিত মেজর বললেন, “দেখুন মিস্টার ত্রিবেদী, একটা ছোট লাইটারকে যদি আমি, মানে আমরা, অতবড় আমেরিকা থেকে উদ্ধার করতে পারি, তা হলে এটাও সম্ভব হবে।”

“কী ব্যাপার ?” ত্রিবেদী কোতুহলী হল।

অমল সোম বাধা দিলেন, “ও-গঞ্জ অন্য সময় শুনবেন।”

লাঢ়ি সেরে ওরা ত্রিবেদীর জিপে উঠল না। ত্রিবেদী বললেন, “আপনারা মিস্টার ব্যানার্জির জিপসিতে আসুন। আমার জিপটিকে জঙ্গলের সবাই চেনে। আমি নীলপাড়ার রেঞ্জারকে খবর পাঠিয়ে দিয়েছি। সে আপনাদের জন্যে বাংলায় অপেক্ষা করবে। আমি আগামিকাল আমার কুটিন ভিজিটে ওখানে গিয়ে আপনাদের সঙ্গে দেখা করে আসব।”

অর্জুনের খটকা লাগল। যাওয়া হচ্ছে একটি ফুলের সন্ধানে। ভুল করে তার কাছাকাছি চলে না গেলে বিপদ নেই। মেজর অবশ্য কয়েকটা মাস্ক নিয়ে এসেছেন, যা নাকে পরলে বিষ শরীরে চুকবে না। এই আবিষ্কারের সঙ্গে কোনও শক্তপক্ষের সম্পর্ক নেই যে, তাদের সঙ্গে সংঘাতে যেতে হবে বলে এই লুকোচুরি দরকার। তার মনে পড়ল, জলপাইগুড়ি থেকে আসার সময় অমল সোম বলেছিলেন, এমনভাবে ঘটনাস্থলে পৌঁছতে চান, যাতে স্থানীয় মানুষ তাঁদের সম্পর্কে কোতুহলী না হয়! ত্রিবেদীর সঙ্গে অমল সোমের কী কথা

হয়েছে তা জানা না গেলেও, অর্জুন অনুমান করল অনেক বড় রহস্য তাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে।

ভানু ব্যানার্জির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ওরা সুহাসিনী চা-বাগান ছেড়ে কয়েক মিনিটের মধ্যে হাসিমারায় চলে এল। অমল সোম বসেছিলেন ড্রাইভারের পাশে, ওরা পেছনে। ভানু ব্যানার্জি কয়েকটা বড় বাঞ্জে চাল-ডাল-আনাজ দিয়ে দিয়েছেন, যদি প্রয়োজনে লাগে।

মেজর গভীর গলায় বললেন, “অর্জুন! তুমি বাইকটাকে নিয়ে এলে তাল করতে!”

অমল সোম বললেন, “আমি নিষেধ করেছি। এদিকের রাস্তায় পাথর বেশি। তা ছাড়া জঙ্গলে বাইক চালালে ওখানকার বাসিন্দাদের বিরক্ত করা হবে।”

মেজর কাঁধ ঝাঁকালেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, “আমরা যে জঙ্গলে যাচ্ছি, তার কোনও চারিত্ব, আই মিন বিশেষত্ব আছে?”

অমল সোম মাথা নাড়লেন, “হ্যাঁ। নীলগিরি খুব গভীর জঙ্গল। শোনা যায়, যারা ডাকাতি করে, তাদের জায়গাটা খুব প্রিয়। তবে এই সময় হাতিরা ওখানে বেশি পরিমাণে রয়েছে বলে আমরা তাদের দেখা নাও পেতে পারি। এ ছাড়া জন্তু আছে প্রচুর। নীলগিরিতে খঞ্জন নামে এক ধরনের পাখি পাওয়া যায়, সাদা বুকের ঠিক মাঝখানে কালো চিহ্ন রয়েছে। একসময় এখানকার মানুষ ওই চিহ্নটাকে শালগ্রাম শিলা অথবা বিষুণ্ড প্রতীক বলে মনে করত। এ ছাড়া পাইথন কোবরার জন্যে জঙ্গলটা বিখ্যাত।”

মেজর বললেন, “হ্ম। কাবলিক অ্যাসিড সঙ্গে আনা উচিত ছিল।”

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “আপনি সাপকে ভয় পান?”

“ঠিক ভয় নয়, যেঙ্গা করি। কেমন কিলবিল করে চলে। সাবধানে পা ফেলো।” জিপসির ভেতর বসেই পা সরিয়ে নিলেন মেজর।

অমল সোম বললেন, “তোমরা কেউ সারাও বলে প্রাণীর নাম শুনেছ?”

মেজর বললেন, “সারাও? নো। অর্জুন শুনেছ?”

অর্জুন মাথা নেড়ে ‘না’ বলল।

অমল সোম বললেন, “ওর নেপালি নাম থর, আর বৈজ্ঞানিকরা নাম দিয়েছেন ক্যাপ্থিকরনিস সুমাত্রেনিস্স।”

মেজর সঙ্গে-সঙ্গে পকেট থেকে ডায়েরি বের করে নামটা লিখে রাখলেন। অমল সোম বললেন, “এটা ছাগল আর অ্যান্টিলোপের মাঝামাঝি গোছের প্রাণী। জিম করবেট যাকে গোরাল বলেছেন তার সঙ্গে এই সারাওয়ের কিছু মিল রয়েছে। এদের শরীরের তুলনায় মাথা বেশ বড়। মাথা ও মুখ গাধার মতো, কান বড়, চোয়ালের পাশে লম্বা-লম্বা চুল, উচ্চতা তিনি ফুটের মতো। গোল খাঁজকাটা শিং বাঁকানো মোচার মতো। বেশির ভাগের শরীরের রং হয়

কালো আৰ পা মৰচে-পড়া লাল । সারাও অস্তুত খাড়া পাহাড় বেয়ে স্বচ্ছন্দে ওঠানামা কৰতে পাৰে । এদেৱ শ্ৰবণশক্তি তীৰ, খোলা জায়গায় আসে না । ১৮৩২ সালে ব্ৰায়ান হজসন এদেৱ আবিষ্কাৰ কৰেন । ” অমলদা নিবিষ্ট গলায় বলে যাচ্ছিলেন ।

“আপনি এই প্ৰাণীটি সম্পর্কে এত জেনেছেন কেন ?” মেজৰ প্ৰশ্ন কৰলেন ।

“জানতে তো সব সময় ইচ্ছে কৰে ! তাৰ ওপৰ সারাও লুপ্তপ্ৰায় না হলেও পশ্চিমবঙ্গে বিৱল হয়ে এসেছে । হঠাৎ বিদেশে এৱ চাহিদা বেড়েছে । এক-একটি প্ৰমাণ সাইজেৱ সারাও অস্তুত এক লক্ষ টাকায় বিক্ৰি হচ্ছে, এমন খৰও আছে । ”

“এক লক্ষ টাকা ? তা হলে ওৱ মাংসেৱ কেজি কত ?”

“শুধু মাংস নয়, ওৱ শিং, লোম, ক্ষুৰ সব কিছুৱাই চাহিদা । জামনীৰ এক বৈজ্ঞানিক নাকি আবিষ্কাৰ কৰেছেন, সারাওয়েৱ শিশেৱ গুঁড়ো খেলে বাত সেৱে যায় । বাত হয় প্ৰোট অথবা বৃন্দাদেৱ । ওই বয়সী মানুষেৱ হাতে টাকা থাকা স্বাভাৱিক । সুস্থভাৱে চলাফেৱা কৱাৱ জন্যে সেই সব মানুষ দুহাতে খৰচ কৰতে রাজি । ” কথাগুলো বলে আচমকা চুপ কৰে গেলেন অমল সোম । একদৃষ্টিতে চা-বাগান দেখতে লাগলেন ।

এখন জিপসি যাচ্ছে পাথৰ-বিছানো পথ ধৰে । এক দিকে চা-গাছগুলো গালচেৱ মতো বিছানো, অন্য দিকে জঙ্গল । অৰ্জুনেৱ মাথায় বিদ্যুৎ চলকে উঠল । অমল সোম কি এখানে সারাও-এৱ সন্ধানে এসেছেন না, তাঁৰ শিকায়ীৰ তলাশে ? স্পষ্ট বোৰা যাচ্ছে মেজৱেৱ ফুলেৱ ব্যাপাৱে তিনি তেমন উৎসাহী নন, হলে এ নিয়ে আলোচনা কৰতেন । জলপাইগুড়িৰ এস পি এবং কোচবিহারেৱ ফৱেস্ট ডিপার্টমেন্টেৱ বড় কৰ্ত্তা কি জানেন অমল সোমেৱ আসাৱ উদ্দেশ্য কী ? অৰ্জুনেৱ খুব খাৰাপ লাগছিল । আজকাল অমল সোম কোনও ব্যাপাৱেই তাৰ সঙ্গে আলোচনা কৰেন নাই । যেদিন থেকে সে নিজে সত্যসন্ধানে নেমে পড়েছে, সেদিন থেকেই উনি তাৰ সঙ্গে দূৰত্ব বেঞ্চে চলেছেন । অথচ ওই মানুষটিকে সে তাৰ গুৰুদেৱ বলে মনে কৰে । সে ঠিক কৱল, নিজে থেকে না বললে একটা প্ৰশংসন কৰবে না । বেড়াতে এসেছে, খাবেদাবে, বেড়িয়ে চলে যাবে । আৱ মেজৰ যদি সাহায্য চান, তা হলে ফুলেৱ সন্ধান কৰবে ।

ওপাশে গাড়িৰ আওয়াজ হচ্ছিল । অৰ্জুন দেখল একটা নীল মারণতি ধূলো উড়িয়ে আসছে । দেখামাৰ্ত্ত তাৰ মনে নীল চ্যাটোজিৰ মুখ ভেসে উঠল । কিন্তু মারণতিটা আসছে সোজা আৱ প্ৰচণ্ড জোৱে । হঠাৎ অমলদা বললেন, “ড্ৰাইভাৱ ভাই, আপনি যেমন চালাচ্ছেন তেমন চালান, সাইড দেওয়াৱ জন্যে নীচে নেমে যাওয়াৱ দৱকাৱ নেই । ”

প্রায় মুখোমুখি ধাক্কা লাগতে-লাগতে দুটো গাড়ি দাঁড়িয়ে গেল। উলটোদিকের গাড়ি এত জোরে ব্রেক করেছিল যে, চাকার শব্দ হল মারাত্মক। গাড়ির জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে চালক জিজ্ঞেস করল, “কী বে, মরার ইচ্ছে হয়েছে নাকি ?”

অমল সোম জবাব দিলেন, “মৃত্যু তো আপনি ডেকে এনেছিলেন ! এত ছোট রাস্তায় অত জোরে গাড়ি চালাচ্ছিলেন কেন, তার জবাব আগে দিন !”

অর্জুন ততক্ষণে চালককে চিনতে পেরেছে। জলপাইগুড়ির শিল্পসমিতি পাড়ার বরেন ঘোষালের ছোট ভাই, যে হাবুকে প্রায় চাপা দিয়ে ফেলেছিল।

॥ আট ॥

“তুমি আমাকে গাড়ি চালানো শেখাচ্ছ চাঁদু ?” অস্তুত গলায় বলল চালক।

“ব্যক্তিদের সঙ্গে তুমি এ ভাষায় কথা বলো বুঝি-ই গাড়ি সরাও নইলে একে বলব তোমার ওই টিনের বাক্সটাকে গুঁড়িয়ে দিতে। ড্রাইভার ভাই, আপনি ব্যাক করছন তো !” অমল সোমের হৃকুম হওয়া মাত্র ড্রাইভার বেশ কিছুটা পিছিয়ে নিয়ে গেল জিপসিটাকে। তারপর নিচ গলায় বলল, “ধাক্কা মারতে বলবেন না, আমি কথনও অমন কাজ করিনি।”

জিপসিটাকে পেছনে হটে গিয়ে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়াতে দেখে উলটো দিকের গাড়ির চালক অনুমান করল পরিষ্ঠিতি ভাল নয়। সে চিন্কার করল, “কী হচ্ছে এসব ? ইচ্ছে করে অ্যাকসিডেট করবেন নাকি ?”

তুমি থেকে আপনিতে ওঠায় অমল সোম ঈষৎ খুশি হলেন। তিনি গলা তুলে বললেন, “সেই রকমই ইচ্ছে আছে। বেয়াদপ বানরদের শিক্ষা দিতে আমার খুব ভাল লাগে। তবে তুমি যদি গাড়িটাকে এক পাশে সরিয়ে নিয়ে যাও, তা হলে আলাদা কথা।”

“আপনি কার সঙ্গে এসব করছেন, তা জানেন ? নীল চ্যাটার্জি আমার বন্ধু।”

“সে আবার কে ?” অমল সোম যে চমৎকার অভিনয় করতে জানেন, তা মেজের বুঝতে না পেরে ব্যাখ্যা করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ওঁকে হাত তুলতে দেখে থেমে গেলেন।

“বুঝবেন, বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে নীল চ্যাটার্জি কে ?” কথা শেব করেই ওই ছোট রাস্তাতেই গাড়িটা ঘুরিয়ে নিল চালক। তারপর একস্থান ধূলো-উড়িয়ে ছুটে চলল, যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে। ড্রাইভার বলল, “এবার নীলবাবু এসে ঝামেলা করবেন।”

“আমরা যেখানে যাচ্ছি সেই জায়গাটা প্রোটেকটেড প্লেস। ঝামেলা করতে এলে তিনি বিপদে পড়বেন। তা ছাড়া আমরা কোথায় যাচ্ছি তা জানতে তো

সময় লাগবে । ” অমল সোম তাকে আশ্বস্ত করলো । ”

চাপা গলায় মেজর বললেন, “আস্পার্ন্স দ্যাখো । ”

অর্জুন বলল, “আমেরিকায় শুনেছি অস্ক বয়সীরা এর চেয়েও খারাপ ব্যবহার করে । ”

একটু হকচকিয়ে গেলেন মেজর, “তা করে । কিন্তু আমাদের বেশ সাবধানে থাকতে হবে । এই সব চুনোপুঁটি শুণাদের আর যাই হোক বিশ্বাস করা চলে না । ” মেজর তাঁর ব্যাগটা কোলে টেনে নিলেন । যেন সেটাই তাঁর আস্তরঙ্গার অন্ত ।

অর্জুন নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, “আপনি কি সঙ্গে কোনও অস্ত্র এনেছেন ?”

দাড়ি-গোঁফের ফাঁক দিয়ে বিরাট মুখে এবার হাসি ফুটল, “সাসপেন্সে থাকো । ”

আগের গাড়িটাকে আর দেখা যাচ্ছিল না । ধূলোর ঝড়টাও মিলিয়ে গেল । কিছুটা চলার পর অমল সোম ড্রাইভারকে বললেন গাড়ি থামাতে । তারপর মুখ ফিরিয়ে অর্জুনকে ইশারা করলেন নামতে ।

মেজর জিজ্ঞেস করলেন, “এখানে আবার কী দরকার ?”

অমল সোম বললেন, “অর্জুনের সঙ্গে একটু ব্যক্তিগত কথা বলব । ”

ওরা গাড়ি দাঁড় করিয়েছিল একটা বাঁক সুরে । অমল সোমের আচরণে একটুও অবাক হয়নি অর্জুন । রাস্তার একপাশে সেগুন গাছের আড়ালে পৌঁছে অমল সোম প্রশ্ন করলেন, “আমাদের নেমে আসার উদ্দেশ্য কী বলো তো ?”

“আপনি সন্দেহ করছেন শিল্প সমিতি পাড়ার বরেন ঘোষালের ছেট ভাই আদৌ এগিয়ে যায়নি । সে রাস্তার পাশে কোথাও গাড়ি লুকিয়ে আমাদের পিছন নেবে বলে অপেক্ষা করছে । এখনই তাকে দেখা যাবে । তাই তো ?” অর্জুন উত্তর দিল ।

“গুড় ! এই কাজটা তুমি হলে করতে না ?”

“হ্যাঁ । আমার শক্তিদের ঠিকানা নিশ্চয়ই আমি জানতে চাইতাম । তবে ছেলেটাকে যে রকম নিশ্চিত দেখাচ্ছিল, তাতে ও বোধ হয় নীল চ্যাটার্জিকে সরাসরি জানাবার কথাই ভাবছে । ”

অর্জুনের অনুমানই ঠিক হল । মিনিট পনেরোর মধ্যে কোনও গাড়িকে পেছনে আসতে দেখা গেল না । অগত্যা ওরা আবার জিপসি চালু করল । এখন থেকেই একপাশে চায়ের বাগান, অন্যপাশে ফরেস্ট শুরু হয়ে গিয়েছে । ফরেস্টে ঢেকার চিহ্নিত পথে ওরা এগোল । খানিকটা যাওয়ার পর চেকপোস্ট । লোহার রড ব্যারিকেড তৈরি করেছে । পাশের ওয়াচ-রুম থেকে বনরক্ষী এগিয়ে এলে ড্রাইভার পরিচয় দিল । ডি এফ ও সাহেব যে এখানেও খবর দিয়ে রেখেছেন, তার প্রমাণ পাওয়া গেল বনরক্ষীর সন্তুষ্ট হয়ে সেলাম

করার ভঙ্গি দেখে । এখন দু'পাশে ঘন জঙ্গল আর অজন্ম পাথির চিৎকার । মাঝে-মাঝে বানরেরা রাস্তার ধারে নিলিপ্তের মতো বসে আছে ।

অমল সোম বললেন, “উত্তর বাংলায় মোট ৩১৫১ প্রজাতির উত্তিদ আছে ।”

“উত্তিদ ?” মেজর সোজা হলেন ।

“হ্যাঁ । তার মধ্যে গাছ হল ৫৪০ রকমের, গুল্ম ১৮৭৯, লতা ২১৬ আর মস, লাইকেন, ফার্ন ৫১৬ ধরনের । ঠিক একশো বছর আগে জে এম কোয়ান একটা বই লিখেছিলেন, ‘দি ট্রিস অব নদার্ন বেঙ্গল ইন্ডুডিং শ্রাব্স, উড়ি ক্লাইম্বার্স, বাস্তুস, পাম অ্যান্ড ট্রি ফার্নস ।’ তাতে তিনি ১৮৮ প্রজাতির উল্লেখ করেছিলেন ।”

মেজর জিজ্ঞেস করলেন, “কী ধরনের গাছ সংখ্যায় বেশি ?”

“শাল, নিম, কাওলা, শিশু আর গামার । এ ছাড়া খয়ের, শিরীষ, ওদাল, শিমুল, বনকাপাস, জামকেল, অমলতাস, নাগেশ্বর গাছ দেখতে পাবে । এখানে ইউক্যালিপটাস গাছ কম, কিন্তু চাপ এবং বহেড়া গাছ পরিমাণে বেশি । এদের ফলও হয় প্রচুর । তাই এদিকে জীবজন্মের আধিক্য বেশি ।” অমল সোম বললেন ।

“বাঘ আছে ?” মেজর প্রশ্ন করলেন ।

“তিনি যে আছেন, তা সুহাসিনীতে ভানু ব্যানার্জি প্রমাণ দিয়েছেন ।”

মেজর শব্দ করে হাসলেন, “তবু রক্ষে সিংহ নেই । বুঁকে অর্জুন, ওই প্রাণীটিকে আমি একদম বুঁকতে পারি না । তুমি সিংহ দেখেছ ?”

“সার্কাসে দেখেছি ।”

“কেমন সন্ধ্যাসী-সন্ধ্যাসী ভাবভঙ্গি । একবার আফ্রিকায়— ।”

“আমরা বোধহয় এসে গিয়েছি ।” অমল সোম গল্পটাকে গড়াতে দিলেন না ।

ততক্ষণে চোখের সামনে চমৎকার একটা বাংলো ভেসে উঠেছে । গাড়ির আওয়াজ পেয়েই বোধহয় একজন সুবেশ যুবক বাংলোর সামনে এসে দাঁড়াল ।

জিপসি থামতেই যুবক এগিয়ে এসে নমস্কার করল, “মিস্টার সোম ?”

অমল সোম জিপসি থেকে নেমে বললেন, “আমি ।”

“আসুন সার । বড়সাহেবে জানিয়ে দিয়েছেন আপনাদের আসার কথা । আমার নাম রঞ্জিত দস্ত, এখানকার রেঞ্জের দায়িত্বে আছি ।”

অমল সোম তাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার পর একজন আদালি ব্যাগপত্র বয়ে ভেতরে নিয়ে গেল । জিপসির ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল, “আমাকে কি দরকার আছে ?”

অমল সোম মাথা নাড়লেন, “না । কিন্তু তুমি একা ফিরবে ?”

পশ্চের অর্থ বুঁকতে পেরে ড্রাইভার বলল, “আমি লোকাল মানুষ, আমার কিছু

হবে না । আর হলে কে আটকাবে ? চলি ।”

জিপসি চলে গেলে রঞ্জিত দন্ত জিজেস করল, “কী ব্যাপার ?”

অমল সোম বললেন, “তেমন কিছু নয় ।”

দোতলায় ব্যালকনি-সমেত দুটো পাশাপাশি ঘরে থাকার ব্যবস্থা । চমৎকার আয়োজন । মেজের বললেন, “গুড় ।”

দোতলা থেকে জঙ্গলের চেহারা আরও সুন্দর দেখাচ্ছে । সামনে খানিকটা ফাঁকা জায়গা । মনে হচ্ছিল ছুটতে-ছুটতে জঙ্গল ওই ফাঁকা জায়গায় এসে হমড়ি খেয়ে পড়েছে । পাথি ডাকছে খুব । মিষ্টি একটা গন্ধ ভেসে আসছে মাঝে-মাঝে । কাঁঠালি চাঁপার গন্ধ ।

রঞ্জিত দন্ত বলল, “এই বাংলোতে একজন বাবুর্চি আর একজন আদালি চবিশ ঘন্টা থাকবে । আপনাদের যখন যা দরকার ওদের বললেই হবে ।”

গাড়ি থেকে সবজির ঝুড়ি নামানো হয়েছিল । সেদিকে তাকিয়ে রঞ্জিত বললেন, “আরে বাস, এসব আনতে গেলেন কেন ? আমি তো মাছ-মাংসের ব্যবস্থা করেছি ।”

অমল সোম বললেন, “আমাদের না লাগলে আপনার সংসারে লাগতে পারে ।”

“আমি সার একা । কলকাতার ছেলে, জঙ্গলের চাকরি নিয়ে এখন আর শহরে ফিরতে ইচ্ছে হয় না । আপনারা চা খাবেন ?”

অমল সোম কাঁধ নাচালেন, তারপর পাশের ঘরে চুকে গেলেন । রঞ্জিত দন্ত ইশারা করতেই আদালি নীচে নেমে গেল । অর্জুন জিজেস করল, “আপনি কতদুরে থাকেন ?”

“হাফ কিলোমিটার দূরে । এদিকে এখন হাতির উৎপাত বেশি ।”

“কেন ?” মেজের মুখ খুললেন ।

“এই সময়টা ওরা আশেপাশের গ্রামে হানা দেয় খাবারের জন্যে । কেউ কেউ এই বাংলোর সামনে চলে আসে কিছু পাওয়া যাবে বলে । মনে হয় ওদের দর্শন আপনারা পেয়ে যাবেন দু-এক দিন থাকলেই ।” রঞ্জিত দন্ত মাথা নাড়ল ।

“আপনি আফ্রিকান হাতি দেখেছেন ?” আচমকা মেজের প্রশ্ন করলেন ।

“না ।” হকচকিয়ে গেলেন রঞ্জিত দন্ত ।

“তাদের কাছে ভারতীয় হাতিকে শিশু মনে হবে । বাই দ্যা বাই, মিস্টার দন্ত, আপনি যখন এখানকার রেঞ্জার, তখন নিশ্চয়ই আপনার কাছে জঙ্গলের একটা ম্যাপ পাওয়া যাবে ।”

রঞ্জিত দন্ত বললেন, “ম্যাপ আছে, তবে সেটা দেখতে আমার অফিসে আপনাকে যেতে হবে । দেওয়ালে টাঙ্গানো তো, খুলে আনা যাবে না ।”

“আপনি এখানে কতদিন আছেন ?”

“আট মাস ।”

“এই জঙ্গলের কোনও রহস্যময় বস্তু, যেমন ধরুন, গাছপালা, পশুপাখি, ফুল, এসবের সঞ্চান পেয়েছেন ?” মেজর এমন ভাবে প্রশ্ন করলেন যে অর্জুন বুঝাল তিনি আসল উদ্দেশ্য প্রকাশ করতে চান না ।

রঞ্জিত দন্ত মাথা নাড়লেন, “সত্যি কথা বলতে কী এখন জঙ্গল তার সমস্ত রহস্য হারিয়েছে । তবে আমরা একটা হরিণের বাচ্চা পেয়েছিলাম যার চামড়া দেখলে মনে হবে নেকড়ে বা শেয়াল জাতীয় কোনও প্রাণীর ।”

মাথা নাড়লেন মেজর, “এমন কোনও ফুলের সঞ্চান পাননি, যার গন্ধ নাকে গেলে মানুষ মরে যেতে পারে । কিলার ফ্লাওয়ার !”

রঞ্জিত দন্ত মাথা নেড়ে ‘না’ বললেন ।

“আপনি সমস্ত জঙ্গল চৰে দেখেছেন ?”

“সেটা কি সম্ভব ?” হঠাৎ মনে পড়ে গিয়েছে এমন ভঙ্গিতে রঞ্জিত দন্ত বললেন, “অবশ্য ঘূম থেকে সান্দাকফু যাওয়ার পথে বিকেভঞ্জন নামে একটা জায়গার কথা শুনেছি । সেখানে খানিকটা জায়গা জুড়ে যখন ফুল ফোটে, তখন বাতাসে অঙ্গিজেন কমে যায় । ওই ফুল নাকি অঙ্গিজেন শৈবে নেয় । ফুলটার নাম লোকেতি ।”

“লোকেতি ?”

“হ্যাঁ ।”

“আচ্ছা মিস্টার দন্ত, আপনার এই জঙ্গলে স্বাধীনভাবে ঘোরাঘুরি করা যাবে ?”

“না করাটাই ভাল । হঠাৎ যদি কোনও হিংস্র জন্তুর সামনে পড়ে যান, তা হলে বিপদ হবে । আপনারা যখন ঘূরতে চান বলবেন, আমি সঙ্গে গার্ড দিয়ে দেব । আচ্ছা, আমি কি এখন একটু অফিসে যেতে পারি, অনেক কাজ ফেলে এসেছি ।” সবিনয়ে বললেন রঞ্জিত দন্ত । মেজর তৎক্ষণাত মাথা নাড়লেন । ভদ্রলোক একবার অমল সোমের ঘরের দিকে তাকিয়ে নীচে নেমে গেলেন । একটু পরে তাঁকে সাইকেলে চেপে উলটো দিকের জঙ্গলে মিলিয়ে যেতে দেখা গেল । আধ কিলোমিটার দূরত্ব এমন কিছু বেশি নয় ।

অমল সোম তাঁর ঘরে বসেই চা খেলেন । বারান্দার বেতের চেয়ারে বসে মেজর বললেন, “আমি লক্ষ করেছি অর্জুন, তোমার দাদার মধ্যে একটুও রোমান্টিক ব্যাপার নেই । এই জঙ্গলে এসে কেউ কি ঘরে বসে থাকে ? আমার ইচ্ছে করছে এখনই বেরিয়ে পড়ি ।”

“যাবেন ?”

“যেতে পারি । তবে প্রথম দিন তো, বেশিদূর না যাওয়াই ভাল । ওই রেঞ্জার ছোকরার অফিস থেকে ঘূরে আসা যাক । ম্যাপটা নোট করে নেওয়া যাবে ।” মেজর উঠে দাঁড়ালেন ।

বেরোবার আগে অর্জুন অমল সোমের দরজায় যেতে তিনি বললেন, “ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে ঘুরে এসো !”

অমল সোম শুয়েছিলেন চোখ বন্ধ করে। একটু আগেও ওঁকে যখন অসুস্থ বলে মনে হয়নি, তখন এভাবে শুয়ে থাকা বিশ্বয়ের।

নীচে নেমে মেজর বললেন, “সাসপেন্স এবার ভাঙি ?”

অর্জুনের খেয়াল ছিল না। সে জিজ্ঞেস করল। “কোন সাসপেন্স ?”

“বাঃ, তখন তুমি জিজ্ঞেস করলে না, আমি সঙ্গে কোনও অন্ত্র এনেছি কিনা ?”

অর্জুনের মনে পড়ল। মেজর বললেন, “জঙ্গলে ঢুকতে হবে বলে আমি তৈরি হয়েই এসেছি। চলো, আর একটু এগিয়ে যাই, আদালিটা বারান্দা থেকে আমাদের লক্ষ করছে।”

অর্জুন মুখ ঘুরিয়ে দেখল লোকটাকে। আদৌ কোনও মতলব আছে বলে মনে হল না। গাড়ি চলার পথ ছেড়ে মেজর জঙ্গলে ঢুকলেন। গা ছাড়া-ছাড়া গাছগাছালি। পাতা মাড়িয়ে হাঁটা যায়। অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “এখানে ঢুকলেন কেন ?”

“গায়ের পাশে গাছ না থাকলে জঙ্গলে হাঁটার থিম থাকে না। কাঠঠোকরা ডাকছে শুনতে পাচ্ছ ? কী রকম একটা ছদ্ম আছে। গুড়। হাঁ, এইবার দ্যাখো।” মেজর বুক পকেট থেকে একটা কলম বের করলেন। মোটা ডট পেন।

“এটা কী ?”

“কলম।”

“ঠিকই, কিন্তু এ কলম সে কলম নয়। দাঁড়াও।” মেজর মুখ ঘুরিয়ে চারপাশে তাকালেন। হতাশ হয়ে বললেন, “সব নিরীহ পাখি। আরও একটু চলো।”

কিছুক্ষণ হাঁটার পর গাছের পাতায় সরসর শব্দ বাজল। ওরা দাঁড়িয়ে দেখার চেষ্টা করল। পাতার স্তুপ রয়েছে যেখানে, শব্দটা সেই স্তুপের মধ্যে চুকে পড়েছে। মেজর ফিসফিস করে বললেন, “এই কলমে টর্চের মতো একটা সুইচ আছে দেখতে পাচ্ছ ?”

“হ্যাঁ।”

“এবার ওই পাতাগুলোর দিকে টিপ করে সুইচটা টিপলাম।” কথা বলা মাত্র মেজরের আঙুল সুইচটাকে সরাতেই পাতাগুলোয় আগুন জলে উঠল। সঙ্গে-সঙ্গে একটা বড়সড় গিরণিটি লাফিয়ে উঠেই পড়ে গেল আগুনে।

মেজর বললেন, “স্যারি। আমি সাপ ভেবেছিলাম।”

পাতাগুলো জলছিল। অর্জুন দ্রুত এগিয়ে গিয়ে সেটাকে নেভাবার চেষ্টা করল। মেজর এসে পা লাগাতে আগুন নিভে গেল। এখন উৎকট ধোঁয়া

চারপাশে ছড়াচ্ছে । অর্জুন বলল, “সাঞ্চাতিক জিনিস তো !”

“হ্যাঁ হে । আমার বস্তু মাইকেল এটা উপহার দিয়েছে । এর রেঞ্জ কম-সে-কম কুড়ি মিটার । পুরো টিপলে একটা হাতির শরীরের অনেকটা জলে যাবে । অথচ পকেটে রাখলে কেউ বুঝতেই পারবে না এটা কী বস্তু । একবার ট্রাই করবে মাকি ৰ ?”

“না । দেখলাম তো । চলুন, আলো পড়ে আসছে ।”

ওরা জঙ্গলের ভেতর দিয়ে চলছিল । হঠাৎ গাড়ির আওয়াজ কানে এল । তারপরেই বোঝা গেল ওটা গাড়ি নয়, মোটর বাইক । বেশ জোরে বাইকটা ছুটে গেল পাশ দিয়ে । যেহেতু ওরা জঙ্গলের খানিকটা ভেতরে দাঁড়িয়েছিল, তাই মোটরবাইকের আরোহীর নজরে পড়েনি । আবার একইভাবে লোকটির পরিষ্কার চেহারা তাদেরও নজরে আসেনি ।

মেজর বললেন, “জঙ্গলের ভেতর এমন উৎকৃষ্ট শব্দ করে বাইক চালাচ্ছে, ওর পানিশমেন্ট হওয়া উচিত । ননসেন্স ।”

কিছুদূর যাওয়ার পর ওরা গাছ-ভাঙার শব্দ পেল । এবং তারপরেই ক্যানেস্টারো বাজার আওয়াজ । বেশ কিছু লোক একসঙ্গে চেঁচাচ্ছে । অর্জুন মেজরের হাত ধরল, “ফিরে চলুন ।”

“কেন ?”

“মনে হচ্ছে কোনও বন্যজন্তু এদিকে এসে পড়েছে । আর না এগোনোই ভাল ।”

সঙ্গে-সঙ্গে মেজর জঙ্গল ছেড়ে রাস্তায় পা বাঢ়ালেন । শব্দটা ওদিকে হচ্ছে খুব । এবার পটকা ফাটতে লাগল । আর তার পরেই অর্জুন দেখতে পেল ওদের । গোটা তিনেক হাতি জঙ্গল ছেড়ে এসে দাঁড়িয়েছে রেঞ্জারের অফিসে যাওয়ার পথে । অন্তত একশো গজ দূরে দাঁড়িয়ে তাদের দেখছে একরোখা ভঙ্গিতে ।

মেজর বললেন, “বিউটিফুল । কী অহঙ্কারী ভঙ্গি । ক্যামেরা আনা উচিত ছিল ।”

আর তখনই একটা লোক পাশের গাছপালার মধ্যে দিয়ে ছিটকে রাস্তায় উঠে চিৎকার করে বলল, “পালাও, পালাও, হাতি বেরিয়েছে ।”

লোকটাকে বাংলোর দিকে ছুটতে দেখে ওরাও দৌড়ল । মেজর ভারী শরীর নিয়ে তাল রাখতে পারছিলেন না । সামনে, ছোটা লোকটাকে ছুটতে ছুটতে অর্জুন লক্ষ করছিল । ওর শার্ট ছিড়ে গেছে । পায়ে জুতো রয়েছে একপাটি । পাম্প-শুয় গোছের । ডান হাত থেকে রক্ত পড়ছে । নির্বাত লোকটার অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে ।

বাংলোর কাছাকাছি পৌঁছে ধপ্ত করে বসে পড়ল লোকটা । অর্জুন দৌড় থামিয়ে ওর পাশে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, “কী হয়েছে ?”

“মরে গিয়েছিলাম। জোর বেঁচে গিয়েছি আজ। ওরে বাবা, সাক্ষাৎ যম।”
হাঁপাতে হাঁপাতে কথাগুলো বলে ঘাস্তিল লোকটা।

“আপনি হাতিদের সামনে গেলেন কেন?”

“কী করে জানব ওরা বাঁকের আড়ালে আছে? উঃ, কী যন্ত্রণা হচ্ছে হাতটায়। বাইকে স্পিড ছিল, ব্রেক ক্ষয়তে ক্ষয়তে একেবারে ওদের সামনে আছড়ে পড়েছি। একটা শুঁড় দিয়ে মারতে আমি ছিটকে প্রাণ নিয়ে দৌড়ালাম জঙ্গলের ভেতরে। বাইকটা শেষ হয়ে গিয়েছে। ওরে বাবা!” লোকটা কাতরাতে লাগল।

অর্জুন ওকে বাঁচলোয় তুলে নিয়ে এল। সঙ্গে ফার্স্ট এইড বক্স সব সময় রাখেন অমল সোম। লোকটিকে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিতে দিতে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, “মেজর কোথায়?”

অর্জুনের মনে পড়ল। সতি তো! মেজর তো তার পেছনে ছুটে আসছিলেন। কোথায় গেলেন তিনি? বুকের ভেতর হাতুড়ির শব্দ শুরু হয়ে গেল অর্জুনের।

॥ নয় ॥

অন্তুত শব্দটা কানে আসতেই মেজর দাঁড়িয়ে গেলেন। শব্দটা অনেকটা শিস্ট-এর মতো। একটানা কিছুক্ষণ বেজে থেমে যাচ্ছে। পৃথিবীর অনেক জঙ্গলে মেজর ঘুরেছেন। সে-তুলনায় ডুয়ার্সের এই জঙ্গল কিছুই নয়। গাছগুলো তেমন ঘন নয়, হিংস্র প্রাণী নেই বললেই চলে। নেহাত কপালে লেখা না থাকলে বুড়ো বাঘ বা গণ্ডারের দর্শন পাওয়া যায় না। অর্জুনের সঙ্গে দৌড়তে দৌড়তে আছাড় থেয়ে পড়েছিলেন তিনি। ভেবেছিলেন হাত পা ভেঙেছে। কিছুই হয়নি তৈর পেয়ে মনে হল জঙ্গলটা একবার দেখে নেওয়া যাক। এই জঙ্গলের কোনও এক বিশেষ জ্যাগায় সেই বিষফুল ফোটে। অর্জুন বা অমল সোমের আগে যদি তিনি সেটা আবিক্ষার করতে পারেন, তা হলে তাঁর খ্যাতি বাঢ়বে। জঙ্গলের ভেতর গাড়ি চলার পথ ধরে দুর্বত্তরা এখন যতই ছোটাছুটি করুক, তার নাগাল পাবে না।

শিসের আওয়াজ লক্ষ করে মেজর এগোলেন। শব্দটা বাড়ছে, স্পষ্ট হচ্ছে, অর্থাৎ কাছাকাছি শব্দের উৎস আছে। মেজর সতর্ক হলেন। পায়ের তলায় বুনো ঘাস আর শুকনো পাতার ছড়াছড়ি। হঠাৎ শব্দটা থেমে গেল। যেন তাকে দেখতে পেয়েই থামল। মেজর স্থির হয়ে দাঁড়ালেন। হঠাৎ বাটপট শব্দ হল। একটা ছোট হরিণ ছুটতে-ছুটতে গাছের নিচে এসে দাঁড়াল। মেজরের মাত্র হাত-আটকে দূরে দাঁড়িয়ে সে অবাক চেখে তাকাল। বড় মায়া হল ওকে দেখে। একটা কালো গাছের গুঁড়ির পাশে হরিণটা দাঁড়িয়ে তাঁকে দেখছে।

মেজর জিভে শব্দ করতেই হরিণটা গাছের দিকে সরে গেল। এবং তখনই ঘটনাটা ঘটে গেল। গাছের শরীর আচমকা চওড়া হয়ে হরিণটাকে ঢেকে ফেলল। ছেট্ট প্রাণীটির শরীর মুহূর্তেই কালো হয়ে গেল। একটু বাটপটানির সময় বিছিন্ন হল গাছ কিন্তু সেটা কয়েক মুহূর্তের জন্য, আবার তা জোড়া লেগে গেল গাছের গায়ে। শুধু গুঁড়ির কাছটা ফুলে রইল হরিণের শরীরের জন্য। এরকম বিস্ময়কর ব্যাপার এই জঙ্গলে ঘটতে পারে, মেজর কল্পনাও করেননি। শুধু এই জঙ্গল কেন, পৃথিবীর কোথাও কোনও গাছ শরীর বাড়িয়ে হরিণের বাচ্চাকে খেয়ে নিতে পারে তা কেউ কি কখনও বিশ্বাস করবে? বাটপটানির সময় গাছ যখন বিছিন্ন হয়েছিল, তখন অংশটিকে কয়েক মুহূর্তের জন্যে নড়তে দেখেছিলেন তিনি। এখনও মনে হচ্ছে জায়গাটা নড়ছে। পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে দূরত্ব রেখে দাঁড়িয়ে তাঁর চোখ চড়ক গাছ হয়ে গেল। গাছ নয়। গুঁড়িটার অনেকটা জুড়ে রয়েছে বিশাল বিশাল কালো পিংপড়ে। গায়ে গায়ে এমন চাপ বেঁধে রয়েছে, সামান্য দূর থেকেও তাদের আলাদা করে চেনা যাচ্ছে না। মাংসখেকো পিংপড়ে। এদেরই এক স্বজাতি আফ্রিকার জঙ্গলে কয়েক ঘন্টার মধ্যে একটা হাতির বাচ্চাকে সাবাড় করে দিতে পারে। কিন্তু তারা থাকে ঢিবির মধ্যে লুকিয়ে। এভাবে গাছের শরীরে লেপ্টে ঝুলে থেকে শিকারের জন্য অপেক্ষা করার বুদ্ধি তাদের নেই। যত ছেট্ট হোক হরিণটা পিংপড়েগুলোকে নিয়ে ছুটে দূরে চলে যেতে পারল না। অর্থাৎ চটজলদি মেরে ফেলার কায়দা পিংপড়েগুলো জানে। এখন দল বেঁধে হরিণটাকে খেয়ে নিচ্ছে ওরা। হয়তো আগামী কাল কিছু হাড় খুঁজে পাওয়া যাবে ওখানে। মেজর গাছটার আশপাশে কোনও পুরনো হাড় দেখতে পেলেন না। তিনি কুমালে মুখ মুছলেন। হরিণটার বদলে তিনি যদি গাছটার পাশে দাঁড়িয়ে বিশ্রাম নিতেন? পিংপড়ের বিষ যদি তাঁকে অসাড় করে দিত, তা হলে তিনি কিছুই করতে পারতেন না। অর্জুনরা হাড়গোড় দেখে কি তাকে চিনতে পারত!

সন্তুষ্পণে জায়গাটা এড়ালেন তিনি। এমন তো হতেই পারে, পিংপড়েগুলো এক জায়গায় রোজ থাকে না। খানিকটা যাওয়ার পর একটা পরিষ্কার গাছের গোড়ায় কিছু হাড় পড়ে থাকতে দেখে তাঁর ধারণা সত্যি বলে প্রমাণ পেলেন। তিনি ঠিক করলেন, কাল সকালে ক্যামেরা নিয়ে এসে ছবি তুলবেন এবং একটা শিশিতে কয়েকটা জ্যাণ্ট পিংপড় ধরে নিয়ে যাবেন প্রমাণ হিসেবে।

বিকেল ফুরিয়ে যাচ্ছে। জঙ্গলে অঙ্ককার খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। মেজর বুরুলেন এবার তাঁকে ফিরতে হবে। যত হালকা জঙ্গলই হোক না কেন, রাত মামলে তার চেহারা বদলে যায়। কিন্তু কিছুটা-পথ হাঁটার পর তাঁর মনে হল, বাংলোর দিকে তিনি যাচ্ছেন না। তখন কোন পথে এদিকে চলে এসেছেন তা যেন ঠাওর করতে পারছেন না। এবং তখনই তিনি ডালপালা ভাঙার শব্দ পেলেন। দিনের আলো তখন নিভু-নিভু। অভিজ্ঞতা থেকে মেজর বুরুলেন,

ওই শব্দ হাতি কিংবা বাইসন ছাড়া কেউ করতে পারে না । এই জঙ্গলে গন্ধার আছে কি না জানা নেই, তবে তাদের চরিত্র তাঁর জানা নেই । তিনি দোড়াতে লাগলেন ।

ভারী শরীর নিয়ে কিছুক্ষণ ছোটার পর দম নেওয়ার জন্য দাঁড়ালেন মেজের । এই জঙ্গলে দ্রুত ছোটাও সম্ভব নয় । কিন্তু এতেই তাকে জোরে জোরে নিখাস নিতে হচ্ছিল । সেটা স্বাভাবিক হতে-না-হতেই অঙ্গুত একটা মিষ্টি গন্ধ নাকে এল । সঙ্গে-সঙ্গে মেজেরে মাথা বিমর্শিম করতে লাগল । শরীরে সেই ভাবটা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল । মেজের দ্রুত পিছু হটতে লাগলেন । যখন গন্ধটা আর নাকে নেই, তখন উবু হয়ে বসে পড়লেন তিনি ।

এখন চারপাশে পাথির চিৎকার ছাড়া কোনও শব্দ নেই । ধাতঙ্গ হতে বেশ কিছুটা সময় লাগল । উঠে দাঁড়িয়ে মেজের উত্তেজিত হলেন । তাঁর মনে হল তিনি পেয়ে গেছেন । যে-খবর বিদেশি কাগজে ছাপা হয়েছিল, তা মিথ্যে নয় । ওই গবেষণার বৃত্ত থেকে তিনি যদি সরে না আসতেন, তা হলে তাঁর মৃতদেহ আজ রাত্রেই জানোয়ারের খাবার হয়ে যেত । ওই বিষফুল অবশ্যই ওখানে আছে । তিনি জায়গাটা চেনার চেষ্টা করলেন । অঙ্ককার এখন বেশ জমাট । তবু একটা পত্রহীন গাছকে তিনি চিহ্ন হিসেবে ঠিক করলেন । কাল দিনের আলো ফুটলেই এদিকে চলে আসতে হবে । মেজের পা বাড়ালেন ।

রেঞ্জার ততক্ষণে লোকজন জোগাড় করে ফেলেছেন । আহত লোকটিকে হতিমধ্যে ফরেস্ট অফিসে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে । সেখান থেকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়ার কথা । রেঞ্জার স্বীকার করলেন মাঝে-মাঝেই দুর্ব্বলুরা জঙ্গলে হানা দেয় । তাদের হাতে এত আধুনিক অস্ত্র থাকে যে বাধা দেওয়ার সাহস তাঁরা পান না । আর এই লোকগুলোর পেছনে এদিকের কিছু ক্ষমতাবান মানুষ আছেন বলেই পুলিশও তেমন সক্রিয় নয় ।

কিন্তু মেজেরে সন্ধানে তখনই একটা “অভিযান সংগঠিত করতে তৎপর হয়েছেন রেঞ্জার । জঙ্গলে ভয়াবহ ঘটনা যে ঘটবে না, তা কেউ জোর দিয়ে বলতে পারে না । অর্জুন খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছিল সঙ্গে নামতেই । রাত্রে মেজেরের পক্ষে পথ চিনে আসা আরও দুরহ হবে । অমল সোম গভীর হয়ে বেতের চেয়ারে বসেছিলেন, আহত লোকটিকে অনেক জেরা করেও তিনি জানতে পারেননি মোটর সাইকেল আরোহীর পরিচয় কী ! কেন এসেছিল ! লোকটা ঠোঁট চিপে যন্ত্রণার ভান করে গিয়েছে । অমল সোম বুঝেছেন ওটা ভানই, কারণ লোকটা খুব বেশি আহত হয়নি । এখানে এসেই নীল চ্যাটার্জির সঙ্গে বিরোধে যেতে হবে তিনি ভাবেননি । এই সব ফালতু ঝামেলা তাঁকে আসল কাজ করতে দেবে না ।

তিনি রেঞ্জারকে জিজ্ঞেস করলেন, “নিম টি এস্টেট এখান থেকে কতদূর ?”

“মাইল দশেক ।”

“আগামী কাল সকালে সেখানে যাওয়া যাবে ?”

“নিশ্চয়ই । কাউকে খবর পাঠাতে হবে ?”

“পাঠানো ভদ্রতা । মিসেস ব্যানার্জি নামে এক ভদ্রমহিলা বোধ হয় ওই চা-বাগানের মালিক । আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাই ।”—অমল সোম বললেন ।

ঠিক এইসময় জঙ্গলের ভেতর গাড়ির আওয়াজ পাওয়া গেল । সঙ্গে নেমে গেলে শুধু সরকারি অফিসার ছাড়া গাড়ি নিয়ে জঙ্গলে কেউ আসেন না । ঢোকার ব্যাপারে বিধিনিষেধ রয়েছে । রেঞ্জার উৎসুক হয়ে তাকালেন । তি এফ ও সাহেবে আসতে পারেন ।

কিন্তু বাঁক ঘুরে যে গাড়িদুটোকে আসতে দেখা গেল, তার প্রথমটা নীল জিপসি । গাড়ি দুটো দাঁড়িয়ে গেল বাংলোর সামনে । দরজা খুলে ড্রাইভার চিন্কার করে উঠল, “অ্যাই, কে আছিস ? সামনে আয় ।”

অর্জুন উঠে দাঁড়াচ্ছিল, তাকে ইশারায় বসতে বলে রেঞ্জার এগিয়ে গেলেন, “বলুন ।”

“ও তুমি এখানে । তা চাঁদু, হঠাৎ ডানা গজাল কেন ?”

“আমি আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না ।”

“বোঝাব । যে লোকগুলো আজ এসেছে, তারা কোথায় ?”

“ওঁরা আমাদের বড় সাহেবের গেস্ট ।”

“গোস্ট করে ছেড়ে দেব ।” নীল চ্যাটার্জি চিন্কার করল, “অ্যাই ! বেরিয়ে আয় ।”

অমল সোম উঠে রেলিংয়ের পাশে দাঁড়ালেন ।

“শোন ! এই এলাকা আমার । এখানে থাকতে হলে আমার কথা শুনে চলতে হবে । নতুন লোকদের প্রথমবার আমি একটা সুযোগ দিই । এর পর কেউ যদি আমার কোন লোককে অপমান করে, তা হলে তাকে এমন শাস্তি দেব যে, বাছাধন উঠে দাঁড়াতে পারবে না । কান খাড়া করে শুনে নে তোরা । অ্যাই রেঞ্জার, আমার লোকটা কোথায় ?”

“তাকে ফরেস্ট অফিসে রাখা হয়েছে ।”

নীল চ্যাটার্জি ইশারা করতে পেছনের গাড়িটা বেরিয়ে গেল । ওই গাড়ি যে জলপাইগুড়ির বরেন ঘোষালের ছেট ভাই চালাচ্ছে, তা বুঝতে অসুবিধে হল না । এবার নীল জিজ্ঞেস করল, “এখানে কেন আসা হয়েছে ?”

সম্মোধন তুই থেকে তুমিতে উঠল । অমল সোম কোনও জবাব দিলেন না । রেঞ্জার বললেন, “বেড়াতে । বললাম তো বড়সাহেবের গেস্ট ওঁরা ।”

“বেড়ানোর আর জায়গা পেল না । আমার সঙ্গে যারা লাগে, তাদের প্রথমবার সতর্ক করি । দ্বিতীয়বারে ঠাকুর্দার নাম ভুলিয়ে দিই । তৃতীয়বারে

বাবার নাম আর চতুর্থবার নিজের। প্রথমবার হয়ে গেল আজ।” গাড়িতে উঠে বসল নীল চ্যাটার্জি। তারপর গাড়ি ঘূরিয়ে যেমন এসেছিল তেমন বেরিয়ে গেল।

রেঞ্জার উঠে এল ওপরে, “সবি স্যর। বুঝতেই পারছেন কী অবস্থায় আছি।”

অমল সোম বললেন, “ছেলেটা আপনার সঙ্গে ওইরকম ব্যবহার করল, আপনি কিছু বলতে সাহস পেলেন না। একজন সরকারি কর্মচারী হিসেবে আপনি কি কিছুই করতে পারেন না?”

“আমি বড়সাহেবকে বলেছি। থানায় জানানো হয়েছে। কিন্তু থানা যদি অ্যাকশন না নেয়, তা হলে তো আমরা অসহায়। শুধু-শুধু আপনাকেও অপমান করে গেল, বড়সাহেব জানলে আমার মুখ দেখানোর উপায় থাকবে না।” রেঞ্জারকে দুঃখিত দেখাচ্ছিল।

এবার অর্জুন কথা বলল, “অমলদা, আপনি কেন চুপ করে রইলেন?”

“কথা বলার সময় তখন ছিল না, অর্জুন। উদ্যাদের হাতে অন্ত্র থাকলে তাকে এড়িয়ে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। যাক, ওরা যে-জন্যে এসেছিল তা সফল হল।” অমলদার দৃষ্টি লক্ষ করে ওরা দেখল দ্বিতীয় গাড়িটা বাংলোর সামনে দিয়ে দুত চলে গেল। অর্জুন বলল, “লোকটাকে নিয়ে গেল?”

“সেটাই তো স্বাভাবিক।” অমল সোম বললেন।

“সার, আপনি নিম টি-এস্টেটে যেতে চাইছিলেন, ওখানেই নীলবাবু থাকেন।”

“ঠিকই। সেজন্যেই যাচ্ছি।” অমল সোম বললেন, “আর দেরি করবেন না, বেরিয়ে পড়ুন।”

বাংলোর বাইরে এখন ঘন অঙ্ককার। গোটাদুয়েক টর্চ, চারজন বনকর্মী, যাদের হাতে অন্ত্র বলতে লাঠি, জঙ্গলে চুকল। অর্জুন রেঞ্জারের সঙ্গে হাঁটছিল।

অর্জুন বলল, “লোকটা ওই রকম অসভ্য ব্যবহার সবার সঙ্গে করে?”

“হ্যাঁ। তবে যেখানে স্বার্থ থাকে, সেখানে যথেষ্ট ভদ্রলোক। আসলে কী করে জানি না ও’ কয়েক বছরের মধ্যে প্রচণ্ড প্রভাবশালী হয়ে পড়েছে। কেউ ঘাটাতে সাহস পায় না। চাকরির জন্যে আমি এই বনবাদাড়ে পড়ে আছি। ও ইচ্ছে করলে আমার বারোটা বাজিয়ে দিতে পারে।”

“নীল চ্যাটার্জি কি শুধু চায়ের ব্যবসাই করে?”

“ওর যে কীসের ব্যবসা নেই, সেটাই বোৰা মুশকিল।”

রেঞ্জারের নির্দেশে কর্মীরা টিক্কার করতে লাগল। টর্চের আলো গাছেদের গায়ে-গায়ে ধাক্কা খাচ্ছিল। অর্জুন টিক্কার করল, “মেজর! মেজর! শুনছেন?”

কিন্তু কোনও সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল না ।

হঠাতেই গাছের আড়াল থেকে একটা লোক বেরিয়ে এল । টর্চের আলো তার ওপর পড়তেই লোকটা চট করে আড়ালে চলে গেল । রেঞ্জার চিন্কার করলেন, “কে ওখানে ?”

গলা ভেসে এল, “আপনারা যাকে খুঁজছেন, তিনি বোধ হয় ওপাশের গর্তে পড়ে আছেন ।”

“তুমি কে ?” রেঞ্জার ধমকে উঠলেন ।

কোনও উত্তর এল না । রেঞ্জার কর্মীদের হৃকুম দিলেন, “ধরো তো লোকটাকে ।”

কিন্তু টর্চের আলোয় লোকটাকে খুঁজে পাওয়া গেল না । রাতের অন্ধকারে কাছাকাছি গা-ঢাকা দিয়ে থাকলেও হদিস পাওয়া সম্ভব নয় । লোকটা জঙ্গলে আনাড়ি নয় ।

রেঞ্জার বলল, “অদ্ভুত ব্যাপার ! অন্ধকারে চিনতে পারলাম না, কিন্তু রাত-বিরেতে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানোর মতো লোক তো এই অঞ্চলে নেই ।”

অর্জুনের মাথায় তখন মেজরের চিন্তা । সে রেঞ্জারকে বলতেই মেজরকে খুঁজে বের করতে আর সময় লাগল না । শুকনো পাতায় ভর্তি একটা গর্তে মেজর পাশ ফিরে শুয়ে আছেন, টর্চের আলোয় মনে হচ্ছিল আরামে ঘুমোচ্ছেন । কিন্তু তিনি যে অজ্ঞান হয়ে আছেন, সেটা টের পেতে দেরি হল না । বনকর্মীরা ধরাধরি করে ওঁকে বের করে নিয়ে এলেন । অর্জুন মুখের কাছে হাত নিয়ে গিয়ে বুবাল নিঃশ্বাস পড়ছে ।

বিস্তর ডাকাডাকির পর মেজর চোখ খুললেন । কিন্তু তাঁর কথা বলার সামর্থ্য ছিল না । বনকর্মীদের সাহায্যে ওঁকে জঙ্গল থেকে বের করে নিয়ে আসা হল । বাংলোর বিছানায় শুইয়ে দেওয়ার পর অর্জুন জিঞ্জেস করল, “এখানে ডাক্তার পাওয়া যাবে না ?”

রেঞ্জার বললেন, “আশেপাশের প্রতিটি চা-বাগানে একজন করে ডাক্তার আছেন, কিন্তু এই রাত্রে তাঁরা কেউই আসবেন না । আপনি যদি চান, তা হলে গাড়ি বের করে ওঁকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে পারি । শরীরে কোনও ক্ষতিচিহ্ন নেই, কিন্তু হলে হাট্টের ব্যাপার হতে পারে ।”

অমল সোম বিছানার পাশে এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন । বললেন, “একটু দেখি !”

তিনি ওঁর নাড়ি পরীক্ষা করলেন । তারপর জিঞ্জেস করলেন, “খুব দুর্বল লাগছে ?”

মেজর কোনওমতে শব্দ উচ্চারণ করতে পারলেন, “হ্যাঁ !”

অমল সোম অর্জুনকে বললেন, “একটু গরম দুধ খাইয়ে দিলে কাজ হতে পারে ।”

গরম দুধ পেতে অসুবিধা হল না। বাবুর্চি স্টো এনে দিতে অর্জুন একটু একটু করে মেজরকে থাইয়ে দিল। অমল সোম বললেন, “ওকে এবার ঘুমোতে দাও।”

একজনকে অপেক্ষা করতে বলে রেঞ্জার বাকি বনকর্মীদের ছেড়ে দিলেন। দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে রেঞ্জার বললেন, “অস্তুত ব্যাপার ঘটছে আজ। তদ্বলোক অজ্ঞান হয়ে পড়ে রইলেন আর সেই খবরটা দিয়ে গেল ভূতের মতো একজন। না হয় বুঝলাম চুরিটুরির ধান্দায় লোকটা জঙ্গলে চুকেছিল। কিন্তু আমাদের খবর দেওয়ার গরজ তো হওয়া উচিত নয়।”

অমল সোম বললেন, “হ্যাঁ। এই ব্যাপারটা অস্তুত। তবে অপরাধীদের মনেও মাঝে মাঝে বিবেক জেগে ওঠে। জেল পালানো অথবা গ্রেপ্তার এড়ানো অপরাধীদের কাছে এই জঙ্গল তো লুকিয়ে থাকার পক্ষে দারুণ।”

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “কিন্তু মেজর তো অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার মতো ভীরুন।”

“স্টো উনি জেগে না উঠলে বোবা যাবে না। যাক, আজ অনেক হয়েছে। এবার খেয়ে নাও। রেঞ্জারসাহেবে, আপনিও এখানে খেয়ে নেবেন নাকি?”

রেঞ্জার আপন্তি জানালেন, “না, না। আমি এবার চলি। বাবুর্চি, সাহেবদের খানা লাগাও।” বাবুর্চি বারান্দার এককোণে দাঁড়িয়ে ছিল, আদেশ পাওয়া মাত্র মীচে নেমে গেল।

রেঞ্জার বললেন, “কাল সকাল আটটায় গাড়ি পাঠাব?”

“বেশ।” অমল সোম মাথা নাড়লেন।

ঠিক তখনই চিংকার শোনা গেল। বাবুর্চি চেঁচাচ্ছে। রেঞ্জারের পেছন পেছন ছুটে গেল অর্জুন। কিচেনের দরজা খোলা। বাবুর্চি তাদের দেখে হাউমাউ করে বলল, “কোই আদমি খানা চুরি কিয়া সাব। সবজি আউর রোটি লে লিয়া।”

কিচেনের পেছন দিকের জানলা খোলা। রেঞ্জার জানলা দিয়ে টর্চের আলো ফেলতে কাউকে দেখা গেল না। একচিলতে মাঠ, মাঠের পর জঙ্গল।

বাবুর্চি যে পাত্রে রুটি রেখেছিল, তার ঢাকনা একপাশে পড়ে আছে। অর্ধেক রুটি নেই, সঙ্গে নেই সবজির বড় বাটি। অর্থাৎ চিকেনে হাত দেয়নি চোর।

রেঞ্জার বললেন, “কেউ যদি খাবার চুরি করতে আসে, তা হলে আগে চিকেন নেবে। এ কী ধরনের চোর? তুমি দরজা বন্ধ করে যাওনি?”

“হ্যাঁ সাব। তালা নেহি দিয়া।”

“ঠিক আছে। যা আছে তাই সাহেবদের দিও।” রেঞ্জার বেরিয়ে এলেন।

অর্জুন বলল, “এই চোর দেখছি নিরামিষ খেতে অভ্যন্ত।”

খাওয়াদাওয়ার শেষে বিছানায় শুয়ে এপাশ-ওপাশ করতে করতে অর্জুনের মনে পড়ে গেল। সুন্দর এখন জঙ্গলে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। পার্বতী বড়ুয়া

যলেছিলেন যে, এদিকের জঙ্গলে ফল নেই, মাটি খুঁড়ে কিছু অবশ্য পাওয়া যায়। সুন্দরকে খাদ্য সমস্যায় পড়তে হবে। এই চের সুন্দর নয় তো? সে কঠস্বর মনে করার চেষ্টা করল। একদিন সুন্দর তার সঙ্গে কথা বলেছে, স্বর মনে রাখা তাই সম্ভব নয়। কিন্তু সুন্দর কি অত দূর থেকে এখানে চলে এসেছে পায়ে হেঁটে? আর এই এলাকাটা তো নীল চ্যাটার্জির বাগানের কাছে। সুন্দরের পক্ষে তো দূরত্ব বাড়ানোই স্বাভাবিক, নীলের কাছাকাছি জঙ্গলে থাকবে কেন?

এই সময় মেজর পাশের খাটে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কিছু বললেন।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “কিছু বলবেন?”

“মাথা! মাথায় মেরেছে। আঃ!” মেজর আবার নাক ডাকা শুরু করলেন।

মেজরের মাথায় কে মারল? সুন্দর? কেন?

॥ দশ ॥

মেজরের মাথার ঠিক পেছনে যেন আধখানা আলু বসানো হয়েছে। ঘুম থেকে উঠেই তিনি তাঁর ব্যাগ খুলে দু-তিনটে ক্যাপসুল খেয়ে নিয়েছেন। খেয়ে বললেন, “কারও ভাল করতে নেই, বুবলে?” অর্জুন চুপচাপ দেখছিল। এখন সদ্য ভোর। জঙ্গলে হাজার পাখির ডাক। সূর্যদেব উঠি উঠি করছেন। পৃথিবীটা বড় শান্ত।

অমল সোম দরজায় এসে বললেন, “গুড মর্নিং।”

মেজর বললেন, “মর্নিং।”

“আপনি সুস্থ?”

“আমার মাথা বলে আঘাতটা হজম করেছে, একটু ফুলে উঠেছে, এই যা।”

“আঘাতটা করল কে?”

“অন্ধকারে মুখ দেখিনি। শুনুন, আমি পেয়ে গেছি। বিষফুল আর মাংসখাদক পিংপড়ে পেয়ে গেছি। আমাদের এক্ষুনি যাওয়া দরকার। ক্যামেরাটা—।”

“আমরা আপনার আঘাত নিয়ে কথা বলছিলাম।”

“ও। বিশ্বাস হল না বুঝি। কী ভাবেন বলুন তো? আমি আপনার চেয়ে গোয়েন্দাগিরি কম বুঝি? এই ক' বছর ইংরেজি সাহিত্যের সব গোয়েন্দা বই তো শেষ করেছি, তার ওপর স্টল্যান্ড ইয়ার্ডের পাঠ্যপুস্তকও নাড়াচাড়া করেছি। গত বছর...।” মেজর উত্তেজিত গলায় কথা বলছিলেন, কিন্তু তাকে হাত তুলে থামতে বললেন অমল সোম, “আমি গোয়েন্দাগিরি করি না।”

“অ।” মেজর থতমত হয়ে গেলেন।

“অঙ্ককারে মুখ দেখেননি বললেন, তাই না ?”

“হ্যাঁ । টর্চ সঙ্গে ছিল না তো ! প্রথমে মাংসখাদক পিংপড়ে তারপর বিষ ফুলের গন্ধ আবিষ্কার করে আমি আপনাদের জানাতে ছুটে আসছিলাম । হঠাৎ দেখি জঙ্গলে জোনাকি ঝুলছে, নিবছে । একটা জোনাকি । তারপরেই বুত্তে পারলাম ওটা বিড়ির আগুন । কাছে গিয়ে লোকটার হাত শক্ত করে ধরে জিজ্ঞেস করলুম, “এই তুই কে ? এখানে কী করছিস ?” লোকটা বলল, ‘বিড়ি থাচ্ছি । হাত ছাড়ো ।’ বলার ভঙ্গিতে মনে হল অ্যান্টি সোশ্যাল । হয়তো চোরা শিকারিদের কেউ । বললাম, ‘রেঞ্জারের কাছে চল ।’ বলল, ‘ঠিক আছে কিন্তু আমার ইয়ে পেয়েছে । করে নিই আগে ।’ বিশ্বাস করলাম । করতেই বিড়ির আগুন নিবে গেল । তারপরেই মাথার পেছনে আঘাত । আমার আর কিছু মনে নেই ।” মেজর গড়গড় করে বলে গেলেন । বলতে বলতে তাঁর হাত উঠে স্পর্শ করল ফোলা জায়গাটা ।

অর্জুন বলল, “আমরা আপনাকে খুঁজতে জঙ্গলে গিয়েছিলাম । তখন ওই লোকটাই হঠাৎ সামনে এসে হাদিস দিয়েই আবার উধাও হয়ে গেল ।”

“তাই নাকি ! লোকটা কিন্তু ক্রিমিন্যাল ।” মেজর বললেন ।

অমল সোম বললেন, “হ্যাঁ । এখানে দেখছি ক্রিমিন্যালদের সংখ্যা কম নয় । যাক, এখনও ঘণ্টা দুয়েক সময় আছে গাড়ি আসার । আমি একটু হাঁটাহাঁটি করে আসি ।”

মেজর তাঁকে সতর্ক করলেন, “জঙ্গলে গেলে কোনও গাছের গা ধরে হাঁটবেন না ।”

“কেন ? গাছ আমার ক্ষতি করবে নাকি ?”

মেজর তখন তাঁর দেখা মাংসখাদক পিংপড়ের কাহিনী শোনালেন । অমল সোম বললেন, “পিংপড়েগুলোকে দেখাতে পারবেন ?”

“অফ কোস ।”

অতএব তিনজনেই রওনা হল । অর্জুন এর আগে পিরান্হা মাছের গল্ল শুনেছে । সেই ছেট মাছ অবলীলায় একটা মানুষকে টুকরো টুকরো করে ফেলতে পারে । আর এক ধরনের পিংপড়ে নাকি হাতির মৃতদেহ খেয়ে নিতে পারে কয়েক দিনে । কিন্তু একটা জ্যান্ট হরিণের বাচ্চাকে পিংপড়েরা যা করেছে বলে মেজর বললেন, সেটা পৃথিবীর কেউ শুনেছে কিনা তার জানা নেই । মিনিট পনের হাঁটাহাঁটি হল । মেজর কিছুতেই জায়গাটা খুঁজে পাচ্ছিলেন না । যদিও এই হাঁটাহাঁটি খুব আরামপ্রদ নয়, তবুও কৌতুহলের কারণে কেউ আপত্তি করছিল না । শেষ পর্যন্ত মেজরই জিজ্ঞেস করলেন, “আমাকে কোথায় খুঁজে পেয়েছিলে বলো তো ?”

অর্জুন আরও খানিকটা ডান দিকে হেঁটে জায়গাটা দেখিয়ে দিল । গর্তের মধ্যে শুকনো পাতা মেজরের দেহের চাপে বসে গেছে অনেকটা । মিনিট

পাঁচেক হাঁটাহাঁটির পর মেজর চিৎকার করে উঠলেন, “ইউরেকা !”

মেজরকে ছুটে যেতে দেখে ওরাও পা চালালো । একটা গাছের সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন মেজর । গাছটার নিচে পরিষ্কার ধ্বনিবে কয়েকটা হাড় পড়ে আছে । কিন্তু গাছের গুঁড়ির কোনও অংশেই একটা পিংপড়ে নেই ।

মেজর উত্তেজিত গলায় বললেন, “এইখানে পিংপড়েগুলো ছিল মিস্টার সোম । ওই দেখুন, হরিণটার হাড় পড়ে আছে ।”

অর্জুন বলল, “হরিণটার মাথার খুলি, পা কোথায় ?”

অমল সোম এগিয়ে গিয়ে একটা হাড় তুলে পরীক্ষা করলেন । তারপর বললেন, “উনি ঠিকই বলছেন । কয়েক ঘণ্টা আগে এটা কোনও জন্মের শরীরে ছিল । মাংস মজ্জা খেয়ে নিয়ে, মেজরের দেখা যদি ঠিক হয়, পিংপড়েরা চলে গেছে । আর জঙ্গলে তো শেয়াল-হায়েনার অভাব নেই, খুলিটুলিগুলো তারাই নিয়ে গেছে ।”

একটা হালকা দাগ গাছের গুঁড়িতে ছিল । বোঝাই যাচ্ছে ওখানে কিছু চেপে ছিল অনেকক্ষণ । অমল সোম বললেন, “আপনি বলছিলেন পিংপড়ের চাকের আড়ালে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল এই জায়গাটা, তাই কালো দেখাচ্ছিল । তা হলে তো হাজার হাজার পিংপড়ে থাকার কথা । একসঙ্গে ওগুলো গেল কোথায় ?”

মেজর বললেন, “নিশ্চয়ই কাছাকাছি আবার ফাঁদ পেতেছে ।”

“না । জন্মজানোয়ার থেকে পাখি পর্যন্ত খিদে না পেলে খাবার খোঁজে না । এখন ওদের পেট ভর্তি । যতক্ষণ না খিদে পাবে, ততক্ষণ ওরা ফাঁদ পাতবে না । মানুষের সঙ্গে এটাই পার্থক্য ।”

অর্জুন আশেপাশে পিংপড়ে খুঁজল । “না কোথাও নেই ।”

“আপনার বিষফুল কোথায় ?” অমল সোম প্রশ্ন করলেন ।

মেজর আবার উৎসাহে এগিয়ে গেলেন, “অন্ধকার ছিল, তবু আমি একটা পাতাবারা গাছকে চিহ্ন হিসেবে রেখে এসেছি ।”

ন্যাড়া গাছটাকে খুঁজে বের করতে সময় লাগল না । হাত বাড়িয়ে ওদের দেখতে বললেন, “একটু এগিয়ে গেলেই গন্ধ পাওয়া যাবে । সাবধান !”

অর্জুন চারপাশে তাকাল । সকালের জঙ্গলে পাখিদের ব্যঙ্গতা থাকে । চার পাশেই তারা চেঁচামেচি করছে । কয়েকটা বাঁদর গাছের ডাল ধরে ওপাশে চলে গেল । সে জিজ্ঞেস করল, “আপনি কোন দিকে গন্ধ পেয়েছিলেন ?”

“ওই দিকে ।”

“কিন্তু ওদিকে যদি বিষফুল থাকে, তাহলে পাখি বা বানরের কিছু হচ্ছে না কেন ?”

অমল সোম বললেন, “ঠিক কথা । মেজর, আপনার বোধহয় ভুল হচ্ছে ।”

“অসম্ভব । ওই গন্ধ নাকে দেকামাত্রই আমার শরীর ঝিমবিম করছিল ।”

মেজর প্রতিবাদ জানিয়ে একপা একপা করে এগোতে লাগলেন ।

অর্জুন স্বচ্ছন্দে হাঁটতে লাগল তাঁকে ডিঙিয়ে। তারপরেই ওরা হাসনুহানার ঘোপটাকে দেখতে পেল। সকালেও সেই ফুলের গন্ধ বাতাস জুড়ে রয়েছে। মেজের অর্জুনের হাত ধরে টানলেন, “খবরদার। আর এগিও না।”

গন্ধ নাকে লাগলেও শরীরে কোনও প্রতিক্রিয়া হচ্ছিল না। অর্জুন ফুলটাকে লক্ষ করছিল। জলপাইগুড়িতে এ রকম হাসনুহানা গাছ সে অনেক দেখেছে। তার ফুলের সঙ্গে এর কোনও পার্থক্য নেই। হাসনুহানার গন্ধে সাপ আসে বলে প্রচার আছে। এ ছাড়া আর কোনও ক্ষতির সন্ধাবনা নেই। অমল সোম শব্দ করে হাসলেন, “জঙ্গলে ঢুকে গন্ধ পেয়েই ভাবলেন, বিষ ফুলের গন্ধ?” তিনি এগিয়ে গিয়ে ফুলের ছাণ নিলেন। “সত্যিই কড়া গন্ধ। কিন্তু দেখুন, আমি ঠিকই আছি। কাল রাত্রে আপনি মানসিকভাবে গোলমেলে ছিলেন।”

মেজের ততক্ষণে বুঝেছেন তিনি ভুল করেছেন।

অমল সোম এবার ফিরলেন। তাঁর পাশে হাঁটতে হাঁটতে মেজের বললেন, “হতে পারে। হতে পারে কেন, ভুল নিশ্চয়ই হয়েছে। কিন্তু পিপড়েদের ব্যাপারটা একশো ভাগ সত্য।

“ঠিক। ওই হাড়গুলো তো মিথ্যে নয়। তবে জঙ্গলের এত কাছাকাছি যদি আপনার বিষফুল থাকত, তাহলে রেঞ্জার খবর পেয়ে যেতেন।” অমল সোম এগিয়ে চললেন।

ব্রেকফাস্ট খাওয়া শেষ না হতেই গাড়ি এসে গেল। অমল সোম বললেন, “তা হলে আপনারা চারপাশে ঘোরাঘুরি করুন।”

মেজের বললেন, “তার মানে? আমাদের তো নিম টি এস্টেটে যাওয়ার কথা।”

“আপনারা যেতে চান?”

“হ্যাঁ, আপনাকে একা ছেড়ে দেওয়া যায় না।”

অমল সোম হাসলেন, মুখে কিছু বললেন না।

ফরেস্ট থেকে বেরিয়ে গতকালের সেই রাস্তা ধরে বেশ কিছুটা পথ যাওয়ার পর চা বাগানের গায়ে নিম টি এস্টেটের সাইনবোর্ড চোখে পড়ল। অমল সোম বললেন, “মনে হচ্ছে বাগানটা বেশ বড়। বাঙালি মালিকের বাগান তো এখন হাতে গোনা।”

এখানে আসার পথে যে কটা চায়ের বাগান নজরে পড়েছে, তার সাইনবোর্ডে হয় বিদেশি নামের কোম্পানি নয় অবাঙালি নাম চোখে পড়েছে। এসব নিয়ে অর্জুন কখনও মাথা ঘামায়নি। এককালে জলপাইগুড়ির এস পি রায় এবং বীরেন ঘোষ অনেক চা-বাগানের মালিক ছিলেন। ওঁদের মৃত্যুর পর এস পি রায়ের ছেলেরা খুব ভালভাবে ব্যবসা করলেও বীরেন ঘোষ মশাই-এর ছেলে তাদের চা-বাগান বিক্রি করে দিয়েছেন। এই নিয়ে জলপাইগুড়ির পুরনো

মানুষেরা আফসোস করেন। অমল সোমের কথা শুনে মনে হল তাঁরও আফসোস ওই কারণে।

গাড়ি বাগানের গেট পেরিয়ে সরু রাস্তায় চুকে পড়ল। সাদা নুড়ি পাথরের রাস্তা। ওপাশে ফ্যাক্টরির শেড দেখা যাচ্ছে। এপাশে অফিস। বেশ নির্জন জায়গা। গাড়ি থেকে নেমে ওরা এপাশ ওপাশে তাকাতেই একজন মঙ্গলিয়ান যুবক এগিয়ে এসে নমস্কার করল। অমল সোম জিজ্ঞাসা করলেন, “মিসেস ব্যানার্জি আছেন?”

“মেমসাহেব বড়া বাংলোতে আছেন।”

“বড়া বাংলো?”

“হ্যাঁ। ওই ওপাশে বড়া বাংলো, আর ডানদিকে ছোটা বাংলো।”

মেজর জিজ্ঞেস করলেন, “মিস্টার হরপ্রসাদ সেন কি এখানে আছেন?”

“হ্যাঁ। আসুন আমার সঙ্গে।” ছেলেটি এগোল।

অমল সোম অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, “ঁকে চিনলেন কী করে?”

অর্জুন জবাব দিল, “জলটাকার কাছে আলাপ হয়েছিল। উনি নীল চ্যাটার্জির পেছন পেছন আসছিলেন। ওই যে বামেলাটা।”

“বুঝেছি।” অমল সোম মাথা নাড়লেন।

অফিসটি ছিমছাম। ছেলেটি জানাতেই তাদের ভেতরে নিয়ে আসতে বললেন হরপ্রসাদ সেন। মেজরকে দেখে বুঝের কপালে ভাঁজ পড়ল, “কোথায় যেন—ওহো, কী ব্যাপার?”

“চিনতে পারছেন?” মেজর গান্ধীর গলায় বললেন।

“বিলক্ষণ।”

“ইনি অমল সোম। সত্যসন্ধানী।”

অমল সোম নমস্কার করলেন, “ওসব কিছু নয়। আমি এই বাগানের মিসেস ব্যানার্জির সঙ্গে দেখা করতে চাই। কিছু ব্যক্তিগত কথা বলব।”

হরপ্রসাদ সেন ঘড়ি দেখলেন, “ওঁর অফিসে আসার সময় হয়ে গিয়েছে। যদিও ‘ব্যক্তিগত কথা’ বললেন, তবু জানতে পারি প্রসঙ্গটি আমাদের ছেট সাহেবকে নিয়ে কি?”

“আপনার অনুমান ঠিক।”

“তা হলে বলব, কথা বলে কোনও লাভ হবে না। উনি স্পষ্ট বলে দিয়েছেন যে, ছেট সাহেবের কোনও ব্যাপারে থাকবেন না।”

“সেটা আপনাদের বলেছেন। আমি নিজের কানে শুনে যেতে চাই।”

হরপ্রসাদ সেন দরজার দিকে তাকালেন। মঙ্গলিয়ান ছেলেটি ওদের এই ঘরে পৌঁছে দিয়ে বেরিয়ে গেছে। হরপ্রসাদবাবু গলা নামালেন, “নতুন কোনও ঘটনা ঘটেছে?”

অমল সোম বললেন, “অনুমান করছি আপনি স্বর্গত অশ্বিনী ব্যানার্জির

আমলের লোক।”

“ঠিক তাই। এসব দেখে শুনে আমি ছুটি চেয়েছিলাম কিন্তু মিসেস ব্যানার্জি আমাকে ছাড়তে চান না। বয়েসও হয়েছে, মানাতে পারছি না তাই।” কথা বলতে বলতে কান খাড়া করলেন হরপ্রসাদ সেন, “ওই যে, মেমসাহেব এসে গেছেন। আপনারা বসুন।”

হরপ্রসাদ সেন তড়িঘড়ি উঠে গেলেন। ততক্ষণে একটা গাড়ি এসে থেমেছে অফিসে। বড়া বাংলো পাথর ছোঁড়া দূরত্বে হলেও মিসেস ব্যানার্জি গাড়িতেই অফিসে আসেন। তাঁকে এই ঘর থেকে দেখা যাচ্ছল না।

মেজর জিঞ্জেস করলেন, “আপনি কি ওই বদমাসটার বিরুদ্ধে নালিশ করতে চান?”

“তাতে কি কোনও লাভ হবে? শুনলেন তো ভাইয়ের ব্যাপারে উনি থাকেন না।”

বারান্দায় শব্দ হল। তারপরই হরপ্রসাদ সেনের গলা, “আসুন, আসুন।”

গটগট করে ভদ্রমহিলা ঘরে ঢুকলেন। অমলদাকে অনুসরণ করে ওরা দাঁড়িয়ে পড়ল। মিসেস ব্যানার্জির বয়স পঞ্চাশের কাছে, মাথার সামনের দিকের চুল ইন্দিরা গান্ধীর মতো সাদা। সাদা জামা আর শাড়িতে বেশ ব্যক্তিগতয়ী বলেই মনে হচ্ছে।

অমল সোম নমস্কার করে নিজেদের পরিচয় দিলেন।

অর্জুন লক্ষ করল, বাগানের মালিক হওয়া সত্ত্বেও ভদ্রমহিলা হরপ্রসাদ সেনের চেয়ারে না বসে পাশের একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বললেন, “বসুন মিস্টার সেন। বসুন আপনারা। হ্যাঁ, কী ব্যাপার? আমি তো ভাবতেই পারছি না, আপনাদের মতো নামী লোক অকারণে আমার বাগানে সময় নষ্ট করতে আসবেন।

হরপ্রসাদ সেন নিচু গলায় বললেন, “মিস্টার সোম আপনার সঙ্গে ব্যক্তিগত কথা বলতে চান। বিষয়টা আমাকে বলেননি।”

অমল সোম বললেন, “মিসেস ব্যানার্জি, আপনাকে বিরুদ্ধ করছি বলে দুঃখিত। কোনও এক সময় আমি আপনার স্বর্গত স্বামীকে চিনতাম। অশ্বিনীবাবু মানুষ হিসেবে শ্রদ্ধেয় ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পরে আপনি যেভাবে এই বাগান চালাচ্ছেন, তা প্রশংসনীয়।”

“অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু যেভাবে চালানো উচিত তা পেরে উঠছি না। মডার্ন মেশিনারি ব্যবহার করার মতো আর্থিক সঙ্গতি আমার নেই। আপনি কি আলাদা কথা বলতে চান?” আচমকা গলার স্বর বদলে গেল।

“দুরকার নেই। শুনেছি আপনার ভাই নীল চ্যাটার্জি আপনাদের সমস্ত সম্পদের উত্তরাধিকারী। অতএব তাঁর আচার-আচরণ সম্পর্কে আপনার দায়িত্ব থেকে যাচ্ছে। তিনি এই এলাকায় যেভাবে রাজত্ব করছেন, তা মাফিয়া ডনেরাই

করে থাকে । আপনার স্বামী বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই সহ্য করতেন না । আমার একমাত্র প্রশ্ন, আপনি কী করে আপনার ভাইয়ের গুণামিকে প্রশ্নয় দিয়ে চলেছেন ?” অমল সোম খুব শাস্ত গলায় প্রশ্ন করলেন । অর্জুন ভাবছিল এসব শুনে মিসেস ব্যানার্জি খুব চটে যাবেন । কিন্তু নিঃশব্দে হাসলেন মাত্র, “আর কিছু ?”

“না ।”

“আপনি নিশ্চয়ই তার গুণামির প্রমাণ পেয়েছেন, নইলে আমাকে বলতে আসতেন না । আপনি বললেন, আমি তাকে প্রশ্নয় দিচ্ছি । ভাল কথা । কিন্তু একই সঙ্গে স্থানীয় পুলিশ, সরকারী সংস্থাগুলো, জেলার এস পি, স্থানীয় মানুষজন তাকে কি প্রশ্নয় দিচ্ছে না ? কোনও এক ব্যক্তির কতখানি ক্ষমতা থাকতে পারে যে, সবাইকে সে হাতের মুঠোয় রাখতে পারে ?”

“আমার প্রশ্নের এটা উত্তর হল না ।”

“মিস্টার সোম, আমি কীভাবে ক্ষতিপূরণ করতে পারি, বলুন ?”

“ক্ষতিপূরণ ?”

“নিশ্চয়ই সে আপনাকে অপমান করেছে ?”

“করেছে । কিন্তু কুংসিত গালাগাল আর হৃষকির ক্ষতিপূরণ কিসে হওয়া সম্ভব ?”

“আমি জানি না ।”

“বেশ । আমি আপনাকে সতর্ক করে দিতে এসেছিলাম । নিশ্চয়ই আপনি ভাই সম্পর্কে অত্যন্ত দুর্বল । কিন্তু এই কারণ আপনার স্বামীর ব্যবসায় বদনাম তৈরি করছে । আচ্ছা, আপনার সময় নষ্ট করার জন্যে আমি দৃঃখ্যি । নমস্কার !” অমল সোম উঠে দাঁড়ালেন ।

এইসময় বাইরের নৃত্বি পাথর ছিটকে ব্রেক করে গাড়ি থামার আওয়াজ এল । হৃণপ্রসাদ সেন চাপা গলায় বলে উঠলেন, “ছোট সাহেব এসেছেন ।”

অমল সোম এবং অর্জুন ততক্ষণে বাইরের বারান্দায় পা রেখেছে । মেজের পেছনে । গাড়ি থেকে নেমে নীল চ্যাটার্জি ওদের দেখতে পেয়ে বেশ অবাক হয়েছে বোঝা যাচ্ছে । দ্রুত পা ফেলে কাছে এসে সে জিজ্ঞেস করল, “এখানে কী ব্যাপার ? আপনারা তো ফরেস্ট বাংলোয় উঠেছেন ?”

অমল সোম বললেন, “কাল ‘তুমি’ ‘তুই’ শুনেছিলাম, আজ ‘আপনি’ । এসো অর্জুন ।”

“দাঁড়ান, দাঁড়ান, ওরকম চালিয়াতের মতো আমার সঙ্গে কথা বলার সাহস হল কী করে ? এটা আমার বাগান, ফরেস্ট বাংলো নয় ।” চিৎকার করে উঠল নীল ।

“বাগানটা এখনও মিসেস ব্যানার্জির । উনি মরে না যাওয়া পর্যন্ত তাঁরই ।” অমল সোম এগিয়ে গেলেন গাড়ির দিকে ।

নীল চ্যাটার্জি কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই বারান্দা থেকে মিসেস ব্যানার্জির গলা ভেসে এল, “নীল !”

নীল পেছন ফিরে তাকাল ।

“আর একটা কথা আমি শুনতে চাই না । এদিকে এসো ।”

ওরা গাড়িতে উঠল । গাড়িটো যখন বাগান ছাড়তে যাচ্ছে, তখন ওপাশ থেকে মারুতিটা বাঁক নিল । দুটো গাড়ি মুখেমুখি দাঁড়িয়ে গেল । ওপাশের গাড়ির সিয়ারিং-এ বসে আছে জলপাইগুড়ির বরেন ঘোষালের ছেট ভাই ।

॥ এগারো ॥

হঠাতে ডান হাতটা বাইরে বেরিয়ে এল, তার মুঠোয় রিভলভার ।

বরেন ঘোষালের ভাই চিক্কার করে উঠল, “তিন গুনব, এর মধ্যে কথা না শুনলে গুলি চালাতে বাধ্য হব । ওয়ান— !”

মেজর হকচিয়ে গেলেন । চাপা গলায় বললেন, “এ দেখছি উশাদ । কী হবে ?”

অমল সোম বললেন, “গুলি করে সবাইকে মেরে ফেলতে পারবে না । যে বেঁচে থাকবে, সে থানায় যাবে । তোমার নির্যাত ফাঁসি হবে ।”

মেজর বললেন, “আশ্চর্য ! আপনি এখনও ঠাণ্ডা মাথায় আছেন ?”

অর্জুনের মাথায় একটা মতলব খেলে গেল, “আপনার কলমটা দিন তো !”

“কী করবে ?”

“দিন না ।” ব্যস্ত হয়ে হাত বাড়াতেই বরেন ঘোষালের ভাই চিক্কার করল, “টু !”

তড়িঘড়ি কলমটা দিয়ে দিলেন মেজর । অর্জুন সেটা নিয়ে নীচে নামল । তারপর দুটো হাত মাথার ওপর তুলে এগোতে লাগল । ছেলেটা চিক্কার করল, “গৌর-নিতাই হয়ে কোনও লাভ নেই, গাড়ি হঠাত, নইলে তিন বললেই গুলি চালাব ।”

“ক’জনকে মারবে ?” একেবারে কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল অর্জুন ।

“সবক’টাকে । আমাকে তো চেনো না !”

“কিন্তু তার আগে যদি তোমার শাট্টে আগুন ধরে যায় ?”

“আমার শাট্টে ? হ্যা হ্যা হ্যা । আমার গায়ে আগুন দেবে এমন কেউ জন্মায়নি রে ! আমি এবার থ্রি বলছি ।” রিভলভারটাকে অর্জুনের বুক লক্ষ করে ধরল সে ।

কথা বলার সময় হাত মাথার ওপর রেখেই পেন্টাকে ঘুরিয়ে নিয়েছিল অর্জুন । এবার বলল, “এক মিনিট । আমি ম্যাজিক জানি । সেটা কী রকম একটু দ্যাখো ।”

তক্ষণি বোতাম টিপল সে । সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির হৃত্তা জলে উঠল । প্রাণপন্থে জাফ দিল বরেন ঘোষালের ভাই । ব্যালান্স রাখতে না পেরে চা-গাছের গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়তেই রিভলভার ছিটকে গেল হাত থেকে । অর্জুন দ্রুত সেটা তুলে নিল । ততক্ষণে গাড়ির নরম হৃত্তা পুড়ে ছাই । বরেন ঘোষালের ভাই ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়ে দৃশ্যাটি দেখে বলে উঠল, “আই বাপ !”

এবার বীরদর্পে মেজর নেমে এলেন । সোজা ছেলেটার পাশে পৌঁছে ওর কান টেনে ধরলেন, “সেদিনের ছেলে, গুণামি করে বেড়াছ । মেরে হাড় ভেঙ্গে দেব বানর ! যা, তাড়াতাড়ি গাড়ি ব্যাক কর, নইলে তোকে পুড়িয়ে মারা হবে ।”

ওপরের কভার পুড়িয়ে আগুন নিভে গিয়েছিল । অমল সোম ডাকলেন, “শোনো, ওকে এই গাড়িতে নিয়ে এসো । মেজর, আপনি গাড়িটা চালাতে পারবেন ?”

মেজর বললেন, “আমার আবার গিয়ার-ছাড়া গাড়ি চালানো অভ্যেস । বুঝলে অর্জুন, আমেরিকায় গাড়িতে গিয়ার থাকে না ।”

অর্জুন গাড়িটা পরিষ্কার করে উঠে বসল । বাইক চালানো অভ্যেস, গাড়ির হাত খুবই কাঁচা । মেজর বললেন, “ওটা দাও । সঙ্গে রাখা ভাল । চলো হে !”

টর্চ সঙ্গে নিয়ে তিনি ফিরে গেলেন বরেন ঘোষালের ভাইয়ের হাত ধরে । যে ছেলেটা এতক্ষণ বীরদর্পে তড়পাছিল, সে হঠাৎ ভেজা মুড়ির মতো মিহয়ে গেছে । বারংবার ঘুরে ঘুরে দেখছে অর্জুনকে ।

বেশ সজাগ হয়ে অমল সোমদের অনুসরণ করে গাড়িটা চালিয়ে নিয়ে এল অর্জুন । সামনের গাড়ির ড্রাইভার সোজা থানার সামনে দাঁড়িয়ে গেলে সেও ব্রেক চাপল । থানার বাইরে দুঁজন সেপাই দাঁড়িয়ে ছিল, তাদের ডাকলেন অমল সোম, “বড়বাবু আছেন ?”

“হ্যাঁ সার ।”

“তা হলে একে নিয়ে ওঁর কাছে চলুন ।”

সেপাইটি বরেন ঘোষালের ভাইকে দেখে হকচকিয়ে গেল । বোঝা যাচ্ছে সে চিনতে পেরেছে । তাকে ইতস্তত করতে দেখে অমল সোম ধমকালেন, “যা বলছি তাই করুন ।”

সেপাইটি নিতান্ত অনিচ্ছায় আদেশ পালন করল । হয়তো সে অমল সোমকে বড় অফিসার মনে করেছিল । অর্জুন রিভলভারটা সঙ্গে নিয়ে ওদের অনুসরণ করল ।

থানার বড়বাবুর বয়স হয়েছে । দেখলেই বোঝা যায় রিটায়ার করার মুখে এসে পৌঁছেছেন । হঠাৎ এইসব ব্যাপার দেখেশুনে খুবই অস্বস্তিতে পড়লেন । অমল সোম বললেন, “এই ছেলেটির শিক্ষা হওয়া দরকার । আমার বক্তব্য

ରେକର୍ଡ କରେ ଓକେ ହାଜତେ ପୁରୁଣ । ”

ବରେନ ଘୋଷାଲେର ଭାଇ ତତକ୍ଷଣେ ଏକଟୁ ସାହସ ଫିରେ ପେଯେଛେ । ଚାପା ଗଲାଯ ବଲଲ, “ଆପନାରା ଝାମେଲା ବାଡ଼ାବେନ ନା । ମେଇ ହ୍ୟାମିଲଟନେର କେସଟା ମନେ ଆଛେ ତୋ । ”

ବଡ଼ବାବୁ ମୋଜା ହୟେ ବଲଲେନ, “ଅନ୍ଧବସ୍ତୀ ଛେଲେର ବ୍ୟାପାର, ହଠାତ୍ ମାଥା ଗରମ କରେ ଫେଲେଛି । ଏଟା ନିଯେ ଆର ନା ଏଗୋଲେଇ ତୋ ଭାଲ । ”

“ଅନ୍ଧବସ୍ତୀ ଛେଲେ ଯଥନ ଗାଲାଗାଲ ଦିଯେ ରିଭଲଭାର ଥେକେ ଶୁଳ୍କ ଚାଲାବାର ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତଥନ ତାର ଶାସ୍ତିର ଜନ୍ୟେ ଏଗୋତେ ହୟ । ଆପନି ଡାଯେରି ନିନ । ଆପନାର ଅସୁବିଧେ ଥାକଲେ ଏସ ପିକେ ଫୋନ କରେ ବଲୁନ ଜଲପାଇଶ୍‌ଡିର ଅମଲ ସୋମ ଇନସିଟ କରଛେନ, କିନ୍ତୁ ଆପନି ଡାଯେରି ନିଚ୍ଛେନ ନା । କୀ କରବେନ ଭେବେ ଦେଖୁନ । ” ଅମଲ ସୋମେର କଥା ଶେଷ ହୃଦୟାମାତ୍ର କାଜ ଶୁରୁ ହୟେ ଗେଲ । ବରେନ ଘୋଷାଲେର ଭାଇକେ ପୁଲିଶେର ହେଫାଜତେ ଦିତେ ମେ ଚିକାର କରେ ଉଠିଲ, “ଆମିଓ ଡାଯେରି କରବ । ଆମାର ଗାଡ଼ିତେ ଏରା ଆଗୁନ ଧରିଯେ ଦିଯେଛି । ”

ବଡ଼ବାବୁ ବଲଲେନ, “ମେ କୀ ! ”

“ହଁ । ବାଇରେ ଚଲୁନ, ଦେଖାଛି । ”

ବଡ଼ବାବୁ ଯେନ ଉଂସାହିତ ହେଇ ବାଇରେ ଏଲେନ । ଛେଲୋଟି ଦେଖାଲ, “ଓଇ ଯେ, କଭାର ପୁଡ଼େ ଛାଇ ହୟେ ଗେଛେ । ଅନ୍ଧେର ଜନ୍ୟେ ବେଂଚେ ଗିଯେଛି ଆମି ! ”

“ଆପନାରା ଆଗୁନ ଲାଗିଯେଛେନ ? ” ବଡ଼ବାବୁ ଘୁରେ ଦାଢ଼ାଲେନ ।

ଅମଲ ସୋମ ଜିଜ୍ଞେସ କରଲେନ, “ଓକେ ଜିଜ୍ଞେସ କରନ ଆଗୁନ ଯଦି ଲାଗାନୋ ହୟେ ଥାକେ, ତା ହଲେ କୀ ଦିଯେ ଲାଗାନୋ ହୟେଛେ ? ”

“ମାଜିକ, ମ୍ୟାଜିକ କରେ ଆଗୁନ ଧରିଯେଛେ ଓ । ” ଅର୍ଜୁନକେ ଦେଖିଯେ ଦିଲ ଛେଲୋଟା ।

“ମ୍ୟାଜିକ ? ମ୍ୟାଜିକେର ଆଗୁନ ଆସଲ ହୟ ନାକି ! ଲୋକେ ବିଶ୍ୱାସ କରବେ ? ”

ଗାଡ଼ିତେ ଉଠେ ଅମଲ ସୋମ ଜିଜ୍ଞେସ କରଲେନ, “ଆପନାଦେର ଅନ୍ତ୍ରଟି ଏକବାର ଦେଖିତେ ପାରି ? ”

ମେଜର ସୋଂସାହେ ଏଗିଯେ ଦିଲେନ । ଚୋଥେର ସାମନେ ଧରେ ଘୁରିଯେ-ଫିରିଯେ ଦେଖଲେନ ଅମଲ ସୋମ । ମେଜର ବଲଲେନ, “ଆପନି ଯଦି ଇଚ୍ଛେ କରେନ, ତା ହଲେ ରେଖେ ଦିତେ ପାରେନ । ”

ଅମଲ ସୋମ କଲମଟା ଫିରିଯେ ଦିଲେନ, “ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ତ୍ର ରାଖା ଆମି ଅନେକ ଦିନ ଛେଡ଼େ ଦିଯେଛି । ”

ଅର୍ଜୁନ ଜିଜ୍ଞେସ କରଲ, “ଛେଲୋଟାର କୀ ହବେ ମନେ ହୟ ? ”

“କୀ ଆର ହବେ ? ଆଧୟାତ୍ମା ବାଦେଇ ଜାମିନ ନିଯେ ଯାବେ । କଷ୍ଟ କରେ କୋଟେ ତୁଳବେ ବଲେ ମନେ ହୟ ନା । ତବେ ଥାନାର ରେକର୍ଡ ଘଟନାଟା ଲେଖା ଥାକଲ, ଏହିଟେଇ ଲାଭ । ”

ওরা ফিরে এল জঙ্গলের ভেতর। আকাশে মেঘ জমছে। ডুয়ার্সের বৃষ্টি একবার শুরু হলে ক'দিন ধরে চলে। মেজর গভীর হয়ে বললেন, “সমস্যা হয়ে গেল।”

অর্জুন জিজেস করল, “কীরকম?”

“বৃষ্টি নামলে সর্বনাশ হয়ে যাবে। বিষফুলের গুৰু টের পাওয়া যাবে না। খুঁজে বের করা অসম্ভব হয়ে পড়বে। কী মনে হয়, বৃষ্টি হবে?”

অর্জুন তাকাল। বৃষ্টি আসবে, কিন্তু সেটা যে প্রবল হবে এমন মনে হচ্ছে না।

অমল সোম বললেন, “আচ্ছা মেজর, বৃষ্টি হবে কিনা তা ভবিষ্যতের ব্যাপার, আপনারা কেউ ওই লোকটাকে নিয়ে চিন্তা করছেন না কেন, যে আপনাকে জঙ্গলের ভেতর আঘাত করেছিল?”

“আমি ভাবিনি, তা কে বলল? ভেবেছি। এই সব জঙ্গলে প্রচুর বন্যজন্ম-শিকারি লুকিয়ে আছে। তাদের কেউ আমাকে দেখে ভয় পেয়ে আঘাত করেছে।”

“এটা হওয়া সম্ভব। কিন্তু যারা গোপনে জঙ্গলে শিকার করে, তারা বাংলোর কিচেন থেকে খাবার চুরি করে খাবে বলে মনে হয় না।”

“ও, খাবার চুরির ঘটনাটা একদম আলাদা। আমি বাবুর্চির সঙ্গে কথা বলেছি। এদিকে এমন ঘটনা না ঘটলেও ঘটা অসম্ভব নয়। পাঁচ-চ' কিলোমিটার দূরে গরিব মানুষের গ্রাম আছে। ওদের কেউ আসতে পারে।” মেজর বললেন।

অমল সোম মাথা নাড়লেন, “তা ঠিক। তবে সেরকম হলে দিনের বেলায় খাবার চুরি যেত। সঙ্গে নামলে কেউ জঙ্গলের ভেতর চুকবে না। চুরি করা খাবারের চেয়ে নিজের কাছে জীবন অনেক মূল্যবান।”

দুপুরের খাওয়ার পর মেজর নাক ডাকিয়ে ঘুমোছিলেন। এরকম মেঘলা দুপুরে ঘরে বসে থাকতে ইচ্ছে করছিল না। এখানে এসে কয়েকটা ফালতু ঝামেলায় জড়িয়ে পড়া ছাড়া তেমন কিছুই ঘটল না। অর্জুনের মনে হচ্ছিল অমল সোম তাঁর স্বভাব অনুযায়ী কোনও কথাই বলতে চাইছেন না। অর্জুন বাংলো থেকে বেরিয়ে এল। চারধার খুব বেশি চুপচাপ। আকাশে মেঘ জমলে পাখিরাও বোবা হয়ে যায়? গতকাল যেদিক দিয়ে জঙ্গলে চুকেছিল তার বিপরীত দিকে চুকল সে। সঙ্গে কোনও অস্ত্র নেই। কলমটা মেজরের কাছে রয়ে গেছে। অবশ্য দিনের বেলায় অস্ত্রের তেমন প্রয়োজন হবে না। কিছুটা হাঁটতে চমৎকার গুৰু নাকে এল। মিষ্টি গুৰু। মাথা বিমর্শ করছে না। অর্জুন কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। বিষফুল যদি হয়, তা হলে আর দেখতে হবে না। মিনিট দুয়েকেও যখন শরীরে কোনও প্রতিক্রিয়া হল না, তখন সে পা বাড়াল।

হঠাতে সামনের বুনো ঝোপের ভেতর ঝটপটানি শুরু হল। তারপরই একটা শেয়াল দ্রুত বাইরে বেরিয়ে এসে অর্জুনের দিকে তাকাল। এরকম ভয়-পাওয়া বোকা-বোকা চাহনি দেখে মজা লাগল অর্জুনের। সে কপট ধমক দিল, “ভাগ।”

সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উধাও হল জন্মটা। অর্জুন বুঝতে পারল, গন্ধটা আসছে ওই ঝোপের মধ্যে থেকে। শেয়ালটা যখন ওখান থেকে বের হল, তখন বোঝাই যাচ্ছে গন্ধটা বিষ ফুলের নয়। সে ঝোপটার ভেতর উঁকি মারার চেষ্টা করল। ডালপালা সরিয়ে এগিয়ে যেতে দৃশ্যটা দেখতে পেল অর্জুন, গোটাদুয়েক শেয়ালের বাচ্চা হতভম্ব হয়ে তাকে দেখছে। বাচ্চাগুলো দিন সাতকেরে বেশি নয়। কুকুরের বাচ্চার মতোই আদুরে দেখতে। আর তাদের পাশে মাটি খানিকটা খোঁড়া রয়েছে। সেখানেই গন্ধের উৎস। কাজটা মা-শেয়ালের, গর্ত খুঁড়ে বাচ্চাদের নিয়ে খাওয়া শুরু করেছিল সে। মাটির তলায় কোনও ফল বড় হয়ে পেকে উঠেছিল, নিজস্ব ধ্বাণশক্তিতে শেয়াল তার খবর পেয়ে গিয়েছিল। জলপাইগুড়ির বাড়িতে একটা কাঁঠালগাছ আছে। যার ফল মাটির নীচে হয়। সেই কাঁঠাল পেকে যাওয়ার সময় ওপরের মাটিতে চিড় ধরে, তার ফাঁক দিয়ে গন্ধ বের হয়। এটা কী ধরনের ফল, বোঝা যাচ্ছে না, কিন্তু ধরনটা ওইরকমের।

এই সময় পেছনে পাতার শব্দ হতে চোখ ফেরাল অর্জুন। এবং তাকে অবাক করে দিয়ে সুন্দর এগিয়ে এল, “নমস্কার বাবু।”

সুন্দরের মুখে খোঁচা-খোঁচা দাঢ়ি, পোশাকও ময়লা।

“তুমি এখানে ?”

“কাল থেকে এদিকেই আছি বাবু !” সুন্দর হাসল, “বাচ্চাগুলোকে খেতে দিন বাবু। পুরোটা খেতে পারবে না, বাকিটা আমি খাব। আসলে এই জঙ্গলে তেমন ফলমূল তো নেই। জন্মগুলোর খুব অসুবিধে হয়।”

“তুমি গতকাল মেজরের মাথায় আঘাত করেছিলে ?”

“আজ্জে ! তিনি কে ?”

“ওঁ, মোটাসোটা মানুষ। পাতার ওপর অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিলেন।”

“ও হ্যাঁ। নাহলে আমাকে ধরে ফেলতেন। পরে যখন আপনারা আমাকে খুঁজতে এসেছিলেন, তখন আমি দেখিয়ে দিয়েছিলাম উনি কোথায় শুয়ে আছেন।”

“বাংলোর রান্নাঘর থেকে তুমিই খাবার চুরি করেছিলে ?”

“হ্যাঁ বাবু। এত খিদে পেয়েছিল যে, নিজেকে সামলাতে পারিনি। তা ছাড়া আপনি ওদের মধ্যে আছেন দেখে ভরসা হল। অন্যায়টা মাফ করে দেবেন।”

“তুমি এই জঙ্গলে জুরু কেন ?”

“আমার কথা থাক। আপনি শহরের মানুষ, আপনি কি বেড়াতে

এসেছেন ?”

“কাজও আছে । শোনো সুন্দর, তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে । আমি জানি, তুমি নীল চ্যাটার্জির ভয়ে জঙ্গলে লুকিয়ে বেড়াচ্ছ ।” অর্জুন জানিয়ে দিল ।

সুন্দরের চোখ ছোট হল । সে জিজ্ঞেস করল, “আপনি নীলবাবুকে চেনেন ?”

“চিনতাম না । এখানে এসে চিনতে বাধ্য হয়েছি ।”

“এই জায়গা রাস্তা থেকে বেশি দূরে নয় । ওপাশে একটা ভাল জায়গা আছে । আসুন আমার সঙ্গে ।” সুন্দর হাঁটতে আরম্ভ করল । ডুয়ার্সের জঙ্গলের মধ্যে স্বচ্ছন্দে হাঁটা মুশকিল । বুনো ঝোপ আর লতাপাতা সরিয়ে রাস্তা করতে হচ্ছে । মিনিট দশকে হাঁটার পর ওরা একটা অস্তুত জায়গায় পৌঁছল । গোটাদশেক মোটা-মোটা শালগাছ গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে । মাঝখানের জায়গাটা একদম ন্যাড়া । ঘেন গাছেরা দেওয়াল হয়ে ঘর তুলেছে ।

সেখানে দাঁড়িয়ে সুন্দর বলল, “অল্প বৃষ্টি হলে এখানে জল পড়ে না । দেখুন মাথার ওপর পাতার ছাউনি কী ভাল । আকাশ দেখা যায় না ।”

কথাটা ঠিক । আর সেই কারণেই জায়গাটা ছায়ায় ভরা । সূর্য ডোবার আগেই অন্ধকার হয়ে যাবে । সুন্দর বলল, “এখানে কথা বললে কেউ টের পাবে না ।”

“শোনো, তোমার জন্যে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে চাকরি ঠিক করে থবর দিতে গিয়েছিলাম । পার্বতী বড়ুয়ার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে । সেখানেই জানতে পারলাম, তুমি জঙ্গলে লুকিয়ে আছ ।”

“অ । দিদি তো জানবেনই । বউ তো ওঁকেই প্রথমে বলবে ।”

“কিন্তু সেই জঙ্গল তো অনেক দূরে । এখানে এলে কী করে ?”

“হেঁটে । জঙ্গলে জঙ্গলে হাঁটতে হাঁটতে চলে এলাম ।”

“কী হয়েছিল বলো তো ?”

“বাবু, এসবই পাপের শাস্তি । চাকরিবাকরি নেই, খেতজমি নেই অথচ সংসার চালাতে গেলে টাকার দরকার হয় । পাখি ধরা শুরু করলাম । প্রথমে ঘৃঘৃ, বনমূরগি ধরতাম, ভাত না জুটুক মাংস খেতে পেত বউ ছেলে । ভারপর ময়না, টিয়া ধরতে লাগলাম । সেগুলো বিক্রি করে দুটো পয়সা হত । সেই পাখি ধরার ধান্দায় জঙ্গলগুলো ঘূরতে হত । হঠাৎ একদিন একটা লোক এসে বলল আমি যদি আরও বেশি টাকা রোজগার করতে চাই, তা হলে সে হাদিস দিতে পারে । যা পাছিলাম তাতে আমার চলছিল না । লোভ হল । গেলাম তার সঙ্গে । যার কাছে নিয়ে গেল সে নীলবাবুর লোক । এই এলাকায় সবাই চেনে । লোকটা বলল, “ময়না টিয়া ধরা বন্ধ কর । নইলে পুলিশ তোকে ধরবে । ওই সব পাখি ধরা আইনের চোখে অপরাধ । তুই এখন থেকে এই সব

পাখি ধরবি । ” আমাকে ছবি দেখল লোকটা । ওই রকম পাখি আমি জঙ্গলে দেখেছি । তবে বেশি নয় । কথা বলে না আর মাংসও খাওয়া যায় না বলে কোনওদিন ধরার চেষ্টা করিনি । লোকটা বলল, ‘অস্তত গোটা কুড়ি পাখি তোকে ধরতে হবে । সেই পাখি নিয়ে জলপাইগুড়ির স্টেশনের কাছে তোকে যেতে হবে । পাখি নিয়ে যাওয়ার আগে আমাকে দেখিয়ে যাবি । কুড়িটা পাখি পৌঁছে দেওয়ার জন্যে আড়াইশো করে টাকা পাবি । কি রে, খুশি তো ?’

“খুশি আমি হয়েছিলাম । আড়াইশো করে সপ্তাহে হলে মাসে হাজার টাকা । এর সঙ্গে ঘুঘু আর ঘুরাগি ধরলে অসুবিধে নেই । কিন্তু লোকটা যে ছবি দেখিয়েছিল, সেই জাতের পাখি চাইলেই পাওয়া যায় না । সারাদিন ঘুরে হয়তো একটারও দর্শন পেলাম না, আবার একদিনেই আট-দশটা জুটে গেল । ফরেস্ট ডিপার্টের লোকদের আর আমি কেয়ার করতাম না । ওরা জেনে গিয়েছিল আমি নীলবাবুর লোক । তবে আমাকে কিছু বলত না । এদিকের বাসে পুলিশ কিছু বলবে না জানি, মুশকিল হত জলপাইগুড়ির দিকে । তবু আমি এই ব্যবসা চালাচ্ছিলাম । রোজগারও হচ্ছিল মন্দ নয় ।”

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “তোমার কৌতুহল হচ্ছিল না, ওই সব পাখি কী জন্যে ধরা হচ্ছে ?”

“হ্যানি যে তা বলব না । তবে আমি গরিব মানুষ, যে যা ইচ্ছে করক আমি আর মাথা ঘামাইনি । পাখি দিতাম টাকা নিতাম । লোকটা বসে থাকত স্টেশনের কাছে চায়ের দোকানে । আমি গেলেই টাকা ধরিয়ে দিয়ে পাখি নিয়ে চলে যেত ।”

“তা, এমন সুন্দর ব্যবসা বন্ধ করলে কী জন্যে ?”

“আপনি আমাকে লোভ দেখালেন । ভালভাবে বাঁচার লোভ । পাখিগুলোকে দেখে বড় বলত, ‘আহা কী নিরীহ বেচারা, তোমার পাপ হচ্ছে, সেইসঙ্গে আমাদেরও ।’”

“আমি ধর্মক দিতাম, ‘পাপ-পাপ করিস না । আমি পাপ না করলে না খেয়ে মরতিস ।’

“বুঝতে পারি বড় কথাগুলো পার্বতীদিদিকে বলেছে । পার্বতীদিদি আমাকে ডেকে খুব ধরকাল । বলল আর পাখি ধরলে পুলিশের হাতে তুলে দেবে আমাকে । তা পার্বতীদিদির ক্ষমতা আছে । বড়-বড় অফিসাররা আসেন তার কাছে । কিন্তু পার্বতীদিদির তো চাকরি দেওয়ার ক্ষমতা নেই । হাতির কাজ আমি জানি না । ছেলেটার সঙ্গে হাতিদের বন্ধুত্ব হয়েছে কিন্তু আমাকে দেখলে ওরা এমন রেগে যায় যে, তবে ওদিকে যেতাম না । এই সময় আপনি লোভ দেখালেন । ফেরার সময় বাসে বসে ঠিক করলাম, আপনি যদি সত্যি কথা বলেন তা হলে জীবনে আর পাপ করব না । বাবু, লোকে মুখে অনেক উপকার করবে বলে আশা দেয়, কিন্তু কাজের বেলায় কথা রাখে না । তাই ভয়ও

ছিল । ”

“তারপর ?” অর্জুন জিজ্ঞেস করল ।

“ফিরে আসার পরই নীলবাবুর লোক আমাকে ডেকে পাঠালেন । গেলাম । তিনি বললেন, ‘তোকে আর পাখি ধরতে হবে না ।’

“আমি অবাক হলাম । এভাবে নিষ্ঠৃতি পাব, কল্পনা করিনি ।

“তিনি বললেন, ‘তোকে একটা নতুন কাজ দিচ্ছি । এখন থেকে ভূটানের পাহাড়ের দিকে যে জঙ্গল আছে সেখানে থাকবি । সেখানে গিয়ে থর খুঁজবি । থর দেখেছিস ?’

“বললাম, ‘দু’বার দেখেছি ।’

“‘ব্যস ! তোর আর চিন্তা নেই । থর দেখতে পেলেই আমাদের খবর দিবি । কী করে ফাঁদ পেতে ওদের ধরতে হয়, শিথিয়ে দেওয়া হবে তোকে ।’

“বাবু, থর হল ছাগলের মতো দেখতে, কিন্তু ছাগল নয় । নেপালিয়া ওদের থর বলে ডাকে । এদিকে দেখা যায় না বড় একটা । কেউ-কেউ অবশ্য ওদের জংলা ছাগল বলে । সহজে ধরা দেয় না ওরা ।”

“তুমি কী করলে ?”

“আমি আর পাপের পথে যাব না বলে ঠিক করলাম ।”

॥ বারো ॥

অর্জুনের মনে পড়ল, এই থর বা পাহাড়ি ছাগলের কথা অমল সোমের মুখে সে এর আগে শুনেছে । অমল সোম ওর ভাল নামটিও বলেছিলেন । অর্জুন মনে করার চেষ্টা করল ।

সুন্দর বলল, “কী ভাবছেন বাবু ?”

“ভাবছিলাম জঙ্গুটার আসল নাম কী ? যাকগে, তুমি ওদের বলতে পারতে আর কোনও অবৈধ কাজ করবে না । তা না বলে জঙ্গলে পালিয়ে এলে কেন ?”

“বললে ওরা কথা শুনত না । এ অঞ্চলে নীলবাবু যা বলবেন, সেটাই আইন । কথা না শুনলে ওরা আমার সর্বনাশ করে দিত ।”

“কিন্তু জঙ্গলে থাবার নেই, বৃষ্টি-বাদল আছে, বন্য জন্তু আক্রমণ করতে পারে, এভাবে তুমি কতদিন পালিয়ে থাকবে ?” অর্জুন জিজ্ঞেস করল ।

“যে ক’দিন পারি ! আমি শহরের দিকে চলে যেতে পারতাম, কিন্তু তা হলে যে আমার ছেলে-বউকে দেখতে পাব না । জঙ্গলে থাকলে ওদের কাছাকাছি থাকব আমি । এই ক’দিনে অবশ্য একটা অন্যায় করেছি । বনমূরগি ধরে ছাড়িয়ে যেয়েছি । এই যা !”

“কী হল ?”

“মাটির নীচের ওই ফলটার কথা খেয়ালই ছিল না । বাচ্চাগুলোর পর মা-শেয়ালটা নিশ্চয়ই এতক্ষণে বাকিটা খেয়ে গেছে ।” হতাশ গলায় বলল সুন্দর ।

“তুমি এক কাজ করো । আমার সঙ্গে চলো । বাংলোয় গিয়ে থাবে ।”

“অসম্ভব ! ওখানে গেলে নীলবাবু ঠিক খবর পেয়ে যাবে ।”

“সে জানবে কী করে ?”

“ওই বাংলোর কর্মচারীদের মধ্যে যে ওর লোক নেই, তা জানব কী করে ?”

“ঠিক আছে । তুমি রাত হলে এসো । আমি জেগে থাকব ।”

সুন্দর অর্জুনকে জঙ্গলের ধারে পৌছে দিয়ে ফিরে গেল । এই সময় টুপ টুপ করে বৃষ্টির ফোটা পড়তে লাগল । অর্জুন দৌড়ে বাংলোয় ফিরে এল । বিকেল হয়ে আসছে । আকাশে জমাট মেঘ । রাত্রে ভারী বৃষ্টি হবে ।

ফরেস্ট বাংলোর বারান্দায় বসে বৃষ্টি দেখা একটা দারুণ অভিজ্ঞতা । সঙ্কের মুখ থেকে তুমুল বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল । সুন্দরের জন্য চিন্তা হচ্ছিল অর্জুনের । বেচারা ভিজে যাবে একদম, অসুখ হওয়া বিচ্ছিন্ন নয় । পাশের বেতের চেয়ারে বসে মেজর আফ্রিকান ভাষায় একটা বর্ষার গান গাইছিলেন গুণ্ডুন করে । একটু আগে তিনি বলেছেন ফরেস্ট বৃষ্টি দেখলেই তাঁর আফ্রিকার কথা মনে পড়ে । হয়তো কোনও গঞ্জের ভূমিকা ছিল সেটা, কিন্তু কেউ প্রশ্ন না করায় গানে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছেন ।

হঠাৎ অমল সোম জিজ্ঞেস করলেন, “আচ্ছা মেজর, এই গানের কবির নাম কী ?”

“খনাতিক মোজাস্বা । যে নৌকোয় চড়ে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরতাম, তার মাঝি ছিল লোকটা । অথচ কবিতা লিখলে নির্ঘাত নোবেল পেয়ে যেত আব্দিনে । লাইনটা শুনুন, ‘হে বৃষ্টি, মেঘ না থাকলে তোমার অস্তিত্ব নেই যেমন, আমার দুঃখগুলোরও কোমও মূল্য নেই আমি না থাকলে ।’ বিউটিফুল । কী বলেন ?” মেজর জিজ্ঞেস করলেন ।

“সত্যিই ভাল । কিন্তু বৃষ্টির জন্যই বারান্দায় পোকা বাঢ়ছে । আমরা যদি তাড়াতাড়ি খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়ি, তা হলে কারও অসুবিধে আছে ?” অমল সোম জানতে চাইলেন প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে ।

“শুয়ে পড়ব । সবাই মিলে ?” মেজর অবাক !

“হ্যাঁ । কেন ?”

“আমাদের সতর্ক থাকা উচিত নয় কি ? নীল চ্যাটার্জি তার বন্ধুর হেনস্থার বদলা নিতে এখানে আসবে না ? যা ফেরোসাম লোক !” মেজর কথা শেষ করেই কানখাড়া করলেন । বৃষ্টির আওয়াজ ছাপিয়ে একটা গাড়ির আওয়াজ ভেসে আসছে । তারপরেই দূরে হেডলাইটের আলো দেখা গেল, আবছা ।

মেজর উঠে দাঁড়ালেন, “আমার অন্তর্টা নিয়ে আসি ।” তিনি দ্রুত ঘরে ঢুকে

গেলেন ।

বৃষ্টি মাথায় নিয়ে গাড়িটা একেবারে বাংলোর গায়ে এসে থামল । দরজা খুলে কে ভেতরে চুকে গেল, ওপর থেকে বোৰা গেল না । কিন্তু তৎক্ষণাতে সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ হল । ওরা দেখল চৌকিদার দৌড়ে উঠে এসেছে, “সাব, নীলবাবু এসেছেন, দেখা করতে চান ।”

অমল সোম বললেন, “নিয়ে এসো ।”

চৌকিদার নেমে গেলে অমল সোম বললেন, “ছেলেটা মোটেই মাথামোটা নয় ।”

নীল উঠে এল । বৃষ্টির জল তার জ্যাকেটে লেগেছে । ওপরে এসে হাতজোড় করে বলল, “নমস্কার । আপনাদের কি বিরক্ত করলাম ?”

অমল সোম বললেন, “মোটেই নয় । বসুন ।”

চেয়ার টেনে পা ছড়িয়ে বসল নীল, “আরে, আপনারা নির্জেদের পরিচয় দেবেন তো, কীরকম মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়ে গেল বলুন তো ! আপনি তো অর্জুন ? আমি আপনার ফ্যান । সেই লাইটারের আমল থেকে । আপনার বাংলাদেশে গিয়ে রহস্য উদ্ধারের শেষটা অবশ্য আমাকে টানেনি । যাকগে, আমি এলাম অনেকটা দিদির চাপে । যা হয়েছে সব ভুলে যান । এনজয় ইওর ট্রিপ ।”

“অনেক ধন্যবাদ ।”

“শুনলাম আপনারা নাকি একটা ফুলের খোঁজে এসেছেন, যা বিষের গন্ধ ছড়ায় । ইন্টারেস্টিং । এ-ব্যাপারে যদি আমার সাহায্য দরকার হয়, তা হলে বলবেন ।”

“নিশ্চয়ই বলব ।” অমল সোম শাস্ত্র গলায় বললেন ।

“তা হলে আজ চলি । আপনারা গঞ্জ করুন । নমস্কার ।” হঠাতে উঠে দাঁড়িয়ে সিঁড়ির দিকে চলে গেল নীল । তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে অর্জুনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, “আপনি যে ম্যাজিক জানেন, তা কখনও পড়িনি তো ! আমার নির্বোধ বন্ধু যা করেছে তার উপযুক্ত শাস্তি দিয়েছেন আপনি । হাত নেড়ে আগুন জ্বালাতে এদেশের সাধু-সন্ন্যাসীরা এককালে পারতেন । অবশ্য আমেরিকানরা বোতাম টিপে সেটা করতে পারে । নমস্কার ।”

দ্রুত চলে গেল নীল । তারপরেই গাড়িটা পাক থেয়ে ফিরে গেল । সে উঠে এসেছিল গাড়ির হেডলাইট না নিভিয়ে । জায়গার অঙ্ককার আরও বেড়ে গেল ।

অমল সোম হেসে জিজ্ঞেস করলেন, “কিছু বুৰাতে পারলে অর্জুন ?”

অর্জুন মাথা নাড়ল, “না । এ যে দেখছি একদম উলটো ব্যবহার ।”

“হ্যাঁ । আমি যা ভেবেছিলাম, নীলবাবু তার অনেক বেশি বুদ্ধিমান । উনি এসে এই বৃষ্টির মধ্যে জানিয়ে গেলেন আমাদের সম্পর্কে সমস্ত খবর ওঁর মেওয়া

হয়ে গিয়েছে । ”

মেজর বেরিয়ে এলেন, “আমার মনে হয় ছেলেটা ভয় পেয়েছে । বন্ধুকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছি দেখে বুঝতে পেরেছে ওরও ওই একই অবস্থা করব আমরা । ”

অমল সোম উঠে পড়লেন, “ভয় পেয়েছে কিনা জানি না, তবে অর্জুন যে বোতাম টিপে আগুন জ্বালিয়েছিল, সেটা ধরতে পেরেছে নীলবাবু । আর আপনি যে আমেরিকায় থাকেন, সেই খবর নিশ্চয়ই ওর জানা হয়ে গেছে । ”

সন্ধের পরই রাতের খাবার দেওয়া হল । কিন্তু অর্জুন খেল না । সে বলল, “এখন আমার একটুও খিদে পাচ্ছে না, আপনারা খেয়ে নিন, আমি পরে খাব । ”

মেজর তাই শুনে খাওয়ার সময়টা পিছিয়ে দিচ্ছিলেন, কিন্তু অমল সোম সেটা করতে দিলেন না । ওঁরা যখন নীচের খাবার ঘরে যাচ্ছেন, তখন দোতলার বারান্দায় বসে অর্জুন বৃষ্টি দেখছিল । যদিও তার মন পড়ে ছিল জঙ্গলের মধ্যে । শালগাছ-ঘেরা, জায়গাটায় নিশ্চয়ই এখন বৃষ্টির জল চুকে পড়েছে । বেচারা সুন্দর ! অন্যায়ের সঙ্গে হাত মেলাবে না বলে এই শাস্তি পেতে হচ্ছে ওকে । নীল চ্যাটার্জি যখন তাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করল, তখন সে সুন্দরের কথা ওকে বলতে পারত । অর্জুনের অনুরোধ হয়তো নীল রাখত । কিন্তু— । না, তাতে সুন্দরেই ক্ষতি বাঢ়ত । ওর মুখে থর শিকারের কাহিনী অর্জুনরা জেনে গিয়েছে, তা বোঝার পর নীল আর পিছিয়ে যেত না । বরং সুন্দর যে এ অঞ্চলে আছে তা জেনে যেত ।

সুন্দরকে সে রাত্রে এখানে আসতে বলেছে । সেই কারণে অমল সোম বলা সঙ্গেও রাতের খাবার খেল না সে । এমন বৃষ্টির রাত্রে চৌকিদার বাবুটি বেশিক্ষণ জেগে থাকবে না । তখন সুন্দর এলে খাবারটা ওর সঙ্গে ভাগ করে খেতে পারবে । অর্জুন দেখল বাবুটি ওর খাবার ওপরে নিয়ে আসছে । শোওয়ার ঘরের টেবিলে যত্ন করে ঢেকে রেখে নেমে গোল ।

অমল সোম এবং মেজর খাওয়া শেষ করে ওপরে উঠে এলেন । মেজর বললেন, “‘খেতে পেলেই শুতে চায়’ কথাটা আমার ক্ষেত্রে খুব খাটে । ভীষণ ঘূর্ম পাচ্ছে । ”

“শুয়ে পড়ুন । ” অর্জুন বলল ।

“আফ্রিকাতেও তাই করতেন ?” অমল সোম জিজ্ঞেস করলেন ।

“আফ্রিকা নয় । গ্রিনল্যান্ড থেকে একশো কিলোমিটার উন্তরে বরফের ওপর তাঁবু খাটিয়ে তিন রাত ছিলাম । তখন শুধুই রাত । সময় বুঝতে হলে ঘড়ি দেখতে হত । বিকেল পাঁচটাৰ সময় থেয়েদেয়ে প্লিপিং ব্যাগের ভেতর চুকে যেতাম । আমার সঙ্গে ছিলেন এক বৃদ্ধ বিজ্ঞানী, স্ট্যানলি স্টিভেনসন । স্ট্যানলির ঘূর্ম আসত না । সে জেগে জেগে হাওয়ার শব্দ শুনত । হাওয়াদের

নাকি নিজস্ব ল্যাঙ্গুয়েজ আছে । ”

“থাকতে পারে । আমি চললাম । ” অমল সোম নিজের ঘরে চুকে গেলেন ।

সেদিকে তাকিয়ে মেজর বললেন, “অমলবাবুর বয়স হয়ে যাচ্ছে, অল্পতেই টায়ার্ড হয়ে পড়েন । যাই, আমিও যাই । ” হাই তুলতে তুলতে নিজের ঘরে চলে গেলেন মেজর ।

মিনিট পাঁচকের মধ্যেই নাক ডাকার আওয়াজ ভেসে এল । মেজর ঘুমাচ্ছেন ।

সঙ্গে সাড়ে সাতটা নাগাদ বৃষ্টির তেজ আরও বাঢ়ল । পোকার জন্য আলো নিভিয়ে দিয়েছিল অর্জুন । জঙ্গলে বাতাসের তুমুল লড়াই চলছে । তার আওয়াজ অবশ্য মেজরের নাসিকাগর্জনের ওপরে । নীচের আলোগুলো নিভে গেল । তার মানে বাবুটি, চোকিদার তাদের কাজ শেষ করে শুয়ে পড়ল ।

বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে । এক মুহূর্তের জন্য গাছপালা নেগেটিভ ছবি হয়েই মিলিয়ে যাচ্ছে ।

“বাবু । ” চাপা গলায় ডাকটা ভেসে এল ।

চমকে মুখ ফেরাতেই অন্ধকারে ঝাপসা শরীরটা নজরে এল ।

“সুন্দর ! ” ফিসফিস করল অর্জুন ।

“হ্যাঁ বাবু । ”

অর্জুন তাজ্জব ! কখন নিঃসাড়ে লোকটা খুঁটি বেয়ে দোতলার বারান্দায় উঠে এসেছে, তা সে টের পায়নি । অথচ সে সুন্দর কোন পথে আসবে তাই অনুমান করার চেষ্টা করছিল ।

“তুমি তো ভিজে গেছ ? ”

“হ্যাঁ বাবু । ”

“এসো । ”

প্রায় নিঃশব্দে ওরা ঘরে চুকল । আলো জ্বালল না প্রথমে । মেজরের নাক ডাকছে । বড় তোয়ালেটো অর্জুন সুন্দরের হাতে দিয়ে বলল, “ওটা বাথরুম । ওখানে চুকে এটা পরো । ”

সুন্দরের হাতে একটা প্যাকেট ছিল । প্যাকেটটা প্লাসটিকের । সেটা টেবিলের ওপর রেখে যখন তোয়ালে নিল, তখন বাইরে বিদ্যুৎ চমকাল । অর্জুন দেখল তার শরীর পুরো জলে ভেজা ।

“ওটা কী ? ”

“আমার জামা । বৃষ্টির জন্য । ”

“ও, যাও । ”

সুন্দর বেরিয়ে এল চটপট । অর্জুন খাবার খুলল । তারপর নিজে যতটা সন্তুষ্ট কর নিয়ে বাকিটা সুন্দরকে দিয়ে দিল । বুড়ুষ্ট মানুষ কীভাবে খায় তা

অনুমান করল অর্জুন । খাওয়া শেষ করে জল খেয়ে সুন্দর ফিসফিস করল,
“কে ইনি ?”

“মেজর । তোমার কোনও চিন্তা নেই ।”

“জঙ্গলে একটা বুড়ো বাঘ আছে, ঘুমিয়ে পড়লে ওইভাবে নাক ডাকে ।”

অর্জুনের হাসি পেল । মেজর শুনতে পেলে সুন্দরকে মেরে ফেলতেন ।
খাওয়ার পর ওরা বাইরে এসে বসল । সুন্দরের কোমর থেকে তোয়ালে
অঙ্ককারেও পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে রঙের ঔজ্জল্যের জন্য । অর্জুন জিজ্ঞেস
করল, “খুব ভিজেছ ?”

“না । গাছের ঘরে তেমন জল পড়েনি । এখানে আসতে গিয়ে ভিজে
গেলাম ।”

“তোমার নীলবাবু এসেছিল এখানে ।”

“অ্যাঁ ? নীলবাবু !” চমকে উঠে দাঁড়াল সুন্দর ।

“অর্জুন, ওকে বলো ভয়ের কোনও কারণ নেই ।” পেছন থেকে নিচু গলা
ভেসে এল । তারপরই অমল সোম এগিয়ে এসে চেয়ার টেনে বসলেন,
“ব’সো । তোমার নাম সুন্দর ?”

“আজ্জে হ্যাঁ ।”

অর্জুন বলল, “সুন্দর, ইনি আমার দাদা ।”

“অ ।”

অমল সোম বললেন, “তুমি নীলবাবুকে এত ভয় পাচ্ছ কেন ?”

“কথার অমান্য করেছি উনি মেরে ফেলবেন ।”

“সে কী ! এর আগে কখনও মেরেছেন ?”

“হ্যাঁ । জঙ্গলে লাশ পাওয়া যায় ।”

“খুন ?”

“ঠিক বলতে পারব না । শরীরে কোনও চিহ্ন থাকে না । রক্ত বের হয়
না ।”

“কতজন এভাবে মারা গিয়েছে ?”

“অন্তত পাঁচজন ।”

“থানা থেকে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি ?”

“না । পুলিশ বলে প্রমাণ নেই কে মেরেছে !”

“হ্যাঁ । তুমি তো পাখি শিকার করো ?”

“করতাম বাবু, এখন ছেড়ে দিয়েছি ।”

“ও । তা জঙ্গলের নাড়িনক্ষত্র তো জানো ?”

“তা জানি ।”

“সেরাও-এর নাম শুনেছ ?”

“সেরাও ?”

তখনই অর্জুনের মনে পড়ে গেল। সে উত্তেজিত গলায় বলল, “সুন্দর, বিকেলে তুমি যাকে থর বলছিলে, তারই ভাল নাম সেরাও।”

সুন্দর বলল, “হ্যাঁ চিনি।”

অমল সোম জিজ্ঞেস করলেন, “কী কারণে এই প্রসঙ্গ উঠেছিল অর্জুন?”

অর্জুন জবাব দিল, “নীলবাবু ওকে থর শিকার করতে বলেছে, অন্তত থর কোথায় আছে তার খবর দিতে হবে। সুন্দর রাজি হয়নি বলে জঙ্গলে লুকিয়ে আছে।”

অমল সোম বললেন, “গুড়। সুন্দর, সেরাও কোন অঞ্চলে থাকে?”

“পাহাড় আর জঙ্গলের মাঝামাঝি জায়গায় ওদের দেখেছি।”

“আমি জানি বঞ্চার পাহাড় থেকে এদিকের ভূটানের পাহাড় পর্যন্ত ওদের দেখা যায়। ওরা কখনওই পাহাড়ের বেশি ওপরে ওঠে না, আবার জঙ্গলের গভীরে ঢোকে না। তাই?”

“আমি অতটা জানি না বাবু।”

“সুন্দর, তুমি আমাকে থর খুঁজতে সাহায্য করবে?”

“আমি? না বাবু, আমি আর পাপ করব না।”

“তোমাকে কোনও পাপ করতে বলছি না। আমি কখনওই পশুপাখি মারি না। আমরা শুধু ওদের লক্ষ করব, ছবি তুলব, ব্যস ! এর জন্যে তুমি টাকা পাবে।”

“কিন্তু নীলবাবু?”

“সে যাতে জানতে না পারে, সেই ব্যবস্থা আমরা করব।”

সুন্দর এবার অর্জুনকে জিজ্ঞেস করল, “আপনি সঙ্গে থাকবেন তো বাবু?”

অর্জুন বলল, “নিশ্চয়ই।”

“ঠিক আছে। কিন্তু আপনাদের অনেকটা পথ হাঁটতে হবে।”

“কতটা?”

“তা এখান থেকে তিনপোয়া বেলা।”

“হাঁটব। মনে হচ্ছে বৃষ্টি মাঝরাত্রেই থেমে যাবে। ভোর ভোর বেরিয়ে পড়তে পারি।”

“কিন্তু—এখন জঙ্গল ভেজা থাকবে। পাতায়-পাতায় জেঁক বের হবে।”

“তা হলে?”

“একদিন রোদ উঠুক। গাছপালা ঠিক হোক, তারপর—”

“তোমার কি এখানে একদিন থাকার ইচ্ছে আছে?” অমল সোম জিজ্ঞেস করলেন।

“মিথ্যে কথা বলব না বাবু। নীলবাবুর বক্র আমার বউকে শাসিয়ে এসেছে। আমি তার বদলা নেব বলে এই জঙ্গলে এসেছি। উনি একা গাড়ি নিয়ে ঘূরতে ভালবাসেন। আমি এমন শাস্তি দেব...!” কথা শেষ করল না

সুন্দর ।

“সে এখন থানায় । তাকে কোথায় পাবে ?”

“থানায় ?”

“হ্যাঁ । আমরাই ওকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছি ।”

“হা ভগবান !”

“আফসোস কোরো না । তা ছাড়া কাউকে শাস্তি দেওয়া আইনের কাজ, তোমার নয় । তুমি আর পাপ করতে চাও না, ওটা করলে পাপ হবে ।”

“বেশ, তা হলে ভোরেই চলুন ।”

অমল সোম একটু চিন্তা করলেন, “না । কিছু জিনিসপত্র সঙ্গে নিতে হবে । আমরা এগারোটা নাগাদ বের হব । তুমি রাতটা এখানেই ঘুমিয়ে নাও । জঙ্গলে চুকে কোথায় খুঁজে পাওয়া যাবে বলো । অন্ধকার চলে গেলে সেখানে গিয়ে আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে ।”

“গাছবাড়ির কাছে পৌছতে পারবেন বাবু ?” অর্জুনকে জিজ্ঞেস করল সুন্দর ।

“গাছবাড়ি ? তার চেয়ে শেয়াল যেখানে ছিল, সেই জায়গাটায় যাওয়া সহজ ।” অর্জুন বলল ।

সঙ্গে সঙ্গে সুন্দর বলল, “তাই হবে । ওখানেই থাকব আমি । তবে এখন আমি চললাম । এখানে থাকতে সাহস হচ্ছে না বাবু ।” সে ঘরে চুকে গেল । তারপর নিজের ভেজা খাটো প্যান্টটা পরে প্যাকেটটা নিয়ে যেভাবে এসেছিল, সেইভাবেই নেমে গেল বাংলো থেকে ।

॥ তেরো ॥

ডুয়ার্সের বাষ্টি সম্পর্কে পল্লিতরাও কোনও পূর্বাভাস দিতে পারেন না । ওরা যখন আজ জঙ্গলের ভেতর দিয়ে হাঁটছিল, তখন আকাশ পরিষ্কার । গাছপালা এখনও ভেজা, কিন্তু পায়ের তলায় জল জমেনি । সুন্দর আগে-আগে যাচ্ছিল ।

বাংলো থেকে ওরা একসঙ্গে জঙ্গলে ঢেকেনি । মেজর এবং অর্জুন যেমন বেড়াতে যায় তেমনই একটু আগেভাগে বেরিয়েছিল । নুড়ির রাস্তাটা ধরে কিছুটা এগিয়ে ওরা জঙ্গলে পা রেখেছিল । অমল সোম এসেছিলেন মিনিট দশকে পরে । প্রত্যেকেই সঙ্গে একটা ব্যাগ অথবা প্যাকেট নিয়ে এসেছে । তাতে দু-একদিনের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র রয়েছে । মেজর বেশ উন্নেজিত । সুন্দরের কথা তিনি জানতেন না । একটু আগে অর্জুনের মুখে সব শুনে মাথা নাড়লেন, “মুশকিলে ফেললে আমাকে !”

“কেন ?” অর্জুন বুঝতে পারল না ।

“যেভাবেই হোক একবার না একবার ওই সুন্দরের মাথায় মারতে হবে

আমাকে। মার খেয়ে হজম করে যাচ্ছিলাম কে মেরেছে জানি না বলে।
জানার পর বদলা না নিলে নিজেকেই অসম্মান করব।”

“অসম্মান ?”

“হাঁ, মনে হবে আমি খুব ফালতু, শক্তিশীল, মুখ বুজে মার খেয়ে যাই।”

“কিন্তু সুন্দর তো জেনেগুনে আপনাকে মারেনি। অনুকার জঙ্গলে
আপনাকে শক্র ভেবে সে আত্মরক্ষা করতে চেয়েছিল। পরে আপনার জানহীন
শরীরটাকে পাহারা দিয়েছে। আমরা আপনাকে খুঁজতে গেলে সে-ই জায়গাটা
চিনিয়ে দিয়েছে। এটা ভাবুন।”

মাথা নাড়লেন মেজর, “সব ঠিক, কিন্তু...দেখি !”

শেষ পর্যন্ত বিকেল হয়ে এল। মাঝে মাঝে জঙ্গল এত ঘন যে, চলতে
অসুবিধে হচ্ছিল। তবে ভুটানের পাহাড় কাছে এসে পড়েছে, চোখেই দেখা
যাচ্ছে। অমল সোম সুন্দরের সঙ্গে তাল রেখে চলছিলেন। অর্জুন তাদের
পায়ে-পায়ে, মেজর মাঝে মাঝেই পিছিয়ে পড়ছেন। তাঁর পিছিয়ে পড়ার কারণ
নাকি বুটজোড়া। ওটা তিনি আফ্রিকার জঙ্গলে স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করতেন।
আজ জঙ্গলে অভিযান জেনে পায়ে গলিয়েছিলেন কিন্তু ডুয়ার্সের জঙ্গলে যে
আফ্রিকার জিনিস অচল, তা জানতেন না।

অর্জুন লক্ষ করছিল এতটা দূর জঙ্গল ভেঙে আসতে তেমন কোনও বন্য
প্রাণীর দেখা পাওয়া যায়নি। কয়েকটা বনমুরগি, খরগোশ এবং দুটো শেয়াল
ছাড়া কেউ ওদের সামনে আসেনি। গতকালের বৃষ্টির জন্য আজ ওরা যে-যার
ডেরায় লুকিয়ে আছে কিনা কে জানে ! কিন্তু উলটোটাই তো হওয়া উচিত।

অমল সোম বললেন, “দিন শেষ হওয়ার আগে আমরা যতটা সম্ভব পাহাড়ের
কাছাকাছি চলে যেতে চাই। এসব জায়গায় রাত কাটানো মোটেই আরামদায়ক
হবে না।”

সুন্দর বলল, “সাহেব ঠিক বলেছেন। তা ছাড়া রাত্রে বৃষ্টিতে ভেজা খুব
কষ্টের।”

মেজর চোখ বড় করলেন, “আকাশ দেখে মনে হচ্ছে না তিন দিনের মধ্যে
বৃষ্টি হবে। তবে আপনি যখন বলছেন মিস্টার সোম, তখন আমাদের হাঁটতে
হবেই।”

“আপনি কি টায়ার্ড ?”

“টায়ার্ড আমি কখনও হই না, একটু খিদে-খিদে ভাব হয়েছে এই যা।”

অমল সোম তাঁর ব্যাগে হাত ঢোকালেন। ব্যাগটা বেশ ভারী। তা থেকে
একটা বিস্কুটের প্যাকেট বের করে এগিয়ে দিলেন, “খেয়ে নিন।”

“আমি একা খাব কি !” মেজর লজ্জিত হলেন।

“যার-যার খিদে পেয়েছে, খাবে। জঙ্গলে সঙ্কোচের কোনও মূল্য নেই।
নিজেকে সুস্থ রাখাই বড় কথা।” বিস্কুটের প্যাকেটের মুখ খুলে নিজে একটা

নিয়ে মেজরের হাতে ধরিয়ে দিলেন। দেখা গেল খিদে কারও কম পায়নি।

খানিকটা এগোতেই গাড়ির শব্দ পাওয়া গেল। সম্ভবত ট্রাক চলছে। অমল সোম তাকালেন সুন্দরের দিকে, “এদিকে মেটরের রাস্তা আছে নাকি?”

“মাটির রাস্তা। জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে নিয়ে যাওয়ার জন্যে লাই চলে।”

“কতদূর গিয়েছে?”

“আমি দেখিনি।”

“চলো, একবার দেখা যাক, ট্রাকে কী যাচ্ছে?”

শর্টকাট পথ করে ওরা মিনিট পাঁচেক যেতেই রাস্তাটাকে দেখতে পেল। বোঝাই যাচ্ছে, ওই রাস্তা সচরাচর ব্যবহার করা হয় না। তারপরেই ইঞ্জিনের আওয়াজ শোনা গেল। দেখা গেল একটা খালি ট্রাক ফিরে যাচ্ছে। ড্রাইভার এবং খালাসি ছাড়া গাড়িতে কেউ নেই।

অমল সোম নিচু স্বরে বললেন, “খালি ট্রাক ফিরে যাচ্ছে। ওদের তো কাঠ বোঝাই করে নিয়ে যাওয়ার কথা। এমনি বেড়াতে নিশ্চয়ই আসেনি।”

অর্জুন বলল, “কোনও জিনিস্পত্র নিয়ে এসেছিল হয়তো।”

“হ্যাঁ। কোথায় গিয়েছিল?”

“দৌড়ে গেলে ট্রাকটাকে ধরা যায়।”

“নাঃ। তাতে কিছু লাভ হবে না। উলটে আমাদের অস্তিত্ব জানিয়ে দেওয়া হবে। চলো।”

মেজর চুপচাপ শুনছিলেন, “আমি একটা কথা বুঝতে পারছি না।”

“কী?” অমল সোম তাকালেন।

“এইরকম একটা রাস্তা থাকতে আমরা এত কষ্ট করে জঙ্গল ভেঙে এলাম কেন? একটা ট্রাক বা জিপ ভাড়া করে অনেক কম সময়ে চলে আসতে পারতাম।”

“পারতাম, যদি রাস্তাটার কথা জানা থাকত। জঙ্গলের ম্যাপে এই রাস্তাটার কোনও হদিস নেই। ব্যাপারটা খুবই ইন্টারেস্টিং। অবশ্য থাকলেও ওই রাস্তা না ব্যবহার করে আমরা ভাল করেছি। মেজর, কষ্ট করলেও তো কেষ্ট মেলে। চলুন।”

একটু আগেও ওরা খোলা মনে হাঁটিলি। অর্জুন গুনগুন করে গানও গেয়েছে। কিন্তু ওরা এখন নিঃশব্দে সর্তক-পায়ে হাঁটিলি। ভুটানের পাহাড়ের প্রায় গায়ে পৌঁছাতেই অন্ধকার নেমে এল জঙ্গল। সুন্দর চটপট তলাশি করে একটা জায়গা বাছল। সমতল থেকে জঙ্গল উঠে গেছে পাহাড়ে। ভুটান এবং ভারতবর্ষের মধ্যে কোনও দেওয়াল বা কাঁটারের বেড়া নেই। এ-দেশের মানুষ ওদেশে চলে যাচ্ছে পাসপোর্ট ছাড়াই। পাহাড়ের নীচে একটা চওড়া পাথর পড়ে ছিল। পাথরটার ওপরের দিক বেশ মসৃণ। ফুট-দশেক হবে পাথরটা। যাথার ওপর একটা ঝাঁকড়া গাছ আছে।

অমল সোমেরও পছন্দ হল পাথরটা । রাত্রিবাসের পক্ষে ভালই । অঙ্গ বৃষ্টি হলে গাছ তাদের রক্ষা করবে, আবার মাটিতে ঘোরা জীবজন্তু সহজে নাগাল পাবে না । তিনি মেজরকে বললেন, “প্রাকৃতিক কাজকর্ম সেরে উঠে পড়ুন ওপরে ।”

মেজর বললেন, “আগে জানলে তাঁবু সঙ্গে আনতাম ।”

অর্জুন বলল, “সেটা আনলে মন্দ হত না । তাঁবুতে থাকা একটা দারুণ ব্যাপার !”

মেজর বললেন, “তোমাকে নিয়ে একবার আফ্রিকায় যাব । দেখবে কী খিল ।”

ওপরে উঠতে মেজরের একটু কষ্ট হল । ভারী শরীরটাকে টানা-হ্যাঁচড়া করে তুলতে অর্জুনের সাহায্য নিতে হল । ওঠার পর হাত-পায়ের জড়তা ছাড়াতে কয়েকবার শুন্যে ছাঁড়ে বললেন, “ফ্যান্টাস্টিক । শুধু যদি চাঁদ উঠত আজ রাত্রে !”

অর্জুন দেখল আকাশের নীল এখন হারিয়ে যাচ্ছে । পাতলা মেঘের আঙ্গুরণ ছড়াতে শুরু করেছে । বৃষ্টি যতক্ষণ না থামছে ততক্ষণ এই পাথরের বিছানা বেশ আরামদায়ক । নীচে একটা আড়াল দেখে আগুন জালিয়েছে সুন্দর । অমল সোমের সঙ্গে তর্ক চলছে তার । অর্জুন পাথরের ধারে এসে কান পাতল । সুন্দর বলছে, “সাহেব, আপনি আমাকে আধঘণ্টা সময় দিন, আমি চারটে মুরগি ধরে আনছি । এই মুরগিগুলো রাত্রে ভাল দেখতে পায় না । এদিকে মানুষজন আসে না বলে ওদের পেতে অসুবিধে হবে না ।”

অমল সোম বললেন, “কোনও দরকার নেই । আমার সঙ্গে ড্রাই ফুডের কোটো রয়েছে । টিন-ফিশের কোটো খুলে একটু গরম করে নিলে দিব্যি চলে যাবে । সঙ্গে একটু কফি করে নেওয়া যাক ।”

অর্জুন বলল, “অমলদা, ও যখন বলছে ধরে আনতে পারবে, তখন টিন-ফিশগুলো কালকের জন্যে থাকলে মন্দ হয় না !”

অমল সোম ওপরের দিকে তাকিয়ে বললেন, “প্রাণী-হত্যা করতে চাও ?”

“বাংলোয় বসেও তো আমরা মুরগি খেয়েছি ।”

“ঠিক আছে । একটু কফি খেয়ে নেওয়া যাক ।”

অমলদার ব্যাগে যে কফি বানাবার সরঞ্জাম ছিল, অর্জুন জানত না । প্লাস্টিকের প্লাসে লাল গরম কফি খুব ভাল লাগল । আগুন নিভিয়ে দিয়ে নিজের ঘোলা নিয়ে সুন্দর ঢুকে গেল জঙ্গলে । অমল সোম পাথরের ওপরে উঠে এলেন, “জায়গাটা দেখছি ভালই ।”

শেষ চুমুক দিয়ে প্লাস্টিক ফেলে দিতে গিয়ে সামলে নিলেন মেজর । পাশে রেখে জিজ্ঞেস করলেন, “আমরা ঠিক কীসের অভিযানে এসেছি মিস্টার সোম ?”

“এটাকে কি অভিযান বলা যায় ?”

“তো কী ? জঙ্গলে রাত কাটানো, মাইলের পর মাইল হাঁটা । আমি খুব দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি, আপনি কিন্তু বিষাক্ত ফুল খুঁজতে আমাকে সাহায্য করছেন না ।”

“কীভাবে করব সেটাই তো বুঝতে পারছি না । প্রথম কথা, এখানে কেউ বলল না ওরকম ফুলের কথা আগে শুনেছে । জঙ্গলে তো অনেক ঘোরাঘুরি হল, সেই রকম ফুলের অস্তিত্ব নজরে পড়ল না । আমার মনে হয় কেউ মনগড়া গল্প প্রচার করেছে ।”

“তার কী-লাভ ?” মেজর প্রতিবাদ করলেন ।

“গুজব যারা ছড়ায়, তারা কি সব সময় নিজের লাভের কথা চিন্তা করে ?”

“আমি কিন্তু এত সহজে ছাড়ছি না । সমস্ত পৃথিবীর লোক ভগবান ভগবান করে মরছে, ভগবানকে কেউ চোখে দ্যাখেনি বলে সেটাকে মিথ্যে বলে বাদ দিচ্ছে না তো !”

“ভয়ে ।”

“ভয়ে, মানে ?”

“ভগবান না থাকলে মানুষের আর কিছুই থাকবে না ।”

মেজর গুম মেরে গেলেন । অর্জুন জিজেস করল, “আমরা ক' দিন জঙ্গলে থাকব ?”

“কালই ফিরে যেতে পারি । আমি একটা সেরাও ধরতে চাই ।”

“সেরাও ?” মেজর অবাক হলেন ।

“হ্যাঁ । পাহাড়ি ছাগল । খুব বিরল প্রজাতির । ওর আঞ্চলিক নাম থৰ । যেহেতু ওরা আমাদের বনাঞ্চলে খুব কম আসে, তাই বনবিভাগ সরাসরি কিছু করতে পারছে না । ওরা সাধারণত ভুটানের পাহাড়ের নীচের দিকে ঘোরাফেরা করে । হঠাৎ এই নিরীহ প্রাণীটির চাহিদা পশ্চিমের বাজারে বেড়ে গিয়েছে । ফলে আমাদের দেশের লোভী মানুষেরা আরও বড়লোক হওয়ার নেশায় মেতে উঠেছে । ভুটানের রাজাও চাইছেন ওদের রক্ষা করতে । কিন্তু ওদের সংখ্যা কত, ঠিক কোথায় থাকে, তাও কারও জানা নেই । আর জায়গাটা যেহেতু দুই দেশের সীমান্ত অঞ্চল, তাই বিধিনিষেধের বেড়া টপকানো মুশকিল হয়ে গিয়েছে । আমি, যদি কপালে থাকে, একটা সেরাও ধরব । তারপর তাদের দলের সন্ধান পেতে অসুবিধে হবে না ।” অমল সোম বললেন ।

অর্জুন বলল, “ওদের তো অনেক দল থাকতে পারে ।”

“অনেক হলে তো সংখ্যায় ভারী হবে । দল কত তা জানা যাচ্ছে না ।”

“আপনাকে কী করতে হবে ?”

“একটা রিপোর্ট দিতে হবে । সেরাওদের কীভাবে সংরক্ষণ করা যায় এবং চোরাশিকারিদের হাত থেকে বাঁচানোর উপায় কী, তা জানাতে হবে

সরকারকে ! ”

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “ব্যাপারটা যখন সরকারি, তখন তো আপনি প্রকাশ্যে দলবল নিয়ে আসতে পারতেন। এই রিপোর্ট দুটোর জন্যে গোপনীয়তার কোনও দরকার ছিল কী ? ”

“ছিল। প্রথমত...” অমল সোম থেমে গেলেন। জঙ্গলে তখন গভীর অঞ্চলকার নেমে গেছে। কিন্তু তার মধ্যেই অজন্ম জোনাকি দাপিয়ে বেড়াচ্ছে চারদিকে। পাথরাও চুপ করে গেছে অনেকক্ষণ। কিন্তু মাঝে মাঝেই অন্তুত ডাক ডেসে আসছে। এই ডাক কোনও পরিচিত জানোয়ারের নয়। কী রকম গা ছমছমে হয়ে উঠছিল পরিবেশ।

হঠাতে মেজের ফিসফিস করে বলে উঠলেন, “ল্যাঙ্গো। ”

“সেটা কী জিনিস ? ” অর্জুন জানতে চাইল।

“অন্তুত জীব। একে আমি দেখেছি ব্রাজিলে। ডুয়ার্সে এল কী করে ? ”

“কী রকম দেখতে ? ”

“শেয়াল, হায়েনা, নেকড়ে পাহাড় করলে যেমন দাঁড়ায়, মুখটা কিছুটা বুলডগের মতো। ”

“বুনো কুকুর ? ”

“তা বলতে পারো। খুব হিংস্র হয়। বড় দলে থাকলে বাঘও ওদের এড়িয়ে চলে। চোয়াল খুব শক্ত। এই পাথরের ওপর লাফিয়ে উঠতে পারবে বলে মনে হয় না। ”

অমল সোম বললেন, “আপনার কলমটাকে হাতের কাছে রাখুন। দরকার হলে পুড়িয়ে দেবেন। একটা পুড়লে আর কেউ আসবে না। ”

ল্যাঙ্গো ডেকে যাচ্ছিল। বেশ করুণ ডাক। সম্ভবত সঙ্গীদের সন্ধান করছে। অর্জুনের মনে হল রাত না নামলে জঙ্গল রহস্যময় হয় না। কিন্তু সুন্দর তো এখনও ফেরেনি। সে যদি ওই ল্যাঙ্গোর সামনে পড়ে? তার মনে অস্বস্তি চুকল।

অমল সোম বললেন, “হ্যাঁ, যে-কথা বলচ্ছিলাম। প্রথমত, সরকারি দল আমাকে ইচ্ছেমতন সেরাও দেখাতে পারত না। ওরা জনপদ এড়িয়ে চলে। দুই চোরাশিকারিয়া আমাদের অস্তিত্ব জেনে যেতই এবং নিজেদের ক্রিয়াকলাপ বন্ধ রাখত। তাই আমি এখানে এসে একজন লোকাল লোকের খেঁজ করচ্ছিলাম, যে কখনও সেরাও দেখেছে। তি এফ ও বলেছিলেন হাদিস দেবেন। কিন্তু গতকাল পর্যন্ত সে রকম কারও সন্ধান তিনি পালনি। তখন ভাবলাম, নিজেরাই জঙ্গলে ঘূরব। এই সময় তোমার সুন্দরবাবুর খবর পেলাম। ”

“এই চোরাশিকারিদের, যারা সেরাও এক্সপোর্ট করতে পারে, তাদের সন্ধান পেয়েছেন ? ”

“না । অনুমানের ওপর নির্ভর করে আমি কখনও সিদ্ধান্ত নিইনি ।”

“তা হলে সুন্দরকে পেয়ে আমাদের লাভ হয়েছে, বলুন ।”

“অবশ্যই ।”

“সুন্দর পাখি ধরত, বিক্রি করত । আমার কথা শোনার পর লোকটার মধ্যে সত্যিই পরিবর্তন এসেছিল । কিন্তু নীলবাবু ওকে অন্য একটি কাজের দায়িত্ব দিলেন । ওকে সেরাও ধরতে হবে । বুঝতেই পারছেন বিদেশে সেরাও এক্সপোর্ট করা নীলবাবুর পক্ষে সন্তুষ্ট ।”

“এসব হয়তো সত্যি, কিন্তু প্রমাণ করতে পারবে না । সুন্দর যে বানিয়ে বলছে না, তারই বা প্রমাণ কী ? কোনও অন্যায় করে ও হয়তো জঙ্গলে লুকিয়ে আছে ।”

“কার কাছে অন্যায় করবে ?”

“আমি জানি না । শুধু বলতে চাইছি প্রমাণ ছাড়া কোনও কিছু, কাউকে বিশ্বাস করতে পারবে না ।” অমল সোম চুপ করতেই পাতার শব্দ হল । মেজের হাত উঁচু করলেন । অঙ্ককারেও, বোঝা গেল সেই হাতের মুঠোয় কলমটি ধরা রয়েছে ।

“কে, সুন্দর ?” অমল সোম জিজ্ঞেস করলেন ।

“হ্যাঁ, সাহেব । দুটো ধরেছি । বেশ বড়সড়, চারজনের হয়ে যাবে ।”

“কোথায় পেলে ?”

“ওই পাহাড়ের খাঁজে । সিকি মাইল দূরে । কিন্তু সাহেব, আপনারা আস্তে কথা বলুন । আমি দূর থেকে শুনতে পাচ্ছিলাম ।”

“কেন ?”

“জঙ্গলে লোক চুকেছিল । এখনও আছে কিনা জানি না, আমি এই প্যাকেটটা কুড়িয়ে পেয়েছি পাহাড়ের গায়ে । খেয়ে দেখুন, একেবারে টাটকা । হয়তো কারও পকেট থেকে পড়ে গিয়েছে ।” সুন্দর প্যাকেটটা ওপরে ছুঁড়ে দিল । অর্জুন কোনওমতে ধরে ফেলল । যত অঙ্ককারই হোক আকাশ একটু চোরা আলো পাঠায় । মেজের চাপা গলায় বললেন, “শাবাশ ।”

প্যাকেটটা দেখে অর্জুন বলল, “ডানহিল । অর্ধেকের বেশি সিগারেট আছে ।”

অমল সোম বললেন, “হঁ । এদিকের লোকের ডানহিল পাওয়ার কথা নয় ।”

ওদিকে সুন্দর বসে গিয়েছে মুরগি নিয়ে । অত দ্রুত মুরগি ছাড়িয়ে কাউকে আগুন জ্বালাতে দেখেনি সে । দুটো লম্বা কাঠির মধ্যে একটা কাঠি আড়াআড়ি পেতে তার তলায় আগুন জ্বালিয়ে দিল সুন্দর । তারপর মুরগি দুটোকে আড়াআড়ি কাঠির মধ্যে কায়দা করে ঝুলিয়ে দিল । দিয়ে বলল, “বড় জেঁক হয়েছে জঙ্গলে । কাল জল হওয়ায় ওদের বাড় বেড়েছে ।”

সঙ্গে-সঙ্গে ওরা তিনজন নিজেদের প্যান্ট-শার্ট-জুতো পরীক্ষা করতে লাগল। না, জোঁক কারও শরীরে হানা দেয়নি। নিবিষ্ট হয়ে মুরগি ঝলসাছিল সুন্দর। বেশ পাকা হাতের কাজ। মিনিট কুড়ি লাগল। তারপর এক-একটা মুরগি দুটুকরো করে ওপরে চালান করে দিয়ে বলল, “নুন কম লাগবে। তা আর কী হবে!”

অমল সোম বললেন, “আমার সঙ্গে নুন আছে। যার যেমন ইচ্ছে মাখিয়ে নাও।”

সুন্দর ওপরে উঠে এল। প্রায় পাঁচশো গ্রাম ঝলসানো মুরগির মাংসে কামড় দিয়ে অর্জুনের মনে হল, এর চেয়ে ভাল রোস্টেড চিকেন সে কখনও খায়নি।

ঠিক তখনই কয়েক হাত দূরে বীভৎস ডাকটা আচমকা শোনা গেল।

॥ চোদো ॥

চারজনের খাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। অর্জুন অন্ধকারে নড়াচড়া করতে দেখল প্রাণীটাকে। এই তা হলো ল্যাস্টো। পোড়া মাংসের গন্ধ পেয়ে চলে এসেছে।

অমল সোম বললেন, “একাধিক দেখছি। ওপরে উঠে আসবে না তো!”

সুন্দর বলল, “অ্যাই ! হ্যাট ! ভাগ এখান থেকে। মুরগি খাবে ! আমি কষ্ট করে ধরে আনলাম তোদের খাওয়াৰ বলে ?”

অমল সোম জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি এদের আগে দেখেছ ?”

“কুকুর। বনে থাকে এই যা। খুব বদমাশ।”

“ওপরে উঠে আসবে না তো ?”

“এতটা লাফাতে পারবে না। মাংস খেয়ে হাড়গুলো ফেলে দিন, তাতেই খুশি হবে !”

ল্যাস্টোগুলো সম্ভবত নীচে বসে পড়েছে। এভাবে কোনও ভাল খাবারও আরাম করে খাওয়া যায় না। মাঝে-মাঝে যখন হাড় ছুড়ে দেওয়া হচ্ছিল তখন সেটার জন্য ওরা একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ছিল। চিংকার, কামড়াকামড়ি শুরু হয়ে গেল।

খাওয়া শেষ হতে অর্জুন বুঝল পেট দারুণ ভরে গিয়েছে। এভাবে কোনও দিন সে শুধু ঝলসানো মাংস দিয়ে ডিনার করেনি। অমল সোমের ওয়াটার বটল থেকে সকলে তিন ঢোক জল রেশন হিসেবে পেল। অর্জুন তার ব্যাগ থেকে চাদর বের করে পাথরের ওপর বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। পাশে-বসা মেজের জিজ্ঞেস করলেন, “এই অবস্থায় তোমার ঘুম আসবে ?”

“আমরা তো বেশ নিরাপদেই আছি।”

“চোখ বন্ধ করলেই ওরা ওপরে উঠে এসে টুটি ছিড়ে ফেলবে।”

“তখন ঠিক জেগে যাব ।”

বাতাস বইছিল । মশার হাত থেকে বাঁচার জন্য অর্জুন মুড়ি দিয়ে শুল । ভগবান যদি আজকের রাতটায় বৃষ্টি না দেন, তা হলে বাঁচোয়া ।

ঘুম ভেঙে যাওয়া মাত্র মনে হল, আর রক্ষে নেই । কুকুরগুলো ওপরে উঠে এসেছে । গজরাছে আক্রোশে, এখনই ঝাঁপিয়ে পড়বে । কিন্তু কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেও যখন কিছু হল না, তখন খেয়াল হল । ধড়মড়িয়ে উঠে বসে পাশে তাকাতেই বুঝল, ওটা মেজরের নাসিকাগর্জন । অয়েরে ঘুমোচ্ছেন ভদ্রলোক । ডান হাত থেকে কলমটা খসে পড়েছে পাশে । ওটা তুলে নিল অর্জুন ।

ওপাশে অমল সোম এবং সুন্দর শুয়ে আছে । বিচিৰ সব আওয়াজ ভেসে আসছে জঙ্গল থেকে । এইসব শব্দাবলীর কোনও উৎস তার জানা নেই । সে নীচের দিকে তাকাল । ল্যাঙ্গেগুলো সভ্বত হতাশ হয়ে চলে গিয়েছে । আকাশ এখন তেমনই ছাইরঙ্গা মেঘে ছাওয়া । অর্জুন বাবু হয়ে বসল । তার খুব সিগারেট খেতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু অমলদার সামনে সে সিগারেট খাওয়ার কথা ভাবতেই পারে না । যদিও উনি এখন ঘুমোচ্ছেন, টের পাওয়ার সভাবনা নেই, তবুও । একবার মনে হল নীচে নেমে একটু আড়ালে গিয়ে সেবন করে আসে । কিন্তু এই রাত্রে সে-সাহস হল না । হঠাতে তার চোখ পড়ল পাথরের প্রাণে । কালোমতো কিছু নড়ছে । ধীরে-ধীরে উঠে আসছে ওপরে । ওটা যে একটা সাপ সেটা বুঝতে সময় লাগল । সাপটা এগিয়ে যাচ্ছে সুন্দরের দিকে । একটুও দেরি না করে সে মেজরের কলমের বোতাম টিপল । সঙ্গে-সঙ্গে সাপটার মাথায় আগুনের শিখা আছড়ে পড়ল । পড়ামাত্র সাপটা মোচড় খেয়ে বাটপটিয়ে নীচে পড়ে গেল ।

“কী হয়েছে ?” অমল সোমের গলা শোনা গেল ।

“সাপ উঠে আসছিল ।” অর্জুন তখন পাথরের কিনারে চলে গিয়ে নীচে তাকাচ্ছে । অন্ধকারে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না । সে কলমটা আবার সক্রিয় করল নীচের দিকে তাক করে । ঘাস এবং আগাছায় আগুন পড়ল এবং তারই আলোয় সে সাপটাকে দেখতে পেল । তখনও শরীর নড়ছে । এত মোটা এবং লম্বা সাপ সচরাচর দেখা যায় না । সে কলমের বোতাম অফ করা সঙ্গেও আগাছার আগুন নিভতে সময় লাগল । ভাগিস গতকালের বৃষ্টি মারাত্মক হয়েছিল, নইলে আগুন ছড়িয়ে পড়া অস্বাভাবিক ছিল না । সে ফিরে তাকাল । আকাশ একটু-একটু করে মেঘমুক্ত হচ্ছে । যদিও খুব উচু করলে গাছের পাতার আড়াল, তবু চারপাশের আকাশ দেখতে অসুবিধে হচ্ছে না । ওপাশে পাহাড় উঠে গেছে । হঠাতে অর্জুনের মনে হল, পাহাড়ের গায়ে কিছু নড়ছে । সে ভাল করে দেখার চেষ্টা করল । ঘন-ছায়া মাখা বলে কিছুই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না । কিন্তু সে নিঃসন্দেহে কিছু নড়তে দেখেছে ওখানে । বড়জোর একশো গজ দূরত্ব

হবে । অর্জুন চুপচাপ তাকিয়ে রইল । মিনিট দেড়েক বাদে একটা জন্ম উঠে দাঁড়াল পাহাড়ের গায়ে গেঁথে থাকা পাথরের ওপর । এখন তাকে অনেকটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে । জানোয়ারটা খুব চঞ্চল স্বভাবের । ঘাড় ঘুরিয়ে এপাশ ওপাশ দেখছে, মাঝে-মাঝেই লাফাচ্ছে ।

প্রথমে মনে হয়েছিল হরিণ, কিন্তু তারপরেই খেয়াল হল, সেরাও নয় তো । সে নিঃশব্দে অমল সোমের কাছে পৌঁছে গিয়ে মনু ধাক্কা দিল । অমল সোম জেগেই ছিলেন, চুপচাপ উঠে বসলেন । অর্জুন তাঁকে আঙুল তুলে দেখাতে তিনি উন্নেজিত হয়ে পড়লেন । তাড়াতাড়ি ব্যাগ থেকে একটা দূরবিন বের করে চোখে লাগালেন । এই অল্প আলোয় দূরবিন কাজ করে কিনা অর্জুন জানে না । কিন্তু অমল সোম চাপা গলায় বললেন, “ইয়েস । সেরাও । দ্যাখো ।”

অর্জুন দূরবিনটা নিল । জানোয়ারটা তখনও ফোটোগ্রাফারকে পোজ দেওয়ার ভঙ্গি করে দাঁড়িয়ে আছে । দূরবিনটা কিছুটা ঘূরিয়ে লক্ষ্যস্থলে নিয়ে যাওয়ামাত্র অনেকটা স্পষ্ট দেখতে পেল । ওর মন নিশ্চয়ই খুব ভাবুক প্রকৃতির, নইলে আকাশের দিকে মুখ করে কী দেখছে দুঁ-চোখ ভরে । পাথর, গাছ ইত্যাদি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, যদিও একটা নীলের আন্তরণ সামনে ছড়ানো । এই দূরবিনটা তা হলে সাধারণ নয় । হঠাতে কানের কাছে ক্লিক শব্দ হতে অর্জুন মুখ ফেরাল । ক্লিক ক্লিক ক্লিক । অমল সোম ছবি তুলে যাচ্ছেন । হঠাতে লাফ দিয়ে উধাও হয়ে গেল সেরাও ।

“যাবেন ?”

“পাগল ! এই অস্বকারে কোথাও খুঁজে পাবে না ওদের ।”

“কিন্তু আলো নেই, আপনি ছবি তুললেন কেন ?”

“এই ক্যামেরায় তোলা যায় । প্রিন্ট করার পর দেখাব । যাক, সুন্দর আমাদের ঠিক জায়গায় নিয়ে এসেছে । ও যখন ফিরে এসে বলল, এদিকে মানুষের আনাগোনা হয়েছে, তখনই মনে হয়েছিল লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে গিয়েছি । নাও, শুয়ে পড়ো ।”

অর্জুন শুয়ে পড়ল । পাশে মেজের তখনও প্রবল বিক্রমে নাক ডেকে যাচ্ছেন । ওপাশে সুন্দর মড়ার মতো ঘুমোচ্ছে । ওরা দুঁজনেই জানল না এখন কী হয়ে গেল । অর্জুন পাশ ফিরে শুয়ে কলমটা হাতের মুঠোয় লাগাল । বলা যায় না, পোড়া সাপটার যদি কোনও সঙ্গী থাকে, সতর্ক থাকাই ভাল । হঠাতে তার কানে অনেক ল্যাঙ্গের ডাক ভেসে এল । ওরা ডাকছে পাহাড়ের গায়ে । কে জানে, সেরাওটাকে ওরা দেখতে পেয়েছে কিনা । কিন্তু এই সেরাও একা কেন ? ওরা তো দল বেঁধে থাকে । দূরবিনে দেখে তার মনে হয়েছে ওরা খুব নিরীহ এবং অবলা । ঠিক ছাগলের মতো । ওর যে চাহিদা, তা কে বিশ্বাস করবে । বিদেশিরা কি ছাগল এবং সেরাও আলাদা করতে পারছে ? নিশ্চয়ই পারে, নইলে এত দাম হয় কী করে ?

ঠিক গালের মাঝখানে একটা বড় জলের ফোঁটা পড়ামাত্র অর্জুন উঠে বসল। বসে দেখতে পেল বৃষ্টি নেমে গেছে। যেহেতু ওরা একটা পাতায় ছাওয়া ঝাঁকড়া গাছের নীচে শুয়ে ছিল, তাই এতক্ষণ জল পড়েনি এখানে। কিন্তু বাকিরা উঠে পড়েছে আগেই।

মেজর বললেন, “ওঁ, তোমার ঘূম বটে ! বৃষ্টি পড়েছে টেরই পেলে না।”

অর্জুন অবাক হয়ে তাকাল। তার ঘূম ? মেজরই তো সারা রাত নাক ডেকে গেলেন।

অমল সোম বললেন, “বয়স অল্প, একটু ঘূম তো হবেই ! কিন্তু আমরা এখন কী করব ?”

সুন্দর বলল, “এরকম বৃষ্টি হলে এখানেও জল পড়বে !”

অর্জুন মুখ ফেরাল। ফোঁটা-ফোঁটা জল পড়েছে। বসে ভেজা ছাড়া কোনও উপায় নেই। অথচ মাঝরাত্রেও আকাশ দেখে মনে হচ্ছিল মেঘ সরে গেছে। বৃষ্টির জলের ফোঁটাগুলো খুব ঠাণ্ডা, শীত-শীত করছিল।

সুন্দর বলল, “বাবু, আপনার চাদরটা দিন।”

“কী করবে ?”

“মাথার ওপর তুলে ধরি, তাতে কিছুটা রক্ষে হবে।”

“এখানে কোনও আড়াল পাওয়া যাবে না ?”

“সেটা পেতে গেলে পাহাড়ে যেতে হবে। যাওয়ার আগেই ভিজে যাবেন। তা ছাড়া এখন ভোরের সময়। জানোয়ারুর এখন জলটিল খেতে বের হয়।”

মেজর বললেন, “ঠিক আছে। দাও তো হে চাদরটা। হ্যাঁ, চারজনে চার কোণে ধরো। ঠিক চাঁদোয়ার মতো হবে ব্যাপারটা। চারটে লাঠি থাকলে অবশ্য হাত দিয়ে ধরে থাকতে হত না। বাঁঁ, গুড়। আর জল পড়েছে না গায়ে। কী জিনিস কোন কাজে লেগে যায় কে বলতে পারে। এই যাঁ। আমার কলম ?” ককিয়ে উঠলেন মেজর। পকেট দেখতে গিয়ে চাদর ছেড়ে দিলেন অজান্তে। সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর শরীরটা চাদরে ঢেকে গেল।

অর্জুন বলল, “আপনার কলম আমার কাছে আছে।”

“ওঁ, বাঁচালে ! কিন্তু কী করে গেল ?”

“আপনি যখন ঘুমোচ্ছিলেন, তখন সাপ এসেছিল।”

“মাই গড়। তবে জানো তো, সাপ মানেই বিষধর বা হিংস্র নয়। বেশির ভাগ সাপ আক্রমণ করে ভয় পেয়ে। সাপের কোনও শৃঙ্খলাঙ্কি নেই। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে সাপ সম্পর্কে যেমন ‘মিথ’ চালু হয়েছিল, তার সঙ্গে বিজ্ঞানের কোনও সম্পর্ক নেই। একবার অতলাস্তিকের নীচে ডুবোজাহাজে যেতে-যেতে সাপ দেখেছিলাম। সে সাপ যদি তুমি দেখতে !” মেজর থামলেন। অর্জুন জানে এই থামার কারণ তিনি প্রশ্ন আশা করছেন। শ্রোতা প্রশ্ন করলেই গড়গড়িয়ে সেই সামুদ্রিক সাপের কাহিনী শোনাবেন। সে গভীর

গলায় বলল, “আপনার মাথার ওপর থেকে চাদর পড়ে গেছে ।”

“জানি হে । মনে হচ্ছে এইটে মোর কমফরটেবল । গায়ে তো জল পড়ছে না, দিব্যি মুড়ি দিয়ে বসে আছি ।” মেজের খুকখুক করে হাসলেন ।

চাদরটা ভিজে সপসপ করছে । সুন্দর মাঝে-মাঝে সেটা চিপে জল বের করে আবার মাথার ওপুর ধরছে । হাত টন্টন করলেও এখন এ ছাড়া উপায় নেই ।

বৃষ্টি থামল সকাল সাতটায় । তখনও জঙ্গলে পাতলা অন্ধকার মাথামাথি । ভিজে গিয়েছে চারজনেই । চাদরে মাথা মুছে অমল সোম বললেন, “এবার একটু চা হোক । আমার ব্যাগটাকে বাঁচাতে পেরেছি । ওহে সুন্দর, আগুন জ্বালো ।”

এখন জঙ্গলে শুকনো কাঠকুটো খুঁজে পাওয়া অসম্ভব ব্যাপার । ডেজা ডালে আগুন জ্বলবে না । সুন্দর তবু নেমে গেল পাথর থেকে । মেজের বললেন, “মুশকিল ।”

“কী হল ?” অমল সোম জানতে চাইলেন ।

“ভোরবেলায় চা খেলেই আমাকে প্রকৃতি ডাকে । এখানে সেটা কী করে সম্ভব হবে, বুঝতে পারছি না ।”

“কেন ? এখানে সারি সারি গাছের আড়াল, অসুবিধে হওয়ার কোনও কারণ নেই । আফ্রিকার জঙ্গলে কী করতেন ?”

“ওখানে টেন্ট ছিল । টেন্টের মধ্যে আলাদা টয়লেট ।”

“এখানে গাছের পাতাকে টয়লেট পেপার হিসেবে ব্যবহার করুন ।”

“জোঁক আছে যে । ডেঞ্জারাস জিনিস ।”

“জিনিস নয়, পোকামাকড় ।” অর্জুন হাসল ।

“তোমার হাসি পাচ্ছে অর্জুন ?” করুণ গলায় বললেন মেজের ।

অর্জুন বলল, “এসব সমস্যা কখনও আটকে থাকে না । প্রাকৃতিক ডাক এলে দেখবেন ঠিক ম্যানেজ করে নিতে পারছেন । কাল রাত্রে ওখানে সেরাও দেখেছি ।”

সব ভুলে গেলেন মেজের, “সেরাও ? ওখানে ? কখন ?”

“মাঝরাত্রে ।”

“আঃ ! আমাকে ডাকোনি কেন ?”

“আপনি ঘুমোচ্ছিলেন । অমলদা বেশ কয়েকটা ছবি তুলেছেন ।”

“কীরকম দেখতে ?”

“ঠিক ছাগলের মতো ।”

“ছাগল । তা হলে সেরাও বলে মনে হল কেন ? ওটা ছাগলও হতে পারে ।”

“এই বনে ছাগল চরে বেড়ায় না ।”

“ও । খুব মিস করেছি দেখছি । কেন যে ঘুমিয়ে পড়লাম !”

অর্জুন নীচে নামল । সাপটা আছে এখনও । একটা ডাল ভেঙে সেটাকে তুলতে চেষ্টা করল সে । এত ভারী যে, ডালটা বেঁকে যাচ্ছিল । ওপর থেকে অমল সোম বললেন, “সাক্ষাৎ মৃত্যুদৃত । থ্যাঙ্ক ইউ অর্জুন ।”

মেজর বললেন, “আমি ভেবেছিলাম জঙ্গলটা খুব নিরীহ, এখন দেখছি তা নয় । খুব ইন্টারেস্টিং । ল্যাঙ্গেগুলো মনে হয় ধারেকাছে নেই ।”

সুন্দরের ক্ষমতা অসাধারণ । এরই মধ্যে আধশুকনো কিছু ডালপালা জোগাড় করে এনে চা বানিয়ে ফেলল । মেজরকে দেখা গেল তার সঙ্গে ফিসফিস করে কথা বলতে । চা খেয়েই তিনি সুন্দরকে নিয়ে ছুটলেন ।

অর্জুন জিজেস করল, “আমরা কি পাহাড়ে উঠব ?”

অমল সোম মাথা নাড়লেন, “না । ওই ডানহিলের প্যাকেটটা যেখানে পাওয়া গিয়েছে, সেখানে একবার যাব । সকালেই যাওয়া উচিত ।”

পাততাড়ি গুটিয়ে রওনা হতে আরও মিনিট পঁয়তাঙ্গিশ লাগল । এখন আলো স্পষ্ট, কিন্তু সূর্য ওঠেনি । জঙ্গলের মধ্যে হাঁটতে অসুবিধে হচ্ছিল । অমল সোম এবং সুন্দর আগে যাচ্ছিলেন । মেজর তার পাশে হাঁটতে-হাঁটতে বললেন, “সকালের কাজটা যদি ভালভাবে সারা যায়, তা হলে তার মতো আনন্দ আর কিছুতেই নেই । কিন্তু তোমার দাদা এত বড় অভিযানে বেরিয়েছেন আমাদের কিছু না জানিয়ে, এটা ঠিক হয়নি । সঙ্গে খাবার, জল, বিছানা কিছুই আনা হয়নি । তোমার খিদে পাচ্ছে না ?”

“এখনও পায়নি ।”

“পেলে কী করবে ?”

“দেখা যাক ।”

মেজরের কথায় অর্জুনেরও মনে হল, ওদের তৈরি হয়ে আসা উচিত ছিল । এখনই যদি বাখলোয় ফিরে যাওয়া হত, তা হলে সমস্যা ছিল না । কিন্তু কে জানে, আজকের রাতও এখানে কাটাতে হবে কি না !

অমল সোম হাত তুলে ইশারা করলেন । অর্জুন এবং মেজর নিঃশব্দে এগিয়ে গেল । সামনের কিছুটা জায়গায় জঙ্গল ফাঁকা । গাছের আড়াল থেকে ওরা জায়গাটা দেখল । একটা সরু পথ ওপাশ থেকে এসে ফাঁকা জায়গায় শেষ হয়েছে । মিনিট পাঁচেক আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকার পর সুন্দর ঘাড় নাড়ল । অমল সোম বললেন, “অর্জুন, একবার গিয়ে দেখে এসো তো জায়গাটা । জঙ্গল কেটে জায়গাটা ন্যাড়া করা হয়েছে । সাবধান ।”

অর্জুন এগোল । পাশে সুন্দর । ফাঁকা জায়গায় পৌঁছে ওরা প্রথমে সরু রাস্তাটাকে দেখল । সন্দেহজনক কিছু নজরে পড়ল না । ফাঁকা জায়গার একধারে পাহাড়ের শুরু । সুন্দর অর্জুনকে আঙুল দিয়ে মাটি দেখাল । সেখানে জুতোর ছাপ স্পষ্ট । আর এই জুতোর দাগ বৃংষির আগে পড়েনি । পড়লে তার

ওপৰ জল থাকত । বৃষ্টি শেষ হওয়াৰ পৰি কেউ এখান দিয়ে হেঁটে গিয়েছে । একজোড়া জুতো নয়, দুটো জুতোৰ ছাপ দেখতে পেল সে । সোজা পাহাড়েৰ দিকে এগিয়েছে । পাহাড়েৰ কাছে পৌঁছে সে ছাপগুলোকে খুঁজে পেল না । পাথৱেৰ ওপৰ কোনও চিহ্ন পড়েনি ।

ওৱা ফিরে এল । সব শুনে অমল সোম নিচু গলায় বললেন, “তা হলো ওৱা একটু আগেই এখানে এসেছিল । এত ভোৱে ওই গাড়িৰ রাস্তায় কেউ এলৈ আমৱা ইঞ্জিনেৰ শব্দ পেতাম । ওৱা এখানেই কোথাও রাত্ৰে থেকেছে । আমাদেৱ খুব কাছাকাছি ওৱা রয়েছে ।” হঠাৎ অমল সোম চুপ কৰে গেলেন ।

দুটো লোক বড়-বড় বাস্কেট আৱ ক্যান বয়ে নিয়ে এল সকল পথটা দিয়ে । এই লোকগুলো স্থানীয় মানুৰ, কৰ্মচাৰী গোছেৰ । ফাঁকা জায়গা পেরিয়ে ওৱা পাহাড়েৰ খাঁজে পা রেখে-ৱেখে ওপৰে উঠে মিলিয়ে গেল ।

অমল সোম বললেন, “সাহেবদেৱ ব্ৰেকফাস্ট এল মনে হচ্ছে । তাৱ মানে সকল রাস্তাটাৰ ওপাশে ওৱা বেস ক্যাম্প কৰেছে । জঙ্গলেৰ আড়াল রেখে আগে চলো, ক্যাম্পটাই দেখে আসি ।”

॥ পনেৱো ॥

জঙ্গলেৰ আড়ালে শৱীৰ রেখে ওৱা খানিকটা এগিয়ে যেতেই চিৎকাৱটা কানে এল ।

চিৎকাৱটা যে কোনও বন্দি জন্মৰ, তাতে সন্দেহ নেই । ডালপালা সৱাতেই ওৱা দেখতে পেল, দুটো তাঁবু পড়েছে ফাঁকা জমিতে । তাঁবুৰ একপাশে একটা লাল জিপসি দাঁড়িয়ে, ওপাশে একটা বড় খাঁচা ।

চিৎকাৱটা ভেসে আসছে তাঁবুৰ আড়াল থেকে । খাঁচটা শূন্য ।

একটু পৱেই একজন ষণ্মার্ক লোক কুচকুচে কালো একটা প্ৰাণীকে টানতে-টানতে এনে খাঁচাৰ মধ্যে চুকিয়ে দৱজা বন্ধ কৰে দিল । প্ৰাণীটা দৌড়ে খাঁচাৰ দেওয়াল ভাঙাৰ চেষ্টা কৰে বিফল হল । তাৱ খাঁজকটা শিং খাঁচাৰ লোহার শিকে আটকে যাওয়ায় সে আবাৱ আৰ্তনাদ কৰল । লোকটা দাঁড়িয়ে যেন মজাৰ দৃশ্য দেখছিল, এবাৱ হেসে তাঁবুৰ ওপাশে চলে গেল ।

অমল সোম তাঁৰ দূৰবিন বেৱ কৱলেন । কিছুক্ষণ দেখে নিচু-গলায় বললেন, “গায়েৰ রং এখনও কাঁচা রয়েছে । পাকা হাতেৱ কাজ নয় ।”

“রং?” অৰ্জুন অবাক হল ।

“ওই জন্মটোৱ নাম সারাও, নেপালিৱা একেই থৰ বলে ।”

মেজৱ বললেন, “কিন্তু দেখতে তো ছাগলেৰ মতো ।”

“সেইজন্মেই ওৱা রং কৰে দিল । কিন্তু লক্ষ কৰে দেখুন, মাথাটা অনেক বড় । গাধা আৱ ছাগলেৰ মিশ্ৰণ । কানও বড়, চোয়ালেৰ পাশেৰ চুল বেচপ

লস্বা । পায়ের মরচে পড়া লাল অংশটা কিন্তু লোকটা কালো রং চেলে আড়াল করতে পারেনি । ”

“এই সারাও ধরা তো ক্রাইম । ” মেজর উত্তেজিত হলেন ।

“যে-কোনও বন্যজন্তু ধরাই অপরাধ । ওই প্রাণীটির কদর বিদেশে খুব বেড়েছে । আর সাধারণ মানুষ যাতে বুবতে না পারে তাই রং করা হয়েছে । ”

“মনে হচ্ছে লোকটা এখন একাই আছে । এগিয়ে যাব ?” অর্জুন জিজ্ঞেস করল ।

“না, আসল অপরাধীরা ওপরে গিয়েছে । বেস ক্যাম্প করে রয়েছে এরা । ওরা ওপরে কী করছে, তা একবার দেখে আসা দরকার । এ তো পালিয়ে যাচ্ছে না । ” অমল সোম ঘুরে দাঁড়ালেন, “সুন্দর, তুমি সাবধানে বাঁ দিক দিয়ে ওপরে উঠে যাও । কিছুতেই ওদের চোখে যেন না পড়ে যাও, খেয়াল রাখবে । দেখা পেলেই আমাকে জানাবে । কীভাবে জানাবে ?”

সুন্দর মাটি থেকে একটা কাঠি তুলে দুঁ টুকরো করে জিতের নীচে ফেলে আওয়াজ করল ।

“চমৎকার ! তুমি দেখছি বেশ শুণী লোক । মেজর, আপনি ফোর্ট আগলান । ”

“ফোর্ট মানে ?” মেজর হতভম্ব ।

অমল সোম বললেন, “যুদ্ধক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল ফোর্ট আগলানো । আমরা ফিরে না এলে অথবা কোনও ঝামেলা হলে আপনি সোজা থানায় চলে যাবেন । কিন্তু তার আগে যতটা সম্ভব নিজেকে আড়ালে রাখুন । চলো অর্জুন । ” অমল সোম পা বাড়ালেন ।

সুন্দর খুব দ্রুত কাঁচা জায়গা পেরিয়ে বানরের মতো পাহাড়ের সঙ্গে মিশে গেল । একা থাকা যে পছন্দ নয়, তা মেজরের মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছিল । কিন্তু কিছু করার নেই তাঁর ।

অর্জুন হাত বাড়াল, “আপনার কলমটা আমাকে দেবেন ?”

একটু দোলেমনা করে কলমটি হস্তান্তর করলেন মেজর । একা থাকতে হবে বলে যতটা নয়, তার চেয়ে দের বেশি তাঁর খারাপ লাগছিল অভিযানে অংশ নিতে না পেরে ।

গাছের আড়ালে ওরা ডান দিকে সরে এল অনেকটা । এবার সামনে ফাঁকা জমি, তারপর পাহাড় । এই পাহাড়ের গায়ে ছোট-ছোট বুনো বোপ, লতানো গাছ । লস্বা গাছেরা রয়েছে অনেক ওপরে । মাঝে মাঝে ন্যাড়া পাথর । একটু আগে যে-পথ দিয়ে লোকদুটো ওপরে উঠে গিয়েছিল, সেই পথ তৈরি হয়েছে চলতে-চলতেই । পাহাড়ের এই দিকটায় মানুষজন আসে না বলে রাস্তা তৈরির দরকার হয়নি । অর্জুন খানিকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর জলের শব্দ শুনতে পেল । খুব আস্তে, তিরতির শব্দ । সে বলল, “মনে হচ্ছে, কাছাকাছি ঝরনা

আছে । ”

শব্দটা অমল সোমও শুনতে পেয়েছিলেন । মাথা নেড়ে আরও কিছুটা এগিয়ে গেলেন তিনি । তাঁবুর কাছ থেকে ওরা অনেকটা সরে এসেছে । এবার ঝরনা চোখে পড়ল । বৃষ্টি না হলে এই ঝরনা শুকিয়েই থাকে । কিন্তু জল পড়ায় পাথর ক্ষয়ে গেছে । অমল সোম বললেন, “ওখানে চলো । প্রকৃতি আমাদের জন্যে সিঁড়ি তৈরি করে দিয়েছে । ”

দৌড়ে ফাঁকা জায়গা পেরিয়ে পাথরের আড়ালে খানিকক্ষণ দাঁড়াল ওরা । ছুট আসার সময় কারও নজরে পড়েছে কি না তা বোঝা যাচ্ছে না । অমল সোম পাথরগুলো দেখতে লাগলেন । বিশাল আয়তনের পাথর এ ওর গায়ে হেলান দিয়ে রয়েছে ।

যাকে সিঁড়ি বলে মনে হয়েছিল তা হঠাৎ দেওয়াল হয়ে গেল । খাঁজে পা দিয়ে কিছুটা উঠতেই আর কোনও অবলম্বন পাওয়া গেল না । তার ওপর জলে ভিজে ভিজে শ্যাওলাও পড়ে গিয়েছে মাঝে মাঝে । অমল সোম ইশারায় অর্জুনকে তাঁর কাঁধে পা রেখে উঠতে বললেন । এখন আর কোনও বিকল নেই । সঙ্কেচ কাটিয়ে অর্জুন ওপরে উঠে পাথরের ওপর শুয়ে পড়ল । হাত বাড়িয়ে অমল সোমকে টেনে তুলল সে ।

প্রায় আধ ঘণ্টা ওঠার পর ওরা একটু জিরিয়ে নিচ্ছিল । এখন পায়ের তলায় জঙ্গলের মাথা । কালচে-সবুজ কার্পেট যেন দিগন্তে ছড়িয়ে গেছে । পাথরের খাঁজে-খাঁজে বুনো ঝোপ এখন বেশ ঘন । ওরা নিজেদের আড়ালে রেখে সরে আসতে লাগল । আর তখনই গুলির শব্দ ভেসে এল । শব্দটা পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে ভয়ঙ্কর শোনাল । পাখিরা ভয়ে চিৎকার করে উড়ে গেল নীচের জঙ্গলের দিকে । অর্জুনের মনে হল সুন্দরের কথা । লোকটা ওদের চোখে পড়ে যায়নি তো !

অমল সোম দ্রুত এগোছিলেন । এই বয়সেও তিনি এত চটপটে কীভাবে আছেন, তা অর্জুন বুঝতে পারছিল না । পাহাড় ভাঙতে গিয়ে সে বেশ হাঁপিয়ে উঠেছে, কিন্তু অমল সোমকে দেখে তা বোঝা যাচ্ছে না ।

“হোয়াট ইজ দিস ! গুলি করলে কেন ? ” চিৎকারটা শুনতে পেল ওরা ।

সঙ্গে-সঙ্গে সতর্ক হয়ে গেলেন অমল সোম । ইশারায় অর্জুনকে নিঃশব্দে এগোতে বললেন । দ্বিতীয় গলা কানে এল, “গুলি না করলে সাপটা আমাকে মেরে ফেলত । ”

“মেরে ফেলত ! ওকে ডিস্টাৰ্ব না করলে ও তোমার কিছুই করত না । ননসেপ্ত । ”

“বকাবকা ক’রো না । ”

“তোমার বুদ্ধি কম, এ-কথা স্বীকার করতে পারছ না কেন ? তোমার ওই গুলির আওয়াজে ওরা কেউ আর কাছাকাছি থাকবে বলে ভেবেছ ? সব হাওয়া

হয়ে গেছে । দিলে সব বিগড়ে ।”

এবার ওরা দেখতে পেল । নীল চ্যাটার্জি ধমকে যাচ্ছে বরেন ঘোষালের ভাইকে ।

বরেন ঘোষালের ভাই সাপটাকে তুলতে যাচ্ছিল একটা ডাল দিয়ে, কিন্তু তার হাত ধরে টানল নীল, “ছেড়ে দাও । যত ফালতু সময় নষ্ট ।”

ওরা চোখের সামনে থেকে সরে গেল ।

ওদের অনুসরণ করতে গিয়ে অমল সোম দাঁড়িয়ে গেলেন । একটা মোটাসোটা বনমুরগি কঁক-কঁক করতে করতে বুনো ঝোপ থেকে বেরিয়ে ছুটে যাচ্ছিল । তাকে তাড়া করে আসছে আর-একটা মোরগ । হঠাৎ মুরগিটা শুন্যে লাফিয়েই স্থির হয়ে গেল এক লহমার জন্য, তার পরেই ডানা ঝাপটে চিংকার করতে লাগল । ওর শরীর নীচে পড়ছে না কিন্তু কাছাকাছি কোথাও একটানা শব্দ বাজতে লাগল । সঙ্গে-সঙ্গে মানুষের পায়ের আওয়াজ এদিকে দ্রুত এগিয়ে এল । মোরগটা খুব খাবড়ে গিয়ে তৎক্ষণাং পেছন ফিরে বুনো ঝোপের মধ্যে মিলিয়ে গেল । অমল সোম আবার পাথরের আড়ালে সরে এলেন ।

দু'জন কর্মচারীকে নিয়ে নীল এবং বরেন ঘোষালের ভাই দৌড়ে এল । ঝুলন্ত মুরগিটাকে দেখে নীল খুব হতাশ হলেও বরেন ঘোষালের ভাই হেসে বলল, “চমৎকার । বনমুরগির রোস্ট খাওয়া যাবে আজ ।”

কথাটা শোনামাত্র নীল এগিয়ে মুরগিটাকে ছাড়িয়ে নিয়ে ছুঁড়ে দিল দূরে । কঁক-কঁক করতে করতে সেটা প্রাণ নিয়ে উধাও হল । বরেন ঘোষালের ভাই চিংকার করে উঠল, “এটা কী হল ? ছেড়ে দিলে কেন ?”

“আমি এখানে মুরগি খেতে আসিনি ! যা ধরতে এসেছি তা না ধরে কী করে মুরগি দেখে তোমার জিভে জল আসে, তা আমার মাথায় ঢোকে না ।”

“যা ধরতে এসেছি তা ধরবই, তাই বলে ফাট পেতে দোষ কী ?”

নীল জবাব না দিয়ে আবার ফিরে গেল । তার দুই কর্মচারী তাকে অনুসরণ করল । বরেন ঘোষালের ভাই মুরগিটা যেদিকে চুকেছে, সেদিকে কয়েক পা এগিয়ে মাথা নাড়ল । তাকে খুব হতাশ দেখাচ্ছিল । শেষ পর্যন্ত সেও ফিরে গেল ।

অমল সোম বললেন, “সাবধানে এগোতে হবে । ওরা জঙ্গলে নেট টাঙ্গিয়েছে ।”

“চোখে দেখা যাচ্ছে না কিন্তু ।” অর্জুন বলল ।

“তৈরি হয়েই এসেছে । তবে নিশ্চিত থাকো, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সারাও এদিকে আর আসবে না । যতক্ষণ সারাও না আসে, আমাদের অপেক্ষা করা ছাড়া কোনও উপায় নেই ।”

“কেন ?”

“এখন পর্যন্ত নীচের রং-করা জন্মটা ছাড়া ওদের বিরক্তে আমাদের কোনও

অভিযোগ নেই । থাকলেও কোনও আদালতে সেটা প্রমাণ করা যাবে না ।”

অর্জুনের মনে হল ওদের অভিযুক্ত করার জন্য ওই একটা সারাও তো যথেষ্ট । অমলদার কথামতো অপেক্ষা করতে হলে হয়তো অনস্তকাল এখানে বসে থাকতে হবে । এত বড় পাহাড় ছেড়ে সারাও যে এখানে আসবেই, তা কেউ জোর করে বলতে পারে ?

এই সময় মদু আওয়াজ ভেসে এল । ওটা সুন্দরের পাঠানো সক্ষেত, তা বুঝতে অসুবিধে হচ্ছিল না । অমল সোম বললেন, “এই আওয়াজ বেশিক্ষণ করলে ওরা সন্দেহ করতে পারে ।”

অর্জুন বলল, “ওকে বলা হয়েছিল দেখতে পেলে যেন আওয়াজ করে ।”

আওয়াজটা থামল । অর্জুন বলল, “আমার মনে হয় আর একটু এগিয়ে যাওয়া ভাল ।”

অমল সোম কিছু বলার আগে মানুষের গলা শোনা গেল । ওপর থেকে নীচে নেমে যাচ্ছে । ওরা এবার এগোল । অমল সোম বললেন, “সাবধানে পা ফেলো । সারাও-এর জন্যে ওরা জাল পেতে রেখেছে ।”

এবার ওদের দেখা পাওয়া গেল । নীল চ্যাটার্জি দাঁড়িয়ে দূরবিনে পাহাড় দেখছে খুঁটিয়ে । ওরা যেখানে চেয়ার পেতেছে, সেই জায়গাটা প্রায় পরিষ্কার । দুটো ফোল্ডিং চেয়ার আর টেবিল ওপরে তুলে নিয়ে এসেছে আরামের জন্য । তার একটাতে বসে আছে বরেন ঘোষালের ভাই । সে চোখ বন্ধ করে সিগারেট থাচ্ছে । টেবিলের ওপর বন্দুক জাতীয় একটি অস্ত্র পড়ে আছে, যা লম্বায় বেশি নয় । অর্জুন এ-জাতীয় অস্ত্র আগে দ্যাখেনি ।

নীল চ্যাটার্জি বলল, “গুলি ছুড়ে তুমি বারোটা বাজিয়ে দিয়েছ ।”

“এক কথা বারংবার শুনতে ইচ্ছে করছে না ।”

দূরবিন থেকে চোখ সরিয়ে নীল তাকাল, “ঘোষাল, বিদেশে তোমার কানেকশনস না থাকলে তোমার কানে কথাটা আমি হাজারবার চোকাতাম ।” সে আবার দূরবিনে চোখ রাখল ।

বরেন ঘোষালের ভাই উঠে দাঁড়াল, “একটা হেলিকপ্টার ভাড়া করে পাহাড়টাকে সার্চ করলেই ঝামেলা মিটে যেত । এভাবে সময় নষ্ট হত না ।”

“চমৎকার ! সমস্ত পৃথিবীকে ডেকে বলতে চাও আমরা এক মহা মূল্যবান প্রাণী ধরতে চলেছি, তোমরা দ্যাখো । ননসেন্স !” পাহাড় দেখতে লাগল নীল ।

বরেন ঘোষালের ভাই অস্ত্রটায় হাত দিয়ে সরিয়ে নিল । তারপর উলটো দিকে হাঁটতে লাগল । কয়েক পা যাওয়ার পর তাকে বুনো ঝোপ সরাতে হচ্ছিল । নীল চেঁচিয়ে ডাকল, “কোথায় যাচ্ছ ?”

“বোর লাগছে, ঘুরে আসি ।” জঙ্গলের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল বরেন ঘোষালের ভাই । যোৰা যাচ্ছিল, ওর ব্যবহারে নীল বেশ বিরক্ত । সে নীচের

দিকে দূরবিন নামাল । খানিকক্ষণ দেখার পর হঠাতে ওকে উন্নেজিত বলে মনে হল । দ্রুত আঙুলে ফোকাস ঠিক করছিল সে । তারপর ছুটে এল টেবিলের কাছে । অন্তর্টাকে তুলে নিয়ে নীল নীচের দিকে দৌড়ে নেমে গেল । অমল সোম কিছু বলার আগেই সুন্দরকে দেখা গেল সামনে । ফাঁকা জায়গাটা পেরিয়ে ওদের কাছে এসে সুন্দর বলল, “সর্বমাশ হয়ে গেল । দাঢ়িওয়ালা মোটা সাহেবকে নীলবাবু দেখে ফেলেছে !”

অমল সোম জিজ্ঞেস করলেন, “কী করে বুঝলে ?”

“আমি খালি চোখেই ওকে ঝাপসা দেখতে পাচ্ছিলাম যখন, তখন উনি তো দূরবিনে স্পষ্ট দেখতে পাবেন । ধরা পড়লে সাহেবের খুব বিপদ হবে ।” সুন্দর হাঁপাছিল ।

অমল সোম ঢালের দিকে সরে গিয়ে দূরবিনে চোখ রাখলেন, “ওঁ, এত করে বলে এলাম !”

অর্জুন তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ালু । খালি চোখেই দেখা যাচ্ছে মেজের একটা গাছের ডালে উঠে বসেছেন । তিনি চেষ্টা করছেন গুঁড়ি মেরে এগিয়ে যেতে । তাঁর লক্ষ্যবস্তু কী, তা বোঝা যাচ্ছে না । নীচ থেকে তাঁকে অবশ্যই দেখা যাবে না । কিন্তু পাহাড়ের ওপর থেকে যে তাঁকে স্পষ্ট দেখা যাবে, এটা ওঁর খেয়ালে নেই । চিংকার করে ওকে সতর্ক করতে গেলে নিজেদের অস্তিত্ব আর লুকিয়ে রাখা যাবে না । নীল চ্যাটার্জির হাতে মেজের ধরা পড়বেনই ।

অমল সোম বললেন, “আমি নীচে যাচ্ছি । সঙ্গে না থাকলে মেজের অসহায় বোধ করবেন ।”

অর্জুন আপন্তি করল, “আপনাকে একলা পেলে নীল কিছুতেই ছাড়বে না । যেতে হলে তিনিজনেই যাব ।”

“না । তোমরা বরং ওই ছোকরাকে আটকাও । তা হলে বারগেন করা যাবে ।” অমল সোম দ্রুত নেমে গেলেন । অর্জুনের মনে হাঁচিল, মেজেরের জন্য সমস্ত ব্যাপারটা গোলমাল হয়ে গেল । সে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করতে সুন্দর বলল, “চলুন, আড়ালে যাই ।”

মেজেরের কী হাল হল, তা দেখার সুযোগ এখন নেই । বরেন ঘোষালের ভাই যদি বেরিয়ে আসে, তা হলে স্পষ্ট দেখতে পাবে । ছেলেটার হাতে অন্তর্বাস আছে । ওরা দ্রুত জঙ্গলের আড়ালে চলে গেল । সুন্দর এগোচ্ছে নিঃশব্দে, অভ্যন্তর পায়ে । ওর সঙ্গে তাল রাখতে বেশ অসুবিধে হচ্ছিল । হঠাতে শিস শুনতে পেল ওরা । সুন্দর অর্জুনকে ইশারা করল থামতে ।

শিসটা বেজেই চলেছে । সুন্দর প্রায় গুঁড়ি মেরে এগিয়ে চলেছে । শেষ পর্যন্ত দৃশ্যটা দেখতে পেল ওরা । বরেন ঘোষালের ভাই দাঁড়িয়ে আছে রিভলভার হাতে । তার হাত-ছয়েক দূরে একটা ভুটানি কোবরা ফণা তুলে দুলছে । বরেন ঘোষালের ভাই যে শিস দিচ্ছে তা কোবরাটাকে স্থির রাখার

জন্য, বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না। হয়তো নীলের বকুনি খেয়ে ও গুলি ছুড়ছে না এখন, কিন্তু অর্জুন বুঝল ছেলেটার সাহস আছে। মাটি থেকে প্রায় তিন ফুট উচুতে ফণা তুলেছে যে-সাপ, তার সামনে দাঁড়িয়ে শিস দেওয়া সহজ ব্যাপার নয়।

হঠাৎ সাপটা ধীরে-ধীরে মাথা নামাল। তারপর ডান দিকে একটা পাথরের খাঁজে দ্রুত শরীরটা লুকিয়ে ফেলল। বরেন ঘোষালের ভাই পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখের ঘাম মুছল। রিভলভারটা একবার ওপরে ছুঁড়ে আবার লুকে নিল। অর্জুন দেখল সুন্দর তার কোমরের গেঁজ থেকে একটা গুলতি বের করছে। সে চট করে ওর হাত চেপে ধরে ইশারায় নিষেধ করল। আর তখনই সাপটা যে-পাথরের খাঁজে লুকিয়ে ছিল, সেখানে হটোপাটি শুরু হল। বরেন ঘোষালের ভাই রিভলভার হাতে দ্রুত এগিয়ে যেতেই একটা কালো গোলার মতো প্রাণী ছিটকে বেরিয়ে এল। তার ধাক্কায় ছিটকে পড়ল ছেলেটা, রিভলভার চলে গেল ঘোপের মধ্যে। চিত হয়ে মাটিতে পড়েই উঠতে গিয়ে যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠল বরেন ঘোষালের ভাই। যে জন্তা বেরিয়েছিল সেটা যে সারাও, তা বোঝার সঙ্গে-সঙ্গেই অর্জুন আর তাকে দেখতে পেল না। কিন্তু সে সাপটাকে দেখতে পেল। খাঁজ থেকে বেরিয়ে এসে প্রচণ্ড আক্রমণে সে আবার ফণা তুলেছে। বরেন ঘোষালের ভাই মাটিতে পড়ে ছিল তখনও। মৃত্যুভয় এখন তার চোখে-মুখে। তবু ওই অবস্থায় সে একটা ছুরি বের করল।

এইসব দৃশ্যের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সুন্দর কখন যে তার গুলতিতে পাথর পুরেছে, লক্ষ করেনি অর্জুন, সাঁ শঙ্গে পাথরটা ছুটে গিয়ে সাপের মাথায় আঘাত করতেই সেটা নীচে লুটিয়ে পড়ল। ভূটানি কোবরার শরীরটা তখনও প্রচণ্ড আক্রমণে পাক খাচ্ছে, কিন্তু তার আর মাথা তোলার সামর্থ্য নেই।

অর্জুন এবার বেরিয়ে এল আড়াল থেকে। যন্ত্রণা সামলাচ্ছিল বরেন ঘোষালের ভাই, সাপটাকে বিষ্঵স্ত হতে দেখে সে যতটা অবাক হয়েছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি হল অর্জুনকে সামনে দেখে। কিন্তু তারপরেই নিজের স্বভাব ফিরে পেল সে, “আর এক-পা এগোলেই খুন করে ফেলব।”

সুন্দর বলল, “আমি না বাঁচালে তুমি একক্ষণে যমের বাড়ি চলে যেতে, বাবু।”

“তুই ? তুই এদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিস ?” গর্জে উঠল ছেলেটা।

অর্জুন বলল, “সুন্দর, আমি তিন গুনব। তার মধ্যে যদি ও ছুরিটা না ফেলে দেয়, তা হলে ওর কপাল লক্ষ করে গুলতি ছুঁড়বে।”

সুন্দর সঙ্গে-সঙ্গে তৈরি হয়ে গেল, “ঠিক আছে।”

অর্জুন ‘এক’ বলতেই ঘোষাল ছুরিটা সরিয়ে দিল।

অর্জুন জিজেস করল, “তুমি উঠে দাঁড়াতে পারবে ?”

“না ! মনে হচ্ছে হাড়টাড় ভেঙেছে। এত জোরে বেরিয়ে এল— !

শোনো, নীচে আমার লোকজন আছে, তাদের ডেকে আনো, জলদি।” হ্রস্ব
করল ঘোষাল।

“এত তাড়াহুড়োর কী আছে?”

“আমার বন্ধুগা হচ্ছে।”

“তা একটু হোক না ! চিকিৎসা করার সময় অনেক পাওয়া যাবে, কিন্তু তার
আগে আমার কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দাও।” অর্জুন ছুরিটাকে লাখি মেরে
আরও দূরে সরিয়ে দিল। ঘোষালের মুখ ঘামে চকচক করছে। একটা পা ভাঁজ
করতে পারছে না সে, দু’ হাতের ওপর ভর দিয়ে বসার চেষ্টা করে যাচ্ছে
এখন।

অর্জুন জিজ্ঞেস করল, “ক’টা সারাও তোমরা এখন পর্যন্ত ধরেছ?”

“সারাও ? সেটা আবার কী জিনিস ?” খিঁচিয়ে উঠল ঘোষাল।

পকেট থেকে কলম বের করল অর্জুন, “এটা চেনো ?”

এক পলক দেখে নিয়ে, আবার চোখ বন্ধ করল, “আমি ওসব কিছু জানি
না। যা জিজ্ঞেস করার, নীলকে জিজ্ঞেস করো।” কথাটা শেষ করেই প্রচণ্ড
জোরে সে চিন্কার করে উঠল, “নীল, নীল !” সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ে পাহাড়ে তার
প্রতিফলনি বাজল, “নী—ল, নী—ল।”

॥ শোলো ॥

মেজের দুলছিলেন। তাঁর ভয় হচ্ছিল খুব, পা শিরশিরি করছিল। গাছের
ডাল বেশ সরু হয়ে এসেছে, আর এগোলে তাঁর ভাব রাখতে পারবে বলে মনে
হচ্ছিল না। অথচ ফুলটাকে তিনি দেখতে পাচ্ছিলেন। এত বড় গাছে মাত্র
একটি সাদা ফুল ফুটে আছে।

অর্জুনরা চলে যাওয়ার পর কী করে সময় কাটাবেন, তেবে পাচ্ছিলেন না
মেজের। তার ওপর একমাত্র অস্ত্রটি ওকে দিয়ে দেওয়ার পর বেশ অসহায়
লাগছিল তাঁর। মনে হচ্ছিল, ওপরে বেশ রুদ্ধশাস নাটক হচ্ছে এবং তিনি তার
সাথ্বী হতে পারলেন না। এই সব ভাবতে ভাবতে দেখতে পেলেন দুটো লোক
পাহাড় থেকে নেমে আসছে গল্প করতে করতে। ওরা এখানে এসেও বেশ
রেকফাস্ট করছে ভাবার পর তাঁর খুব রাগ হল। তবু তিনি নিজেকে লুকিয়ে
রাখার জন্য জঙ্গলের ভেতরে চলে এলেন। খানিকটা হাঁটার পর তার চোখে
পড়ল মাটিতে ঘাসের ওপর অনেক মৌমাছি মরে পড়ে আছে। খামোখা এত
মৌমাছি দল বেঁধে এক জায়গায় মরতে গেল কেন, বোঝার চেষ্টা করতে তিনি
পা মুড়ে বসলেন। আজ পর্যন্ত তিনি কখনওই শোনেননি মৌমাছিরা
গগ-আঘাতহত্যা করে। এই সব যখন ভাবছেন, ঠিক তখনই তাঁর দাঢ়িতে কিছু
একটা ওপর থেকে পড়ে আটকে গেল। হাত দিয়ে দাঢ়ির জঙ্গল থেকে যে

বন্ধুটি টেনে বের করলেন, সেটি একটি মৌমাছির মৃতদেহ। সঙ্গে-সঙ্গে ওপরে তাকালেন তিনি। ঘন পাতা এবং অনেক ডালের ওপরে ঠিক কী আছে তা ঠাহর করতে পারলেন না নীচ থেকে। মৌমাছির চাক থেকে মধু শেষ হয়ে গেলে এ বকম হতেও পারে। কিন্তু মেজরের মনে হয়েছিল ব্যাপারটা দেখা উচিত। তাঁর শরীর ভাঁরী, গাছ বেয়ে ওপরে উঠায় বেশ ঝুঁকি আছে। তবু মেজর উঠতে লাগলেন। তাঁকে বেশ পরিশ্রম করতে হচ্ছিল। প্রায় ঘোরের মধ্যে তিনি এগিয়ে যাচ্ছিলেন। মোটা ডাল সরু হচ্ছে যখন, তখন তিনি দেখতে পেলেন। বেশ বড় প্ল্যাণ্ডিফ্লোরার মতো একটা সাদা ফুল ফুটে আছে অনেক ওপরে। ফুলটা একদম একা, এই গাছে দ্বিতীয় কোনও ফুল ফোটেনি। তারপর তিনি আবিকার করলেন, ওই ডালের কান্দাকাছি কোনও পাখি বসেনি, মৌমাছিদের দেখা যাচ্ছে না আশেপাশে। একটা সুন্দর তরতাজা সাদা ফুল, বেশ গভীর ধরনের। হঠাৎ তাঁর মনে হল এই ফুল সেই ফুল হয়তো, যার গল্ল তিনি আমেরিকায় বসে শুনেছেন। হওয়া অসম্ভব নয়। মৌমাছিগুলো ঠিক ওর নীচে মাটিতে মরে পড়বে কেন? নিশ্চয়ই ওই ফুলের গল্লে বিব আছে।

মেজর যখন উত্তেজনায় অস্তির, ঠিক তখনই গাছের নীচে এসে দাঁড়াল নীল চ্যাটার্জি। পাহাড়ের ওপর থেকে গাছের ডালে খোলা লোকটিকে খুঁজে পেতে তার বিন্দুমাত্র অসুবিধে হয়নি। ওপরের দিকে তাকিয়ে মেজরকে তার ভালুকের মতো মনে হল। হাতের অঙ্গুটি উঁচিয়ে সে চিংকার করল, “অ্যাই? কে তুই?”

সঙ্গে-সঙ্গে মেজর স্থির হয়ে গেলেন। কোনও মতে মুখটা নীচের দিকে ফেরাতেই তিনি নীলকে দেখতে পেলেন। ওইটুকুনি একটা ছোকরা তাঁকে তুই বলে সম্মোধন করছে শুনেও নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারলেন না। কিন্তু তাঁর মনে হল, সঙ্গে কোনও অস্ত্র নেই, অমল সোম বলেছিলেন গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে, সেটা ব্যর্থ হল।

মেজরের মুখ দেখামাত্র নীল তাঁকে চিনতে পারল। সে চিংকার করল, “ঝটপট নেমে এসো, নইলে গুলি চালাব।” অজাঞ্জেই তুই থেকে তুমিতে সরে এল সে।

মেজর বুঝলেন তাঁর আর কিছু করার নেই। ফুলটির দিকে তাকালেন তিনি। এখনও অনেকটা দূরত্বে রয়েছে সেটা। একটা আঁকশি থাকলে টেনে আনা যেত। তিনি ওই অবস্থায় বললেন, “নেমে এলে ফুলটাকে পাওয়া যাবে না।”

“ফুল মানে? কী ফুল?” নীচ থেকে নীল চ্যাটার্জি চেঁচাল।

“মনে হচ্ছে ওটা বিষফুল!”

“নেমে না এলে ওই ফুল তোমাকে খাওয়াব চাঁদু।”

“অ্যাই, ওইভাবে কথা বলো না। তুমি আমার হাঁটুর বয়সী।”

সঙ্গে-সঙ্গে গুলি চালাল নীল। একটাই গুলি। সেটা মেজরের ডান দিক

দিয়ে বেরিয়ে গেল। মেজরের শরীর কাঁপতে লাগল। ছেলেটা উঞ্চাদ। তিনি নামার চেষ্টা করলেন। কিন্তু গাছ বেয়ে ওপরে ওঠা যত সহজ, নামা ঠিক ততই কঠিন। দু-দু'বার পড়তে-পড়তে সামলে নিয়ে তিনি আর্তনাদ করলেন, “আমি নামতে পারছি না।”

“ওঠার সময় খেয়াল ছিল না? ট্রাই, ট্রাই এগেন।” নীল চিংকার করতেই দুটো লোক ছুটে এল। ওরা গুলির আওয়াজ পেয়েই এসেছে। নীলের দৃষ্টি অনুসরণ করে ওপরের দিকে তাকাতেই দু'জনে হেসে উঠল। নীল বলল, “লোকটাকে নামিয়ে আনো। জলদি।”

অনেক কসরত করে ওরা মেজরকে মাটিতে নামাতে পারল। মেজর তখন থরথর করে কাঁপছিলেন। গাছে ঢড়া তাঁর অভ্যেস নেই। জামাকাপড়ের অবস্থা সঙ্গিন হয়ে গেছে।

নীল সামনে এসে দাঁড়াল, “এখানে কেন এসেছ?”

মেজর হঠাত স্মার্ট হয়ে গেলেন, “ফুল, ফুল খুঁজতে।”

“কী ফুল?”

“বিষফুল।”

প্রচণ্ড জোরে একটা আঘাত এসে পড়ল মেজরের গালে। তিনি টাল সামলাতে না পেরে পড়ে যাচ্ছিলেন, লোকদুটো ধরে ফেলল।

নীল আবার জিজ্ঞেস করল, “তোমার সেই দুই গোয়েন্দাসঙ্গী কোথায়?”

মার খাওয়ামাত্র মেজর তাঁর স্বভাব ফিরে পেলেন। প্রচণ্ড রাগ হয়ে গেল তাঁর। তিনি চিংকার করলেন, “মেরে হাড় ভেঙে দেব বদমাশ ছোকরা। আমার গায়ে হাত তুলেছ? পাজি, বদমাশ, উল্লুক। বন্দুকটা রেখে থালি হাতে এসো।”

সঙ্গে-সঙ্গে ঘুসির বড় উঠল। মেজর কাটা কলাগাছের মতো মাটিতে পড়ে গেলেন। তাঁর জামার কলার ধরে টেনে তুলল নীল, “লোকদুটো কোথায়?”

মেজর কোনও রকমে বললেন, “জানি না।” তাঁর দাঢ়ি ততক্ষণে রক্তে ভিজে জবজব করছিল।

“জানো না? আমার পেছনে গোয়েন্দাগিরি করা হচ্ছে!” সে ক্ষিপ্ত হতেই মেজর মিনতি করলেন, “বিশ্বাস করো, আমি ফুলের সঙ্গানে এসেছি।”

এবার কী মনে হতে মেজরকে মাটিতে ফেলে দিয়ে ওপরে তাকাল নীল। তারপর সঙ্গীদের বলল, “লোকটাকে খাঁচায় ঢুকিয়ে রাখো। হাত পা বেঁধে রাখবে।”

সঙ্গে-সঙ্গে লোকদুটো ওঁকে চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে গেল।

গাছের ডালগুলো লক্ষ করতে করতে নীল মরা মৌমাছিদের কাছে চলে এসেছিল। ঠিক তখনই ওপর থেকে একটা মৌমাছির মৃত শরীর নীচে নেমে এল। সে মাটিতে তাকাতেই আগের মৃত মৌমাছিদের দেখতে পেল।

এতক্ষণে সে অবাক হল । এক লাফে নীচের ডালটা ধরে বন্দুক নিয়ে সে কিছুটা ওপরে উঠতেই পায়ের শব্দ কানে গেল । শব্দটা আচমকা নেমে গেল । গাছের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে ওপর থেকে লক্ষ করতে লাগল নীল । তারপর মনে হল ঘোষাল হয়তো নীচে নেমে এসেছে গুলির আওয়াজ শুনে ।

অমল সোম স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন । ওপর থেকেই তাঁর কানে গুলির আওয়াজ পৌঁছেছিল । কিন্তু নীচের জঙ্গলে এসে মেজর যে গাছটিতে উঠেছিলেন, সেই গাছটিকে তিনি চট করে খুঁজে পেলেন না । যখন মনে হল কেউ কাছাকাছি নেই, তখন গাছের আড়াল ছেড়ে পা বাড়ালেন । কিছুটা হেঁটে চাপা গলায় ডাকলেন, “মেজর !”

ডাকটা নীলের কানে পৌঁছল । সে বন্দুক সতর্ক হাতে ধরল । ওপর থেকে অমল সোমকে সে দেখতে পেল । এখন গুলি চালালে লোকটা ঘায়েল হবে । কিন্তু ! নীল যা খবর পেয়েছে তাতে অমল সোমকে ভারত এবং ভূটান সরকার পাঠিয়েছেন সারাওদের ব্যাপারে খোঁজখবর নিতে । এই রকম দায়িত্বশীল লোক মারা গেলে তোলপাড় হবে । মিছিমিছি বামেলায় যাওয়া ঠিক হবে না । সে দেখল, অমল সোম নিচু হয়ে কিছু কুড়োছেন । তারপর বোতামটাকে দেখতে পেল । লোকটাকে খুব চিন্তিত দেখাচ্ছে বোতাম নিয়ে । ওটা মেজরের হতে পারে । মার খাওয়ার সময় জামা থেকে ছিড়ে যেতে পারে ।

অমল সোম এগোছেন । তারপর চোখের বাইরে চলে গেলেন ।

নিঃশব্দে গাছ থেকে নেমে পড়ল নীল । তারপর দ্রুত জঙ্গল পার হয়ে চলে এল তার ডেরায় । মেজরকে তখন খাঁচায় চুকিয়ে দরজা বন্ধ করছে তার লোক । সে হ্রস্ব করল, “কালো কাপড়টা দিয়ে খাঁচাটাকে ঢেকে দাও ।”

আদেশ মান্য করল ওরা ।

একটা ফেন্সিং চেয়ারে আরাম করে বসল নীল । সে ভেবে পাচ্ছিল না কী করবে । তিন-তিনটে মানুষকে মেরে ফেলা এমন কিছু শক্ত ব্যাপার নয়, কিন্তু ব্যাপারটা কত দিন চাপা থাকবে সেইটে ভাবার বিষয় । হঠাৎ তার সারাও ধরার ফাঁদটার কথা মনে এল । ওই পাহাড়ের ঠিক নীচে অন্তত কুড়ি ফুট গভীর গর্ত করে ওপরে লতাপাতা দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে । প্রথমবার একটা সারাও ওই গর্তে পড়েছিল । কিন্তু সে-সময় তারা এখানে ছিল না । কয়েকদিন পরে এসে পচা গন্ধ পেয়েছিল । ওপর থেকে নীচে পড়ে ঘাড় মটকে মরে গিয়েছিল জন্মটা । মরে পচে গিয়েছিল শরীর । ওটা আর কোনও কাজে লাগেনি, আর তারপর থেকে সারাওগুলো যেন ফাঁদটার কথা জেনে গিয়েছিল ।

হঠাৎ সে সোজা হয়ে দাঁড়াল । তারপর কঠস্বর অনেকটা স্বাভাবিক করে একটু তুলে বলল, “মিস্টার সোম, আমি জানি আপনি কাছাকাছি আছেন । আপনার সঙ্গে তো আমার কোনও শত্রুতা নেই । চলে আসুন, কথা বলা যাক ।”

অমল সোম প্রায় সেই মুহূর্তেই ক্যাম্পের কাছে পৌঁছে গিয়েছিলেন। নীলকে অত স্বাভাবিক গলায় তাঁর উদ্দেশে কথা বলতে শুনে তিনি খুব অবাক হলেন। ওই অল্লবংশী ছেলেটি এত বুদ্ধিমান?

নীল আবার বলল, “আপনাকে ভাল কর্ফি খাওয়াব। বিদেশি কফি। কই, চলে আসুন। সময় নষ্ট করবেন না। আমি চাইলে আপনার ক্ষতি করতে পারতাম। এই জঙ্গলটাকে আপনার চেয়ে আমি তের বেশি জানি।”

অমল সোম কথাটাকে মেনে নিলেন। তিনি গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন। সঙ্গে সঙ্গে নীল তাঁকে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানাল, “আসুন, আসুন।”

অমল সোমকে একটা চেয়ার দেওয়া হল। নীল বলল, “কী ব্যাপার? আপনারা সবাই দল বেঁধে এখানে চলে এসেছেন?”

“হ্যাঁ। আপনি এখানে?”

“পিকনিক করতে। টানা কাজ করে করে ক্লান্ত। একটু রিল্যাক্স করতে না পারলে আর চলছিল না।” নীল হাসল, “কিন্তু এখানে এলেন কীভাবে?”

“হেঁটে।”

“মাই গড়। এতটা পথ হেঁটেছেন?”

“প্রয়োজনে অনেক কিছু করতে হয়।”

“মিস্টার সোম, আপনার প্রয়োজন কি আমার পেছনে লাগা?” হঠাৎ গভীর হয়ে গেল নীল। তার গলার স্বর শক্ত হয়ে গেল।

“আমি আমার কাজ নিয়ে এসেছি। সেটা যদি আপনার ক্ষতি করে তা হলে আমার কোনও উপায় নেই। মেজর কোথায়?”

“কে মেজর?”

“যাঁকে গাছে উঠতে দেখে আপনি পাহাড় থেকে নেমে এলেন।”

“আচ্ছা! দেখুন গিয়ে, গাছে-গাছে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।”

“আমি উত্তরটা আশা করছি।”

“মিস্টার সোম, আশা তো প্রত্যেক মানুষই করে। আশা পূর্ণ হয় কতজনের? আপনাকে আমি অনুরোধ করছি, এখনই এই জঙ্গল থেকে চলে যান। আপনাদের যাওয়ার ট্রাঙ্গপোর্টের ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি।”

“তাই? না ভাই, আগে সারাওদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করি, তারপর ফিরে যাওয়ার কথা ভাবব। ওই নিরীহ প্রাণীগুলোকে বিদেশের বাজারে পাঠিয়ে যারা মুনাফা লুটবে, তাদের ছেড়ে দিই কী করে বলুন? মেজর কেথায়?”

প্রায় কুড়ি সেকেন্ড অমল সোমের দিকে চুপচাপ তাকিয়ে থেকে নীল জবাব দিল, “উনি বিষফুল খুঁজতে গিয়েছেন। বিষফুল বলে কিছু আছে বলে বিশ্বাস করেন?”

“আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাস নিয়ে কিছু এসে যায় না। কিন্তু মেজরকে আমি এখানকার কোনও গাছে উঠতে দেখেছি। এত তাড়াতাড়ি তিনি কোথাও যেতে

পারেন না । ”

“আপনি যখন সবই জেনে বসে আছেন, তখন আমাকে জিজ্ঞেস করছেন কেন ?”

অমল সোম চারপাশে তাকালেন । তাঁর চোখ সেই খাঁচার দিকে গেল, যেটা কালো কাপড়ে ঢেকে রাখা হয়েছে । তিনি হেসে বললেন, “কালো কাপড়ে ঢাকলেই কি আর আড়ালে রাখতে পারবেন নীলবাবু ?”

“চেষ্টা করতে দোষ কী !” নীল উঠে দাঁড়াল, দাঁড়িয়ে হাততালি দিল । সঙ্গে-সঙ্গে দুটো লোক সামনে এসে দাঁড়াল । নীল জিজ্ঞেস করল, “সাহেবকে পৌঁছে দিয়ে এসেছ ?”

“জি সাব । ”

“ঠিক আছে, যাও । ” নীল ঘুরে দাঁড়াল, “সময় যদি নষ্ট করতে না চান, তা হলে আপনি আপনার বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যেতে পারেন । ”

অমল সোম কালো কাপড়ে ঢাকা খাঁচাটার দিকে তাকালেন । এদের পক্ষে জন্মটাকে অন্য কোথাও সরিয়ে ফেলা সহজ, কিন্তু নীল নির্দেশ না দিলে নিশ্চয়ই সেটা করবে না । তাই আগে মেজরের দেখা পাওয়া দরকার । তিনি মাথা নাড়লেন, “বেশ, চলুন । ”

নীল বন্দুক হাতেই এগোছিল । হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল, “আপনি শুই পথ ধরে আগে চলুন । বুবাতেই পারছেন, এই মহুর্তে আপনাকে আমি শত্রু ভাবছি । শত্রুকে কেউ পেছনে রাখে না । ”

অমল সোম হাসলেন এবং এগিয়ে চললেন ।

সরু পথ । এখানে অবশ্যই আগে কোনও পথ ছিল না । হাঁটাহাঁটি করে সরু পথ তৈরি হয়ে গিয়েছে । অমল সোম ভাবছিলেন, হঠাৎ এই পথ দিয়ে ওরা যাওয়া-আসা করছে কেন ?

নীল বলল, “বিষয়ুল আছে বলে আপনার বন্ধু এদিকে এসেছেন, আপনি ওঁকে বিশ্বাস করেন ? ওর আসার পেছনে অন্য কোনও কারণ নেই তো ?”

অমল সোম বললেন, “থাকলে সেটা ভবিষ্যতে জানা যাবে । ”

কথাটা বলেই অমল সোম দাঁড়িয়ে গেলেন । পথটা নেই । পায়ের দাগ মিলিয়ে গিয়েছে অথচ মরা ঘাস রয়েছে সামনে । এবং তখনই তিনি পেছন থেকে প্রচণ্ড ধাক্কা খেলেন । নিজেকে সামলাতে না পেরে হড়মুড়িয়ে চলে গেলেন সামনে । সঙ্গে-সঙ্গে ঘাসের গালিচা দুলতে লাগল । দুহাতে আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন তিনি । তাঁর শরীরটা সরাসরি নীচে নেমে যেতে লাগল ।

মাটিতে আছাড় খেয়ে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে পড়ে রইলেন তিনি । কোমর এরং গোড়ালিতে আঘাত লাগায় যন্ত্রণা হচ্ছিল । চারপাশে ঘুটঘুটে অঙ্ককার । শুধু অনেক ওপরে তাঁর পড়ে যাওয়ার গর্ত দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে । নীল

চ্যাটার্জির গলা শুনতে পেলেন তিনি, “এখন কয়েক দিন ওখানেই থাকুন। বাতাস যাতে পান, তাই ফাঁকটা বন্ধ করছি না। কিন্তু কোনও সারাও যদি আপনার সঙ্গী হয়, তা হলে তার থেকে দূরে থাকবেন।”

অমল সোম জবাব দিলেন না। নীলের গলা আর শোনা গেল না। তিনি বুবাতে পারলেন এই ফাঁদ পাতা হয়েছিল সারাও ধরার জন্য। গর্তটা গভীর। একটু নড়াচড়া করতে বুবাতে পারলেন চওড়া বেশি নয়। হাত লাগাতেই মাটি খসে পড়ল কিছুটা। এই দেওয়াল বেয়ে কী করে ওপরে ওঠা যায়! একবার ভাবলেন, চিংকার করবেন। জোরে চিংকার করলে নিশ্চয়ই সেটা অর্জুনদের কানে পৌঁছবে! যদি না পৌঁছয়, তা হলে খামোখা পরিশ্রম হবে।

খাঁচার মধ্যে তেমন অঙ্ককার ছিল না। বাইরের কালো কাপড়ের আড়াল ঘন ছায়া ফেলেছিল মাত্র। হাঁটু মুড়ে পড়েছিলেন মেজের। জ্ঞান হওয়ামাত্র উঠে বসতে গেলেন। সর্বাঙ্গে যন্ত্রণা শুরু হতেই বুবলেন তাঁর হাত-পা এখন বাঁধা। তিনি চিংকার করলেন, “অ্যাই, কে আছ এখানে? চটপট চলে এসো। আমাকে হাত-পা বেঁধে এখানে ফেলে রাখার মানে কী? হ্যাঁ! অ্যাই!”

কিন্তু কেউ সাড়া দিল না। বরং খটখট আওয়াজ কানে এল। তিনি মুখ ফেরাতেই জন্মটিকে দেখতে পেলেন। খাঁচার অন্য কোণে সিঁটিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মুখটা তাঁর দিকে ফেরানো। নিজের দুর্দশায় আর-একটি প্রাণীকে পড়তে দেখে বেশ অবাক হয়ে গেছে। মেজের কিছুক্ষণ তাকানোর পর যখন বুবাতে পারলেন প্রাণীটি সারাও, তখন বেশ উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। বিদেশে এর দাম এখন অনেক। যদিও প্রাণীটির শরীর এখনও রঙে ভেজা, তবু ওর গায়ে হাত বোলাতে খুব ইচ্ছে হল তাঁর। একটু এগোতেই যেভাবে ওটা মাথা নামিয়ে শিং খাড়া করল, তাতে সাহস পেলেন না তিনি।

মেজের জিভ দিয়ে একটা শব্দ করলেন। সেটা শোনামাত্র সারাও অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রাখল। একটু অপমানিত হয়ে চোখ বন্ধ করতেই আচমকা ফুলটার কথা মনে এল। বিষফুল। এখনও ফুটে রয়েছে। ওটা নির্বাত বিষফুল, নইলে মৌমাছিরা মরবে কেন? ওই গাছে দ্বিতীয় কোনও ফুল ফোটেনি। বৃষ্টি বা বড়ে যদি ফুলটা পড়ে যায়, তা হলে মহামূল্যবান জিনিস তিনি হারাবেন। তা হাড়া ওই ফুলের আয়ু কতক্ষণ, তাও তো তাঁর জানা নেই।

মেজের চিংকার শুরু করলেন। দু'বারের পর একটা লোক কাপড় সরিয়ে উকি মারল, “অ্যাই, চোপ্। পাঁঠার মতো চেঁচাচ্ছে। অথচ পাঁঠাটা চুপ করে আছে।”

কাপড় আবার ঠিক হয়ে গেল। মেজের এত অবাক হয়ে গিয়েছিলেন যে, করেক সেকেন্ড তাঁর চিন্তাশক্তিও অসাড় হয়ে গেল। হঠাৎ তাঁর কানে গাড়ির শব্দ চুক্তে তিনি নিজেকে ফিরে পেলেন। গাড়িটা এসে থামল একেবারে

কাছে । দরজা খোলার শব্দ হল । মেজরের একটা মহিলাকর্ত্ত্ব কানে এল, “নীল কোথায় ?”

॥ সতেরো ॥

গলা শুনে মেজর চমকে গেলেন । এই ঘন জঙ্গলে মহিলা কী করে আসবেন ? যদি কোনও সাহসিনী জঙ্গল দেখতে গাড়িতে চেপে আসেনও, তিনি ওই নীল চ্যাটোর্জিদের হাতে পড়ে বিপদ ডেকে আনবেন । মেজরের মনে হল, ভদ্রমহিলাকে স্তর্ক করে দেওয়া তাঁর কর্তব্য ।

তিনি উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করতেই খাঁচায় মাথা ঠুকে গেল । বেশ ব্যথা পেলেন । সেটা একটু সামলে উঠে খেয়াল করলেন আর মহিলার গলা শুনতে পাচ্ছেন না । অর্থাৎ এ-তল্লাটে উনি নেই । তিনি যে খাঁচায় বসে আছেন সেটা কেন যে খেয়ালে ছিল না, থাকলে ওই মহিলাকে তিনি বাঁচাতে পারতেন । আর তখনই সারাওটাকে তীব্র গতিতে তাঁর দিকে ছুটে আসতে দেখলেন তিনি । ওর মাথা নিচু করা, শিং তাঁর দিকে সোজাসুজি ।

সঙ্গে-সঙ্গে প্রচণ্ড জোরে চিংকার করলেন মেজর, “এই কী হচ্ছে ? অ্যাঁ । পাজি, ছুঁচো, বদমাশ । আমাকে টুঁস মারতে আসা হচ্ছে ? মেরে বাঁ পায়ের হাড় ভেঙে দেব তোমার ।” সন্তুষ্ট সেই চিংকার শুনে একেবারে তাঁর গায়ের কাছে এসে হকচিয়ে দাঁড়িয়ে গেল সারাও । বিপুল বিস্ময় ফুটে উঠল তার চোখে ।

মেজর চিংকার করল, “অ্যাঁই, কে আছ ? কাম হিয়ার, জলদি ।”

এবার কালো কাপড় তুলে একটা মুশু উকি মারল । তার মুখে কৌতুক ।

“অ্যাঁই । হয় ওকে, নয় আমাকে এখান থেকে বের করে দাও, কুইক !”

“কেন ?”

“কেন ! একটা মানুষকে খাঁচায় বন্দি করে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, কেন ? রাস্কেল ।”

“গালি দেবেন না বলে দিলাম ।”

“আলবৎ দেব, একশোবার দেব । তোর থেকে ওই সারাওটা বেশি বুদ্ধিমান ।”

“তা হলে থাকুন ওর সঙ্গে ।” লোকটা কালো কাপড় ফেলে চলে গেল ।

মেজর হতাশ হলেন । আপাতত তাঁর কিছুই করার নেই । অর্জুন অথবা অমল সোম নিশ্চয়ই তাঁকে এক সময় উদ্ধার করবে । ততক্ষণ বসে না থেকে শুয়ে পড়াই ভাল । মেজর পা ছড়িয়ে পাশ ফিরে শুলেন ডান হাতের কনুইয়ে মাথা রেখে । সারাওটা একমনে তাকে দেখে যাচ্ছিল । জন্মের সন্তুষ্ট মানবচরিত্র ভাল বোঝে । একটু পরে সেও শুয়ে পড়ল মেজরের কোল ধোঁয়ে । মেজর মনে মনে বললেন, “গুড বয় ।”

অর্জুন দ্বিতীয়বার চিংকার করতে দেয়নি ঘোষালকে। একবার গলা ফাটনোর পরই সে তার মুখে রুমাল গুঁজে দিয়েছিল, বাঁধার কাজটা সুন্দর করেছিল। ওরা আশঙ্কা করেছিল ঘোষালের চিংকার শুনে নীল ওপরে ছুটে আসবে। কিছুক্ষণ প্রস্তুত হয়ে থেকেও যখন তেমন কিছু হল না, তখন ওরা সামনের দিকে এগোল। ঘোষালকে দুটো পাথরের খাঁজে এমনভাবে ফেলে রাখল, যাতে সে কোনওভাবে বেরিয়ে আসতে না পারে।

ঢালের কাছে গাছের আড়ালে পৌঁছবার আগেই গাড়ির আওয়াজ কানে এল। ওরা অবাক হয়ে ওপর থেকে দেখল, দামি গাড়িটা তাঁবুর কাছে এসে দাঁড়াল। নীল, অমল সোম বা মেজরকে দেখা যাচ্ছে না। গাড়ির দরজা ড্রাইভার খুলে দিলে ওরা চমকে উঠল।

নিম টি এস্টেটের মিসেস ব্যানার্জি এরকম জায়গায় কেন এলেন! তিনি কি তাঁর ভাইয়ের এই সব কারবারের কথা জানতে পেয়ে বাধা দিতে এসেছেন? ভদ্রমহিলা গাছপালার আড়ালে হারিয়ে যাওয়ামাত্র সুন্দর বলল, “উনি হলেন মেমসাব। নীল সাহেবের দিদি।”

অর্জুন বলল, “এবার আমাদের নীচে যাওয়া উচিত! চলো।”

ওরা আর-একটু নীচে নেমে এল। এবার সেই ন্যাড়া জায়গাটা পেরিয়ে যেতে হবে। আর সেটা করতে গলে ওদের চোখে পড়ার সম্ভাবনা শতকরা পঁচানবই ভাগ। অর্জুন সুন্দরকে বলল, “একসঙ্গে যাওয়া উচিত হবে না। তুমি ওই দিক দিয়ে যুরে যাও। অমলদার কাছাকাছি থেকে সঙ্কেতে জানিয়ে দিয়ো সেটা। যাও।” সুন্দর দ্রুত সরে গেল।

এক দৌড়ে ফাঁকা জায়গাটা পার হতেই অর্জুন দেখতে পেল মিসেস ব্যানার্জি সামনেই দাঁড়িয়ে আছেন। তাকে ওইভাবে ছুটে আসতে দেখে খুব অবাক হয়েছেন মহিলা। কিন্তু মুখে কিছু না বলে তাকিয়ে আছেন দেখে অর্জুনই প্রথম কথা বলল, “আপনি এখানে?”

“প্রশ্নটা আমিই করছি। আপনি সেদিন ডিটেকটিভ অমল সোমের সঙ্গে আমার বাগানে গিয়েছিলেন, তাই তো? কিন্তু এখানে কী করছেন? ওটা তো ইতিয়া নয়, ভুটান। পাহাড় থেকে দৌড়ে নামলেন, কিছু হয়েছে কি?” মিসেস ব্যানার্জি জিজ্ঞেস করলেন।

“নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে। নইলে আমরা এখানে আসব কেন? আপনার ভাই...।” অর্জুন এবার নীলকে আসতে দেখল। এখনও একটু দূরে রয়েছে সে।

“হ্যাঁ বলুন, আমার ভাই কী করেছে?”

“উনি খুব মূল্যবান এবং নিষিদ্ধ প্রাণী এখান থেকে ধরে চালান দিচ্ছেন বিদেশে। এটা গুরুতর অপরাধ।” অর্জুন বলল।

“তাই নাকি? ঠিক আছে, ও যাতে কাজটা না করে, সেটা আমি দেখব। ও

এখানে এসেছে খবর পেয়েই আমি চলে এলাম । এবাব আপনারা ফিরে যেতে পারেন । ” মিসেস ব্যানার্জির কথা শেষ হওয়ামাত্র নীল পাশে এসে দাঁড়াল, “এই লোকগুলো আমার পেছনে লেগেছে দিদি, এদের চলে যেতে দেওয়া ঠিক হবে না । ”

মিসেস ব্যানার্জির গলা ওপরে উঠল, “তোমার সাহস খুব বেড়ে গেছে নীল । অনেক সহ্য করেছি, আর নয় । যাও, এই ছেলেটিকে গাড়িতে তুলে দিয়ে এসো । ”

নীল বাধ্য হল মেনে নিতে, “ঠিক আছে, চলুন । ”

“কিন্তু আমার সঙ্গে যাঁরা ছিলেন—” অর্জুন আপন্তি করল !

“তারা ওদিকেই আছে । আসুন । ” নীল কঠিন মুখে বলল ।

মিসেস ব্যানার্জি জিজ্ঞেস করলেন, “নীল, তোমার বন্ধু কোথায় ?”

“ওপরে আছে । ইডিয়টটার জন্যেই ঝামেলা বাড়ল । ” নীল ইশ্বরা করতে অর্জুন হাঁটতে লাগল । দিদির কথা নীল নিশ্চয়ই মান্য করবে । পেছনে নীল আসছে এবং ওর সঙ্গে অন্ত্র আছে । সে ঠিক করল নীল তাকে কোথায় নিয়ে যায়, দেখবে । পাহাড়ি পথ ধরে হাঁটছিল ওরা । মাঝে-মাঝে বুনো ঝোপ । হঠাতে সে ফাঁটাকে দেখতে পেল । গাছপাতায় গর্তের মুখ কখনও ঢেকে রাখা হয়েছিল, কিন্তু এখন তার খানিকটা সরে যাওয়ায় ফাঁদ বলে বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না । সে দাঁড়াতেই পেছন থেকে প্রচণ্ড ধাক্কা খেল । ব্যালাঙ রাখতে পারল না অর্জুন । টলমলিয়ে শুকনো ডালপালায় পা পড়তে শরীর নীচের দিকে নেমে গেল । অঙ্ককারে অনেকটা যাওয়ার পর সে আছাড় খেয়ে পড়তেই গলা শুনতে পেল, “হাড়গোড় ভাঙেনি তো ?” অমল সোমের গলা !

“অমলদা !”

“হ্যাঁ । আমার মতো তোমাকেও ট্র্যাপে ফেলেছে ওরা । বাইরের সাহায্য ছাড়া ওপরে ওঠার কোনও সুযোগ নেই । ”

মিসেস ব্যানার্জি গাছের নীচে দাঁড়িয়ে ছিলেন । নীল ফিরে আসামাত্র বললেন, “এসব আমার ভাল লাগছে না । ওরা এখানে আসছে জানতে পারলে...”

“জানতে পারলে কী করতাম ? কালকের মধ্যেই এক লট পাঠাতে হবে । ”

“অ্যাট লিস্ট ওদের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করে ম্যানেজ করা যেত । ” মিসেস ব্যানার্জি মাথা নাড়লেন, “ক'জন এসেছে ?”

“তিনজন । তিনটিকেই কবজা করেছি । আমেরিকায় যেটা থাকে, সেটাকে খাঁচায় রাখা আছে । ওকে বের করে ওই গর্তে ফেলতে পারলে চিন্তা থাকবে না । এ-জীবনে আর বের হতে পারবে না ওপরে । হাজার চিংকার করলেও সাড়া দিতে কেউ আসবে না এখানে । ”

“তোমার বন্ধু কোথায় ?”

প্রশ্ন শুনে নীলের খেয়াল হল। এসে চিন্কার করে ডাকল। তিনবারেও ওপর থেকে সাড়া এল না। নীল বিরক্ত হয়ে বলল, “ওকে আমি ঠিক ম্যানেজ করতে পারছি না। হয়তো পাহাড়ের ভেতরে কোথাও চলে গিয়েছে। দায়িত্বজ্ঞানহীন।”

“ওকে ছাড়া তো চলবে না। যাও, খুঁজে নিয়ে এসো।”

নীল বাধ্য হয়েই পাহাড়ে উঠতে লাগল। তার হাতে অস্ত্র। মনে-মনে সে ঘোষালকে গালাগাল দিচ্ছিল। এবার কাজটা হয়ে গেলে ঘোষালকে কাটাতে হবে। সে ওপরে উঠে এল। অনেকবার ডাকাডাকি করার পরও যখন সাড়া পাওয়া গেল না, তখন সে রিভলভারের ট্রিগার টিপল। পাহাড় কেঁপে গেল আওয়াজে, পাখিরা ডড়ল কিন্তু ঘোষালের সাড়া পাওয়া গেল না। পাথরের খাঁজে পড়ে-থাকা ঘোষাল নিজের নাম এবং গুলির শব্দ শুনতে পেয়েও সাড়া দিতে পারছিল না মুখ বন্ধ থাকায়। নীল তার খুব কাছে এগিয়ে এসেছে। সে প্রবলভাবে নড়াচড়া করতেই পায়ের যন্ত্রণা বেড়ে গেল।

বটপট শব্দ কানে গিয়েছিল নীলের। সে সর্তক চোখে চারপাশে দেখতে লাগল। ঠিক তখনই কিছু একটা তীব্র গতিতে ছুটে এসে তার কপালে আঘাত করল। চেষ্টা করেও মাথা সরাতে পারল না নীল। মুহূর্তেই পৃথিবীটা অঙ্ককারে ঢেকে গেল। দু’ হাতে মাথা চেপে হাঁটু মুড়ে বসে পড়তেই আর একটা পাথরের টুকরো তার কানের ওপর আঘাত করল। সে ছিটকে পড়ে গেল মাটিতে। রিভলভার পড়ে গেল একপাশে। নীল জ্ঞান হারাল।

সুন্দর দ্রুত দৌড়ে এল কাছে। তার খুব আনন্দ হচ্ছিল। নীলের পরনের জামা ছিড়ে ফেলে তাই দিয়ে দুটো হাত পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলল সে। পা দুটোও বাদ দিল না। তারপর রিভলভার তুলে নিল। এটা কী করে ব্যবহার করতে হয় সে জানে না। একটু ভেবে একটা পাথরের আড়ালে লুকিয়ে রাখল সেটা।

এত সব কাও ঘটে গেল ওপরে, কিন্তু ক্যাম্পের কাছে থাকা নীলের কর্মচারীরা তা টের পায়নি। তারা মেজরের কাণ্ডকারখানা নিয়ে হাসাহাসি করছিল। সুন্দর নীচে নেমে আড়ালে থেকে তাদের দেখল। সে অমল সোম বা অর্জুনকে খুঁজে পাচ্ছিল না। ওঁদের খবরটা দিলে এখনই সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। সে চিন্কার করে ডাকবে কি না ভাবছিল, ঠিক তখনই নাক ডাকার আওয়াজ পেল। যে খাঁচাটার কাছে সে দাঁড়িয়ে ছিল, শব্দ বের হচ্ছে সেখান থেকেই। ওটা যে নাক ডাকার শব্দ তা, প্রথমে ঠাওর করতে পারেনি সুন্দর। শেষ পর্যন্ত কোতুহলে কাপড়টা তুলতেই দেখল, পা ছড়িয়ে বসে মেজর ঝুমোচ্ছেন। তাঁর কোল যেমন শুয়ে রয়েছে সেই রং-করা পাহাড়ি ছাগলটা।

সুন্দর খোঁচা মারতেই মেজর হকচকিয়ে সোজা হলেন। ঠোঁটে আঙুল চেপে

তাঁকে শব্দ করতে নিষেধ করল সুন্দর। তারপর কাপড়ের আড়ালে-আড়ালে খাঁচার মুখটায় চলে গিয়ে দরজা খুলে দিল। মেজের দ্রুত বেরিয়ে এসে বললেন, “ধন্যবাদ।”

“কথা বলবেন না। লোকজন কাছেই আছে।”

মেজের ওকে অনুসরণ করে কিছুটা দূরে চলে আসামাত্র সেই ফুলটার কথা মনে করতে পারলেন। সঙ্গে-সঙ্গে তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়লেন ওই গাছটার কাছে যাওয়ার জন্য। তিনি বললেন, “তুমি বুঝতে পারছ না সুন্দর। ওই ফুলটার রহস্য আছে। ওটা আমাকে পেতেই হবে। এই রকম রহস্যের জন্যে পৃথিবী তোলপাড় করি আমি।”

যে মানুষটা একটু আগে খাঁচায় বসে নাক ডাকছিল, সে পৃথিবী কী করে তোলপাড় করে, বুঝতে পারল না সুন্দর। সে জিজ্ঞেসা করল, “ফুল কোন গাছে আছে?”

“ওই ওপাশে। অত বড় গাছে মাত্র একটাই ফুল। কিন্তু এত উচুতে আর ডাল খুব সরু বলে আমি উঠতে পারিনি। বাট আই মাস্ট ট্রাই এগেইন।”

মেজেরকে অনুসরণ করে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে কিছুটা যেতেই মেজের দাঁড়িয়ে পড়লেন, “হ ইজ শি? মিসেস ব্যানার্জি বলে মনে হচ্ছে, উনি এখানে কেন?”

“তা তো বলতে পারব না। তবে কাছে না যাওয়াই ভাল।”

“কিন্তু উনি তো খুব বিদুষী মহিলা। ভাইয়ের অন্যায় সমর্থন করেন না।”

“সমর্থন না করলে ভাই এত অন্যায় করার সাহস পায় কী করে?”

“ঠিক। কিন্তু উনি ওখানে দাঁড়িয়ে থাকলে আমি গাছটার কাছে যেতে পারব না। মুশকিল হয়ে গেল! ওই যে গাছটা দেখছ, ওর মগডালে ফুল ফুটেছে।”

মেজেরের কথা শুনে সুন্দর এ-পাশ ও-পাশে ঘুরে ঘুরে ফুলটাকে দেখার চেষ্টা করে বিফল হয়ে কাছাকাছি একটা গাছে উঠে গেল। বেশ কিছুটা ওঠার পর দূরের গাছের মগডালে ফুলটাকে দুলতে দেখল। এমন ফুল সে কোনও দিন দেখেনি। হঠাৎ মাথায় বুদ্ধিটা খেলল। সে গুলতি বের করে টিপ করল। সাঁ করে ছুটে গেল ছোট পাথরটা। বোঁটার একটু ওপরে আঘাত করতেই ফুলটা টুক করে খসে পড়ল নীচে।

মিসেস ব্যানার্জি উদ্বিগ্ন হয়ে নীচে দাঁড়িয়ে ছিলেন। হঠাৎ দেখলেন গাছের ওপর থেকে একটা ফুল খসে পড়ল নীচে। বেশ বড়সড় এবং নধর ফুল, যা তিনি কখনও আগে দেখেননি। ফুলটা এত টাটকা যে, বোঁটা খসে পড়ার কোনও কারণ নেই। তিনি একটু এগিয়ে গিয়ে ওটাকে তুললেন। তারপর মাথা তুলে দেখার চেষ্টা করলেন।

সুন্দর ঘাবড়ে গেল। মেমসাহেব যে ফুলটা কুড়িয়ে নিতে পারেন, তা ওর মাথায় আসেনি। এখন যদি তিনি ফুলটা না দেন, তা হলে মেজের তাকে...। সে দ্রুত গাছ থেকে নেমে এল, “আমি ফুলটাকে পেড়ে ফেলেছি।”

“পেড়ে ফেলেছ ? কোথায় ?” মেজর উত্তোজিত।

“মেমসাব তুলে নিয়েছেন। ওঁর সামনে পড়েছিল।”

“সর্বনাশ !” মেজর আর দাঁড়ালেন না। সুন্দর আপত্তি করছে জেনেও দৌড়ে গেলেন সামনে। মিসেস ব্যানার্জি ফুল হাতে দাঁড়িয়ে দেখলেন দাঙ্গিওয়ালা মোটাসোটা একটি মানুষ তাঁর দিকে দ্রুত এগিয়ে আসছে।

“এক্সকিউজ মি ম্যাডাম।”

“আপনি ?”

“আমি আপনার বাগানে মিস্টার সোমের সঙ্গে গিয়েছিলাম। আমি একজন অভিযাত্রী। আপনার হাতে যে ফুলটা রয়েছে, তার সন্ধানে এখানে এসেছি। অনুগ্রহ করে ফুলটা আমাকে দিন।” হাত বাড়ালেন মেজর।

“এটা কী ফুল ?”

“আমি নাম জানি না।”

“আপনি এখানে ফুলের সন্ধানে এসেছেন ?”

“হ্যাঁ।”

“আপনার সঙ্গীরা ?”

“ওদের আসার উদ্দেশ্য আলাদা। দিন।”

“আপনি এতক্ষণ কোথায় ছিলেন ?”

“খাঁচায়। আপনার ভাই আমাকে বন্দি করে রেখেছিল। ক্রিমিন্যাল অফিস।”

“কী করে বেরিয়ে এলেন ?”

“সেটা বলা যাবে না। দিন ফুলটা।”

“আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে। আমার ভাই এখনই ফিরে আসবে।”

“আপনার ভাই একজন ক্রিমিন্যাল। আপনি তাকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন ?”
মেজর চিৎকার করলেন, “আপনার স্বামী খুব শুদ্ধের মানুষ ছিলেন।”

“তাঁর সঙ্গে আমার ভাইয়ের কোনও রক্তের সম্পর্ক ছিল না।” বেশ অহঙ্কারী গলায় বললেন মিসেস ব্যানার্জি। মেজর ফাঁপরে পড়লেন। একজন মহিলার ওপর জোর খাটানো যায় না। হঠাৎ তাঁর মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল, “মিসেস ব্যানার্জি। এটা একটা অসাধারণ ফুল, প্যারিসের একটি বিখ্যাত ‘পারফিউম’ ওই ফুল থেকে তৈরি হয়। দশ আউন্সের দাম দেড়শো ডলার। দারুণ গন্ধ।”

মিসেস ব্যানার্জি ফুলটার দিকে তাকালেন। তারপর সেটাকে নাকের নীচে নিয়ে এসে স্বাণ নেওয়ার চেষ্টা করলেন। দ্বিতীয়বারেই তাঁর চোখ বন্ধ হল। মেজর লক্ষ করলেন ওঁর পা টলছে। মাটিতে পড়ার আগেই তাঁকে ধরে ফেললেন মেজর। ধীরে-ধীরে ঘাসের ওপর বসে পড়ে দু’ হাতে মাথা চেপে ধরলেন-মহিলা। আর ঠিক তখনই পেছনে হই-হই আওয়াজ উঠল। মেজর

চমকে পেছনে তাকালেন। কালোঁ'গোলার মতো কিছু ছুটে আসছে। কোনওমতে তিনি সরে দাঁড়াতেই সেটা মিসেস ব্যানার্জির শয়ীর ঘেঁষে বেরিয়ে গেল। কিন্তু আর্তনাদ করে উঠলেন মেজর। ছুটে যাওয়া সারাওয়ের পায়ের চাপে ফুলটা থেঁতলে গিয়েছে পুরোপুরি। ঘাসের সঙ্গে মিশে গিয়েছে বলা যায়। কোনও মতেই তাকে আর ফুল বলা যায় না।

পেছন-পেছন যারা ছুটে আসছিল, তারা এবার মেজর এবং সুন্দরকে দেখে থমকে গেল। মেজর চিংকার করলেন, “কে ওকে তাড়া করেছিল? কে? এগিয়ে এসো। আমি ধড় থেকে মুগুটা ছিড়ে ফেলব। শয়তানের দল সব।”

সঙ্গে সঙ্গে লোকগুলো উলটো দিকে দৌড়াল। কুমাল পেতে মেজর ফুলের অবশিষ্টাংশ তোলার চেষ্টা করলেন। আর তখনই চিংকার ভেসে এল। চাপা অস্পষ্ট মানুষের গলা। একাধিক। সুন্দর ছুটল।

ফরেস্ট বাংলোয় বসে কথা হচ্ছিল। ডি এফ ও সাহেব, থানার বড়বাবু, রেঞ্জারও আছেন সঙ্গে। ঘোষাল স্বীকার করেছে। নীল মুখ খোলেনি, কিন্তু ঘোষালের স্টেটমেন্ট তাকে বাঁচাতে পারবে না। অমল সোম বলছিলেন, “সবচেয়ে অবাক হয়েছি মিসেস ব্যানার্জির ভূমিকা দেখে। তিনি যে ভাইয়ের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন, আমি কল্পনা করিনি। তবে এবারে আমরা শেষ পর্যন্ত কী করতে পারতাম, তাতে সন্দেহ আছে। যা কিছু কৃতিত্ব, তা সুন্দরে। কী বলো অর্জুন?”

অর্জুন বলল, “হ্যাঁ। ও না থাকলে আমরা হয়তো আর ফিরতাম না।”

ডি এফ ও জিজেস করলেন, “সে কোথায়? আমি তাকে ফরেস্টে চাকরি দিতে চাই। ওর মতো লোক আমাদের দরকার।”

অর্জুন বলল, “সে এখন বুক ফুলিয়ে বাড়ির লোকের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছে। কিন্তু অমলদা, আপানি লক্ষ করেছেন, জঙ্গল থেকে ফেরার পর মেজর একদম চুপ করে গিয়েছেন। একটাও কথা বলছেন না।”

এককু দূরে বসা মেজর শব্দ করে নিশাস ফেললেন, “পরশমণি পেয়েও যে হারায়, তার দুঃখ তোমরা বুঝবে না হে। তবে মিসেস ব্যানার্জির কথা বলছিল মিস্টার সোম, ফুলেও যে বিষের গন্ধ থাকে, সেটা আর একবার প্রমাণিত হল, তাই না?”

গ্রন্থ-পরিচয়

কালাপাহাড় । মণ্ডল বুক হাউস ।

প্রথম সংস্করণ—আশ্বিন ১৩৯৮ । তৃতীয় মুদ্রণ—চৈত্র ১৩৯৯ ।

পৃ. ১৬৭, মূল্য ৩০.০০ ।

উৎসর্গ : এই বিশের কিশোর গোষ্ঠীকে

প্রচ্ছদ : গণেশ বন্দু ।

অলংকরণ : রঞ্চিয়া মজুমদার ।

অর্জুন বেড়িয়ে এলো । আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ।

প্রথম সংস্করণ—জানুয়ারি ১৯৯৩ । দ্বিতীয় মুদ্রণ—মার্চ ১৯৯৬ ।

পৃ. ১৪৪, মূল্য ৩৫.০০ ।

প্রচ্ছদ : অনুপ রায় ।

সূচি : অর্জুন বেড়িয়ে এলো, কার্ভালোর বাল্ল ।

রত্নগর্ভ । আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ।

প্রথম সংস্করণ—জানুয়ারি ১৯৯৪ ।

পৃ. ১১১, মূল্য ২৫.০০ ।

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : অনুপ রায় ।

ম্যাকসাহেবের নাতনি । আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ।

প্রথম সংস্করণ—জানুয়ারি ১৯৯৫ ।

পৃ. ১৪৯, মূল্য ৩৫.০০ ।

উৎসর্গ : অগ্রব মির্র মেহাম্পদেমু ।

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : বিমল দাস ।

ফুলে বিষের গন্ধ । আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড ।

প্রথম সংস্করণ—জানুয়ারি ১৯৯৬ ।

পৃ. ১৯৫, মূল্য ৫০.০০ ।

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : দেবাশিস দেব ।